গ্রন্থাগার

পঞ্চদশ খণ্ড : বৈশাখ–চৈত্র ১৩৭২

: সম্পাদক :

চঞ্চল কুমার সেন (বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২)
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (আষাঢ়—চৈত্র, ১৩৭২)

কলিকাতা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
১৩৭২

গ্রন্থাগার

পৃষ্ঠা সংখ্যা

নির্ঘণ্ট

পঞ্চদশ খণ্ড : ১৩৭২

নির্দেশিকা :

১ম অংশ : লেখক-আখ্যা সূচী : বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা প্রভৃতি পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত। বিন্যাস আভিধানিক তালিকা পর্যায়ের।

২য় অংশ : বিষয় সূচী : নির্দিষ্ট বিষয়-শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : বিভাগ সূচী : 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা, গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, চিত্র সূচী, পরিষদ কথা, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়।

নির্ঘণ্টটি সংকলন করেছেন সর্বশ্রী অমিতা মিত্র, গীতা মিত্র ও প্রীতি মিত্র।

লেখক-আখ্যা সূচী

বিষয় সূচী

বিভাগ সূচী

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিঠিপত্র

পরিষদ কথা

বার্তা বিচিত্রা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পঞ্চদশ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৭২ [প্রথম সংখ্যা

শতবর্ষের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারের কাহিনী

প্রমীল চন্দ্র বসু

[১৯৬৩ সালের জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা Library Herald এ প্রকাশিত The Story of a Century Old University Library প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীবিনয় ভূষণ রায়]

কলিকাতার সদাব্যস্ত কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া চলিবার কালে মনোরম কলেজ স্কোয়ারের শান্ত দীঘির বিপরীত দিকে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মীয়মান বিরাট দশতলা ভবনটি দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যেকেরই গতি বিস্ময়ে মন্দীভূত হইয়া আসে এবং ভবনটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইতেছে মনে সেই প্রশ্নের উদয় হয়। পর মুহূর্তেই গৃহগাত্রে স্থাপিত বার্ন কোম্পানীর ফলক হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

গৃহটির বিরাট আয়তন হয়ত ক্ষণিকের জন্য পথিকের মনে গ্রন্থাগারটির বিশালতা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু কি ভাবে গ্রন্থাগারটির উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি হইয়াছে সে সম্বন্ধে চিন্তা বা ধারণা করিবার অবসর খুব অল্প লোকেরই থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই কাহিনী সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৮৫৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাচীনতম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম সভা ১৮৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি সনদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় একটি আইন বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং উক্ত আইন ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাটের সম্মতি লাভ করে।

সূচনাবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানকরা অথবা গবেষণা পরিচালনা করা হইত না। তখন পরীক্ষা গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র কাজ ছিল। সুতরাং সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারের কোন জরুরী প্রয়োজন ছিল না। তাসত্বেও তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। ইহার প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রচিত উপবিধিতে রেজিস্ট্রারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তি সহ গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গ্রন্থ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় কারণ ১৮৫৭ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত সেনেটের সভায় রেজিস্ট্রারের উপস্থাপিত বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে ইতিমধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া হাউস কর্তৃক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবের মারফং কিছু গ্রন্থ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৭ পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশনের বিবরণী গ্রন্থ এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৭ সালের ক্যালেন্ডারও ছিল। ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট এবং বিভিন্ন ফ্যাকালটির অধিবেশনের বিবরণীও মুদ্রিত অবস্থায় গ্রন্থের আকারে রাখা হইত। সুতরাং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা এবং বাস্তবাকারে অন্ততঃ অল্প কিছু গ্রন্থের সমাবেশ শুরুকাল হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। নানা কারণে গ্রন্থাগার তখন আনুষ্ঠানিক এবং পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য।

(ক) তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা গ্রহন করা।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না। ক্যামাক ষ্ট্রীটের এক বেসরকারী গৃহে রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ছিল।

সিন্ডিকেটের সভা উপাচার্যের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। সেনেটের সভা কখনো বা উপাচার্যের গৃহে, কখনো টাউন হলে এবং কখনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব ছিল না।

শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটি নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর ফলে ১৮৬২ সালের ১৪ই জুন সেনেটের সভায় এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ ভবনে অন্যান্য বিভাগের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠকক্ষের জন্য স্থান সংকুলানের প্রস্তাবও একই সাথে গ্রহণ করেন।

১৮৭২ সালের শেষে ৪,৩৪,৬৯৭ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভবন (বর্তমানে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভবন নির্মিত হইতেছে) নির্মিত হয়। ১৮৭৩ সালের ১২ই মার্চ তারিখে সমাবর্তন উৎসবের সময় এই ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। ১৮৬৯ সালে উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০০ টাকা দান করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব সিন্ডিকেট কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে তাঁহার এই দান গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে জুন তারিখে রেজিষ্ট্রার সিন্ডিকেটকে জানান যে স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার উইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু গ্রন্থ দান করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বিখ্যাত ঈশান স্কলারশিপের প্রবর্তক ঈশান চন্দ্র বসু মহাশয়ের সংগ্রহ (collection) এবং বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য গ্রন্থকে মূল সংগ্রহ হিসাবে অবলম্বন করিয়া বিশ্বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি গড়িয়া ওঠে।

১৮৭৩ সালের ১লা মার্চ তারিখের সেনেটের সভায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়, এই কমিটির প্রথম কাজ ছিল ৬০০০ টাকা পরিমাণের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থ ক্রয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করা। এই কমিটি পরে গ্রন্থাগার কমিটি রূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং এর গঠন প্রণালী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে প্রদত্ত ৩৫০০ টাকা এবং পূর্বে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত দানের টাকা একত্র করিয়া গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই তহবিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ধৃত্ত তহবিল হইতে অর্থ সংযোজিত হইতে থাকে।

১৮৭৪ সালে গ্রন্থাগার কমিটির সুপারিশ ক্রমে স্থির হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি কলিকাতার তৎকালীন অন্যান্য গ্রন্থাগারের সমপূরক হিসাবে কাজ করিবে। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক যে সমস্ত সংস্থাকে সোসাইটির পত্র পত্রিকা প্রদত্ত হইত সেই তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় এবং সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচ্য গ্রন্থ সংগ্রহের একসেট এই গ্রন্থাগারকে দেওয়া হয়। ১৮৭৫-৭৬ সালে লাইব্রেরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কিছু গ্রন্থ গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা হয়। প্রথম অবস্থায় গ্রন্থাগার শুধু সেনেটের সদস্যগণই ব্যবহার করিতে পারিতেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে আশা করা গিয়াছিল যে লাইব্রেরী কমিটি গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিবে কিন্তু উক্ত কমিটির দুইজন সদস্য ইংল্যান্ডে চলিয়া যাওয়ায় উহা আর সম্ভব হয় নাই। পরের বছর গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সমূহের একটি ছাপান তালিকা এবং গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন প্রকাশিত হয়। ঐ সকল নিয়ম কানুনের মধ্যে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

"সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্বাচিত ন্যূনপক্ষে পাঁচজন সেনেটের স্থানীয় সদস্যের একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালিত হইবে।

রেজিষ্ট্রার পদাধিকার বলে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন।

কেবলমাত্র সেনেটের স্থানীয় সদস্যগণই গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিবেন।

লাইব্রেরী কমিটির সুপারিশ এবং সিন্ডিকেটের অনুমতিক্রমে সাহিত্যিক গবেষণার উদ্দেশ্যে কলিকাতাবাসী অপর কেহ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিবেন। গৃহে ব্যবহারের জন্য কাহারও নিকট কোন সময়েই দশ খানির অধিক গ্রন্থ থাকিবে না, এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ দুই মাসের মধ্যেই ফেরৎ দিতে হইবে। সেনেটের সদস্যগণ ছাড়া অপর ব্যক্তিদের সাহিত্যিক গবেষণার জন্য লাইব্রেরী কমিটির একজন সদস্যের সুপারিশক্রমে গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থ পাঠের অনুমতি দেওয়া হইলে তাঁহাদিগকে বেলা সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হইবে। গ্রন্থ ফেরৎ দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পত্রদ্বারা অবহিত হইবার পরেও কেহ গ্রন্থ ফেরৎ না দিলে বিলম্বে গ্রন্থ ফেরৎ দেওয়ার জন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট হারে জরিমানা দিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে গ্রন্থাগারের স্থান সমস্যা বিশেষ ভাবে উপস্থিত হয়। গ্রন্থাগারের স্থান সমস্যা মেটানোর জন্য ১৮৯৬ সালে সিন্ডিকেট সিনেট হাউসের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দুইটি কক্ষকে দ্বিতলকক্ষে পরিবর্তিত করিবার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা পুনর্মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগারের কার্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ ভাবে গ্রন্থাগারের কার্য সম্পাদনের জন্য ১৯০২ সালের জুন মাসে সিন্ডিকেট একজন অতিরিক্ত সহকারী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতককে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইবে। ঐ পদের বেতন হার ৫০ টাকা হইতে শুরু করিয়া বছরে ৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০ টাকা পর্যন্ত হইবে এবং নির্বাচিত কর্মীকে ১০০০ টাকা নিরাপত্তা দিতে হইবে।

গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির যত্ন লইবার জন্য মাসিক অনধিক ৯ টাকা বেতনে একজন নিম্নমানের কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থাও ঐ সময় করা হয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯০২ সালের ২১শে আগষ্ট হইতে শ্রীশরৎ চন্দ্র দে বি, এল, ঐ অতিরিক্ত সহকারী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা দেওয়া না হইলেও কার্যত তাঁহাকে গ্রন্থগারিকের সকল কার্যই করিতে হইত।

১৯০২ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। এই নতুন আইন অনুযায়ী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ব্যতীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়, এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার, ল্যাবরে-টারি, মিউজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি ১৯০৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে বলবৎ হইলেও ১৯০৬ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইবার পর হইতেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নবজাগরণ সূচিত হয়। ইহার ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সহায়ক হিসাবে গ্রন্থাগারের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। নূতন আইন অনুসারে প্রতি বৎসর দুইটি লাইব্রেরী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উহাদের মধ্যে একটিকে জেনারেল কমিটি বলা হইত। উহা উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও সেনেট কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইত। এই কমিটি সিন্ডিকেটকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মকানুন বিষয়ে সুপারিশ করিত, অপর কমিটিকে লাইব্রেরী এক্জিকিউটিভ কমিটি বলা হইত। উহা উপাচার্য, রেজিষ্ট্রার এবং জেনারেল কমিটি কর্তৃক মনোনীত ৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইত। ইহার প্রধান কাজ ছিল গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি ক্রয় করা। ১৯০৭ সালে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রথম লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়। তখন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং স্থানীয় রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটগণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার সুযোগ পান। ক্রমে ক্রমে এই সুযোগ ছাত্রদেরও দেওয়া হয়।

এই সময় আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য (Mr. K. A. Kanade) দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ কাজের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে কর্তৃপক্ষের নিকট একাধিকবার আবেদন করেন, কিন্তু তাঁহার এই আবেদন গৃহীত হয় নাই। ১৯০৭ সালে পুনরায় গ্রন্থাগারের স্থান সমস্যা দেখা দেয়। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা শ্রীরামেশ্বর সিং বাহাদুর গ্রন্থাগার ভবনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ, সংস্কৃত পুস্তক, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী ইত্যাদি ক্রয় করা হইত। ১৯০৯ সালে অধ্যাপক R. Pischel এর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সকল গ্রন্থাগারের জন্য দশ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। ঐ গ্রন্থ সংগ্রহে ঐ সময়ে ত্রিশ, চল্লিশ বছরের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রকাশিত পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল।

মার্টিন বার্ণ এন্ড কোম্পানী কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য নূতন ভবন (দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং) নির্মাণের কাজ ১৯০৯ সালে সুরু হয় এবং ১৯১১ সালে শেষ হয়। ১৯১২ সালে গ্রন্থাগার ঐ ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। দোতলার হলঘরটি ছাত্রদের পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হয়। নীচের তলার হলঘর ও তৎসংলগ্ন কক্ষগুলি এবং দোতলার হলঘর ও পার্শ্ববর্তী ঘরগুলি শীঘ্রই গ্রন্থে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।

এম, এ শ্রেণীর ছাত্রগণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণে বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই। প্রথম হইতে গড়ে দৈনিক ৪০ জন ছাত্র গ্রন্থাগারে পাঠ

করিত। প্রচুর স্থান সংকুলান হওয়ায় গ্রন্থ সকল বিষয় অনুসারে সাজান সম্ভব হইয়াছিল। ১৯১২ সালে নূতন গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১১-১২ সালের বাজেটে ৬০০০ টাকা গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯১২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত এককালীন দান ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। গ্রন্থাগারের আয়তন বৃদ্ধির সাথে স্যাথ ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন সহকারী কর্মী নিযুক্ত করা হয়, উহাদের মধ্যে একজনের মাসিক বেতন ৩০ টাকা ছিল। এবং অপর দুইজনের মাসিক বেতন ২৫ টাকা ছিল। দিনে দিনে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাঠকক্ষের দৈনিক ছাত্র সংখ্যা ক্রমে গড়ে ১০০ জন হয়।

গ্রন্থাদির সূচীকরণের জন্য ১৯১৪ সালে সিণ্ডিকেট একজন সহগ্রন্থাগারিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপযুক্ত প্রার্থী না থাকায় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী সম্ভব হয় নাই। ১৯১৫ সালে একজন যুগ্ম গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু ওই প্রস্তাবও কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯১৫ সালে রসায়ন বিভাগের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত অধ্যাপকের অনুরোধে গ্রন্থাগার হইতে রসায়ন সম্বন্ধীয় গ্রন্থসকল রসায়ন বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাই বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপনার প্রথম প্রচেষ্টা।

জাষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ে ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ৮ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পূর্ণ ভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারেও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। ১৯১৬ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ আমেরিকা বাসী Mr. A. D. Dickinson ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিবের নিকট এক পত্রে লিখিয়া জানিতে চাহেন যে তাঁহাকে কোন ভারতীয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত করা সম্ভব কিনা! ইতিপূর্বে Dickinson পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি পুনর্গঠিত করিয়া গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই পত্রখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সিণ্ডিকেটে এই পত্র আলোচনা করা হয় কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

১৯১৬ সালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনার জন্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রায় ২০টি বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠনপাঠন ও গবেষণা কার্যের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী শুরু করার পর এবং গবেষণা বিভাগ স্থাপনের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব প্রচুর

পরিমানে বৃদ্ধি পায়। ছাত্রদের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার সকাল ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্ররা এই গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাইত; বাড়ীতে বই লইতে পারিত না। ১৯১৮-১৯ সালে ছাত্রদের জন্য একটি লেন্ডিং লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ঐ লাইব্রেরীর কাজ প্রকৃত পক্ষে ১৯১৯-২০ সাল হইতেই শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে লেন্ডিং লাইব্রেরীর জন্য স্থান সংকুলান প্রথমেই এক সমস্যা হিসাবেই উপস্থিত হয়। অবশেষে দ্বারভাঙ্গা ভবনের নীচের তলার হল ঘরে লেন্ডিং বিভাগ তখনকার মত স্থাপিত হয়। যদিও স্থানাভাব ও অন্ধকার থাকায় হলটি গ্রন্থ রাখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিলনা। লেন্ডিং বিভাগের তত্বাববানের জন্য কয়েকজন কর্মীও নিযুক্ত করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সর্বপ্রথম রসায়ন বিভাগে বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ফলিত গণিত ইত্যাদি বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতে দূরে স্থাপিত হওয়ায় ১৯১৭ সালে উক্ত বিভাগ সকলের সাথে সাথে একটি করিয়া বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ঐ সব গ্রন্থাগার সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকিত। ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের সুপারিশ অনুসারে গ্রন্থ ব্যবহার করিতে পারিত। ক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অন্যান্য নূতন নূতন বিভাগ স্থাপনের সাথে সাথে বিভাগীয় গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইতে থাকে। অবশ্য যে সমস্ত বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এলাকার ভিতর অবস্থিত ছিল উহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা করা হয় নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত পৃথক একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথমাবধি ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে একটি প্রসস্থ হলঘর নির্দিষ্ট করা ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ স্থাপনের সাথে সাথে বিভাগীয় গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এলাকায় স্থানাভাবের জন্য কলা বিভাগের শিক্ষা ও অর্থনীতি এই শাখা দুইটি পরবর্তী কালে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে।

ফলে অনিবার্য কারণে উহাদের সাথে দুইটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ সৃষ্টির প্রথম দিকে বাংলা পান্ডুলিপি ও সংস্কৃত পান্ডুলিপি লইয়া দুইটি পৃথক পান্ডুলিপি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল। সেগুলির ও বর্তমানে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই ভাবে ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ২৪টি বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে মূল গ্রন্থাগারটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রূপে পরিচিত। দৈনন্দিন পরিচালনার ব্যাপারে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি সাধারণত নিজ নিজ বিভাগীয় অধ্যাপকদের অধীন। তবে ইহাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা ক্রয়, প্রাথমিক গ্রন্থ সূচী প্রণয়ন গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীন। এই সমস্ত গ্রন্থাগার ১৯৫১ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলী

বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী কমিটির পরিচালনাধীন। ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে এই কলেজেও একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ঐ গ্রন্থাগার অবশ্য আইন কলেজের পরিচালক সভার কর্তৃত্বাধীন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হইতে শরৎ চন্দ্র দে মহাশয়ের অবসর গ্রহনের পর তাঁহার স্থলে শ্রীবসন্ত বিহারী চন্দ, এম, এ মহোদয়কে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের পদে ও মর্যাদায় নিযুক্ত করা হয় এবং ইনিই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা প্রাপ্ত হন। ঐ সময় ঐ পদের বেতনের হার ছিল ১০০-১০-১৫০। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন এবং গবেষণার কার্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগারের আয়তন ও কার্যও বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রন্থাগারের জন্য পুনরায় স্থানের অভাব দেখা দেয়। ১৯২৭ সালে গ্রন্থাগারের স্থান সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৩৪ সালে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি ঐ পদ গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি দেন। তখন আশুতোষ ভবনের চতুর্থ তলায় কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে কয়েকটি কক্ষ ছিল। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় চতুর্থ তলার বাকি অংশে গৃহ নির্মাণের দিকে মনোযোগ দেন এবং এইজন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ইতিপূর্বে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য স্থাপিত লেণ্ডিং লাইব্রেরীটি দ্বারভাঙ্গা ভবনের নীচের তলা হইতে আশুতোষ ভবনের নীচের তলায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান গ্রন্থাগারিকের (যিনি তখন গ্রন্থাগারের একজন অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন) এক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার এবং স্নাতকোত্তর লেণ্ডিং লাইব্রেরী দুইটিকেই আশুতোষ ভবনের চতুর্থতলায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থান পরিবর্তনের কাজ এপ্রিল মাসে শুরু হয় এবং গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে শেষ হয়। ১৯৩৫-৩৬ সালের একাডেমিক সেসন হইতে নূতন স্থানে গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়। নূতন গ্রন্থগৃহে দেড় লক্ষ গ্রন্থ রাখিবার জন্য কাঠের সেলফ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সুতরাং গ্রন্থাগারের তখনকার অনুমানিক একলক্ষ গ্রন্থসংখ্যার পক্ষে ঐ গ্রন্থ গৃহে স্থান সংকুলানের কোন অসুবিধা হয় নাই। ছাত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পাঠককে গ্রন্থগৃহে অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইল। সুপ্রশস্ত পাঠকক্ষটি যাহাতে ৩০০ ছাত্র এক সঙ্গে বসিয়া ব্যবহার করিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইল। পাঠকক্ষের দেওয়ালে প্রায় ঐতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনের চিত্র (ফ্রেস্কো) অঙ্কন করিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা হইল। তথাপি এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু অসুবিধা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। গ্রন্থাগারটি আশুতোষ ভবনের সর্বোচ্চতলায় অবস্থিত হওয়ায় এবং তাপ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্যতাপে তপ্ত হইয়া উঠে। ইহার ফলে শুধু যে পাঠকদের পড়াশুনার অসুবিধা হয় তাহা নহে, গ্রন্থ সকলও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে নির্মিত নহে এইরূপ

একটি ভবনে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হয় ফলে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বন্দোবস্ত সর্বপ্রকারে সন্তোষজনক করা সম্ভব হয় নাই, গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ গ্রন্থগৃহে কৃত্রিম আলোকের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই, উপাচার্য শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত মানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সালে দুইটি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থাগারিক বিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত দুইজনকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ সালে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মহাশয় ইউরোপ হইতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের ডিপ্লোমা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার উদ্যোগে গ্রন্থাগারে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়, এবং নানাভাবে গ্রন্থাগারটিকে আধুনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দুইটি সহ গ্রন্থাগারিক পদের একটিকে ক্রমে উপ গ্রন্থাগারিক পদে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৪ সালে ডাঃ রায় বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে উপ গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তখন হইতে বর্তমান লেখক ঐ পদে নিযুক্ত আছেন।

১৯৫১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য লাইব্রেরী জেনারেল ও লাইব্রেরী এক্‌জিকিউটিভ কমিটির স্থলে তিন বৎসরের মেয়াদে একটি মাত্র লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় পদাধিকার বলে উহার সভাপতি। কোষাধ্যক্ষ, রেজিষ্ট্রার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিভিন্ন কলেজের দুইজন সহসভাপতি, দুইজন সম্পাদক, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত কাউন্সিলের দুইজন সভ্য এবং সেনেটের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সেনেটের সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত। পূর্বের লাইব্রেরী কমিটি দুটিতে লাইব্রেরিয়ানের কোন সদস্যপদ ছিল না, গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে বর্তমান কমিটির সদস্য ও সচিব এবং সরাসরি উপাচার্যের কর্তৃত্বাধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগার বর্তমানে এই কমিটির অধীন। সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে নানা ধরণের ক্রম বর্ধমান পাঠক কর্তৃক গ্রন্থাগারের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে অপরদিকে ইউ, জি, সি, ভারত হুইটলোন পরিকল্পনা প্রভৃতির বদান্যতায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সেকসনকে দেশের অভ্যন্তরের ও বিদেশের বিদ্যানুরাগীদের এবং গবেষকদের সেবার কার্যে সর্বসময় ব্যপ্ত থাকিতে হয়। নানা ধরণের পরিকল্পনা, বিবরণ, সংখ্যাতাত্বিক হিসাব নানা উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রস্তুত করিতে হয়। বিভিন্নমুখী সর্বপ্রকার কার্যের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত কর্মীর অভাব। অন্যত্র অধিকতর আকর্ষনীয় কর্মের সুযোগ থাকায় ক্রমাগত কর্মী পরিবর্তন বর্তমান কালের আর একটি প্রধান অসুবিধা।

অচল হয়ে গেল। পাতাগুলিকে আঠা লাগিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। পুথির যুগেও যে এধরনের বাধাই একেবারে হতোনা তা নয়। Reims-এর ধর্ম মন্দিরে Guy de Roye যে বইগুলি ১৪০৯ সালে দান করেন সে বই গুলির মধ্যে এ-ধরনের বই কিছু দেখতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ বইগুলির মলাট Board-এর কিন্তু এগুলি ব্যাতিক্রম মাত্র, বোর্ড-বাঁধাই প্রচলিত ছিল না।

ক্রমশঃ ছাপাখানা থেকে যেমন বেশী সংখ্যায় বই ছেপে বার হতে থাকল, বাঁধাইয়ের খরচ কমতে থাকল এবং বই যাতে সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বই বাঁধাই হতে থাকল। ১৪শ শতাব্দীতে Flanders-এ চামড়ার উপরে যন্ত্রের দ্বারা একটি একটি করে অলঙ্কার করার পরিবর্তে একেবারে এক ফলক থেকে চাপদিয়ে চামড়ার উপরে নক্সা তুলে বাঁধাই অলঙ্কৃত করা হতে থাকল। এ ধরনের নক্সা তুলে বাঁধাইয়ের খরচ কম হতো সে জন্য এধরনের বাঁধাই ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত খুব প্রচলিত হয়েছিল। ১৪৮০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে পুরান টেকনিকে বাঁধাইয়ের পরিবর্তে এধরনের বাঁধাই চালু হলো। এধরনের বাঁধাইয়ের জন্য Denis Roche (১৪৯০—১৫১৮) ও Andre´ Boule-এর নাম বিশেষ পরিচিত। ফলকের পরিবর্তে নক্সা তোলবার জন্যে বেলনও ব্যবহার হতো। ১৪৫০ সাল থেকে বেলনের দ্বারা বইয়ের মলাটের উপর জালির ন্যায় নক্সা করা হতো। ক্রমশঃ প্রায় ৫০ বছর পরে বেলনের দ্বারা বইয়ের মলাটের উপর নানা ধরনের নক্সা তোলা হতে থাকল। ১৫৩৫ সালে ফ্রান্সে বাঁধাইয়ের উপর এধরনের নক্সা চালু হলো এবং কিছু পরে চালু হলো ইংলণ্ডে।

এদিকে ইতালীতে বই বাঁধাই সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিতে লাগল। মুসলমানেরা বহু আগে থেকেই বোর্ডের উপর পাতলা চামড়া দিয়ে বই বাঁধাত এবং এধরনের বাঁধাইয়ের উপর তারা সোনালী দিয়ে নানা ধরনের নক্সা করতো। চামড়ার উপরে সোনালীর পাতা রেখে নক্সা তোলা লোহা উত্তপ্ত করে চাপ দিয়ে তারা বইয়ের মলাটের উপর নক্সা করতো। এ ধরনের বাঁধাই ১৫দশ শতাব্দীতে আশ্চর্য্য ভাবে জনপ্রীয় হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের কাজ হতো পারস্য দেশে; পারস্য দেশ থেকে যায় তুর্কিতে। ১৫ দশ শতাব্দীর শেষের দিকে নেপল্‌স্‌-এ গিয়ে পৌছায়। নেপলসে Baldassare Scariglia ১৪৮০ সালে Hispano-Moorish ও ভেনিসের অলঙ্কার অনুকরণ করে বাঁধাইয়ের উপর সোনালী কাজ করে। ভেনিসে এ-সময়ে পারস্য দেশীয় অলঙ্কারের অনুকরণে arabesque-এর দ্বারা বাঁধাই অলঙ্কৃত করা হতো। এ ধরণের অলঙ্কৃত বঁধাই করা হতো ধনী Jenson, Pierre Ugel-heimer-এর জন্য। Alde´ই প্রথম publishers binding সুরু করে, মরক্কো চামড়ায়। তা ছাড়া নিজের কারখানায় নামকরা ব্যক্তিদের জন্য সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত করা বই বাঁধান হতো। Alde´র পূর্বে কোন প্রকাশক বা মুদ্রাকর নিজেরা বই বাঁধাত না। ছাপা কাগজগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন লোককে বিক্রি করে দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বই বাঁধাই হয়ে বিক্রি হতো ফলে একই স্থানে ছাপা বই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লোকের কাছে বিক্রি হতো।

১৫২৪ সালে ফ্রান্সে প্রথম বাঁধাইয়ের উপর সোনালী দিয়ে কাজ করবার প্রচেষ্টা হয়।

প্রথম Bis-তে রাজ-দরবারের বাঁধাইয়ের কাজের জন্য একটি কারখানা খোলা হয়। এই কারখানায় বাছুরের চামড়ার বাঁধাইয়ের উপর পুরাতন Stamping-এর সঙ্গে সোনালীর কাজ সুরু হ'লো। ১৪৯৯ থেকে ১৫২২ পর্য্যন্ত ফরাসী পুস্তক প্রেমিকরা Milan থেকে সোনালী কাজ করা বাঁধাই বই সংগ্রহ করতো। এ সব বই সাধারণত Morocco চামড়ায় বাঁধাই। কিন্তু Pavia'র ধ্বংসের পর Jean Grolier ফ্রান্সে এলেন। ইনি ছিলেন Alde'র রক্ষক। Grolier'র আমল থেকে ফ্রান্সে বাঁধাইয়ের নতুন যুগ সুরু হলো। ফ্রান্সের দপ্তরিরা প্রথমে প্রথমে ইতালীয় বাঁধাইয়ের অনুকরণ করতে থাকল, কিন্তু ক্রমশঃ বাঁধাইয়ের পরিবর্তন হতে থাকল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঁধাই একেবারে নতুন রূপ নিল। এ সময়ে ঐতিহাসিক ঘটনা ফ্রান্সের দপ্তরিদের সহায় হলো। ফ্রান্সের রাজা ও পারস্যের সুলতানের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে Levant morocco অর্থাৎ পুর্বদেশীয় মরক্কো ফ্রান্সে আসতে সুরু হলো। মরক্কো চামড়া রেশম ও ভেলভেটের বাঁধাইয়ের স্থান অধিকার করলো।

মরক্কো চামড়ায় প্রথম রাজকীয় বাঁধাই Estienne-এর ২ খণ্ডে বাইবেল। Estienne Roffet প্রথম রাজার দপ্তরি হন ১৫৩৯ সালে। পরে ১৫৪৮ সালে তার মৃত্যুর পর ঐ পদে বসে Claude de Picques। এদের কারখানার আশে পাশে, পারীতে এবং Lyon সহরে Jean Grolier'র জন্য বা তার প্রতিদ্বন্দ্বি Thomas Mahieu (maioli)'র জন্য আরোও বই বাঁধাইয়ের কারখানা খোলে। এই সময়ে Mosaic বাঁধাইয়ের সুরু হয়।

Grolier-এর বাঁধাইয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এই সময়ে Geofroy Troy, arabesque style-এ বাঁধাই সুরু করে। তার বাঁধাইয়ের অলঙ্কারে থাকত একটি ভাঙ্গা-পাত্র এবং কয়েকটি বক্ররেখায় সংমিশ্রনে অলঙ্কার।

ইংলণ্ডে Henry viii-এর দপ্তুরি ১৫৪১-১৫৪৩ সালে ভেনিসের বাঁধাই প্রচলিত করে কিন্তু ১৭ দশ শতাব্দীর পূর্বে ইংলণ্ডে Morocco চামড়ার দ্বারা বাধাই প্রচলিত হয়নি।

জার্মানীতেও Grolier'র বাঁধাই প্রচলিত হয়েছিল। ১৫৬৬—১৫৮৯ পর্য্যন্ত Jacob Kraus, Germany'তে অতি সুন্দর ভিনিসীয় বাঁধাই প্রচার করে। তবে Kœnigsberg-এর স্যাকরাদের সাহায্যে জার্মানীতে এ সময়ে রূপালীর-উপর অলঙ্কৃত বাঁধাই প্রচলিত হয়েছিল।

১৫৬০ সালে ফ্রান্সে বেশী চলত "Semis" বাধাই। এই বাঁধাইয়ের উপর নামের আদ্যাক্ষর বা বংশপরিচয়ের নিদর্শন ছাপা হতো। কিন্তু খুব দামী বাঁধাইয়ের উপর যে অলঙ্কার থাকত তাকে বলা হতো "Fanfare"—এ ধরনের বাঁধাইয়ের অলঙ্কার সাধারণতঃ কতগুলি জ্যামিতিক নক্সা ও লতাপাতার সমন্বয়।

এই সময় Nicolas Eve-এর বাঁধাই Eve binding নামে প্রচলিত হয়। Nicolas Eve ছিলেন রাজ-দপ্তরি। পরে তার পুত্র Clovis রাজদপ্তরি হন।

১৬৬২ সালে ফ্রান্সে বাঁধাই যে রূপ নিল সে বাঁধাই ফ্রান্সে ancien régime অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের সুরু পর্য্যন্ত চলেছিল; বাঁধাই হতো বাছুরের বা ভেড়ার চামড়ায়— পুটের শিরাগুলি সোনালীর কাজ করা এবং মলাটের উপর থাকত বইয়ের মালিকের বংশের

নিদর্শন এ ধরনের বাঁধাইকে বলা হতো à la du Seuil এধরণের বাঁধাই প্রচলিত ছিল ১৪দশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত। এ সময়ে "Gascon" নামে পরিচিত আর এক ধরনের বাঁধাই প্রচলিত ছিল। এ ধরনের বাঁধাইয়ে মলাটের উপর বক্ররেখা ও বিন্দুর সংমিশ্রনে কাজ করা হতো। Florimond Badier (১৬৪৫) আর এক ধরনের বাঁধাই চালু করে। এ ধরনের বাঁধাই Holland-এ এবং পরে Charles II (১৬৬০)-এর আমলে England-এ প্রচলিত হয়েছিল। এ ধরনের বাঁধাই "Cottage" নামে পরিচিত ছিল। এ ধরনের বাঁধাই ফুল ও লতাপাতার অলঙ্কৃত হতো। ১৬দশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাঁধাইয়ের অলঙ্কার প্রায় উঠে যায় কারণ এ সময়ে ফ্রান্সে ছিল Jansenist দের যুগ, অর্থাৎ সংযমের যুগ।

১৭১২ সালে Antoine Michel Padeloup ফ্রান্সে রাজ দপ্তরি নিযুক্ত হয় এবং "Fanfare" বাধাই পুনর্জ্জিবীত করে এবং এ বাঁধাইয়ের কিছুটা পরিবর্তনও করে। মলাটের কোন গুলিতে মোজাইকের কাজের উপর নানাধরণের ছোট ফুলের অলঙ্কার থাকত।

১৭৩৭ সাল থেকে সুরু হলো চিকনের কাজ। সারা ইউরোপে বাঁধাইয়ের উপর চিকনের কাজ প্রায় ৫০ বছর প্রচলিত ছিল। এ ধরণের বাঁধাইয়ে Padeloup ছিল সুনিপুণ। Padeloup-এর পর আসে J. A. Derome.

ইংলণ্ডে Roger Pyne (১৭০৯-১৭৭৭) চিকণের কাজযুক্ত বাঁধাইয়ের জন্য বিখ্যাত। *ইনি বই বাঁধাইয়ের জন্য রুশদেশীয় মরক্কো ব্যবহার করতেন।*

আধুনিক-যুগ :—আধুনিক যুগে বই বাঁধাইয়ের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। ১৮০০ সাল থেকেই বই সেলাই করে, ছাপা মলাট দিয়ে বাঁধাই করে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল—সে বইগুলি এখন কৌতুহলোদ্দীপক বই বলে পরিগণিত হয়। ছাপা মলাটে বাঁধাইয়ের সূত্রপাত হয় ফ্রান্সে রোমান্টিসিজ্‌ম-এর যুগে। ইংলণ্ডে সুরু হয় Publisher's Casing এবং প্রথম সুরু করে Pickering। ১৮২০ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে এ ধরণের বাঁধাইয়ের উৎকর্ষ সাধন করে। Lieghton (১৮৩২—পুটে সোনালীতে নাম ছাপা থাকত)। পরে Sherwin ও Cooper বইয়ের মলাট ছাপার জন্য ছাপার যন্ত্র বার করে। ফ্রান্সে ইংলণ্ডীয় বাঁধাই চালু করে ১৮৪০ সালে Engel ও Mame। এই সময়ে সেলাইয়ের যন্ত্র, কাগজ ভাঁজ করবার যন্ত্র এবং Casing-এর যন্ত্র বার হয়। এই সব যন্ত্রের দ্বারা বাঁধাইয়ের সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছে। ইংলণ্ডে, Germanyতে ও রুশদেশে।

চামড়ার পরিবর্তে কাপড়ের বাঁধাই, আধুনিক যুগে বাঁধাইয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

বাঁধাইয়ের ব্যবহারিক ক্ষেত্র

পুরান বই বাঁধাই :—পুরাতন বাঁধাই করা বই নতুন করে বাধাবার সময়, পুরাতন বাঁধাইকে যথাসম্ভব বজায় রেখে বাধাই করা প্রয়োজন। পুস্তক বিজ্ঞানীরা জানেন পুরান বাধাই করা বইকে নতুন করে বাঁধাবার সময়, পুরাতন বাঁধাইকে বজায় রাখা বইখানির ইতিহাসের দিক থেকে কত প্রয়োজন। পুরাতন বাঁধাইয়ের তারিখ থাকতে পারে, বাঁধাইয়ের সহিত সংযোজিত কাগজে পুস্তকের মালিকের স্বাক্ষর থাকতে পারে, এবং মালিকের নিজের হাতে লেখা,

বইখানি সম্বন্ধে টীকা থাকতে পারে। সুতরাং নতুন করে বাঁধাইয়ের সময় বইখানি সম্বন্ধে এই সব সন্ধানগুলি বজায় রেখে বাঁধাই করা প্রয়োজন।

বাজারে একখানি বই তার আসল রূপে (mint condition) দাম খুব বেশী। তবে পুস্তক প্রেমিকদের কাছেই সে সব বইয়ের দাম—তারা চেষ্টা করবে বইখানিকে তার আসল রূপে বজায় রাখতে। আধুনিক গ্রন্থাগারে এভাবে বই রাখার কোন মূল্য নেই, এবং এ ধরনের বই রাখারও কোন মূল্য নেই কারণ এসব বই ব্যবহারের দিক থেকে মৃত কিন্তু Curio হিসাবে দামী।

বাঁধাই ছিড়ে গেছে এ ধরণের বই বাঁধান প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজন বোধে পুরাতন বাঁধাইকে বজায় রেখে নতুন করে বাঁধাই করা যায়।

একখানি বইয়ের সম্পূর্ণ বাঁধাইকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়: বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিকে একত্রিত করে বেঁধে মলাটের সংগে সংযুক্ত করা (forwarding) এবং শেষ কাজ করা (finishing)।

প্রথম বইখানির পৃষ্ঠাগুলিকে আলাদা করে, ছেঁড়া অংশ সারিয়ে আবার পাতাগুলিকে পত্রাঙ্ক ও স্বাক্ষর অনুযায়ী একত্রিত করে এবং পুস্তকের গোড়ায় ও শেষে সাদা কাগজ দিয়ে শেলাই করবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। কাগজের ভাঁজ করা স্থানগুলি কমজোরী হয়ে থাকলে সেখানে পাতলা ও শক্ত কাগজ দিয়ে সারিয়ে নিতে হয়

বইকে অর্থাৎ পৃষ্ঠাগুলিকে একত্রে শেলাই করা হলো বই বাঁধাইয়ের আসল কাজ। বইয়ের গোড়ার ও শেষের সংযুক্ত করা কাগজের সহিত বা চামড়া বা কাগজের কব্জা, বইয়ের সকল ফরমা বা বইয়ের পুটের সহিত শেলাই করা দরকার।

বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিকে বা ফরমাগুলিকে সাধারণতঃ মোটা দড়ির উপর বা ফিতার উপর শেলাইয়ের দ্বারা আটকে রাখা হয়। পূর্বে সুতার দ্বারা কাগজের ভাঁজের মাঝখানে শেলাই করা হতো এখন একটি সুতার দ্বারাই সারা বইয়ের পুটে সেলাই করা হয়।

যে ফিতা বা যে দড়ির উপর শেলাই করা হবে এবং যে সুতার দ্বারা শেলাই করা হয় তা শক্ত এবং স্থায়ী হওয়া দরকার কয়টি ফিতে বা দড়ি লাগবে তা নির্ভর করবে বইয়ের আকারের উপর। এই দড়ি বা ফিতা পুস্তকের পুট যত পুরু তা অপেক্ষা কিছুটা বেশী লম্বা হওয়া দরকার কারণ ফিতা বা দড়ির দুটি প্রান্ত বইয়ের মলাটের সংগে সংলগ্ন করতে হবে। শেলাই করবার জন্য সুতাটি বইয়ের ফরমার ভিতর দিয়ে ও দড়ি বা ফিতার সহিত ফরমাগুলিকে সংলগ্ন করে কি ভাবে যাবে তার ছবি নিচে দেওয়া হলো। দড়ি বা ফিতা বইয়ের পুটে দুই

দড়ি বা ফিতার উপর শেলাই

ভাবে লাগান হয়। বইয়ের পুটকে করাতে করে কিছুটা কেটে নিয়ে দড়ি বা ফিতাকে সেই কাটা অংশের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় (Sunken chords বা bands) না হয় পুটের উপরেই ফিতা বা দড়িকে আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয় (raised bands)। সেলাইয়ের সুতাটি

পুটের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যায়—পরে চেনের ন্যায় (Kettle Stitch) শেলাইয়ের দ্বারা একটি ফরমা থেকে, পরের ফরমার মাথায় এবং এই ফরমার পায়ের দিক থেকে অন্য ফরমার পায়ের দিকে যায় ফলে পুটের শীর্ষে এবং পাদদেশে দুটি চেন শেলাই পড়ে। সম্পূর্ণ শেলাইটিকে ইংরাজী ভাষায় বলে all-along। এ ভাবের শেলাই যন্ত্রের দ্বারা হয়না, হাতে করতে হয়। একখানি বইকে আলাদা করে ভালো ভাবে বাঁধাবার জন্যে এই একমাত্র উপায়। বই মোটা এবং ভারি হলে একটীর স্থলে পুরাকালে দুটি করে দড়ি ব্যবহার করা হতো।

Kettle Stitch

All-along
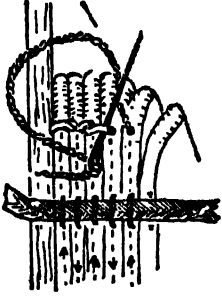
মলাটের সহিত সংযুক্ত করবার পূর্বে সারা বইখানিকে সেলাই করা হয়। যে দড়ির উপর সেলাই করা হয় সেই দড়ির প্রান্তগুলির পাক খুলে ফেলা হয় এবং সুতাগুলিকে এলো করে নিয়ে বইয়ের মলাটের বোর্ডের সংগে সংযুক্ত করা হয়।

বইয়ের মলাট লাগাবার পূর্বে বইয়ের তিন ধার ছাঁটা হয়। বই এভাবে ছাঁটার উদ্দেশ্য হচ্ছে বইয়ের তিন ধার পরিষ্কার করা। পুরাণ বইয়ের তিন দিক সাধারণতঃ কাটা হয় না। বইয়ের তিন ধার কাটবার সময় সাবধানে কাটতে হয় কারণ বেশী কাটা হলে ছাপা অংশ পর্য্যন্ত কাটা হয়ে যেতে পারে।

বইখানি মলাটের সংগে সংযুক্ত করার পর বোর্ডের উপর চামড়াখানি আঠার দ্বারা জুড়ে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে বইয়ের পুটেও চামড়া জুড়ে দেওয়া হয়। যে বাঁধাইয়ের চামড়া বইয়ের পুটের সংগে জুড়ে দেওয়া হয় সে বাঁধাইকে ইংরাজী ভাষায় বলে Tight back। যে বাঁধাইয়ের চামড়াকে বইয়ের পুটের সংগে জুড়ে দেওয়া হয় না সে বাঁধাইকে বলে Hollow back।

Tight back

Hollow back

ভালো বাঁধাই করা বইয়ের বাঁধাইয়ে শীর্ষে ও পাদদেশ দুটি বাঁধুনী থাকে। পূর্বে এই বাঁধুনীর উদ্দেশ্য ছিল বইয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা এবং বইয়ের formatগুলিকে একত্রিত করে রাখা। এই দুইটি Headbands এখন সাধারণতঃ বাঁধাইয়ের মাথায় ও পাদদেশে আঠা

দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। পূর্বে এই বাঁধুনীকে বইয়ের উপরের ও নিচের দিকের বাঁধাইএর সেলাইয়ের সংগে সংযুক্ত করা হতো।
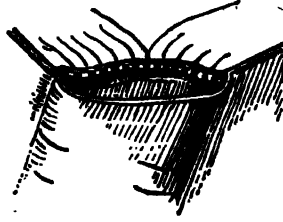
Head band

গ্রন্থাগারের জন্য বাঁধাই: গ্রন্থাগারের জন্য বাঁধাই মানেই ভালো বাঁধাই যাকে ইংরাজী ভাষায় বলে "extra" বা "Luxurious binding"। বই বহু ব্যবহারের ফলেও এ ধরণের বাঁধাই ছিঁড়ে যায় না।

প্রকাশকের বাঁধাই: বইয়ের আবরণ প্রথম যন্ত্রের সাহায্যে করে নেওয়া হয় পরে বইখানিকে এই আবরণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফিতা বা দড়ির দুই সীমা মলাটের সঙ্গে বইয়ের গোড়ার দিকের ও শেষের দিকের কাগজের সহিত জুড়ে দেওয়া হয়। ভালো বাঁধাই দড়ি বা ফিতার দুইদিক বোর্ড ছিদ্র করে সংযুক্ত করা হয়, না হয় বোর্ডকে চিরে সেই ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। Publishers casing-এ বইয়ের পুটে জালি কাপড় দেওয়া থাকে এই জালি কাপড়কেও মলাটের উপর জুড়ে দেওয়া হয়। এ ধরণের বাঁধাই করা বইয়ের মলাট খুললেই জালি ও ফিতা যে বইয়ের মলাটের সহিত জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

বাঁধাইয়ের আবরণের উপাদান: আবরণের উপাদান হচ্ছে দুটি: চামড়া ও কাপড়। গ্রন্থাগারের জন্য যে সব বই বাঁধাই হয় সেগুলির বেশীর ভাগই কাপড়ের। কেবল কয়েক ধরণের সন্ধান দেবার বই (Reference books)—যেগুলি খুব বেশী ব্যবহার হয়, চামড়ায় বাঁধান হয়। বই যে কাগজে ছাপা হয় সেই কাগজের জীবন যতদিন সাধারণতঃ কাপড়ের বাঁধাইয়ের জীবনও ততদিন। ছোটখাট বই যা বেশী ব্যবহার হয় না সেগুলি সাধারণ কাগজের বাঁধাই করলেই যথেষ্ট হয়।

সবচেয়ে শক্ত কাপড় হচ্ছে Buckrum। খুব বড় বই বাঁধাবার জন্য এই কাপড় বিশেষ উপযোগী। বই ব্যবহার না হলে চামড়ার বাঁধাই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু Buckrum নষ্ট হয়ে যায় না। Buckrum চামড়া অপেক্ষা কম দামী।

বাঁধাইয়ের জন্য আজকাল সাধারণতঃ দুই ধরণের চামড়া ব্যবহার হয়: শুয়ারের চামড়া ও nigger morocco। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যে-বই খুব বেশী ব্যবহার না হয় এবং বই যদি বড় না হয় তা হলে চামড়ার বাঁধাই না করাই ভালো। এমন কি গ্রন্থাগারের কোন বই চামড়ায় বাঁধাই করা প্রয়োজন হলেও তা সম্পূর্ণ ভাবে চামড়ায় না বাঁধিয়ে কেবল পুট ও কোনগুলি চামড়ার বাঁধাই করা ভালো। এ ধরণের বাঁধাইকে বলে Half leather binding। বই যদি খুব বড় না হয় তা হলে কেবল বইয়ের পুটে চামড়া দিলেই চলে। এই দুই ধরণের

বাঁধাইয়ে যে বইয়ের মলাটের উপর যে কাপড় দেওয়া হবে তার গুণাগুণ নির্ভর করবে বইয়ের জীবনের উপর।

আগের দিনে আরও নানা ধরণের চামড়া বাঁধাইয়ের জন্যে ব্যবহৃত হ'তো। যেমন: বাছুরের চামড়া, ভেড়ার চামড়া, শীল মাছের চামড়া এবং নানা ধরণের মরক্কো। কিন্তু এসব চামড়া এখন পাওয়া যায় না এবং বাঁধাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় না। এ সব চামড়ার জীবন কম সেই জন্যে এসব চামড়ার পরিবর্তে এখন কাপড় ব্যবহৃত হয়।

বাঁধাইয়ের জন্য আজকাল নানা ধরণের কাপড় তৈরি হ'চ্ছে এবং plasticও বাঁধাইয়ের কাজে লাগান হচ্ছে।

বই বাঁধাইয়ের পরের কাজ :—বই বাঁধাই করার পর বইয়ে, বইয়ের নাম, লেখকের নাম এবং বইয়ের মালিকের নাম লেখা হয় এবং সময়ে সময়ে বাঁধাইকে অলঙ্কৃত করা হয়।

বইয়ের শির দাঁড়ায় এবং মলাটের উপর নাম লেখা হয় সাধারণতঃ সোনার পাতার উপর, ছাপার যন্ত্রকে গরম করে চাপ দিয়ে। কাপড়ের উপরে এ ভাবে সোনালীতে নাম লেখা হয় না। কাপড়ের উপর নানা রংএর কালি দিয়ে নাম ছাপা হয়।

বইয়ের পুটের বাঁধাইয়ের দড়ির জন্য উন্নত অংশগুলি অলঙ্কৃত করা হয়। আধুনিক বইয়ে সাধারণতঃ দড়ির উঁচু অংশ থাকে না তবে বইয়ের পুটের যে অংশগুলি উঁচু থাকে আজকাল সেই অংশগুলিও অলঙ্কৃত করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে অলঙ্কার যত সাদাসিধে হয় ততই ভালো। লেখার জন্য বেশী কালি বা বেশী সোনালী ব্যবহার করা কুরুচির লক্ষণ।

বই বাঁধাইয়ের নির্দেশ

১। ভারী সন্ধান দেওয়ার বই :—	
(ক) খুব বড় বই যেমন Webster's Dictionary বা Encyclopaedia Britannica	চামড়ার বাঁধাই (Half leather) মলাটে Buckrum.
(খ) ছোট বই :—Shorter Oxford, Cassell's German dictionary	পুটে চামড়া (quarter leather) মলাটে Buckrum
২। যে সব সন্ধান দেবার বই ব্যবহার হয় না।	
(ক) বড় বই : Penrose annual	পুরাপুরি Buckrum-এ বাঁধাই।
(খ) ছোট বই :—Cambridge ancient history	ভাল কাপড়ের বাঁধাই
৩। খুব কম ব্যবহৃত সন্ধান দেবার বই	কাপড়ের বাঁধাই
৪। পত্রিকা :—	
বড় আকারের, ছোট আকারের	Buckrum কাপড়
৫। সংবাদপত্র	
২½" অপেক্ষা কম পুরু	Buckrum
,, মোটা	Half leather

৬। পুস্তিকা (যদি আলাদা করে বাঁধাই করা হয়।	কাপড়ের পুট বাকি অংশ শক্ত কাগজের।
৭। যে সব বই পাঠকরা বাড়ী নিয়ে যায় :—	
(ক) উপন্যাস বাদে যে বই বেশী ব্যবহার হয় :	ভালো কাপড়ের
(খ) উপন্যাস বাদে প্রয়োজনের দিক থেকে ক্ষণস্থায়ী বই ও উপন্যাস	কাপড়ের
৮। গানের বই	বোর্ড না দিয়ে কেবল কাপড়ের।

আধুনিক যুগে এক ধরণের বাঁধাই হচ্ছে যাতে বইয়ের ফর্মাগুলিকে আর পরস্পরের সহিত শেলাইয়ের দ্বারা সংযুক্ত করা হয় না। এ ধরণের বাঁধাইকে বলে perfect binding। এধরনের বাঁধাইয়ের কাগজের ভাঁজগুলি কেটে ফেলে প্রথমে পাতাগুলিকে একেবারে আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর পাতাগুলিকে একত্রিত করে বইয়ের পুট ঘসে নিয়ে ভালো করে আঠা লাগিয়ে উপরে একটুকরো জালি কাপড় জুড়ে দেওয়া হয়। যে আঠা লাগানো হয় সে আঠা নমনীয়, ফলে বই খুললে আঠা ফেটে যাবার ভয় থাকেনা। এর পর বই বাঁধাইয়ের বাকি কাজ করা হয়। পুটের সঙ্গ জুড়ে দেওয়া জালির দুদিকের বাড়তি অংশ বইয়ের বাঁধাইয়ের চেরা বোর্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। শেলাইয়ের কাজ কমে যায় সেই জন্যে এ ধরনের বাঁধাইয়ের খরচ কম হয়।

কিন্তু এ ধরণের বাঁধাইয়ের প্রধান দোষ হচ্ছে বইকে পুনরায় বাঁধাবার সময় বইয়ের পুটের আবার কিছু অংশ কেটে ফেলতে হবে ফলে বইয়ের পুটের দিকের মার্জিন একেবারে কমে যাবে। বইয়ের পুটের দিকের মার্জিন সাধারণতঃ সবচেয়ে কম থাকে সে জন্যে এদিকে কাটতে মুস্কিল হয় এবং বইখানি যদি শেলাই করে বাঁধাতে হবে ঠিক করা হয় তা হলে খরচের আর অন্ত থাকবে না।

এ ধরনের বাঁধাই যতই ভাল হক, যে সব বই খুব বেশী ব্যবহার হয় এবং নাম করা উপন্যাস এ ভাবে বাঁধান কখনই ঠিক হবে না।

বাঁধাইয়ের চামড়াকে বাঁচিয়ে রাখা

৫০ বছর আগের চরমড়ার বাঁধাই নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। বইয়ের চামড়া কেন নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে গবেষণা হল। ১৯০০ সালে Society of Arts এবিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই committeeর গবেষণার ফলাফল বার হয় ১৯০৫ সালে। তারা অনুসন্ধানের দ্বারা জেনেছে ১৮৩০ সালের কাছা-কাছি এবং ১৮৬০ সালের পর থেকে বইয়ের বাঁধাইয়ের চামড়া খুব বেশী নষ্ট হয়ে গেছে। তারা প্রমাণ করেছে যে গ্যাসের ধোঁয়া চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর কারণ গ্যাসের ধোঁয়ায় Sulphuric Acid থাকে। আলো এবং উত্তাপও চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতি করে বলে তারা প্রমাণ করেছে। পচে যাওয়া চামড়ায় যে Sulphuric Acid পাওয়া যায় তা চামড়ার দ্বারা হাওয়া থেকে শোষিত হয়। হাওয়ায় Sulphur Dioxide থাকে।

চামড়ার স্বাস্থ্যের জন্য আলো বাতাস প্রয়োজন কিন্তু এ দুটির কোনটির বেশী চামড়ার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

উপেক্ষিত একটি কর্তব্য

—বনবিহারী মোদক

গ্রন্থাগারের ইতি কর্তব্য ও কার্যবিধি সম্পর্কে অনেক উপদেশ-নির্দেশই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বইতে লেখা থাকে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক. তার অনেকগুলোই আমরা কার্যকরী করি। যেগুলো আমরা যথাযথভাবে করতে অপারগ, নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী সেগুলোকে আমরা কিঞ্চিৎ অদল-বদলও করে নিই। কিন্তু পূর্বোক্ত দু'রকম ছাড়া, আরও একরকমের করনীয় কাজ আছে, নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে যেগুলোকে আমরা অকৃতই ফেলে রাখি। লাইব্রেরীর গ্রন্থসংগ্রহ থেকে নিয়মিত বই বাতিল বা প্রত্যাহার করার কাজটি এই শেষোক্ত শ্রেণীতেই পড়ে। সঠিক রীতিতে এই কর্তব্যটি নিয়মিতভাবে সম্পাদন করেন, এরকম গ্রন্থাগারের সংখ্যা এদেশে আঙুলে গোণা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে উপেক্ষিত এই কর্তব্যটি নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

বই যেখানে জোটেই না, সেখানে আবার বাতিলের বখেড়া নিয়ে মাথাব্যথা কেন?—পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে সঙ্গত কারণেই এপ্রশ্ন তুলতে পারেন। জবাবে বলতে হয়, চাষের জমিতে ভালো ফসল ফলাতে হলে, আগাছা তুলে ফেলার খাটুনিটুকু করতেই হয়। যে গ্রন্থাগার মানব-জমিনে সোনা ফলাতে চায়, অব্যবহার্য বই বেছে বাতিল করাটা তার পক্ষেও ঠিক তেমনিই অপরিহার্য কর্তব্য।

এছাড়া আরও একটি কথা এখানে ভেবে দেখবার আছে। গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। ক্রমাগত শুধু জমিয়েই যাব, বর্জন করব না কিছুই—এ মনোভাব নিয়ে চললে, সমস্ত বইয়ের স্থান সংকুলান করাটা অচিরেই দুরতিক্রম্য একটি সমস্যায় পরিণত হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে, অব্যবহার্য বই দিয়ে জায়গা জুড়ে না রাখাটাই বাঞ্ছনীয় নয় কি? অতএব দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু বই বাতিল করাটা নীতিগত বিচারেও যেমন অবশ্য করণীয়, বাস্তব উপযোগিতার দিক দিয়েও আবার ঠিক তেমনিই বাঞ্ছনীয়।

এরপর দেখতে হবে, প্রত্যাহারের এই কাজটা কোন্ রীতি-পদ্ধতিতে কার্যকরী করতে হবে? কী কী বই, কোন্ নিরীখে আমরা বাতিলের জন্যে বেছে নেব? এবিষয়ে নিয়ামক নীতি হবে তিনটি। সেই তিন রকমের বই-ই আমরা প্রত্যাহার করব, যেগুলো:

১। অত্যধিক জরাজীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত; বাঁধিয়ে নিলেও যেগুলো আর ব্যবহারের উপযোগী হবে না।

২। প্রকৃত পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ ('সংস্করণ কথাটির দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো হচ্ছে, পুনর্মুদ্রণ নয়) সংগৃহীত হলে, সেই বইয়ের পুরনো কপি।

৩। স্থায়ী সাহিত্যমূল্যে চির আবৃত হবার সম্ভাবনা নেই, এমকম পুরনো কথা সাহিত্য, অর্থাৎ উপন্যাস, ছোটগল্প, গোয়েন্দাকাহিনী প্রভৃতি।

উপরোক্ত ধরণের বই যখনই হাতে পড়বে, তখনই সেটা বাতিল করা উচিত। এক একটি বর্গের সংগ্রহ, এই উদ্দেশ্যে এক একদিন চেক করলেও কাজটি সহজ হতে পারে। তবে বার্ষিক ষ্টক মেলানোর সময়েই এই কাজটির প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বেশীর ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারেই দেখা যায়, অ্যাকসেসন রেজিষ্টারে মন্তব্যের স্তম্ভরূপে চিহ্নিত সর্বশেষ কলামটিতে 'Lost' বা 'Damaged' লিখেই বই বাতিলের কাজটির দায় খালাস করা হয়। কিন্তু এত সহজে কার্যোদ্ধার করতে চাইলে, একটি বিষয়ে আমরা খুবই অসুবিধেয় পড়ব।

গ্রন্থাগারের সঠিক গ্রন্থসংখ্যা নির্ণয় করতে হলে, অ্যাকসেসন খাতার কোন্ পাতায় কয়টি বাতিল আছে, সেগুলো যোগ করে, বাতিলের মোট সংখ্যাটা আগে বের করতে হবে। তারপর অ্যাকসেসনের সর্বশেষ সংখ্যাটি থেকে মোট বাতিলের সংখ্যা বাদ দিলে, তবে পাওয়া যাবে সঠিক গ্রন্থসংখ্যা। উইথড্রয়াল রেজিষ্টার রাখলে কিন্তু এতো ঝঞ্ঝাটের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

এই জন্যেই, আলাদা একটি বাঁধানো খাতাকে উইথড্রয়াল রেজিষ্টার করা দরকার। যখন যে বই প্রত্যাহৃত হচ্ছে, তখনই সেটির বিবরণ এই খাতায় তুলে ফেলতে হবে। পরিগ্রহণ খাতা বা অ্যাকসেসন রেজিষ্টারের মতো, বর্জিত বইগুলোর দরকারী কয়েকটি বিবরণও প্রত্যাহারের খাতায় রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। খাতাটিতে নিম্নোক্ত দশটি কলাম করে নিলেই কাজ চলে যাবে :

তারিখ	প্রত্যাহারের ক্রমিক নং	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	অ্যাকসেসন নং	ডাক নং		প্রত্যাহারের কারণ	বদল কপি নুতন সংগৃহীত হয়ে থাকলে তার অ্যাকসেসন নং	মন্তব্য
					বর্গীকরণ নং	বুক নং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

বই বাতিলের সময় এই কলামগুলো পূরণ কোরে, তারপর অ্যাকসেসন খাতার প্রাসঙ্গিক এন্ট্রির শেষ কলামে শুধু উইথড্রয়াল নাম্বারটি লিখে রাখলেই কাজ শেষ।

নিজেরা বই হারালে বা ক্ষতিসাধন করলে, পাঠক বা সদস্যরাও অনেক সময় ক্ষতিপূরণস্বরূপ নতুন বই কিনে দিয়ে থাকেন। নতুন এই বইকে বলা হয় **Replenished copy.**

পরিগ্রহণ খাতায় এই Replenished Copy-র অন্তর্ভুক্তি; এবং যে বইয়ের বদলে নতুন বইটি আসছে, সেটির প্রত্যাহার—এই দু'টি কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রায়ই সংশয় ও অসুবিধের সম্মুখীন হতে দেখেছি। এসম্পর্কে করণীয় হল :

॥ ক ॥ প্রদত্ত নতুন বইটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত বইটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন (অর্থাৎ একই সংস্করণের; প্রকাশের সন, মূল্য, চিত্র ও পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রভৃতি সবকিছুই অপরিবর্তিত) হয়, প্রাপ্ত বইটি তাহলে আর নতুন করে অ্যাকসেসন না করলেও চলে। ক্ষতিগ্রস্ত বইটির সমস্ত নাম্বার নতুনটিতে বসিয়ে, পরিগ্রহণ খাতায় প্রাসঙ্গিক এণ্ট্রির (অর্থাৎ বর্জিত বইটির নাম যে সাড়িতে আছে) মন্তব্যের ঘরে লাল কালিতে শুধু "Copy Replenished on......(তারিখ)" লিখলেই কর্তব্য শেষ। প্রত্যাহারের খাতায়ও আর কোনো কিছু লেখার দরকার হয় না।

॥ খ ॥ সম্পূর্ণ অভিন্ন না হলে কিন্তু এত সহজে কাজ হাসিল হবে না। সেক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত বইটিকে রীতিমাফিক বাতিল কোরে, নবলব্ধ কপিটী নতুন করে অ্যাকসেস্‌নও করতে হবে। প্রত্যাহার খাতার প্রাসঙ্গিক এণ্ট্রির ৯নং কলামে নতুন কপিটির অ্যাকসেসন নম্বরটিও লিখে রাখতে হবে।

বাতিল করা বইগুলোর কী গতি হবে, এইবার সে-আলোচনায় আসা যাক। এসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম পূর্বাহ্নেই স্থির করে দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এগুলো যথাসম্ভব বিক্রি করে ফেলারই চেষ্টা করতে হয়। টেণ্ডার ডেকে বিক্রি করতে না পারলে, অগত্যা ওজন দরেই ওগুলো ছেড়ে দিতে হবে। মিছিমিছি জঞ্জালের মতো জমিয়ে রাখলে, যে সব পোকা ওতে বাসা বাঁধবে, ক্রমে লাইব্রেরীর ভালো বইগুলোর দিকেও তারা ধাওয়া করবে এবং সেগুলোকেও অচিরেই বাতিলের দশায় এনে ফেলবে। এইজন্যে, বাতিল বইয়ের জঞ্জাল অবিলম্বে অপসারণের কাজটা গ্রন্থাগারের স্বার্থেই ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

প্রত্যাহৃত বই বিক্রি করার সময় শুধু একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। বিক্রীত কোনো বই ভবিষ্যতে কারুর হাতে পড়লে, তিনি যেন সেটাকে লাইব্রেরী থেকে খোয়া-যাওয়া বই বলে ভুল না করেন—এই উদ্দেশ্যে, বইয়ের ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো একটি পাতায় (ধরা যাক, প্রত্যেক বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠায়)—

"Withdrawal No...............
Sold by..............................
on behalf of
..................LIBRARY"

সীল দিয়ে, শূন্য স্থানগুলো লাল কালিতে পূরণ ও স্বাক্ষর করে দেওয়া কর্তব্য। ব্যস্, তাহলেই ভবিষ্যতে কোন সংশয়েরও কোন অবকাশ থাকবে না, ক্রেতাও নিশ্চিন্ত মনেই বইগুলো কিনতে পারবেন।

বই প্রত্যাহার করার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে কিন্তু খুবই সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে। সেগুলো হল :

(১) প্রখ্যাত কোন মনীষীর স্মরণচিহ্নযুক্ত কোনো বই, জরাজীর্ণ হলেও বাতিল করা যাবে না।

(২) Rare এবং out of print বইও বর্জন করা চলবে না।

(৩) একমাত্র সংবাদপত্র ও সংবাদ সাময়িকী (News magagine) ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকা কদাচ বাতিল হবে না

(৪) দান হিসেবে প্রাপ্ত বই, পারতপক্ষে বাতিল না করাই ভাল।

(৫) খুব পুরোনো বইয়ের মূল্য অনেক সময় অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়। বর্জনের অত্যুৎসাহে সেগুলোকে যেন আমরা বাদ দিয়ে না ফেলি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত কালসীমায় যেসব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল, অধুনালুপ্ত সেইসব বইয়ের (বটতলা ছাড়া) পুরনো কোন কপি থাকলে, জীর্ণদশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে।

শেষোক্ত বিভাগটিতে ঠিক কোন্ কোন্ ধরনের বই সম্পর্কে নিষেধ করা হচ্ছে, সেটা একটু দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। বস্তুতঃ এরকম সম্ভাবনার কথা আগে-ভাগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবও নয়।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করুন, আপনার গ্রন্থাগারে অতি জরাজীর্ণ এককপি 'চয়নিকা' আছে। আপনি জানেন, বর্তমানের 'সঞ্চয়িতা'-র অনুরূপ রবীন্দ্রকবিতার এই সংকলন-গ্রন্থটির প্রকাশ বহুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ-বই ভবিষ্যতে কখনও আর নতুন কিনতে পাওয়া যাবে না। জীর্ণদশাগ্রস্ত বলে, তখন কি আপনি 'চয়নিকা' খানিকেও বরবাদ করে দেবেন ?

বই অপসারণ করতে গেলে অনেক সময় peculiar দু-একটি অসুবিধেরও সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধরুন, একাধিক খণ্ডবিশিষ্ট (multi-volume) গ্রন্থসমষ্টির কোন একটিমাত্র খণ্ড বাতিলযোগ্য হল। তখন আমরা কী করব ? এক্ষেত্রে দেখতে হবে, শুধু বাতিল খণ্ডটি আলাদাভাবে সংগ্রহ করা যাবে কিনা। তা যদি কেনা যায়, তাহলে শুধু সেই ক্ষতিগ্রস্ত খণ্ডটিই প্রত্যাহার করতে হবে এবং নতুন বই কেনার সময় সেই খণ্ডটিকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার।

কিন্তু শুধু একটিমাত্র খণ্ড যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিনতে পাওয়া যায় না, অর্থসঙ্গতিতে কুলোলে সেক্ষেত্রে পুরো সেটটাই বাতিল করতে হবে। সঙ্গতিতে না কুলোলে, বা অত্যধিক মূল্যবান গ্রন্থসমষ্টির বেলায়, অগত্যা, ক্ষতিগ্রস্ত খণ্ডটিতে—

"PRESERVED COPY
Not to be lent out"

সীল দিয়ে, শালু জড়িয়ে আলাদা করে রেখে দিতে হবে। পরে সুযোগ ও সময়মত নতুন সেট কিনতে পারলে, সমগ্র পুরনো সেট-টাই তখন বর্জন করা যাবে।

সযত্নসঞ্চিত যে-কোন জিনিস বর্জন করতে হলে আমরা বেদনা বোধ করি। গ্রন্থাগারের বই বর্জনের বেলায়ও এ-সত্যের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুতঃ, সঞ্চয়স্পৃহা মানুষের মৌল প্রবৃত্তি-গুলোরই একটি। স্মরণাতীত কালের অন্ধকারময় অতীতে, গুহাবাসী মানুষ হঠাৎ একদিন

উপলব্ধি করেছিল, আজকের শিকারলব্ধ পশুমাংসের উদ্বৃত্তটুকু রেখে দিলে কাল সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবে। সেই সুরু। তারপর সভ্যতার ক্রম-পরিণতির স্তরে স্তরে, আদিম সেই সঞ্চয় স্পৃহার বহুবিচিত্র প্রকাশ ও নব নব অভিব্যক্তি। পরম যত্নে একদিন যে-বইটি আমি সংগ্রহ করেছি; কর্মক্লান্ত দিনের ব্যস্ত মুহূর্তে অনেক ক্লেশকর আয়াস স্বীকার করেও পরম স্নেহে যে বইটি আমি প্রসেসিং করেছি; অনুরাগ ও প্রীতির সঙ্গে যে প্রিয় গ্রন্থখানিকে বহুবার আমি নাড়াচাড়া করেছি; সহৃদয় অনেক পাঠকের মনে যে-বইখানি একদিন আনন্দ-বেদনার হিল্লোল জাগিয়েছে; সেবাভারজীর্ণ পরিণত বয়সের সেই বইখানিকেই আজ আমি নির্মম অবহেলায় সরিয়ে দিতে চাই! কাজটি তাই সত্যিই বেদনাদায়ক।

কিন্তু বেদনাদায়ক এই কঠোর কর্তব্যও সহনীয় হতে পারে, যদি আমরা ভাবি—নূতনের আগমনকে সম্ভব করতে হলে, পুরাতনকে তার জন্যে স্থান ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। এটা বিশ্বপ্রকৃতিরই অমোঘ নিয়ম।

তাছাড়া, গ্রন্থসংখ্যার বহুলতাই তো গ্রন্থাগারের উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়। আয়তনের আত্যন্তিক বিস্তৃতি গ্রন্থাগারের সেবাকুশলতাকে বরং ব্যাহতই করে। জেমস্ ডাফ্ ব্রাউন এইজন্যেই বলেছেন—"বৃহত্তম সাধারণ গ্রন্থাগারেও, বিশেষ বিশেষ বইয়ের একাধিক কপি সহ, মোট পঞ্চাশ হাজারের বেশী বই থাকা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়"। কাজেই, কেবলমাত্র সুনির্বাচিত বইগুলো সংরক্ষণ করে, গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পরিমিত রাখাটাও তো কাম্য। বর্জনের এই অপ্রিয় কর্তব্যটিকে তাহলে কেন আর আমরা ঔদাসীন্যভরে দূরে সরিয়ে রাখব?

A Neglected duty
by Bonbehari Modak

ডিউই বর্গীকরণ :
ভারতবর্ষ ও এশিয়া

—বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ একাদশ সংখ্যায় 'ডিউই বর্গীকরণের ৮১০ ও দেশীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সেন লিখিত মন্তব্য পড়লাম। এ প্রসঙ্গে গুটিকতক কথা নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ অথবা যে কোনো বিদেশীয় বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই ভারতীয়—ব্যাপকভাবে এশীয়—বিষয়াবলীর স্থান এবং বিভাগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। বিশেষত এযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে জ্ঞানাত্মীয়তার বিবেচনায় একটি সর্বজনীন সর্বকালীন পদ্ধতির অভাব গ্রন্থজগতে স্বভাবতই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। সম্প্রতি এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে এটা খুবই আনন্দের কথা। এ নিয়ে 'গ্রন্থাগার' এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু আলোচনাও হয়েছে। এবং সভা সমিতিতেও বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলা সাহিত্যের বর্গীকরণ ও ডিউই' প্রবন্ধটিও এই সূত্রে উল্লেখ্য। তিনি সুনিপুণভাবে বর্গীকরণের মূল উদ্দেশ্য কী এবং বিচার বিবেচনা কোন খাত ধরে হওয়া উচিত তার আলোচনা করেছেন। এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সেন তারই বক্তব্যের রেশ টেনে ৮১০ বিভাগটির ভারতীয় করণের সূত্র নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, বর্গীকরণের এই প্রস্তাবাদির সূত্রে কেউই এযাবত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নি। ৮১০কে তালিকায় রূপ দেবার সময়ে। অথবা ডিউইতে বাংলা সাহিত্যের স্থান নিরূপণের চিন্তায় কারোই তাঁর কৃত তালিকার কথা মনে পড়েনি। অথচ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের নাম এবং গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর চিন্তা, অবদান এবং ব্যবহারিক কৃতিত্বের কথা কারো অজানা থাকবার কথা নয়। বিশেষ করে বাংলা দেশের গ্রন্থাগারবিদরা যদি তা না জানেন তবে সেটা শুধু আশ্চর্যের বিষয় বা সীমিত জ্ঞানেরই পরিচায়ক নয়, লজ্জাজনকও। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার তরফেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র হিসেবে —যে পরিষদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার কার্যকরীভাবে যুক্ত থেকেছেন—তাঁদেরও এবিষয়ে মন্তব্য আশা করা অন্যায় ছিল না। কেননা ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে এ পর্যন্ত যাঁরা চিন্তা করেছেন এবং বর্গীকরণের মান এবং স্থান নির্ণয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথম সারিতে। একথা ভুলে যাওয়া আত্মবিস্মরণের সামিল।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির একটি সম্প্রসারিত রূপ খাড়া করে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন এবং সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সেটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে চালু করেন। সেই পদ্ধতি অদ্যাবধি এখানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর সফলতা এবং রূপায়ণের সার্থকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই। কেননা এযাবত অবারিত-দ্বার উন্মুক্ত-মঞ্চ এই গ্রন্থাগারে এই সহজ সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুযায়ী বর্গীকৃত বইএর ব্যবহারে

পাঠক বা গ্রন্থাগারের কর্মীপক্ষে কারো কোন অসুবিধা হয়নি। বর্গীকরণ সূত্রের ভিতরের কথাটা—বিজয়নাথ বাবু যাকে ব্যাঙ্গার্থ প্রভৃতির উপমায় স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—তা ধরতে সেকালের সচেতন গ্রন্থাগার-মনীষী প্রভাতবাবুর বিলম্ব হয়নি। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ৮১০ বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যকে। এবং এই ধারা বজায় রেখে ৪১০ বিভাগে স্থান দিয়েছেন ভারতীয় ভাষাবর্গের। শুধু তাই নয়, ১৮২ তে ভারতীয় দর্শন, ২২০ থেকে ২৯০ পর্যন্ত বিভাগের পুনর্বিন্যাস করে সেখানে ভারতীয় ধর্মগুলির স্থান (সাহিত্যের মতো ধর্মও ডিউইতে খ্রীষ্টপ্রভাবে কোণঠাসা), ৩৫৪ ও ৩৭৪এ যথাক্রমে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন, (বস্তুত পক্ষে ৩৫০ বর্গের-পুনর্বিন্যাস করেছেন তিনি) ৯৫৪তে ভারতীয় ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়েরও বর্গসন্নিবেশ করেছেন। (ডিউইতে অবশ্য এখন ৯৫৪ বর্গের বিস্তারিত বিভাগ সন্নিবেশিত হয়েছে)। এবং এই ধারা অনুসরণ করেই দ্বিবিন্দু বিভাগের প্রবর্তন করে বাংলা প্রভৃতি ভাষার এবং সংস্কৃতের বর্গীকরণ সূত্র প্রস্তুত করেছেন। বিশ্ব-ভারতীর বাংলা এবং বিশেষ করে—সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার যেমন কার্যকরীতায় বিশিষ্ট তেমনি বৈজ্ঞানিক। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় প্রভাতবাবুর হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতিতেও চালু হয়েছে। বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণের মতো হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণেরও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং এটিও এখানকার হিন্দী গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিউই বর্গীকরণে, এবং অল্পবিস্তর সব বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই গ্রন্থাঙ্ক নামটি আকারে বড় হয়ে যায় বলে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূর করবার কথা গ্রন্থবিজ্ঞানীরা ভেবেছেন, কিন্তু সবদিক বজায় রাখবার মতো সরল সূত্র তৈরী করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। প্রভাতবাবুও কাজ সহজ এবং সরল করবার জন্য ডিউইর সঙ্গে কোলন মিশ্রত করে নিয়েছেন (ইউ ডি সি লক্ষণীয়)। এতে বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝবার কাজ যেমন পরিচ্ছন্ন হয়েছে তেমনি গ্রন্থাঙ্ক নামটিও অনর্থক লম্বা হয়ে যায়নি। যেমন, ৯৫৪.১—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ৯৫৪.১ : ১০—সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ৯৫৪.১ : ২০—ধর্মীয় ইতিহাস, ৯৫৪.১ : ৩৯—জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি। যেমন, ডিউইতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের জন্য গ্রন্থাঙ্ক হয় ৩১১.০০০১৩৩, সেখানে সহজেই আমরা ৩১১:৩৩ দিতে পারি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত ইংরেজী বর্গীকরণের সাইক্লোস্টাইলে ছাপানো কয়েকটি বই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে তার একটি করে বই তখন পাঠানোও হয়েছিল। যতদূর জানি তাঁর পদ্ধতিটি এখন বই হিসেবে ছাপা হবার অপেক্ষায় রয়েছে। এপর্যন্ত তাঁর এই সম্প্রসারিত ডিউইর রূপ নিয়ে নানান জায়গায় আলাচনা হয়েছে। কয়েক বছর আগে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ-নিযুক্ত লাইব্রেরী কমিশন যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তখন এটি নিয়ে তাঁরা প্রভাতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে গিয়েছিলেন, এবং সম্ভবত এর একটি প্রতিলিপিও নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই কিছুকাল আগেও ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে কলকাতায় (হিন্দী হাইস্কুল গৃহে) এটি আলোচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান'

গ্রন্থে ডিউইর ভারতীয় কৃত একটি রূপ খাড়া করেছেন। এসবের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করে একটি সর্বভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতি তৈরী করা খুবই দরকার। প্রভাতবাবু কৃত পদ্ধতিটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে, বিশ্বভারতীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং বর্গীকরণ সূত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কার্যকরী রূপটির দাবী যে সবার আগে সে বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত।

এই নিয়ে আরো একটি বৃহত্তর আলোচনার চেষ্টা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। কিছুকাল আগে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের ডিউই বিশারদ শ্রীমতী সারা ভাণ এদেশে এসে দেশীয় প্রয়োজনের অনুকূলে কিভাবে ডিউইর সংশোধন সংযোজন করা যায় তার জন্য সরেজমিন জরিপ করে গিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ডিউইতে এশীয় বিষয়ের স্থান নিরূপণ। তিনি বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে কিভাবে ডিউই প্রযুক্ত হচ্ছে তার সমীক্ষা করেছেন এবং সিংহল, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও এই উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। শ্রীমতী ভাণের সমীক্ষা সূত্রে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় বিদ্যাভবন, টাটা সমাজ-বিদ্যা কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থাগারে ডিউইর বিশেষ ব্যবহারের উল্লেখ দেখেছি। কিন্তু প্রচার-নিরপেক্ষ অথচ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সুপ্রাচীন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কথা কোথাও উঠেছে বলে জানিনা। শ্রীমতী সারা ভাণের সমীক্ষাসূত্রে বোম্বাই গ্রন্থাগারিকরা যে কয়টি সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে আছে ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, বিবিধ দর্শন প্রভৃতির জন্য স্থান সঙ্কুলান ও বিশেষ বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা। বিশ্বভারতার পদ্ধতির বিচার করে দেখলে এ ব্যাপারে কার্যকরী নির্দেশ কিছুটা পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

একথা ঠিক যে কোন রীতিই চিরন্তনতার দাবী করতে পারে না। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অধুনাতন চিন্তাশীল পূর্বতন প্রাজ্ঞের রীতি পদ্ধতিকে নিপুণতরভাবে প্রয়োগ করবার হদিস দেন। ডিউইর সংস্করণগুলির ক্রমিক পরিবর্তন পরিবর্ধনই তা প্রমাণিত করে। একদা যে রীতি আমেরিকাতে প্রবর্তিত হয়েছিল তা আজ বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকাতে ছিলাম তখন পরিচয় হয় লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কর্মী, ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রকল্পের সহকারী সম্পাদক শ্রীমতী মেরী এঙ্গলমেয়ারের সঙ্গে। বর্গীকরণ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এখানকার ডিউই স্বাঙ্গীকরণ সূত্রে আমি যখন তাঁকে বলি যে বিভিন্ন বিষয় বিভাগগুলিকে আমরা ভারতীয় করণ করে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছি, এবং ৮১০ কে ভারতীয় সাহিত্যের জন্য ব্যবহার করে মার্কিন সাহিত্যকে ৮২০র মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছি তখন তিনি এবং আরও অনেকে বলে ওঠেন, সে কী—মার্কিন সাহিত্য যে ইংরেজি সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁকে আমি স্বাভাবিক যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছিলাম যে ডিউই তাঁর বর্গীকরণে যে কারণে আমেরিকা এবং পশ্চিমার্ধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেই কারণেই আমরা ভারত ও এশিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি। বর্গীকরণের সঙ্গে বর্গীকৃত দেশ ও তার জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গতি বজায় রাখাই মূল নীতি। প্রাচ্যের দর্শনচিন্তা এবং ধর্মীয় বিশিষ্টতার কোনো গুরুত্ব

যেমন ডিউইতে দেওয়া হয়নি তেমনি অবহেলিত হয়েছে সাহিত্যও। বিশ্বভারতীতে প্রবর্তিত এই পরিবর্তিত রীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, তাহলে ডিউইর একটি এশীয় সংস্করণের কথা ভাবলে কেমন হয়। আমি বলেছিলাম, তাতে মূল নীতি ঠিক থাকেনা, এবং ক্রমে আফ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য ভূভাগের জন্যও বিশেষ সংস্করণের কথা ভাবতে হতে পারে। তার চেয়ে ডিউইর মধ্যেই এই সম্প্রসারণের অঙ্কুর রেখে দেবার কথা ভাবা উচিত—যাতে প্রতি দেশ তার অনুকূলে এটিকে ভিত্তি করে নিজেদের প্রকল্প গড়ে নিতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ অনুকূলে সংশোধিত বা সুবিধাজনক রীতি প্রবর্তন করে থাকেন। ডিউইর মধ্যেই তার বীজ থাকলে সব মিলিয়ে একটা ঐক্য থাকবে।

ডিউই প্রকল্প বিভাগ তখন ষোড়শ সংস্করণের কাজ করছিলেন, এবং তাঁরা বোধ হয় এশিয়া প্রভৃতি দেশের কথাও চিন্তা করছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের পরিবর্তিত ডিউইর একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো শ্রীমতী এঙ্গলমেয়ারকে দিই, এবং দেশে ফিরে এসে সেটির আরেকটু বিস্তারিত তালিকা করে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। আমার আমেরিকা প্রবাসের স্বল্পকালে, এবং দেশে ফিরে আসবার পরেও শ্রীমতী এঙ্গলমেয়ার ডিউই ষোড়শ সংস্করণের বিভিন্ন বিভাগের একটি করে মুদ্রিত প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। এবং তাঁর আহ্বান মতো আমি অকিঞ্চিৎকর কিছু মন্তব্য করে পাঠাবার স্পর্ধাও করেছিলাম।

তারই কিছুকাল পরে শ্রীমতী এঙ্গলমেয়ার কার্যসূত্রে দুই দফায় শ্যামদেশে আসেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর পূর্বপ্রস্তাবিত এশীয় প্রকল্পের কথা ভেবে এখানে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কেশবন প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করবার প্রস্তাব দিই। তাঁর ভ্রমণসূচীতে শান্তিনিকেতনে আসবার মতো সময় করে উঠতে পারেননি বা প্রভাতবাবুও যেতে পারেননি, তবে শ্রীযুক্ত কেশবন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলেই আমি জানি। তারপরে দীর্ঘকাল এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। বৃহত্তর পরিবেশের হদিস দিয়েই আমি কর্তব্য শেষ করে নিশ্চিন্ত ছিলাম। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে গ্রন্থবিজ্ঞানীরা ভাবছেন এটি সুখের বিষয়। এ ব্যাপারে ভারতের গ্রন্থাগার সংস্থাগুলি যদি এগিয়ে আসেন তাহলেই ভরসার কথা। কার্যকরী ক্ষেত্রে ভারতীয় বিষয়াবলীর বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদেরই বার করে নিতে হবে।

এখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্প্রসারিত এবং পরিবর্তিত রীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-তালিকা নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই শান্তিনিকেতনে এসে সমগ্র প্রকল্পটি দেখে যেতে পারেন।

৮১০	ভারতীয় সাহিত্য	৪১০	ভারতীয় ভাষা
৮১১	সংস্কৃত মহাকাব্য	৪১১	সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব
৮১১'১	রামায়ণ	৪১১'১	সংস্কৃতের উৎপত্তি
৮১১'২	মহাভারত	৪১১'৫	ব্যাকরণ
৮১১'৩	কালিদাস	৪১২	প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব
৮১২	সংস্কৃত নাটক	৪১৩	পালি
৮১৩	খণ্ডকাব্য	৪১৫	আর্য ভাষাবর্গ
৮১৪	গদ্যকাব্য	৪১৫'৩	হিন্দী
৮১৫	চম্পূকাব্য	৪১৫'৪	বাংলা
৮১৬	কথা-সাহিত্য	৪১৫'৪৯	অসমীয়া
৮১৭	বিবিধ	৪১৫'৫	ওড়িয়া
৮১৮	প্রাকৃত সাহিত্য	৪১৬	মুণ্ডা ভাষাবর্গ
৮১৯	অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য	৪১৭	তিব্বত-চীন ভাষাবর্গ
৮১৯'৩	হিন্দী-সাহিত্য	৪১৭'১	তিব্বতী
৮১৯'৪	বাংলা সাহিত্য	৪১৭'২	পার্বত্যাঞ্চল
৮১৯'৪১	বাংলা কাব্য	৪১৮	দ্রাবিড় ভাষাবর্গ
৮১৯'৪৯	অসমীয়া সাহিত্য	৪১৯	অষ্ট্রিয়া-এশীয় ভাষা
৮১৯'৫	ওড়িয়া সাহিত্য	৪১৯'৩	ঘাসি
৮১৯'৮	দ্রাবিড় ভাষাবর্গের সাহিত্য	৪২০	ইংরেজি ভাষা
৮২০	ইংরেজি সাহিত্য	৪৬৯	পর্তুগীজ
৮৬৯	পর্তুগীজ সাহিত্য	৪৮০	গ্রীক
৮৮০	গ্রীক সাহিত্য	৪৯০	অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষা
৮৯০	অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্য	৪৯১	ইন্দো-য়ুরোপীয়
৮৯১	পশ্চিম এশীয়	৪৯৫'১	চীনা ভাষা
৮৯১'৫	পারসিক	৪৯৫'২	জাপানী ভাষা
৮৯৪	মধ্য এশীয়	৪৯৬	আফ্রিকান ভাষা
৮৯৫	এশীয়		
৮৯৫'১	চীনা সাহিত্য		
৮৯৫'২	জাপানী সাহিত্য		
৮৯৬	আফ্রিকান সাহিত্য		

২২০	ভারতীয় ধর্ম	২৫৫	উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধ
২২১	বৈদিক ধর্ম	২৫৬	তিব্বতী, লামাতন্ত্র
২২১'১	ঋগ্বেদ সংহিতা	২৫৭	চীনা বৌদ্ধ
২২২	উপনিষদ	২৫৮	জাপানী বৌদ্ধ
২২৩	গীতা	২৫৯	মধ্য এশীয় বৌদ্ধ
২২৪	ভক্তিবাদ	২৬০	জৈনধর্ম
২২৪'১	ভাগবত	২৭০	খ্রীষ্টধর্ম
২২৫	পুরাণ	২৮০	মুসলমান ধর্ম
২২৬	তন্ত্র	২৮১	কোরাণ
২২৭	স্তোত্র, ইত্যাদি	২৮৪	সুফী সম্প্রদায়
২২৮	পৌরাণিক কাহিনী	২৯০	অন্যান্য, আলোচনা
২২৯	ভারতীয় সমাজ বিন্যাস	২৯১	তুলনামূলক
২৩০	হিন্দুধর্ম (প্রাচীন)	২৯২'৫	জরথুস্ত্র
২৩১	শৈব	২৯৩	অবলুপ্ত ধর্ম
২৩২	শাক্ত	২৯৪	প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক
২৩৩	গৌর গানপত্য	১৮২	ভারতীয় দর্শন
২৩৪	বৈষ্ণব (মধ্যযুগ)	১৮২'০১	ষড়দর্শন
২৩৫	বৈষ্ণব	১৮২'০২	তুলনামূলক
২৩৬	মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারক	১৮২'১	ন্যায়-অক্ষপাদ গৌতম
২৩৭	শিখ	১৮২'২	বৈশেষিক—কনাদ
২৩৮	দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কারক	১৮২'৩	সাংখ্য– কপিল
২৩৯	বিবিধ	১৮২'৪	যোগ—পতঞ্জলি
২৪০	হিন্দুধর্ম (আধুনিক)	১৮২'৫	মীমাংসা—জৈমিনী
২৪১	ব্রাহ্ম-সমাজ	১৮২'৬	বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র—বাদরায়ণ
২৪২	আর্য সমাজ	১৮২'৭	শৈব
২৪৩	রামকৃষ্ণ মিশন	১৮২'৮	শাক্ত
২৪৪	আধুনিক সম্প্রদায়	১৮২'৯	বিবিধ
২৪৪'৮	শ্রীঅরবিন্দ	৩৫৪	ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান
২৪৫	উত্তর ভারতীয় সম্প্রদায়	৩৫৪'১	পরিসংখ্যান
২৪৬	বোম্বাই সম্প্রদায়	৩৫৪'২	রাজনীতি
২৪৭	গুজরাট সম্প্রদায়	৩৫৪'৩	অর্থনীতি
২৪৮	দক্ষিণ ভারতীয়	৩৫৪'৪	গ্রামীন, কৃষি-বিজ্ঞান
২৪৯	বিবিধ	৩৫৪'৫	প্রশাসন, পরিচালনা
২৫০	বৌদ্ধধর্ম	৩৫৪'৬	সমাজ কল্যাণ

৩৫৪'৭　　কুটির শিল্প
৩৫৪'৮　　শিল্প, বাণিজ্য
৩৭৩　　ভারতীয় শিক্ষা
৩৭৫　　পাঠক্রম
৩৭৬　　স্ত্রী শিক্ষা
৩৭৭　　গৃহশিক্ষা ইং
৩৭৮　　কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়
৩৭৯　　সরকার সম্পর্কিত, ইং
৯৫৪　　ভারতীয় ইতিহাস
৯৫৪'১　　প্রাচীন
৯৫৪'২　　মধ্যযুগ, মুসলমান পর্ব
৯৫৪'৩　　পরিবর্তন যুগ
৯৫৪'৪　　ব্রিটিশ পর্ব
৯৫৪'৫　　স্বাধীনতা সমর
৯৫৪'৬　　স্বাধীন ভারত
৯৫৪'৮　　ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য
৯৫৫'৯　　বিভিন্ন প্রদেশ
৯৫৪'১　　প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা
৯৫৪'১　　১০ সাংস্কৃতিক ইতিহাস
৯৫৪'১　　২০ ধর্মীয় ইতিহাস
৯৫৪'১　　৩০ সামাজিক ইতিহাস
৯৫৪'১　　৪০ ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস
৯৫৪'১　　৫০ হিন্দু বিজ্ঞান
৯৫৪'১　　৬০ ঐ—ব্যবহারিক
৯৫৪'১　　৭০ শিল্পেতিহাস
৯৫৪'১　　৮০ ঐতিহাসিক ভৌগোলিক তত্ত্ব
৯৫৪'১　　৯ বৃহত্তর ভারত
৯৫৪'১　　৯১ চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি
৯৫৪'১　　৯৩ মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি

[এইভাবে ৯৪২ (ইংলণ্ড) ৯৫৩ (আরব) প্রভৃতিরও বিভাগ করা যায়।]

Dewey Decimal Classification : India and Asia
by Birendra Chandra Bandyopadhyay

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ

পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম : তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্মপ্রণালী

ভূমিকা

বিগত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলিতে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো, আর্থিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবারের এই মূল আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যপ্রণালীর বর্তমান রূপ ও রীতি এবং উপযোগী কার্য পদ্ধতি নিরূপণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও সামাজিক রূপ

গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান বিকীরণ। সে কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারেই হতে পারে। যদিও গ্রন্থই গ্রন্থাগারের প্রধান উপচার; কিন্তু একমাত্র উপচার নয়। জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে যে কোনও উপযোগী ব্যবস্থার অবলম্বন ও উপকরণের সাহায্য নেওয়া নীতিগত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গ্রন্থাগারের রূপ ও কার্যধারা দেশ ও কাল ভেদে এক নাও হতে পারে।

এদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বর্তমান রূপ

উপরিউক্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে এখন বিচার করা দরকার যে পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এদেশের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী কতটা উপযোগী। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে বিদেশী শাসকেরা তাঁদের শাসনকার্যের সুবিধার্থ ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা এদেশের পক্ষে উপযোগী ও কার্যকরী হয়নি। এদেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তাও কি এদেশের সর্বসাধারণের পক্ষে সর্বাংশে উপযোগী ও সার্থক হয়েছে? প্রশ্নটা বিশেষ করে এই কারণে উঠতে পারে যে এদেশের বারো আনা লোক নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এদেশের গ্রন্থাগার কর্মতৎপরতা মূলতঃ গ্রন্থকেন্দ্রীক। সর্বসাধারণের এক অত্যন্ত লঘিষ্ট সংখ্যার প্রয়োজনই কেবল এইসব গ্রন্থাগারগুলি মেটায়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হিসেব অনুযায়ী সারা রাজ্যের সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র দুইলক্ষ। সেগুলি এখনো সর্বজনের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠেনি। জনশিক্ষার বাহক ও ধারক হিসাবে এবং সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের গ্রন্থাগারগুলি সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছয়নি।

হিসাব নিকাশের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা অনেকাংশে বর্ধিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রচেষ্টাও আশানুরূপ না হলেও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এতাবৎকাল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার যথোচিত হিসাবনিকাশ হয়নি। যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন ও বিধি-ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ হয়নি যা দিয়ে প্রমাণ

করা যেতে পারে গ্রন্থাগারগুলি কি পরিমাণে সার্থকতা ও সাফল্যলাভ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সেগুলি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই হিসাবনিকাশের কাজ না হলে বোঝা যাবে না আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, কতদূর এগিয়েছি এবং সঠিক পথে এগুনর পক্ষে অন্তরায় কি? সেই প্রয়োজনে প্রথমে নীচের প্রশ্নগুলি তোলা যাক :

হিসাব নিকাশের মাপকাঠি

১। জনসাধারণের ভিতর গ্রন্থপাঠ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে? পাঠরুচি ও মানের কোনও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

২। জনসাধারণ কি অধিক হারে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে? দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রন্থাগারের সংখ্যাও বর্ধিত হয়েছে, সেই অনুপাতে কি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে? যারা আদৌ গ্রন্থাগারমুখী ছিল না (উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, সাক্ষর, সদ্যসাক্ষর) তাদের কি পরিমাণে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে?

৩। গ্রন্থাগারগুলিকে আশ্রয় করে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির কাজ কি পরিমাণে ত্বরান্বিত হচ্ছে?

৪। সমাজ শিক্ষা অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত চিন্তা, ধারণা ও জ্ঞানকে আদর্শ মানে উন্নীত করার কাজে গ্রন্থাগারগুলি কি পরিমাণে সহায়তা করে?

৫। গ্রন্থাগারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট কতখানি জনপ্রিয়তার অধিকারী? মন্দির, হাসপাতাল, স্কুলের ন্যায় সেগুলির কোন প্রতিষ্ঠা জনমানসে আছে কিনা?

প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অভিমত

উপরের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে নেই। কারণ এসম্পর্কে আজও কোন সমীক্ষা হয়নি। তবুও সকল গ্রন্থাগার কর্মীই স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোক সম্পাত করতে পারবেন। প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মোটামুটি নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করা যেতে পারে :—

১। প্রকাশকদের তালিকা ও গ্রন্থাগারের আদান প্রদানের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে জনসাধারণ তিন ধরনের বই পড়ে :

(ক) লঘু সাহিত্য গ্রন্থ (খ) লঘু পত্রপত্রিকা (গ) পাঠ্য পুস্তক (তারও অংশ বিশেষ)

গল্প উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বইয়ের চাহিদা কম বলে বাংলায় সিরিয়াস বই লেখা ও ছাপার হার বর্ধিত হচ্ছে না। বঙ্গ সংস্কৃতির অবনতিই হবে তার পরিণাম। এর প্রকৃত কারণ ও প্রতিকার পরে আলোচিত হবে।

জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা সহজেই অনুমেয়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে পাঠাভ্যাস যে বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই কারণ এ বিষয়ে জনমন অনেকাংশে গ্রন্থাগার দর্পণেই প্রতিফলিত হয়। গ্রন্থাগারগুলির ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্ধিত হয়ে থাকলে জনসাধারণের মধ্যেও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে বলা চলে। এ ব্যাপারে পুস্তক ব্যবসায়ীদের হিসাবও আশাপ্রদ নয়। বিভিন্ন শতবার্ষিকী উৎসব, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির অনুকূলে বইয়ের কাটতি মোটেই পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি নির্দেশ করে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার কাটতিও আশার আলোক দর্শায় না।

এ বিষয়ে সঠিক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

২। পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার ও জনসংখ্যার তুলনায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রন্থাগারে দীর্ঘকাল সদস্যপদ বজায় রাখেন কিছু সংখ্যক লোক। একদল নাম কাটান আর একদল নাম লেখান। কাজেই গ্রন্থাগারের আওতার বাইরে জনসাধারণের একটা মোটা অংশ সবসময় থেকেই যায়।

৩। গ্রন্থ লেনদেনেই গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকায় গ্রন্থ পাঠে ইচ্ছুক ও চাঁদা দিতে সক্ষম যাঁরা তাঁরাই কেবল গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত কার্যক্রমের মধ্যে সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র উৎসব, স্বাধীনতা দিবস ধরণের কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। এই সীমিত কার্যক্রমের জন্যে সবমানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নেই এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মে সেগুলির ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তারে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সহায়তার পরিমাণ অল্প।

৪। অর্থাভাব, লোকাভাব ও পরিকল্পনার অভাবে গ্রন্থাগারগুলি সমাজ শিক্ষার কাজে অংশভাক নয়। তাছাড়া এ কাজটা আদৌ গ্রন্থাগারের বিষয়ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

৫। জনসংখ্যার এক ক্ষীণ অংশের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কোনও প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন সত্তা অর্জন করতে পারে না। জন সমর্থনের পৃষ্ঠপোষকতা বিনা গ্রন্থাগারের সকল দাবীই অবহেলিত থাকবে। শিক্ষিত ও কিছুটা সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের রুচি, সদিচ্ছা ও উৎসাহের উপর গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে। সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্ক না থাকায় গ্রন্থাগার জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা প্রভৃতির সুরাহা করতে হোলে গ্রন্থাগারের দাবিকে প্রকৃত অর্থে সামাজিক তথা গণদাবিতে পরিণত করা দরকার।

প্রশ্নগুলি সম্পর্কে উপযোগী সিদ্ধান্ত

উপরিউক্ত কথাগুলি থেকে এই কথায় আসা যায় যে দেশের গ্রন্থাগারগুলির যেটুকু উন্নতি লক্ষিত হয় তা পরিমাণগত (quantitative) পরিবর্তন, গুণগত (qualitative) নয়। ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির দরুণ সমাজ শিক্ষার বিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারগুলি আশানুরূপ ভূমিকা

গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু এইসব ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণ কি দেখা দরকার। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির দিক থেকে তার উপায় বার করাও দরকার।

১। পাঠাভ্যাস প্রসঙ্গে চাঁদার বাধা

পাঠাভ্যাসের ধারক ও বাহক মূলতঃ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের দিক থেকেই তাই বিষয়টি আলোচিত হওয়া ভাল। জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাসের এক মস্ত বাধা গ্রন্থাগারের চাঁদার বেড়া। তা তুলে দেবার একমাত্র পথ গ্রন্থাগার আইন যার সাহায্যে বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। বিষয়টির প্রতি নৈতিক সমর্থন হিসাবে জেলা, গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি থেকে সরকারের অবিলম্বে চাঁদার নিয়ম তুলে দেওয়া উচিত।

ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন পদ্ধতি

অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পাঠকদের সঙ্গে পুস্তকের কোন সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয় না। কোন বইটা আছে না আছে তা জানার সুযোগ এবং বই দেখে বেছে নেবার সুবিধা না থাকায় পাঠস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটে। বই নেবার সময় পাঠকরা অতৃপ্ত থাকেন ও অনেক সময় গ্রন্থাগারের সদস্যপদ থেকে নাম কাটিয়ে নেন। অন্যদিকে কর্মীরাও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হন পাঠকদের বই যোগাতে। যাহোক কিছু তাদের গছিয়ে বিদায় দিতে পারলে তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। Open access ব্যবস্থা এর প্রতিকার। তাতে পাঠস্পৃহাই শুধু উৎসাহিত হয় না, পাঠরুচিরও পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটে। এ ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ ও সূচীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এ দুটি বিষয় ত্রুটিপূর্ণ থাকায় অনেক সময় গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটে।

স্কুল কলেজে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব

মানুষের জীবন ও মননের ভিত স্কুল কলেজেই গাঁথা হয়ে যায়। অথচ সেই সময়টায় এদেশের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল কলেজে গ্রন্থাগারের যথোচিত সুযোগ সুবিধা পায় না। ফলে ছোটবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ জন্মায় না। স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ পড়া ও টোকার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের অস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্য বইয়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটে না। পরীক্ষার পর পড়াশুনা ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যায়।

সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর বিভাগের অভাব

পাঠাভ্যাস সৃষ্টির এক মস্ত প্রয়োজন মানুষের শৈশব ও কৈশোরে। সাধারণ গ্রন্থাগার এ ব্যাপারে উপযুক্ত সহায়ক। কিন্তু ছোটদের উপযোগী স্বতন্ত্র বিভাগ খুব কম সাধারণ গ্রন্থাগারেই আছে। তাদের জন্যে বইপত্র হয়ত কেনা হয়। কিন্তু তাদের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অথবা সরঞ্জামের সাহায্যে তাদের মনকে আকর্ষণ করা ও মনের খিদেটা বাড়িয়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা হয় না।

২। গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চাঁদার বাধা থাকার দরুণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়

এবং এর ফলে পাঠস্পৃহাও বিনষ্ট হয়। ছোটবেলা থেকেই পূর্ব বর্ণিত কারণে পাঠাভ্যাস না থাকায় শিক্ষিত বয়স্কদের মধ্যে গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের গরজ দেখা যায় না, এটা সমাজের দিক থেকে মোটেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। তাই শিক্ষিত জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার সম্ভাব্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে। গ্রন্থ-সমালোচনা সভা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা ও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা ছাড়াও পুস্তক প্রদর্শনী, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে প্রচার প্রভৃতিও কার্যকর হবে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্ন সম্পর্কে

শেষোক্ত তিনটি প্রসঙ্গ পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রথমেই গ্রন্থাগারের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে এদেশের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালী নিরূপণ করা প্রয়োজন।

উন্নতিকামী এদেশের সকল বৈষয়িক উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান বাধা দেশবাসীর গরিষ্ঠ অংশের শিক্ষাহীনতা। কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন সর্বাংশে নির্ভরশীল সমাজ সচেতন জাগ্রত জনমনের উপর। সেই জনমন তৈরীর কাজে গ্রন্থাগারেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালী কোনও বাঁধাধরা ছককাটা পথে যে নির্দ্ধারিত হবে তার কোন মানে নেই। নিজ এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যপদ্ধতি নিরূপণ করবেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মিগণ। তবে তাঁদের কার্যক্রমে নিম্নপ্রদত্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন।

জীবিকা: স্থানীয় জনসাধারণের জীবিকা যেমন কৃষি, কুটিরশিল্প, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর ও তথ্যাদি দেবার ব্যবস্থা থাকা চাই।

চিত্তবিনোদন: যাত্রা, গান, অভিনয়, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে চিত্তবিনোদন ও সেই সঙ্গে উপযোগী শিক্ষার বিষয়ও পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলাপ-আলোচনা: স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত জনসাধারণকে চলতি দুনিয়ার সর্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্যে বক্তৃতা, আলোচনা সভা, বইপত্র পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছবি, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা ও প্রদর্শনী ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

নিরক্ষরতা দুরীকরণ: শিক্ষা ও জ্ঞানের আস্বাদ পেলে নিরক্ষর লোকেরা অক্ষরজ্ঞান অর্জনে আগ্রহান্বিত হ'তে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তার কোনও সুযোগ না থাকলে গ্রন্থাগারে সুবিধা মত অক্ষর পরিচয় দেবার ব্যবস্থা করলে সেটা গ্রন্থাগার নীতির পরিপন্থী হবে না।

পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা

পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সংযোগ ও সহযোগিতার কথা বহুদিন ধরেই বলা হচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে আজও কোনও কাজ হয়নি। জেলা গ্রন্থাগারগুলির নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে বিভিন্ন এলাকায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠনের সরঞ্জাম ইত্যাদি

বিনিময়ের ব্যবস্থা হতে পারে। আলোচনা সভা, গান বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়েও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা এবং আলাপ-পরামর্শের জন্যে কর্মীদের মাঝে মাঝে আঞ্চলিক বৈঠকে মিলিত হওয়া প্রয়োজন।

আদর্শের সহিত বর্তমান কার্যক্রমের সামঞ্জস্য

প্রস্তাবিত কার্যপ্রণালীর বহুবিষয়ই বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। কারণ অর্থাভাব ও লোকাভাব। কিন্তু নীতি ও আদর্শের দিক থেকে এদেশে গ্রন্থাগার-গুলির সঠিক কর্মধারা নির্ণয় করা প্রয়োজন, কারণ অর্থাভাব ও লোকাভাবের প্রশ্ন যদি ক্ষেত্র বিশেষে না থাকে অথবা সময়ক্রমে মীমাংসিত হয়ে যায় তাহলে প্রস্তাবিত কার্যপ্রণালী গ্রহণ ও পালন করা হবে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। প্রস্তাবিত নূতন কর্ম-প্রণালী আংশিক পালনের মধ্য দিয়েও সর্বসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের মূল্য ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে এবং কর্মী ও অর্থের অভাবে লোকে গ্রন্থাগারের পূর্ণ সেবা ও উপকার থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছে সেই অনুভূতিই গ্রন্থাগারের পিছনে গণদাবীর ধ্বনি তুলবে।

কোন আদর্শকে রূপায়ণ করার পথে বিস্তর বাধা বিপত্তি থাকতে পারে সেজন্যে আদর্শের কোন বিচ্যুতি ঘটে না। আদর্শকে সাধ্যমত রূপায়ণের চেষ্টা থাকা চাই। কিন্তু আদর্শ কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সঠিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাগিদ কেবল নীতিগত প্রয়োজনেই নয় প্রস্তাবিত আদর্শ কার্যক্রম গ্রন্থাগারকে সর্বজনের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলবে। জনসমর্থন ও সহানুভূতি গ্রন্থাগারের সকল দাবি দাওয়া—তা গ্রন্থাগার আইনই হোক অথবা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নই হোক অর্জনের পথকে সহজ ও সুগম করে তুলবে। জনচিত্তে গ্রন্থাগারের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সরকারের পক্ষে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারের সমস্যাকে উপেক্ষা করা চলবে না, অপরদিকে জনসাধারণও নানাভাবে গ্রন্থাগারকে সাহায্য করার জন্যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবে।

Programme of the Public Libraries in West Bengal: its present character and suitable measures.

পরিষদ কথা

শিল্পী সম্বর্দ্ধনা

গত ১লা বৈশাখ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের ৭৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে শিল্পীর বাসভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বহু শিল্পী, শিল্প-রসিক ও সুধীজন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে সম্বর্দ্ধনা জানান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় এবং পরিষদের পক্ষ থেকে, পরিষদ প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার' এবং কিছু পুষ্পোপহার শিল্পীকে দেওয়া হয়।

শ্রীযামিনী রায়

বাংলা দেশের যে সব শিল্পী বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছেন যামিনী রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শিল্পের মধ্যে সাধারণ মানুষ এবং গ্রামীন জীবন-যাত্রার অপূর্ব প্রতিকৃতি কমনীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে রূপময় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে তাঁর শিল্প সাধনার গভীরতার কিছুটা আভাষ পাওয়া গেল। শিল্পী দীর্ঘজীবী হোন এই আমাদের একান্ত কামনা

Reception to an Artist

বাংলা শিশু-সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ উপলক্ষে অনুষ্ঠান

শ্রীমতী বাণী বসু সংকলিত বাংলা শিশু-সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী পুস্তকটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছে। গত ৬ই মে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক সভায় পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহকে এই পুস্তকখানি আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভার সূচনায় পরিষদের সহ-সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু অনুষ্ঠানের সভাপতি, পরিষদের সভাপতি ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই গ্রন্থের সংকলয়িতা শ্রীমতী বাণী বসু বহুদিন ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অক্লান্ত কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। প্রথমে তিনি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও শিক্ষালাভ করেন। আমাদের ছেলেবেলায় শিশুসাহিত্যের বই খুব বেশী পাওয়া যেত না। আজকাল সে অভাব অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। এই সংকলনের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের একট সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে বলেই আমার মনে হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য ও জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে গবেষণা করেন সুতরাং তিনি আমাদেরই লোক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের পরিষদের সভাপতি সুতরাং তিনিও আমাদেরই লোক, তাই এঁদের আমার বলবার কিছু নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। এই গ্রন্থের সংকলয়িতা শ্রীমতী বসু এই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মী। তিনি প্রথম মহিলাকর্মী হিসাবে সামান্য বেতনে এখানে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় টেকনিকাল বিদ্যা শিক্ষালাভ করে উন্নতি করেন। এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। এই সাহায্য যে তিনি অর্জন করতে পেরেছেন এটাও তাঁর একটা বিশেষ কৃতিত্ব। এই গ্রন্থপঞ্জীরূপ শিশু সাহিত্যের মানচিত্রের মধ্যে হয়ত কোন গ্রাম বা কোন নদী বাদ পড়েছে কিন্তু তবুও একথা বলা যায় একটা সামগ্রিক চিত্রের পরিচয় এর মধ্যে আমরা দেখতে পাব।

পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহকে পুস্তকখানি উপহার দিতে গিয়ে বলেন: আমি আজ এই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। গত দুবছর ধরে আমি এই পরিষদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছি। এর আগেও আমি পরিষদের সম্মেলন ও বার্ষিক সভায় যোগদান করেছি। এই পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চক্র, সম্মেলন, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে চলেছে। আজ একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে জাতীয় জীবনে ও জাতীয় শিক্ষায় গ্রন্থগারের ভূমিকা অপরিহার্য।

এই গ্রন্থপঞ্জীটি প্রকাশ করাও পরিষদের গঠনমূলক কাজের আর একটি পরিচয়। সরকার এর জন্যে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার যথার্থ প্রয়োজন ছিল বলেই করেছেন। কল্যাণকামী সরকার সব ভাল কাজেই সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ বলেন: শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই পরিষদের কর্ম-প্রণালীকে সরকার সব সময়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। জনসেবার কাজে যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য। জনগণের পরিচালিত সরকার গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সুতরাং এর অগ্রগতির বিষয়ও সরকার নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। দেশের নিরক্ষরতা দূর করায় গ্রন্থাগার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তারা এই কাজ করে

চলেছে। বাংলা সাহিত্যের এই শিশু গ্রন্থপঞ্জী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন,—এই উৎসবের জন্যই আমি দুদিন আগে কলকাতায় এসেছি। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের সাথে আমি অনেকদিন যুক্ত ছিলাম। ঐ গ্রন্থাগারে একটা ছোটদের বিভাগও আমি খুলেছিলাম। এই শিশু-গ্রন্থপঞ্জীটি আমি নেড়ে চেড়ে দেখে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। আমাদের দেশে এই রকম গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শিশু সাহিত্যের মৌমাছি শ্রীবিমল ঘোষ বলেন—আমি আজ শুধু শ্রীমতি বাণী বসুকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। বাংলা দেশের শিশু সাহিত্য যে আজ সমস্ত পৃথিবীর শিশু সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এটা প্রচার করবার সময় এখন এসেছে। এ ব্যাপারে শিশু সাহিত্যিকদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, এবং এই রকম গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে সাহায্য করা উচিত।

সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে বৃদ্ধবয়সে তীর্থবাসের রেওয়াজ আছে। আমাকে বৃদ্ধবয়সে জাতীয় গ্রন্থাগারে একটু স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এটাই আমার তীর্থ স্থান। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকার হাসিখুসি বই বের করেন। সেই ছিল আমাদের শিশু সাহিত্য। সখা ও সাথী ও মুকুল এই দুটো ছোটদের পত্রিকাও তখন বেরুত। এ থেকেও আমরা কিছু কিছু শিশু সাহিত্যের স্বাদ পেতাম। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম শিশু সাহিত্য হিতোপদেশ এবং তারপর পঞ্চতন্ত্র। এগুলির মধ্য দিয়ে রাজকুমারদেব নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশু বোধক আমাদের সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্য ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি চমৎকার। আরো কয়েকটি শিশু গ্রন্থাগার দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আজকাল এবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শ্রীমতী বাণী বসু এই শিশু গ্রন্থপঞ্জীটি সংকলন করেছেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বই প্রকাশ করেছেন সুতরাং এরা আমার ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Report of the function for publishing
Bibliography of Bengali Children's Literature.

বঙ্গীয় গ্রন্থগার পরিষদ কার্যালয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন

গত ২৫শে বৈশাখ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ হুজুরীমল লেনে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠন ও সংযোগ সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ বসু।

Rabindra Birth Anniversary Celebration

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ পরিক্রমা

সম্প্রতি গ্রন্থ পরিক্রমা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত দীর্ঘ দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে চলেছেন। পত্রিকাটির বিশেষত্ব হচ্ছে এতে শুধুমাত্র গ্রন্থ সমালোচনা ছাপা হয়। কবিতা, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, পুস্তক প্রভৃতির সুন্দর সমালোচনা এতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনীর উপর বিভিন্ন বিখ্যাত সমালোচকদের লেখা সঙ্কলিত হয়েছিল এই সংখ্যায়। শুধুমাত্র গ্রন্থ সমালোচনা ও বাংলা গ্রন্থের নানাবিধ সংবাদ সম্বলিত এই রকম পত্রিকা বাংলাদেশে মনে হয় এই প্রথম। গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ পত্রিকা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থ সমালোচনা ছাড়াও এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মাঝে মাঝে প্রকাশ করা। আজকের দিনে শুধুমাত্র সমালোচনাকে কেন্দ্র করে এ রকম পত্রিকা পরিচালনা করা খুবই দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই।

Book Review,
Grantha Parikrama,
(A Bi-Weekly Journal.)

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিশেষ ঘোষণা

সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসের (৩০ শে মে, রবিবার যাঁহারা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন তাঁহাদের জানান যাইতেছে যে সকাল ৭টা ২ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেণে যাত্রা করা শ্রেয়। ঐ গাড়ী ৮টা-৪৮ মিনিটে বাগনান পৌঁছিবে। বাগনান হইতে ঐ সময় বিশেষ বাস প্রতিনিধিদের লইয়া যাইবে।

সম্পাদকীয়

যাত্রারম্ভ

এই সংখ্যা থেকে গ্রন্থাগার পঞ্চদশ বর্ষ পরিক্রমা শুরু করল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যাঁরা সভ্য, পত্রিকার যাঁরা গ্রাহক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের যাঁরা সমর্থক ও সহায়ক তাঁদের সকলকেই জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। দীর্ঘদিন ধরে যেসব কর্মীর সহায়তায়, যে সব সম্পাদকের সম্পাদনায় এবং যেসব লেখক লেখিকার পৃষ্ঠ-পোষকতায় এই ক্ষুদ্র পত্রিকার যাত্রাপথ সহজ ও সুগম হয়ে উঠেছে তাঁদেরও জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

বৈশাখ মাস বছরের প্রথম মাস তাই এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। বৈশাখ মাস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম মাস তাই এর অশেষ মূল্য আছে বাংলাদেশের সুধীজন মহলে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি। প্রথম সভাপতির উদ্দেশ্যেও আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

Beginning of the journey

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে পশ্চিম বাংলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির একটা সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষার কিছু অংশ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। কাগজে যেটুকু অংশ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভাল ব্যবস্থা নেই। উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মানোন্নতি সম্ভব হচ্ছেনা বলেও অভিমত জানিয়েছেন সমীক্ষকবৃন্দ।

মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম বাংলায়। এই রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্যেও ভাল সুপারিশ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুন্দর গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রদের গ্রন্থাগারে পড়াশুনো করবার ব্যবস্থা করে দিয়ে পাঠাভ্যাস বাড়ানোয় সাহায্য করতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা করাতে হবে। ভাল ভাল বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে, এবং গ্রন্থাগারিককে সিনিয়র টিচারদের সমতুল্য বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ মুদালিয়র শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সুপারিশ আজও পর্যন্ত ভালভাবে কার্যকরী হয়নি। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের সমীক্ষা এই সত্যতাকেই প্রমাণ করল।

গ্রন্থাগারকে এইভাবে অবহেলা করে চললে কোন দিনই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

Higher Secondary School Library

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পঞ্চদশ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭২ [দ্বিতীয় সংখ্যা

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
শ্যামপুর, হাওড়া

সভাপতির অভিভাষণ

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ১৯তম বার্ষিক অধিবেশনে আপনাদের সকলের সাক্ষাৎ-লাভের সুযোগ পেয়েছি, এর জন্য আপনাদের নিকটে আমি কৃতজ্ঞ। শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, একথা গভীরভাবে অনুভব করি ব'লে আপনাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলাম।

কয়েক বৎসরের সম্মেলনের কাগজপত্র পড়লাম। ক্রমশ: দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং গ্রন্থাগারিকগণের শিক্ষাব্যবস্থা ও চাকরীর ক্রমশ: উন্নতিবিধান হচ্ছে দেখে বিশেষভাবে আশান্বিত হ'তে হয়। একদিকে গভর্ণমেণ্ট যেমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও যাতে পঞ্চায়তীরাজ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার হয় তার জন্যও তাঁরা আগ্রহান্বিত। পুরাতন বাৎসরিক রিপোর্ট এবং সম্মেলনে বক্তৃতাদির মধ্যে লক্ষ্য করলাম, কোন কোন বক্তা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি করণীয়, সে-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, কেহবা বলেছেন সমাজচেতনার দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা অথবা প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা যায় না। কেহবা প্রস্তাব করেছেন গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কীর্তিশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন, যেখানে সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক

কীর্তির নিদর্শনগুলি সংগৃহীত হবে এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের খাওয়াপরা, শিক্ষাদীক্ষা, আমোদ প্রমোদ বিষয়েও নানাবিধ সংবাদের সংকলন করা হবে। এটিও আমার নিকট খুব সমীচীন প্রস্তাব বলে মনে হয়েছে।

আপনারা হয়ত অবগত আছেন প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্থাপিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কর্তব্য হবে, বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভাষা, লোকসংস্কৃতি এবং কীর্তিরাজি সম্বন্ধে যথোচিত তথ্য সংগ্রহ করা। পরিষৎ যথাসাধ্য এই চেষ্টা করে এসেছেন, এবং তার প্রমাণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নানা সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

তখনকার দিনে গ্রন্থাগার বা লোকশিক্ষার প্রসার মোটামুটি ব্রিটিশ সরকারকে বর্জন করে পরিচালিত হ'ত। দেশের অর্থবান ভূস্বামীগণ একদিকে যেমন আর্থিক সহায়তা করতেন, তেমনই সাধারণ সাহিত্যানুরাগী গৃহস্থ পাঠকও প্রায় মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা, এবং অনেকক্ষেত্রে নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে নয়, বাংলা দেশে নানা স্থানে গ্রন্থাগার বা কীর্তিশালা স্থাপিত করে জিইয়ে রেখেছিলন।

গত বৎসর বীরভূম অধিবেশনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ পাঠে দেখতে পাচ্ছি গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু গ্রন্থাগার ভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। "জন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের' সংখ্যাই ৪০০০ ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে রাজ্য সরকার অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণ ততোধিক আগ্রহভরে বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপনা করেছেন।

পুরাতন রিপোর্টগুলির মধ্যে একটি সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছি: বই থাকলেই তাকে গ্রন্থাগার বলা চলেনা। কতজন সেই বইয়ের ব্যবহার করছেন, এবং বইগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, এইটাই ভেবে দেখার বিষয়। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছিল যে, গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা অপেক্ষা জনসাধারণের চেষ্টা এবং আত্মবিচার যে সতেজ ও সক্রিয়, এই লক্ষণকে সমাজের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে শুভ বলে মনে করতে হবে।

আজ দেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পর সমাজের শুভ কর্মোদ্যমের একটি সহায়ক শক্তি ক্ষীণবল হয়ে গেছে। নূতন শিল্পপতি বা বাণিজ্যপতিগণ এখন পর্যন্ত সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট অগ্রসর হ'ন নাই: হয়ত সেইজন্য নূতন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে কর্মীগণের মনে গভর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভরশীলতার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। কিন্তু যে-দেশে মানুষ কলের অভাবে চরকা দিয়ে বস্ত্রের অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছে চরকার অভাবে প্রয়োজন হ'লে তকলি দিয়েও কাপড়ের জন্য সূতা কেটেছে, সেখানে আত্মবিশ্বাসের শক্তিকে আশ্রয় করলেই অঘটন ঘটানো যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্বদেশী সমাজ'' নামক প্রবন্ধে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে পশ্চিমে রাষ্ট্রশক্তি সমাজের কেন্দ্রে যে-স্থান অধিকার করে আছে, ভারতে তৎপরিবর্তে স্বেচ্ছায় রচিত বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। আজ জগতের সকল দেশেই সরকারের বা গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক

উৎপাদনব্যবস্থা রচনার চেষ্টায় উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধীর দেশে হয়ত আমাদের পক্ষে সরকারী সহায়তা অপেক্ষা আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়। সেই দিক দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে আমার মনে যে দু-একটি কথা এসেছে, আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শকে বাদ দেওয়া যায় না, একথা আমি আংশিকভাবে স্বীকার করি। কিন্তু একথা বোধ হয় আরও বেশি ক'রে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মনের সম্যক প্রসারণে সহায়তা করাই গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটি বিশেষ পথে মানুষের মনকে পরিচালিত করা তার লক্ষ্য নয়। অন্ততঃ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

আমার নিজের ধারণা, ভারতবর্ষকেই আমরা ভালকরে দেখিনি বা চিনিনা। মারাঠা দেশের চাষী কিরকম ঘরবাড়ীতে বাস করে, তাদের দেশে সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রাচীন মঠ, মন্দির বা ব্রাহ্মণসভার স্থান কোথায়, গ্রাম্যসমাজের বর্তমান গতি কোন্ দিকে—এসকল বিষয়ে আমাদের-যে পরিমান জ্ঞান আছে, ইউরোপ বা আমেরিকার বিষয়ে হয়ত তার চেয়ে বেশী আছে। এর কারণ এ নয় যে ইউরোপের প্রতি আমাদের অনুরাগ দেশের প্রতি অনুরাগের চেয়ে বেশী। আসল কথা হ'ল ইউরোপ বা আমেরিকা এমনকি জাপানের সম্পর্কেও তথ্যবহুল অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে, কিন্তু মাদ্রাজ বা কেরল, মারাঠা বা অসমীয়া ভাষাভাষী রাজ্যের সম্পর্কে স্বাধীন দৃষ্টি ও চিন্তাপ্রসূত অনুরূপ তথ্যবহুল পুস্তকাদি নাই বল'লেই চলে।

হয়ত উৎসাহী কেহ কেহ বলবেন ভারতের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সম্বন্ধে আমাদের আবার জানবার মত কি আছে? কিন্তু এর উত্তরে আমার বক্তব্য হ'ল, চিকিৎসক যদি রোগীর অবস্থা এবং রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ না রাখেন তাহ'লে তিনি কখনও সুচিকিৎসক হ'তে পারেন না। ক্যানসার সম্বন্ধে আজ অনেক গবেষণা হচ্ছে; তাতে দেখাগেছে, ক্যানসার রোগও বহু রকমের হয়। একের ক্ষেত্রে যে চিকিৎসা অপরের পক্ষে সে চিকিৎসা হয়ত চলে না। সমাজের দেহে দারিদ্র্য, অসমতা প্রভৃতি যে-সকল রোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃতি এবং বিস্তার সম্বন্ধে যদি আমরা সূক্ষ্ম গবেষণা না করি, তাহলে এক দেশের পেটেণ্ট ঔষধ অন্য দেশে প্রয়োগ করে সুফলের চেয়ে হয়ত আমরা কুফলই বেশী উৎপাদন করবো।

নৃতত্ত্ববিদ্ বা সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু কর্মী হিসাবে আমি এই কথা বল'ব, আমাদের দেশের প্রতি অঞ্চলের অবস্থা কি' মানুষ কেমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তার সমস্যাই বা কি, এসকল বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান্ পাঠকগণের নিকট পরিবেশন করতে হবে॥ ইংলণ্ড আমেরিকা নরওয়ে; সুইডেন চীন জাপান রুশ বা পোল্যাণ্ড কিভাবে স্বীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে সেকথা নিশ্চয়ই আমরা পড়বো, কিন্তু নিজের দেশের সম্বন্ধেও আরও গভীর ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।

আজ ভারতের ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা সরকারী দপ্তরখানায় এই সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান পাওয়া যাবে, তাকে পর্য্যাপ্ত বলে মনে হয় না। তথ্যেরই যেখানে অভাব, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তথ্যের অপ্রাচুর্য্য ঢাকবার জন্য অথবা স্বীয় সমাজসংস্কারের আগ্রহাতিশয্যের বশে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন, সে গুলিকে নির্বিচারে পাঠকসমাজের নিকট উপস্থাপিত করা ভাল কাজ নয় বলে আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি।

অথচ এই সকল তথ্য বা মতামতকে উপেক্ষা করাও চলে না। উপেক্ষা রকলে দেবার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। ব্যাক্তিগতভাবে আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর'ব যে গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য সংগ্রহের এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের কেন্দ্ররূপে কি ব্যবহার করা যায় না ?

সেখানে পাঠকগণ এক এক বিষয় বা প্রশ্ন নিয়ে যাবতীয় তথ্য এবং মতামত সংগ্রহ করবেন, সম্ভব হ'লে পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় অনুসন্ধান করে পুস্তকে লব্ধ তথ্যাদিকে যথাসাধ্য যাচাই করে নেবেন। তাহ'লে গ্রন্থাগারগুলি চিন্তারাজ্যে সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন এবং মনকে আরও মুক্ত ও সুস্থ করার ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব হয়ত আরও ভালভাবে পালন করতে পারবে।

আমার বক্তব্য সামান্য। কিন্তু আপনারা ধৈর্য্যের সঙ্গে এতক্ষণ শুনলেন ব'লে আমি আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার নিবেদন করছি।

Nineteenth Bengal Library Conference
Shyampur, Howrah.
Presidential Addtess
by Prof. Nirmal Kumar Basu

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

অনন্তপুর গ্রামে এই শুভ সম্মেলনে আজ আপনাদের সকলকে সৌহার্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। স্বাগতম্ সভাপতি মহাশয়, স্বাগতম প্রতিনিধিবৃন্দ ও জনমণ্ডলী। আপনাদের সহযোগিতায় এই সম্মেলন সার্থক হোক্, সফলতামণ্ডিত হোক্, সম্মেলনে আপনাদের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থাগার-আন্দোলন-প্রচেষ্টাকে আদর্শনিষ্ঠ ও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করুক। গান্ধীজীর কর্ম-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে অসামান্য তপস্যার তেজে গান্ধীজী যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্তরূপে আরম্ভ হ'ল।" দেশগঠনের কার্যে যে কোন ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য কথাগুলি কর্মিগণের শিরোধার্য করা উচিত। গ্রন্থগারও দেশগঠনের অন্যতম ক্ষেত্র।

জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়-দান প্রসঙ্গে প্রথমেই সেই পুণ্য কথা স্মরণ করি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব পদব্রজে নীলাচল গমন কালে আমাদের এই শ্যামপুর অঞ্চলে রূপনারায়ণ তীরবর্তী পিছলদহ গ্রামে বিশ্রাম করেছিলেন। আমাদের মাটি তাঁর পদস্পর্শে ধন্য পবিত্র হয়ে আছে। পিছলদহের অপর পারে সুবিখ্যাত তাম্রলিপ্তি—বর্তমান তমলুক। বৌদ্ধধর্মকে হৃদ্গত করবার জন্যে সুবিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েংসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত ভ্রমণকালে এই তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন। তাম্রলিপ্তি তখন সমুদ্র-উপকূলবর্তী ছিল। অর্ণবযান সকল সেখান থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করত। প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবময় যুগের কথা আজ আমরা স্বাধীন ভারতে স্মরণ করি।

জেলার প্রাচীন ইতিহাস অস্পষ্ট। জেলার পরিচয়ে দুই একটা স্থূল কথা মাত্র বলা সম্ভব হতে পারে। পূর্বে হাওড়া জেলা নানা অবস্থায় বর্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৩ সাল থেকে স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীনে হাওড়া একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে। হাওড়া নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অনেকের মত এই যে 'হাওড়' অর্থাৎ কর্দমাক্ত জলাভূমি থেকেই এই নাম এসেছে। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া জেলায় সর্বত্র নিম্নভূমি—খাল, বিল, জলা প্রভৃতি। হাওড়া সহরের দক্ষিণে বেতোড় নামে গ্রাম আছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে লিখিত কবি বিপ্রদাসের "মনসামঙ্গল" কাব্যে উল্লেখ আছে যে সুবিখ্যাত চাঁদ সদাগর বেতোড় গ্রামে তাঁর সপ্তডিঙ্গা লাগিয়ে বেতাইচণ্ডীর পূজা করেন। ১৫৬৫ খৃঃ য়ুরোপীয় পর্যটক সিজর ফ্রেডারিকের বাঙ্গলা-ভ্রমণ বিবরণী থেকে জানা যায় যে পর্তুগীজ বণিকগণ বাণিজ্য করতে এসে প্রতি বৎসর বেতোড় গ্রামে বহুসংখ্যক খড়ের চালা বেঁধে বর্ষা যাপন করতো। বর্ষা অন্তে তারা সেই সব চালাঘর পুড়িয়ে দিয়ে চলে যেতো।

ভাগীরথীর উপর এই সময় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার ও পর্তুগীজ বণিকগণের বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করতো। কলকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের নাম সুবিদিত। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জব চার্ণক রণতরী নিয়ে এসে এই সব অঞ্চল জুড়ে খুব অত্যাচার করতো। চার্ণককে শাসন করে এক চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে উলুবেড়িয়ার নিকট কুঠি ও ডক নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। তদনুসারে জব চার্ণক ১৬৮৮ খৃঃ ১৭ই জুন একদল ইংরেজ নিয়ে উলুবেড়িয়া যান এবং ঘাঁটি নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দৈবের বিধান ছিল অন্যরূপ। ইংরেজ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁকে উলুবেড়িয়া ছেড়ে এসে সুতানটিতে ঘাঁটি নির্মাণের আদেশ দেন। তদনুসারে চার্ণক বাধ্য হয়ে সুতানটিতে চলে এসে তথায় ঘাঁটি নির্মাণ করে কলকাতা সহরের পত্তন করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সেদিন সুতানটির পক্ষে সিদ্ধান্ত না করলে হয়ত কলকাতার স্থানে উলুবেড়িয়া বৃটিশ ভারতের রাজধানী হতো। এখন একথা ভাবলে ভারি অদ্ভুত লাগে।

কলকাতা-পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়ার উন্নতি হতে থাকে। হাওড়ার অন্যতম সহর বালির দক্ষিণে ঘুসুড়িতে ভোটবাগানে তিব্বতীদের একটি মন্দির আছে। ১৭৭২ খৃঃ ভূটান যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হলে তাশী লামার অনুরোধে ওখানে ওয়ারেন হেষ্টিংস বৌদ্ধদের জন্য ভাগীরথী তীরে এই মন্দির নির্মাণ করান। হাওড়া জেলার রামরাজা ঠাকুর, রামরাজাতলার শঙ্কর মঠ, মৌরী গ্রামে শ্মশানেশ্বর শিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, সাঁকরাইলের বিশালাক্ষী মন্দির, আমতার মেলাইচণ্ডী, খালোরে কালী, মাকড়দহে মাকড়চণ্ডী, বেতোড়ে বেতাইচণ্ডী, বালিতে কল্যাণেশ্বর ও বেলুড়মঠে সুবৃহৎ রামকৃষ্ণ মন্দিরে নানা তিথি ও পূজা উপলক্ষে বহু যাত্রী সমাগম হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ্ ও কয়টা গির্জাও আছে।

ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বেলুড়মঠ হাওড়া জেলার অপূর্ব গৌরব। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে ও ভিন্ন দেশে আমাদের ধর্ম-সাধনা, সেবা-প্রচেষ্টা, শিক্ষা-প্রচেষ্টা, সংস্কৃতি ও তপস্যার বাণী বহন করে। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মানসপুত্র বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইগণ কর্তৃক ১৮৯৭ সালে বেলুড়মঠ স্থাপিত হয়। ভারতের বহু স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে। ভগিনী নিবেদিতা অনেক সময়েই এই মঠে আসতেন।

হাওড়া জেলায় ভাগীরথী নদীর উপর হাওড়া পুল—বর্তমান রবীন্দ্র সেতু এবং বালি পুল—বর্তমানে বিবেকানন্দ সেতু, জেলার শোভাবর্ধন ক'রে জীবনচাঞ্চল্য ও কর্মব্যস্ততার পরিচয় দেয়।

এইবার সুবিখ্যাত শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা উল্লেখ করি। ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার পত্তন এই উদ্যান-রচনার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। ভাগীরথী তীরে এই সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে নানারকম ফুল ফল ও অন্যান্য গাছপালার অপূর্ব সুন্দর সমারোহ। এই উদ্যানের পশ্চিম দিকে রয়েছে সেই পুরাতন বিখ্যাত বট বৃক্ষ। উদ্যানের শ্রেষ্ঠ শোভা ও গৌরব এই বট-বিশাল আপন মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আছে। এই সুপ্রাচীন গাছ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ছিল। কথিত আছে এক সন্ন্যাসী তখন এই গাছের তলদেশে প্রতিদিন ভিক্ষায় বসতো। ১৭৮৬ সালে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণ ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট এই উদ্যান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ১৭৮৭ সালে এই উদ্যান স্থাপিত হয়। উদ্যানের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন কর্ণেল কিড্। তাঁর মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত ডক্টর রকস্‌বোরো উক্ত কর্মের ভার প্রাপ্ত হন। যোগ্য পাত্রে যোগ্য ভার অর্পিত হয়। ডক্টর রকস্‌বোরো ভারতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদের পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও রক্ষণভার নিপুণভাবে গ্রহণ করে এইখানে ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পত্তন করেন। ভারতীয় উদ্ভিদ্ বিদ্যার তিনি জনক ও প্রবর্তক।

বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের নিবাস ছিল এই জেলার পেঁড়ো হরিশপুর গ্রামে। বালিতে গঙ্গাতীরে বাঙ্‌লা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বাগান বাড়ী ছিল। সুবিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিবপুরে বহুকাল বাস করেন। এইখানেই তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস রচিত হয়। রূপনারায়ণ তীরে পাণিত্রাস গ্রামে তিনি বাড়ী করেছিলেন। শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের আদি নিবাস ভাগীরথী তীরে রাজগঞ্জে। হাওড়ার সুবৃহৎ রেল ষ্টেশন ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। আপনারা জানেন এখান থেকে রেলযোগে ভারতের সর্বত্র যাওয়া যায়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পুরাতন ও বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়ার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর ১৯৩০ সালের লবণ-সত্যাগ্রহে ও ১৯৪২-এর "ভারতছাড়' আন্দোলনে হাওড়ার এই শ্যামপুর থানা কৃতিত্বে জেলার অপর সকলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই সময় পল্লীতে পল্লীতে নব জাগরণ হয়। গ্রামে গ্রামে নতুন রাজনৈতিক ও সমাজচেতনা পরিস্ফুট হ'তে থাকে। গান্ধীপূর্ব বিপ্লবযুগে শিবপুর, শালকিয়া ও বালি বিপ্লবচেষ্টার সহিত যুক্ত ছিল। গণ-আন্দোলন শ্যামপুরে সবচেয়ে প্রবল হ'লেও হাওড়া ও বালি সহরে এবং অন্য বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মানচিত্রে হাওড়া জেলা ভারতের দাক্ষিণাত্যের মত ত্রিভুজাকার—পূর্ব সীমায় ভাগীরথী ও পশ্চিম সীমায় রূপনারায়ণ। আর জেলার মধ্যস্থলে মেরুদণ্ডের মত দামোদর নদ। ডি.ভি.সি. পরিকল্পনা জেলার এই মেরুদণ্ডের উপর সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আজ লোকের মন সংশয়ে পূর্ণ। পরিকল্পনার ফলে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে আজ দুর্দশার সীমা নেই। জেলায় নদী নালা খাল বিলের চারিদিকে সহস্র সহস্র জেলেদের বাস। স্মরণাতীত কাল থেকে মাছ ধরা ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা। জেলেরা বলে 'পরিকল্পনা' হ'য়ে তাদের সর্বনাশ হয়েছে। উন্মাদ দামোদরের জলের সে দুর্দাম চাপ আর নেই, সে লাল জলের সোনার পলির প্লাবন নেই—যেন মেরুদণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের অভাবে দেহ দিন দিন শুকিয়ে উঠছে। দামোদর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দামোদরের জল না পেয়ে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ লবণাক্ত হয়ে উঠেছে। অজস্র ইলিস মাছের সম্ভার চক্ষের নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। জেলেরা আর নৌকা গঠন করে না, জাল বোনে না, নৌকায় বসে মাছ ধরতে ধরতে আনন্দে বাউল, ভাটিয়ালী গান গায় না। তাদের মধ্যে হাহাকার। গঙ্গা ও রূপনারায়ণ নদীতে দামোদরের প্রবলতার স্পর্শের অভাবে দ্রুত চর পড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে ভূমির সে উর্বরতা ও ফলন নেই। শ্যামপুরে হাওড়ার কৃষিলক্ষ্মীর আসন বিছানো ছিল। আজ সে আসন যেন টলেছে। বিখ্যাত সীতাশাল ধান আ

তেমন ফলে না। ডি. ভি. সি. কি বাঞ্ছিত ফল দিয়েছে? ডি. ভি. সি. জলবিদ্যুৎ স্বল্প পরিমাণ দিচ্ছে—প্রধান নির্ভর ত তাপবিদ্যুতের উপর। ডি. ভি. সি.র দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮৪ মাইল ব্যাপী খাল বিশীর্ণ, বিশুষ্ক, কুৎসিৎ ও অলস হয়ে পড়ে থেকে পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে। পরিকল্পনার অন্যতম কথা ছিল দামোদর নাব্য হয়ে উঠবে। নদী ত মরেই গেল —নাব্য হওয়া ত স্বপ্নাতীত। আর সেচের ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধেও নানা সন্দেহ জেগেছে। এই ব্যবস্থায় এক অঞ্চলকে দামোদরের স্বাভাবিক দান থেকে বঞ্চিত করে, বাঁধ বেধে খাল কেটে অপর অঞ্চলে জল দেওয়া হচ্ছে না ত? মোটের উপর ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি যদি পেয়ে থাকে, সংখ্যাতথ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে তা দেখান হয়েছে কি? ডি. ভি, সি. হওয়া সত্বেও কয় বৎসর পূর্বে আমাদের এই অঞ্চল বর্ষায় অনেকদিন ধরে জলে জলমগ্ন হয়েছিল। সে ভয় এখনও রয়েছে। স্বয়ং জওহরলাল তখন প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করে বলেছিলেন জলনিকাশই এই অঞ্চলের আসল সমস্যা। মনে হয় ডি, ভি. সি সম্বন্ধে সুকঠোর চিন্তা ও পুনর্বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় এসেছে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলকে বাঁচাতে হবে ও বাঁচতে হবে। আমরা যে দক্ষিণ দামোদরবাসী।

জেলায় মজা সরস্বতী নদী আছে, আর কাণা দামোদর। তা ছাড়া খাল ও খাঁড়ি আছে অনেক—যেমন বালি খাল, রাজগঞ্জ খাল, শাঁকরাইল খাল, সিজবেড়িয়া খাল, চম্পা খাল, মাদারিয়া খাল, বাঁশবেড়িয়া খাল, বাকসী খাল, গাইঘাটা খাল প্রভৃতি। হাওড়া জেলায় সাধারণতঃ পলিমাটি, নদীতীরে বেলে মাটি আছে, আর জলাভূমিতে কাদা। বাঙলার আম, কাঁঠাল, নারিকেল, আনারস, জাম, জামরুল প্রভৃতি সকল ফলের গাছ হাওড়ায় যথেষ্ট আছে। ধান, পাট, আলু, রবি ফসল, শাকসব্জী ভালই ফলে। আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া ও শ্যামপুর অঞ্চলে ধান ভাল হয়। কিন্তু জনবহুল হাওড়া ঘাটতি জেলা—হাওড়ায় বর্গমাইল পিছু লোক বসতি ভারতে তথা পৃথিবীতে সব চেয়ে ঘন। জেলায় তাঁত, মাদুর, তাল গুড়, শঙ্খশিল্প, মৃৎশিল্প, ইট খোলা প্রভৃতি আছে। কিন্তু যন্ত্র যুগে পল্লীশিল্প ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবনত অবস্থায় এসে পড়েছে। গ্রামে কামার এখনও আছে। ঢেঁকি উঠে গেছে।

হাওড়া সহরে বেলিলিয়স্ রোড শিল্পপ্রতিষ্ঠার কারণে পশ্চিম বাঙলার শেফিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ছোট ছোট লোহার কারখানা বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া কল কারখানা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এই জেলা শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। গঙ্গাতীরে বহু চটকল, এবং বহু স্থানে লোহারখানা ও অন্য কারখানা সকল স্থাপিত হওয়ায় জেলায় মজুর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল কলেজ জেলায় অনেকগুলি আছে। খেলাধূলার জন্য ফুটবল ক্রিকেট ত আছেই। তাছাড়া বালি অঞ্চলে দেশীয় ক্রীড়া কপাটী নৌবাহন উল্লেখযোগ্য। হাওড়ায় দুইটি মিউনিসিপালিটি আছে—হাওড়া ও বালি।

হাওড়া পাঠাগার সংঘের সহিত সহর ও গ্রামের প্রায় ২৫০টি গ্রন্থাগার যুক্ত আছে। তদ্ভিন্ন সহরে ও গ্রামে আরও শতাধিক ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে বলে আমাদের ধারণা। হাওড়ায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি। সরকার-প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারে ১১৭৮৩ খানি পুস্তক আছে এবং ৩৬টি গ্রাম্য গ্রন্থাগারে (rural library) মোট পুস্তক সংখ্যা ১৩৫৩৯৬।

শেষোক্ত সংখ্যা অন্য জেলার অনুরূপ পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। গত বারো বৎসরে হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ কর্তৃক প্রতি বর্ষে অনুষ্ঠিত শিক্ষণ-ব্যবস্থায় প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। হাওড়া পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে প্রতি বৎসর একটি বড় বই-এর প্রদর্শনী ও বাজার বসতো। ক্রেতারা কয়দিন ধরে প্রায় ৪০ হাজার টাকার বই সর্বোচ্চ হারে কমিশনে ক্রয় করতেন। সরকারের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করা উচিত।

পশ্চিম বাঙ্‌লার জেলা গ্রন্থাগারসমূহে কর্মচারীদের বেতন অতিশয় কম। এই অভিযোগের কথা অনেকবার সরকারের গোচরে আনা হয়েছে। একান্ত পরিতাপের কথা শ্লথগতি সরকার গরীব কর্মচারীদের এই ঘোর অভাব ও দুঃখের কথা গত ১০।১২ বৎসরেও কানে তোলেন নি। আশা করি তাঁরা এইবার এই বিষয়ে অবহিত হবেন।

গ্রন্থাগার-আন্দোলনে হাওড়া জেলা বিগত কয় বৎসরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে কয়টা কথা বলে ভাষণ শেষ করবো। একথা আমি অন্যত্রও বলেছি। গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের স্থান ও কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"লাই-ব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল গ্রন্থের ভাণ্ডারী হলে চলবে না।" গ্রন্থাগারিক অতিথিপরায়ণ হবেন—পাঠক তাঁর বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারকে যেন আনন্দধাম বলে গ্রহণ করতে পারে। আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে বড়র চেয়ে ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা অধিকতর বলেই অনুভূত হয়। সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজন এই ছোট ছোট গ্রন্থাগারের। সেই সমস্ত গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বিষয়ের বাছা বাছা বই থাকবে, প্রত্যেক বই-এর নিজ বৈশিষ্ট্য, বইগুলি গ্রন্থাগারিকের আয়ত্তের মধ্যে থেকে পাঠকগণের কাছে নিত সুকৌশলে পরিবেশিত হবে। ছোট ছোট লাইব্রেরীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাগবে। প্রত্যেক লাইব্রেরীর অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরীকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরীর মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়—গ্রন্থ-পাঠকেরও।"

বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টায় ছোট ছোট গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবের কর্মকেন্দ্ররূপে নানা স্থানে সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক সমিতির সহিত একটি ভাব ও চিন্তাকেন্দ্র সৃষ্টির জন্য এক একটি ছোট লাইব্রেরী যুক্ত থাকতো। লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্বাচিত বই থাকতো। প্রচণ্ড শক্তি ছিল এই ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির। বইগুলি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ও যত্নের সহিত অধীত হয়ে পাঠককে যুগোপযোগী নতুন মানুষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা করতো। গান্ধী আন্দোলনের সময়ও এই সব ছোট ছোট লাইব্রেরীর প্রভাব ও প্রসার অব্যাহত ছিল। আজ স্বাধীন ভারতে নতুন যুগের কর্মিগণকে এইজাতীয় গ্রন্থাগারসমূহ গড়ে তুলতে আহ্বান জানাই।

গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে বিশ্বের নানা দেশের দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞানের নানা জ্ঞান আহরণ করা চাই। গান্ধীজী বলেছেন "বিশ্বের হাওয়া যাতে প্রতিনিয়ত আমার ঘরে অবাধ প্রবেশ করে তার জন্য আমি ঘরের সকল দোর-জানালা আগাগোড়া খুলে রেখে দেবো —কেবল একটি বিষয়ে সাবধান থাকবো—বাইরের ঝড়ের বেগে স্বভূমি থেকে আমি যেন বিচ্যুত না হই।" তাই লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে আমরা যেন সর্বাগ্রে আপন দেশকে—এই ভারতবর্ষকে ভাল করে জেনে বুঝে চিনে নিয়ে ভালবাসতে শিখি, দেশের কল্যাণসাধনের জন্য যেন ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা পাই। গ্রন্থাগারগুলিকে অগ্রণী হয়ে এসে দেশের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বাধীনতার বিচিত্র ইতিহাস, দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিজের ভেবে গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে আর বিস্তার করা উপস্থিত আমার কাজ নয়। তাই নিরস্ত হচ্ছি।

ছোট গ্রাম এই অনন্তপুরে আমি পুনরায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম্ জানাচ্ছি। এই স্বল্পায়তন অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের উচ্চতর বিদ্যালয়, কলেজ, লাইব্রেরী ও হাসপাতাল আছে। শিল্পগঠন হিসাবে একটি সুতার কলও স্থাপিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিক সকলেই বাঙালী—তারা এখানে সহরের মিল্-বস্তীর দুষ্ট বিকৃত হাওয়ায় থাকে না—সুস্থভাবে আপন আপন ঘর বাড়ী থেকে কারখানায় যাতায়াত করে। এখানে অবাধ খোলা মাঠ, ধানের ক্ষেত, গাছপালা, নদীর-ধার, বটের ছায়া, গরু বাছুর, ক্ষেত খামার—এই নিয়ে গ্রামের লোক যেন ভাল থাকতে পারে। গান্ধীজী গ্রাম ভালবাসতেন, সারা ভারত জুড়ে গ্রাম-গঠন চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, গ্রামে-গাঁথা আমাদের এই বিশাল দেশ। এই বিশাল দেশের কল্যাণকল্পে গ্রামের যতটুকু সাধ্য তা যেন এখানে গ্রামে থেকে সাধতে পারা যায় এই প্রার্থনা।

আপনারা অনেক গুণী সজ্জন এই ক্ষুদ্র গ্রামে পদার্পণ করেছেন। আদর-আপ্যায়নের সকল ত্রুটি আপনারা অনুগ্রহ করে মার্জ্জনা করবেন। আপনাদের উদারতাই আমাদের আশ্রয়।

বন্দে মাতরম্

Address by Shri Ratan Mani Chattopadhyay
Chairman,
Reception Committee.

প্রদর্শনীর উদ্বোধক অর্থমন্ত্রীর অভিভাষণ

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

বন্ধুগণ,

আমাদের জীবনযাত্রা আজ এত জটিল হ'য়ে উঠেছে যে পূর্বেকার গতানুগতিক পদ্ধতিতে আজকের দিনের জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আজ বেঁচে থাকার জন্যই আমাদের প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয়। সর্বসাধারণের কাছে এই পরিচয় সহজলভ্য করাই গ্রন্থাগারের কাজ।

আজকের সমাজে একক চেষ্টায় মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। তাই মনুষ্যের অসুবিধা দূর করার জন্য রাষ্ট্র আজ নানারূপ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালের আগে কখনও সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবেনি—নিজের থেকে মানুষের কল্যাণের দায়িত্ব নেয়নি তাই আমাদের দেশের এত দুর্দশা—এই অনগ্রসরতা। পরাধীনতার যুগে ছিল আইন ও শৃঙ্খলা রাখার রাষ্ট্র। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র কল্যাণবতী রাষ্ট্র। জনসাধারণের সমগ্র কল্যাণের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়েছে।

এই অনগ্রসরতা দূর করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ভোগ করবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের কল্যাণরাষ্ট্র কতকগুলি পন্থা গ্রহণ করেছে। সেই সমস্ত পরিকল্পনার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে আমাদের অনাগতদিনের সুখ সমৃদ্ধি। কিন্তু ঐ সাফল্য কখনই দেশের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা, প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া আসবে না। তাই দেশের লোককে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধি আনায়—বুঝতে হবে তারা কী ভাবে সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতে বিরোধিতার সংস্থান আছে, রাষ্ট্র সমালোচনার সংস্থান আছে। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা ডেকে আনার সংস্থান নেই!

সুদূর ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধিই আমাদের পরিকল্পনাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, জনসাধারণের আশু কল্যাণও আমাদের লক্ষ্য। আমরা প্রতিবারই জাতীয় আয় ও সম্পদ বাড়াতে চাই। ব্যক্তির সম্পদের মধ্য দিয়েই জাতির সম্পদ গড়ে উঠে; তাই পরিকল্পনার দূর লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে আশু কল্যাণও উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু আমাদের অক্ষরজ্ঞানবর্জিত, জীবন সংগ্রামে বিব্রত, চিন্তার সময় না পাওয়া কোটি কোটি মানুষকে নতুন অনুপ্রেরণা দিয়ে নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার কাজে উন্মুখ করে তোলার কঠিন ব্রত নেবে কে? দেশের মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতন না হবে, টাকা দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ সৃষ্টির চেষ্টা বাতুলতা। দেশের মানুষ সংকল্পবদ্ধ হলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলে কি করতে পারে নতুন জার্মাণী, নতুন জাপান তার প্রমাণ। তাই দেশের মানুষকে দেশ গড়ার উন্মাদনায় দীক্ষিত করার গুরুতর দায়িত্বের কথাই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী ভাববার।

এই দায়িত্ব আজ আমাদের গ্রন্থাগারগুলির উপর এসে পড়েছে। একদিকে সব রকম জ্ঞান এবং সংবাদের ভাণ্ডার এর হাতে অন্যদিকে পল্লীর সাধারণ লোকের সংগে সহজ মেলামেশার সুযোগ। এই দুই জিনিষের সমন্বয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। তাই জাতীয় উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের মত আর কারও এত বেশী নয়।

কিন্তু আমাদের দেশের অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের আবেদন সাধারণ গ্রন্থের মাধ্যমে হ'তে পারে না। তাই আমাদের সাহায্য নিতে হবে বক্তৃতা, কথকতা, গান, অভিনয়, তথ্যপরিবেশন প্রভৃতির এবং সবচেয়ে বেশী প্রদর্শনীর। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অঙ্গ হিসবে তাই প্রতি বছরই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'য়ে থাকে। এখানে যে সব গ্রন্থাগারিক ও সমাজ কর্মীরা সমবেত হয়েছেন তারা প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্যক, অনুধাবন করে নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যদি উৎসাহী হন তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে।

পরিশেষে আমি হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে এই বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থায় যাঁরা অগ্রণী তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন জানাই। উপেক্ষিত অবহেলিত গ্রাম্যজীবন আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠায় আজ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে গ্রামের সমস্ত কল্যাণ রচনার ভার অর্পিত। গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি যে বিরাট দেশগঠন যজ্ঞে তাঁদের কর্মীদের নিঃস্বার্থ দেশাত্মবোধে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের দায়িত্ব নেবেন সে আশা পোষণ করা স্বাভাবিক। আশা করি আমাদের সে আশা পশ্চিমবাংলার গ্রামের তরুণগণ বিশেষতঃ গ্রন্থাগারকর্মীরা অচিরেই ফলবতী করবেন।

Address by Shri Saila Kumar Mukhopadhyay
President,
Bengal Library Association

শিশুগ্রন্থাগার : একটি সামাজিক দাবী

গীতা মিত্র

সমাজের সঙ্কট ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবন এক সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে চলেছে। এই সঙ্কটের রূপ অতি ভয়াবহ। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। আমাদের যুবসমাজ, যারা আমাদের সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাদের অনেকের মধ্যে রুচিহীনতা, দেখা দিচ্ছে বিকৃত সংস্কৃতির প্রবাহে তারা আজ আদর্শ ভ্রষ্ট। তাদের অপরাধ প্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সকলকেই চিন্তিত করে তুলেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব ও সুস্থপথে অবসর বিনোদনের নানারূপ আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর অভাব আমাদের সমাজ জীবনকে এইভাবে দূষিত করছে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের এই সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হলে সুচিন্তিত বহুমুখী পরিকল্পনার প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। আর এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজন সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় শিশুগ্রন্থাগারের স্থান

সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাচুর্য যদি এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় বলে মনে করি তবে শিশুগ্রন্থাগারের মধ্যে তার গোড়া পত্তন করতে হবে। কারণ সমস্যাটির মূল ধরেই আমাদের সমাধানের চেষ্টা করা দরকার। আগামী দিনের সুশিক্ষিত ও রুচিবান নাগরিককে শৈশবকাল থেকেই গড়ে তুলতে হবে। ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আধার গ্রন্থাগারের প্রতি শিশু ও কিশোরমনকে আকৃষ্ট করতে হবে। মানবজীবনের প্রথম স্তরেই এই কাজ করা সহজসাধ্য। কেননা শিশুমন কল্পনাপ্রবণ অনুসন্ধিৎসু ও কৌতুহলী। শিশুগ্রন্থাগার গড়ে তোলার সামাজিক প্রয়োজনটি আমাদের সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করতে হবে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজকে যদি আমরা উচ্ছৃঙ্খলতার ও রুচিহীনতার হাত থেকে বাঁচাতে চাই, তাকে শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করতে চাই তবে সামাজিক জীব মানুষের শৈশবকে সুপরিকল্পিত ও সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। খাদ্যের সাহায্যে শিশুদেহকে যেমন সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম করে তুলতে হয় তেমনি তার মানসিক প্রসারতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাটাও একান্ত প্রয়োজন। যে সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের শৈশবকালকে উপেক্ষা করল' তাকে সযত্ন প্রচেষ্টায় শিক্ষিত করে আগামী যুগের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলল না সে সমাজ বা রাষ্ট্রের মান দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম, বিচক্ষণ, গ্রন্থাগারিকের অভাবে অবনত হয়ে পড়তে বাধ্য। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা সমাজের আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন।

বিকাশোন্মুখ শিশুমনের চাহিদা

স্বাভাবিক শিশুমাত্রেই একটি সজীব প্রশ্নচিহ্ন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানসিক চাহিদা দেখা দেয়। পূর্বে শিশুর মানসিক চাহিদা, তার স্বকীয়তাকে কোন মূল্য দেওয়া হত না—তার মানসিক গঠন অনুযায়ী তাকে গড়ে তোলা হত না। বিংশ শতাব্দীর মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন শিশুর এই অতৃপ্ত মানসিক চাহিদা তার মনে এক অস্বস্তিকর উত্তেজনার সৃষ্টি করে—এর ফলে শিশু কতকগুলি অদ্ভুত আচরণে অভ্যস্ত হয়। শিশুর এই অস্বাভাবিক আচরণের জন্য আমরা তাদের তিরস্কার করি। তিরস্কারের ফলে দুষ্টবুদ্ধি ক্রমশঃ যদি কুপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয় তবে সে বিপথগামী হতে বাধ্য। আর তারা হয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খল যুবশক্তির আধার। সুতরাঃ যুব-সমাজের অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হলে শৈশবেই তার মানসিক চাহিদাগুলি আমাদের পূরণ করতে হবে। তারজন্য চাই সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বভাবতঃ এখানে প্রশ্ন উঠে এই ধরণের সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি ?

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ভূমিকা—

প্রতিটি শিশুই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে। তার সেই ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলাই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে ছক বাঁধা নিয়মে শিক্ষাদান করা হয়। বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষাদানের মধ্যে শিশুর তীব্র মানসিক চাহিদা মিটতে পারে না। প্রতিটি শিশুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই শিক্ষা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হচ্ছে কিনা সেটাও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা হয় না। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করে তার ব্যর্থতাকে স্বীকার করা হয়েছে।

"This education is too bookish and mechanical, stereotyped and rigidly uniform and does not cater to the different aptitude of the pupils or pupils of different aptitudes. Nor does it develope those basic qualities of discipline, co-operation and leadership which are calculated to make them function as useful citizens." নিরানন্দ পরিবেশে, মুখস্থ করা পুস্তকাশ্রিত বিদ্যার শোচনীয় ফল শিশুর উত্তর জীবনে দেখা যায়। পরবর্তীকালে অর্জিত বিদ্যার অধিকাংশই তারা ভুলে যায়। তার উপর জ্ঞানলাভের সঙ্গে বিদ্যালাভের সামঞ্জস্য না থাকায় সাধারণ জ্ঞানের অভাব ঘটে। ফলে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। যতটুকু অত্যাবশ্যক তাই গ্রহণে তাদের বাধ্য করায় তাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন হয় না এবং স্বাধীন পাঠে তারা অভ্যস্ত হয় না। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও স্বল্প ধারণা তাদের সৃজনশক্তিকে বিনষ্ট করে—তারা হয় কৃত্রিমতার বাহক মাত্র। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা "চলন্ত পুঁথি" বা অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক সঙ্কোচনের ফলে তার দুর্বল জ্ঞানশক্তি পুঁথির চক্ষুঃসীমায় আটকে রইল—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের-নবীনতায় বেগবান হয়ে উঠতে পারলো না।

জীবনের শুভ প্রভাতে যে জ্ঞান শিশু লাভ করে তাই অনুশীলিত হয় তার উত্তর জীবনে তাই দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয় যৌবনের আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা ও কর্মশক্তি। জ্ঞানলাভের সুতীব্র স্পৃহা যার শিশুকালে মিটল না ও স্বাধীন চিন্তা শক্তির উন্মেষ যার ঘটল না, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা তার দূরে সরে গেল।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিদ্যালয়ের প্রদত্ত-শিক্ষার সীমানা—

শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্মেষের পক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষাই যে পর্যাপ্ত নয় এ কথা অনস্বীকার্য্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যদি কেবল পরীক্ষা ফল লোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।" বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট গণ্ডির বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষেত্রে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। অবাধ স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা— এই দুটি, শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ জন ডিউই বলেন যে, সত্যকারের জ্ঞান আসে একমাত্র সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে, নিষ্ক্রিয়ভাবে বইপড়া বা বক্তৃতা শোনার মধ্যে দিয়ে নয়। বিদ্যালয় পরিবেশের সম্পূর্ণ বাইরে যেখানে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে কোন সম্পর্কে নেই, সেখানে শিশুর দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হবে— সেখানে সেই গ্রন্থাগারে প্রভূত আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে, মুক্ত পরিবেশে অনাবিল আনন্দের মধ্যে শিশুর মানসিক চরিত্র গঠন করা অনেক সহজ।

শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের ক্ষেত্র ও সহায়ক শিশু গ্রন্থাগার—

গ্রন্থাগার স্থাপনে আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে চাহিদাগুলি যেন পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চিত্তবৃত্তির সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে মিটতে পারে এবং যে জ্ঞান সে লাভ করুক না কেন সেটা যেন সহজ, সরল ও সঠিক হয়। জ্ঞান লাভের পদ্ধতির সঙ্গে প্রাণ ও মনের চিরস্থায়ী সম্পর্ক শিশু গ্রন্থাগারের সহায়তায় সহজেই করা সম্ভব।

শিশু-গ্রন্থাগারকে শুধু গ্রন্থ কেন্দ্রিক করা সম্ভব নয়—

আমাদের এই উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে গ্রন্থাগারটি শুধু বইতেই ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। শিশুর অচেনা ও অজানা জগত ও জীবন সম্পর্কে শিশুমনে সুস্পষ্ট চিরন্তন ছাপ ফেলার জন্য গ্রন্থাগারে Audio-visual-aid বা শ্রব্য-দৃশ্যবস্তুর ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্কদের জ্ঞান-পিপাসা বইএর সাহায্যে মেটান যেতে পারে। কিন্তু শুধু বই দিয়েই শিশুর জ্ঞান পিপাসা মেটাতে গেলে সেটা বিদ্যালয়েরই প্রকারভেদ হবে। যে বস্তু সম্বন্ধে শিশুমনে কোন ধারণাই নেই তা শুধু ছাপার অক্ষরে বোঝান সম্ভব নয়। সেইজন্য শিশু যেন তার দৃষ্টি দিয়ে কোন বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, তার শ্রবণশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্পর্শের দ্বারা অনুভব করতে পারে, তার ব্যবস্থা শিশু-গ্রন্থাগারে অবশ্যই করতে হবে।

দৃষ্টি-মাধ্যমে—

ম্যাজিক লণ্ঠন, ছায়াচিত্র, পুতুল নাচ, রঙিন চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে শিশু পুঁথিসর্বস্ব নিরানন্দ জ্ঞান লাভের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তার কৌতূহলদীপ্ত দৃষ্টি দিয়ে অজান্তে কখন অজ্ঞানতার সীমা অতিক্রম করে আনন্দিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি যখন ছায়াচিত্র মাধ্যমে কিশোরদের সামনে উপস্থিত হয়, বা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিচিত্র জীবের রঙীন ছবির মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠে তখন তার সম্বন্ধে শিশু মনে বাস্তব ধারণা করা সম্ভব হয়।

শ্রুতি-মাধ্যমে—

রেডিও, গ্রামফোন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশু তার সাগ্রহ শ্রবণে যা গ্রহণ করে সেটা তার মনে চির জাগরূক থাকে। গ্রন্থাগারে শিশুদের গল্প শোনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গল্প শোনার মধ্য দিয়ে শিশুর মন আপনা থেকেই কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।

কর্ম-মাধ্যমে—

শিশুর মনে নতুনত্বের চাহিদা মেটানর জন্য শিশুকে নতুন নতুন প্রাকৃতিক জিনিষ, খেয়াল-খুশীর জিনিষ সংগ্রহ করতে দিতে হবে। তাকে সৃজনধর্মী কাজে উৎসাহ দিলে তার সক্রিয়তার চাহিদা মিটবে। এর জন্য গ্রন্থাগারে ছবি আঁকা, গল্পলেখা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। হস্ত-নির্মিত বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। শিশু সাহিত্যের ক্লাসিক গল্পগুলির যদি পুতুল নাচ দেখান যায় বা তার আকর্ষণীয় জায়গাগুলির মডেল ইত্যাদির সাহায্যে দেখান যায় তা হলে সেই সব বই পড়ার আগ্রহ ছোটদের থাকা স্বাভাবিক। সেই সব মডেল শিশুদের নিজেদের তৈরী করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং সেই সব গল্প ছোটদের দিয়েই বলাতে হবে। এইভাবে গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে ছোটরা স্বাধীন পাঠে অভ্যস্ত হবে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এই গ্রন্থাগারের রূপ—

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবে, শিশুর তৈরী জিনিষ Audio-visua-lএর উপাদান হবে; সৃষ্টির আনন্দই শুধু এতে চরিতার্থ হবে না।

তার সংগ্রহ—

শিশুর এই সমস্ত সৃষ্টিশীলতা তার বন্ধুজনের মধ্যে যখন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে তখন তার মধ্যে শিশু খুঁজে পাবে তার আত্মস্বীকৃতি। নিজমূল্যের স্বীকৃতির ফলে অবহেলিত ও উপেক্ষিত শিশুর ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে জেগে উঠবে।

তার সংগঠন—

শিশু তার জীবনের চলার পথে কোন বাধাই সহ্য করতে চায় না। এই স্বাধীনতার স্পৃহাকে শৃঙ্খলা রক্ষার কঠোরতায় নিয়ন্ত্রিত করা চলে না। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ জন ডিউই বলেন যে শৃঙ্খলা শিশুর উপর জোর করে আরোপিত হবে না। তা আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর মধ্যে। শিশু যখন কোন সৃষ্টিশীল কাজ করে তখন এই শৃঙ্খলা আপনা থেকেই দেখা দেয়। শিশুকে

গ্রন্থাগারে চিত্রাঙ্কন, গ্রন্থ নির্বাচন, কারুশিল্প ইত্যাদি, এমনকি গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে শৃঙ্খলা বোধ, সাংগঠনিক প্রতিভা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সামাজিকতা। সুতরাং দেখা যায় অপূর্ণ মানসিক চাহিদা থেকে শিশু যে সব প্রতিকূল আচরণ করে, গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দিয়ে নানা উপায়ে তার আত্মতৃপ্তির সন্ধান দিলে তার অবাঞ্ছিত আচরণগুলি বন্ধ করা যেতে পারে, তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করে তাকে যথার্থ নাগরিক করে গড়ে তোলা যায়। অবাধ স্বাধীনতা, বহুবিধ আকর্ষনীয় বিষয়বস্তু ও বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বকীয়তাকে গ্রন্থাগারে যে ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় বিদ্যালয় পরিবেশে তা করা অনেক অসুবিধাজনক। তাই শিশুর জীবনে তাদের উপযোগী গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না।

অর্থাভাবের অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়—

শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকে যদি সামাজিক প্রয়োজন বলে স্বীকার করি, তা হলে সুষ্ঠু শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্র ও সমাজের আশু কর্তব্য। অর্থাভাবের যুক্তি দেখিয়ে এই সামাজিক কর্তব্যকে ব্যয়সাধ্য বলে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু এই যুক্তি যদি আমরা মেনেনি তা হ'লে সমাজ ও সংস্কৃতির মান অবনত হয়ে যাওয়ার সঙ্কটকে আমরা আরও গভীর করে তুলব। মানুষকে অনাহারে রাখা যেমন মানবিক ধর্মবিরুদ্ধ, তেমনি মানুষের মনের খোরাক যোগান মানবিক কর্তব্য। অর্থাভাবে যদি সামাজিক মানুষের শৈশবের চাহিদা আমরা মেটাতে না পারি, তবে সেটা শুধু সামাজিক ধর্ম বিরুদ্ধই হবে না, সমাজের ভিত্তিটাও তাতে দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে পরবর্তীকালে দুর্বল ভিত্তির উপর গড়ে উঠা সমাজ বা রাষ্ট্রের কাঠামোটা যখন ভেঙ্গে পড়বে, তখন তার দায়িত্ব আমরা কি করে অস্বীকার করব? সুতরাং সমাজকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে চাই তবে, তার উত্তর-সাধক শিশুদের দাবী অর্থাভাবের অজুহাতে উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারি না।

বাহ্যিক রূপকে প্রাধান্য না দিলে অর্থের ব্যয়কে পরিমিত করে রাখা সম্ভব——

অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্ট্রকে নিতে হবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার, আমরা দেখেছি, যখনই আমরা কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করি, আমরা স্বভাবতঃ ধনিক দেশের অনুকরণে কাজ আরম্ভ করি। ফলে ঠাট বজায় রাখতেই সব অর্থ চলে যায়। এখানে কবিগুরুর কথা মনে হয়। তিনি বলেছেন "আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতঃই যায় বাহুল্যের দিকে।" সাধারণতঃ দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য আসে গৃহনির্মাণ আসবাব ইত্যাদির জন্য। যেন ভাল বাড়ীতে ভাল আসনে বসে বিদ্যালাভ করাটাই বড় বলে মনে হয়; কিন্তু বিদ্যালাভের আসল উদ্দেশ্য তাতে সার্থক হয় কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন "গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলার খাতিরে ফল ফলানর রস জোগানর টানাটানি চলেছে।" সুতরাং বলা যেতে পারে সে অর্থ অতি বাহুল্যে নষ্ট হয়, সংসারের যে সব জিনিস অপ্রয়োজনীয় বলে আমরা ফেলে দি, এবং যে সব ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমীর জ্বালায় চিন্তাক্লিষ্ট হই, সেই অর্থ, সেই বস্তু আর সেই সব অশান্ত ছেলেমেয়েদের নিয়েই গড়ে তোলা যায় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ।

Children's Library : a social need by Gita Mitra

পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা: একটি কর্মসূচী

অমিতা মিত্র

আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা—

বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র সংকটময়। এই সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আজ আমরা সকলেই অল্প বিস্তর চিন্তিত না হয়ে পারি না। প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করব বর্তমান সমাজের যথাযথ বাস্তব চিত্র; অনুসন্ধান করব এই ভয়াবহ চিত্রের মূল সূত্র কোথায়?—এখানেই আমাদের থেমে গেলে চলবে না—আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে—কি ভাবে আমরা পতনমুখী সমাজকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

বিপর্যস্ত অবস্থার কারণ—

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে আমাদের জীবনের মূল্য বোধ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বিকৃত ও অসুস্থ রুচির প্রভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে। কিন্তু কেন এই বিপর্যয়?—এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কারণ হিসেবে আমরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করতে পারি যে, জীবনের নিরাপত্তার অভাব, চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট, আর সকলের উপর সুস্থভাবে সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের অভাব ইত্যাদি আজকের যুব সমাজকে ভাঙ্গনের দিকে বেশ দ্রুত লয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছে।

বিপর্যয় রোধের পন্থা—

এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার যথার্থ সমাধান করতে হলে রাষ্ট্র পরিচালক, পরিকল্পনা বিশারদ, সমাজতত্ত্ববিদ, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদগণকে যৌথ ভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। এই ধরনের বিপর্যয় রোধের অন্যতম পন্থা হ'ল একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে সুশিক্ষার অন্যতম পরিপূরক তা আজ দেশকাল পাত্রভেদে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিপর্যয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে গেলে সমস্যার মূল ধরে নাড়া দিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সুশিক্ষিত, আদর্শনিষ্ঠ, রুচিবান ও চারিত্রিক বলে বলীয়ান যুব সম্প্রদায়। সুশিক্ষার মূলে গ্রন্থাগারের অবদান যে কতখানি সুদূরপ্রসারী তা অন্যান্য প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে—সেই কারণে তার পুনরুক্তি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। গ্রন্থাগারের মূল্য যে কতখানি তা এই অতি ক্ষুদ্র উক্তিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—"দেশ গড়তে মানুষ চাই, মানুষ গড়তে গ্রন্থাগার চাই।" গ্রন্থাগার আজ একটি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র। সেই কারণে যে সমাজ ব্যবস্থায় সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগারের মূল্য নির্ধারিত হয়নি সেই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সুদূর পরাহত।

বিপর্যয় রোধে শিশু গ্রন্থাগারের ভূমিকা—

শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংহত ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে কোন দিনই একটি সুসংহত সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযুক্ত প্রাধান্য দিয়েই হবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়া পত্তন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে শিশু গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং শিশু গ্রন্থগারের মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সেই কারণে এই বিশেষ দিকটির উপর পুনরায় আলোকপাত না করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা, এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি ধরণের নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত তাই এই প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয়।

সাধারণ গ্রন্থাগারের অবস্থা এদেশে এবং বিদেশে -

শিশুগ্রন্থাগার সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি অবস্থায় আছে সে সম্বন্ধে কিছুটা অবগত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলির তুলনায় তার শৈশব অবস্থা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অপরদিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উন্নত বিভিন্ন দেশগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটা সুপরিকল্পিত পথে বিকশিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ঐ সকল দেশে অনেক ব্যাপক ও প্রাচীন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঐ সব দেশে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত। শিশুগ্রন্থাগারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, আসবাব পত্র নির্মাণ, আভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জার আয়োজন, আলো বাতাসের বন্দোবস্ত, গ্রন্থসংকলন, নানা প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ, এবং সকলের উপর অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশে শিশুগ্রন্থাগার-গুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মানুষ গড়ার কাজ শৈশবাবস্থা হতে সুরু হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য দেশগুলি মানুষ গড়ার কঠিন দায়িত্ব ভার বহুদিন পূর্বেই গ্রহণ করে শিশুমন ও ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের উপর জোর দিয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে—শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাদেরই মধ্যে একটি অন্যতম কর্মপন্থা।

এ দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংহত না হওয়ার ইতিহাস—

আমাদের দেশে আজও সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পূর্বে তখনকার বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কোন রকমের আর্থিক সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করিনি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত আমাদের দেশে অনেকাংশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবেই। এই আন্দোলনের প্রভাবেই আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এক এক করে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং দেখতে পাই যে বৃটীশ আমলে কোন রকম সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের জাতীয় সরকারের

উদ্যোগে একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংহত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় জেলা-গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই সকল গ্রন্থাগারগুলি ক্রমেই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সুরু করেছে। তবুও আমরা না বলে পারি না যে আজও আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতার ও উপযুক্ত সংগঠনের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার মূল কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলির মত আজও আমাদের দেশে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। সকলপ্রকার ত্রুটিমুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেদিনই আমরা গড়ে তুলতে পারব—যে দিন আমরা আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি কাঠামো দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হ'ব।

শিশুগ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ত্রুটি—

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিতর যে দুর্বলতা আজও রয়ে গেছে তার প্রতিফলন শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। শিশু গ্রন্থাগারের যে সীমাবদ্ধ প্রসার হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব আছে। সংগঠন ও পরিকল্পনার উভয়ের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি!

পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সুপরিকল্পিত কার্যক্রম নির্ধারণ করার পূর্বে প্রয়োজন এই রাজ্যের শিশু গ্রন্থাগারগুলির একটি সমীক্ষা করা।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিশু গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণীবিভাগ

(১) **আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার :**—আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার হিসেবে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। কারণ আদর্শ গ্রন্থাগার গড়ে উঠার জন্য যে সকল কার্যক্রম ও বিধি ব্যবস্থা অনুসৃত হয় তার অধিকাংশই আমরা এই শিশু বিভাগটিতে লক্ষ্য করি। শিশু গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন, আভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জা, শিশুর উপযোগী আসবাব-পত্র নির্মাণ, সুনির্বাচিত গ্রন্থ সংকলন, শিশু গ্রন্থাগারের উপযোগী নানাপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের মাধ্যমে। এই শিশু বিভাগটী সর্বাঙ্গীনভাবে ত্রুটীমুক্ত না হলেও আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার হিসেবে এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারটির ভূমিকা শিশু গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সমগোত্রীয় আর একটি শিশু বিভাগের কথা স্মরণ না করে পারি না—সেটি হ'ল—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিট্যুট অব কালচারের অতি মনোরম, সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে পরিচালিত শিশু বিভাগটি।

(২) **পরিপূর্ণভাবে শিশু-গ্রন্থাগার :**—এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এইরূপ বিচ্ছিন্ন থেকেও এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির মূল্য শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অপরিসীম। পরিপূর্ণভাবে শিশু গ্রন্থাগার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থাগার বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। মণিমেলা, সবপেয়েছির আসর ও অন্যান্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র শিশুদের জন্যই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল গ্রন্থাগারগুলি যেমন একদিকে সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে যোগসূত্রহীন—অপরদিকে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি শিশু হিতৈষীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও অধিকাংশই কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা পরিচালিত। এইরূপ শিশু-গ্রন্থাগারগুলির উৎস আমরা খুঁজে পাই শিশু ও কিশোর আন্দোলনে। এই গ্রন্থাগারগুলির কার্যবিধি সীমিত হলেও শিশুদের দাবী মেটাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের সত্যই বিস্মিত করে তোলে।

(৩) **সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ :**—রাজ্য-সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে এবং কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলগুলির জন-পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে অধুনা শিশুবিভাগ খোলা হয়েছে। এই ধরণের ব্যবস্থাপনা শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি সূচনা করে। সরকার ও দেশবাসী যে ধীরে ধীরে শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় উদ্যম। এই প্রসঙ্গে আমরা না বলে পারি না যে আদর্শ শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থার কার্যপরিক্রমা এই শিশুবিভাগগুলিতে সম্পূর্ণভাবে আজও অনুসৃত হচ্ছে না। তাই নানা দিক দিয়ে এই বিভাগগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়।

(৪) **সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু-সাহিত্যের সংকলন :**—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ আজও নেই, তবুও এই গ্রন্থাগারগুলি বিস্ময়াভূত প্রশ্নবহুল শিশুমনের উপযোগী সামগ্রী যোগাতে পিছিয়ে পড়েনি। এই সকল গ্রন্থাগারগুলিতে শিশুদের ব্যবহারের জন্য শিশু সাহিত্যের একটি সংকলন গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংকলন হতে বাড়ীতে পড়ার জন্য শিশুদের গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এইগুলি শিশুগ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ নয়,—শিশুগ্রন্থ সরবরাহ করার জন্য শিশু-সাহিত্যের সংকলন মাত্র। কিন্তু কেবলমাত্র শিশু সাহিত্যের সংকলন যে কোনদিনই শিশু-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বহুমুখী উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না তার পুনরায় বিশদ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। শিশুগ্রন্থের সংকলনই কেবলমাত্র শিশু মনের খোরাক জোগাতে পারে এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা যারা আজও পোষন করেন তাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে শিশু গ্রন্থের সংকলন শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থার একটি মাত্র বিশেষ দিক।

পশ্চিমবঙ্গের শিশু-গ্রন্থাগারের কর্ম-পদ্ধতির ত্রুটি—

পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে যে কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই তা হ'ল :—

(ক) আদর্শ শিশু-গ্রন্থাগারের নীতি অনুসারে অধিকাংশ শিশু গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন আভ্যন্তরীন সাজসজ্জা, পুস্তক নির্বাচন, শিশুদের উপযোগী আসবাবপত্র নির্মাণ, শ্রাব্য এবং চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য বস্তুর আয়োজন (audio-visual material) বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি প্রশ্নে আমরা দেখি উপরোক্ত শিশু গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়।

(খ) গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও এর কি রূপ অবস্থান হওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে বিশেষ করে শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যে কতখানি উপেক্ষা আজও হয়ে চলেছে তা' আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারি। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন তো দূরের কথা প্রয়োজনের তুলনায় শিশুবিভাগ বা শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যা যে কম তা অনস্বীকার্য।

(গ) পরিকল্পনা ও যথাযথ সংগঠনের অভাব সর্বত্র শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের অভাবে যে বহু সম্ভাবনা অচিরেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায় তা আমরা জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি।

(ঘ) শিশু গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ভার শিশু মন ও শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কর্মীদের উপর ন্যস্ত থাকে না। তাঁর পরিবর্তে অবৈতনিক অনভিজ্ঞ কর্মীদের দ্বারা এই গুরু দায়িত্ব চালিত হওয়ার ফলে নানাপ্রকার সংকট দেখা দেয়।

(ঙ) আজ অবধি অধিকাংশ গ্রন্থাগারে চাঁদার ব্যবস্থার প্রচলন থাকায়—দরিদ্র পরিবার থেকে আগত শিশুরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়।

(চ) অধিকাংশ শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংকলন অত্যন্ত দুর্বল। আর্থিক অস্বচ্ছলতা যেমন শিশু গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থসংকলনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে—অপরদিকে শিশু ও শিশুমনের সাথে পরিচিত অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে মূল্যবান গ্রন্থ নির্বাচনের কাজ যথেষ্ট অল্প হচ্ছে।

(ছ) সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে পরিমান শিশু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং যে ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, এবং এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মপরিসরে সীমাবদ্ধ।"

বর্তমান অবস্থা হ'তে উন্নীত হবার কর্মপন্থা—

উপরোক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা পশ্চিম বঙ্গের শিশুগ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা ও কার্যধারা সম্পর্কে মোটামুটি কিছুটা অবগত হলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই সমস্যার সমাধান কোথায় ও কিভাবে সম্ভব ?—সমাধানের এক মাত্র পথ হ'ল গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার একটি কাঠামো গড়ে তোলা। শিশু গ্রন্থাগার এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলার স্বপক্ষে যে কর্ম সূচী গ্রহণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন তা নিম্নে দেওয়া হল :—

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

১। (ক) দীর্ঘস্থায়ী সমাধান (Long term solution) :—

পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) এই কমিটি শিশু মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, শিশু-সাহিত্যিক, শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক অর্থাৎ শিশুহিতৈষী ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত হবে। এই কমিটির সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞগণের কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতমানের সঙ্গে পরিচয় থাকাই যথেষ্ট নয়—তাঁদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য আমাদের দেশের কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক, সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ফলে প্রগতিশীল দেশগুলির উন্নত শিশু-গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও নিজেদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে যথার্থ চেতনা—উভয়ই যুগপৎভাবে এই কমিটির সদস্যগণকে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের কি মাপকাঠি হওয়া উচিৎ সেই সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও নির্ভুল সুপারিশ করতে সহায়তা করবে। এই কমিটি শিশু গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন; গৃহ-নির্মাণ, আসবাব পত্রের মান, গ্রন্থ নির্বাচনের নীতি, শিশু গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা, নানাপ্রকার audio-visual materials এর (শ্রাব্য এবং চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য বস্তুর) আয়োজন ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

বর্তমান অবস্থার প্রসার ও উন্নতি—

২। আশু সমাধান (Short term solution) :—এই রাজ্যে যে কয়েকটি শিশুগ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত শিশুবিভাগ আছে সেগুলির প্রসার ও উন্নতির জন্য রাজ্য-সরকারের অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির প্রধান অন্তরায় হ'ল আর্থিক অনটন। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে জেলা গ্রন্থাগারগুলির শিশু বিভাগের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এই শিশুবিভাগগুলির কার্যক্রমের সম্যক উন্নতি হয়নি।

(ক) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিশু গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের কার্যক্রম যাতে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয় সেইদিকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিদেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্যক উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ—

(খ) শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা করে যে সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থার স্বল্পতা ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাবে সেই সকল অঞ্চলে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাতে প্রসার হয় সেই দিকে নজর দিতে হবে।

গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম—

(গ) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যাতে রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু-বিভাগ থাকে তার আয়োজন করা প্রয়োজন (গ্রামীণ অঞ্চলে শিশু-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন সহর অঞ্চলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়)।

কার্যক্রমের পরিবর্তন—

(ঘ) অধিকাংশ শিশুগ্রন্থাগার কতকগুলি বাঁধাধরা ছকে আবদ্ধ। নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে, নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থাকে ক্রমেই জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সরকার, জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও যথাযথ সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ। এই কার্যক্রম শিশুগ্রন্থাগারব্যবস্থাকে অচিরেই একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংহত পথে আত্ম-প্রকাশ ক'রতে সহায়তা করবে।

চাঁদার বাঁধা অপসারণ—

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সেদিনই আমরা আশা করতে পারি যেদিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আমাদের শিশু পাঠকদের বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যে অর্থ চাঁদা বাবদ শিশু পাঠকদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে, সেই অর্থ যদি রাজ্য সরকার কতৃক বরাদ্দ হয় তাহলে এই গ্রন্থাগারগুলির বিনা চাঁদার শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলনে নিশ্চয়ই কোন রকম আপত্তি থাকতে পারে না।

(চ) শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনমূলক কর্মপদ্ধতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত বেতনে নিয়োগ ক'রতে হবে। অবৈতনিক ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শিশু গ্রন্থাগারের শোচনীয় পরিণাম আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। তাই উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ কল্লেও সরকারকে আরও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

আলোচনা চক্র—

(ছ) শিশুগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং উৎকৃষ্ট শিশুগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আলোচনা-চক্র ইত্যাদির আয়োজনের প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থ-নির্বাচন—

(জ) শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রন্থনির্বাচনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশু-মনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ও শিশুগ্রন্থসংকলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। আমাদের দেশে বাংলা শিশুসাহিত্যনির্বাচন কোনরূপ সহায়ক গ্রন্থের অভাবে আজ অবধি খুব কষ্টকর ছিল। কিন্তু যে গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বাংলা শিশু সাহিত্য নির্বাচনে সহায়তা করে আমাদের কষ্ট যথেষ্ট লাঘব করবে।[১] এই গ্রন্থটির দ্বারা সকল প্রকার শিশু গ্রন্থাগার খুবই উপকৃত হবে—এই কারণে এই গ্রন্থটির আরও সংস্করণ প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

১। বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী [বাণী বসু সংকলিত]। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬৫ ।

গ্রন্থ-সংগ্রহ—

(ঝ) শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংকলনকে ক্রমেই বাড়াতে হবে। এই প্রসঙ্গে সজাগ থাকা প্রয়োজন গ্রন্থ সংকলন বৃদ্ধি অর্থে গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথাই আমরা শুধু চিন্তা ক'রব না। গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উচ্চমান সম্বন্ধেও চিন্তার প্রয়োজন আছে। শিশু-উপযোগী গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

গ্রন্থ সংগ্রহের পরিপূরক (Audio-visual-aids)—

(ঞ) উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংকলন কেবলমাত্র বিস্ময়াভিভূত, প্রশ্নবহুল শিশু মনের সকল চাহিদা মেটাতে পারে না। নানাপুস্তকের ভিতরই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অসীম অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার—এই চরম সত্যকে শিশু মন প্রথমেই উপলব্ধি ক'রতে পারেনা। গ্রন্থ প্রীতি ও পাঠ স্পৃহা শিশুকে ক্রমে সত্যকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে সহায়তা করে। কিন্তু গ্রন্থ-প্রীতি একটি সহজাত প্রবৃত্তি নয়। ইহার সম্ভাবনা থাকে শিশুমনে—আর সেই সম্ভবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব থাকে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের উপর। এই গুরু দায়িত্ব কোন গ্রন্থাগারিকেরই শুধু মাত্র শিশু গ্রন্থ সংকলনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্য শিশুগ্রন্থাগার গুলিতে (audio visual materiats) এর আয়োজনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই আয়োজনের জন্য যে যথেষ্ট অর্থ শিশুগ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ হওয়া দরকার তাহা অনস্বীকার্য্য।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের শিশুগ্রন্থাগার গুলির একটি সমীক্ষা ও ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সংগঠনমূলক পরিকল্পনার বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা—১৯৬৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ১১ই জুলাই বিকাল ৫টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে (কলেজ স্কোয়ার) অনুষ্ঠিত হইবে। সদস্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কর্মসচিব।

॥ শিশু গ্রন্থাগার ঃ রূপ ও প্রয়োজনীয়তা ॥

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্মরণীয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। এ বছরেই গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম 'পাবলিক লাইব্রেরীজ, অ্যাক্ট' পাশ হয়। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বরোদার গায়কোয়াড়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনই আমাদের দেশের গ্রন্থাগার-চেতনার ক্রান্তিকাল। এরপর গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটেছে অনেক কিন্তু পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যা নগণ্য। এর একটা বড় কারণ আমরা গ্রন্থাগারের উপযোগিতা তেমন উপলব্ধি করি না। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারি না—আর যখন পারি তখন গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণে আসে নানা বাধা ও বিপত্তি। শিক্ষার প্রথমাবস্থাতেই যদি আমরা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হই তবে পরবর্তীকালে এর প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়নে উদাসীন থাকা আদৌ বিচিত্র নয়।

কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে ঠিক এই অবস্থাই প্রতিভাত হয়। গ্রন্থাগারের প্রসার লাভের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করা আর এর প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই। কোমল মৃত্তিকায় যেমন খুশীমত রূপ দেওয়া যায় মনোরমা মূর্তির, উপযুক্ত ব্যবহার প্রভাবে শিশুর কোমল মন ও ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে গ্রন্থাগারমুখী যা ভবিষ্যৎ জীবনে গ্রন্থাগারের সম্যক প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সাহায্য করে প্রভূতভাবে। শিশু যখন পড়তে শেখে তখন তার পাঠস্পৃহা থাকে বুভুক্ষার ক্ষুধার মত—একে মেটানোর ক্ষমতা অনেক অভিভাবকেরই থাকে না তাই "তারা ক্ষুধার তাড়ায় যেখান থেকে যা সংগ্রহ করতে পারবে তাই পড়বে। শিশু যদি অকালে বড়দের খাদ্য খেতে শুরু করে তবে দেখা দেবে যকৃতের ব্যাধি। যকৃতের ব্যাধির চিকিৎসা হয় কিন্তু মনোবিকার সামলানো দায়।" কেবলমাত্র উপযুক্ত শিশু গ্রন্থাগারই পারে এর উপযুক্ত খোরাক দিতে।

বয়স্করা তাঁদের বই দরকার মত বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আনতে পারেন বা প্রয়োজনানুযায়ী দুই এক খানা কিনতেও পারেন কিন্তু ছোটদের সে রকম কোন সুবিধাই নেই। গ্রন্থাগারের প্রসারলাভের জন্য যে পর্যাপ্ত শিশুগ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন তার দৃষ্টান্ত আমরা পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেই দেখতে পাই। গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী দেশে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য আইন রয়েছে। এমন কি প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে শিশু-গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আইনের ধারায় বিধিবদ্ধ। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে 'লি'রেনেকুজ' (L'Hiwrejeo cuse) শিশু-গ্রন্থাগার ও আমেরিকার ইয়ংটাউনের ওহিও শিশু গ্রন্থাগার সকল দেশেরই শিশু গ্রন্থাগারেব আদর্শস্থানীয়। জাপান ও কানাডায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত

শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কক্ষ প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারেই আছে। এমন কি "নয়াচীন গ্রন্থাগার সমিতি"ও শিশুদের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেছে কয়েক বছর আগেই। কেবলমাত্র আমাদের দেশেই দেখা যায় এর চরম বৈপরীত্য।

১৯১০ সালে এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হলেও বাংলা দেশে তার রূপ পায় ১৯২৬-২৮ সালে। ১৯৩০ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিনিধি হয়ে স্পেনে যাওয়া সূচনা করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে যোগ দিয়ে এর গুরুত্ব বাড়ান অনেক খানি। কিন্তু ছোটদের গ্রন্থাগারের ধারণাকে সম্যকরূপ দিতে কলকাতায় মাত্র ১৯৫৫ সালে 'কিশোর কল্যাণ পাঠাগার পরিষদ" স্থাপিত হয়েছে। এদের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু এ গুরু দায়িত্ব বহন করা একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব কিনা তা বিচার্য বিষয়। এদেশে শিশুগ্রন্থাগারের সূচনাও প্রথমে বরোদা রাজ্যেই হয়। এর পরেই নাম করতে হয় বোম্বাইয়ের 'বাল ভবনের'। নয়াদিল্লীর 'বলকানজী-বাড়ি' গ্রন্থাগারও একটি উল্লেখযোগ্য শিশু গ্রন্থাগার। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা) ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের (গোলপার্ক, কলিকাতা) সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে স্বতন্ত্র শিশু গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ অতি সামান্য।

শিশুমনসমীক্ষণে দেখা যায় বাড়িতে যেখানে অভিভাবকের তাড়না ও নীরস বইয়ের 'অ—অজগর আসছে তেড়ে' দিয়ে পড়া শুরু করতে হয় সেখানে অজগর ভীতি না থাকলেও চপেটাঘাতের ভীতি পড়ার প্রতি বিতৃষ্ণাই জাগায়। কিন্তু এই শিশুকেই গ্রন্থাগার-আগ্রহী করে তাকে পড়ায় আগ্রহশীল করার কাজ শিশু গ্রন্থাগারিকের এবং এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিশু-গ্রন্থাগার। বসতি অঞ্চলের মাঝখানে শান্ত পরিবেশে সহজগম্য স্থানই হবে শিশু-গ্রন্থাগারের নির্বাচিত এলাকা। হালকা রঙে রাঙানো এর চার দেওয়াল, নানা রঙের ফুলের শোভায় করবে আশপাশ ঝলমল। সুন্দর মনোমত আসবাব পত্র, নানা রঙের ছবি দিয়ে সাজানো ঘর আর গ্রন্থাগারিকের মিষ্টি ব্যবহার শিশুকে আকৃষ্ট করবে গ্রন্থাগারে আসার জন্য।

তাক ভর্তি বই, সুন্দর করে বাঁধানো. পাতায় পাতায় রঙীন ছবির মেলা, এসব আবার নিজের হাতেই খুসীমত বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সকল শিশুই গ্রন্থাগারে আসার জন্য আগ্রহান্বিত হবে। গ্রন্থাগার হল 'দ্বারখোলা রত্নভাণ্ডার'—কিন্তু এর অন্তর্নিহিত রত্নের সন্ধান দিতে হবে শিশুদের। তাই প্রয়োজন মাঝে মাঝে গল্প বলার ক্লাসের ব্যবস্থা। ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়ার প্রতিযোগিতা এমন কি গ্রন্থসূচী দেখে তাড়াতাড়ি বই বের করা প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অনেক সময় শিশুরাই চায় নানা প্রশ্নের উত্তর—তার সঠিক উত্তর দেওয়া ও ঐ বিষয়ে আরও চমকপ্রদ ঘটনার সন্ধান কোন বইতে পাওয়া যায় তার হদিস দিয়ে শিশুর আরও পড়ার দিকে ঝোঁক বাড়ানো যায়। কোন বই পড়ে সে সম্বন্ধে মতামত লিখতে দেওয়া ও শ্রেষ্ঠ রচনাকারীর নাম গ্রন্থাগার মুখপত্রে প্রকাশ করলে বই পড়ার দিকে শিশুর ঝোঁক আরও বাড়বে। এ ছাড়া মনোরঞ্জনের জন্য গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার প্রভৃতি রাখলে

গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিশুকে আরও প্রলুব্ধ করা যায়। মাঝে মাঝে চলচ্চিত্রে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় ও গ্রন্থাগার 'সদস্য সংগ্রহ প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা করলে গ্রন্থাগারের প্রসার লাভ হয়। নিজের নাম স্বাক্ষর করা ও নামে চিঠি আসা সকলের কাছেই কাম্য। এই কারণে গ্রন্থাগারের হাজিরা খাতায় প্রত্যেকের নাম স্বাক্ষরের ব্যবস্থা ও মাসে একখানি করে গ্রন্থাগার কার্য-বিবরনী প্রত্যেক শিশু সদস্যের নামে পাঠালে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। বই লেনদেনের সহজ ব্যবস্থা ও বই বাড়ি নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা রাখাও বাঞ্ছনীয়।

এই ভাবে যদি শিক্ষার প্রথমাবস্থা থেকেই শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে আগ্রহ জন্মানো যায় তবে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা আরও সচেতন হবে। শিশুর জ্ঞানস্পৃহা বাড়াতে শিশু গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অনেক আর সম্প্রসারণের জন্য জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হ'লে শিশু গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। কবির কথা, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে"—এই সুপ্ত অন্তর্নিহিত সত্বাকে জাগিয়ে তুলতে সবার আগে প্রয়োজন শিশু গ্রন্থাগার। আর পাঠবিমুখ, চঞ্চল, সমস্যামূলক কম বুদ্ধির শিশুদের পড়ায় আগ্রহী করা ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানোর কাজও গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই শিশু তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে পারে—ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু নাগরিক হবার প্রথম সোপানই এই শিশু গ্রন্থাগার। তাই আজ শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক। আর গ্রন্থাগারিকই শিশুদের জীবনের প্রথম জ্ঞানালোকবর্তিকা বাহক—তাঁরাই আজ সত্যিকারের "মানুষ গড়ার কারিগর"—তাঁরাই আজ সবার চেয়ে প্রয়োজনীয়॥

Children's Library : its form and necessity
by Bimal Chandra Chattopadhyay

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" ডাকযোগে পাঠাইবার জন্য আমরা বহু অনুরোধ পাইতেছি। কিন্তু ভি-পি-তে বই পাঠাইয়া ভি-পি ফেরৎ আসিলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠান। ডাকযোগে বই পাইতে হইলে ২'১৫ পয়সা ডাকমাশুল সহ মূল্য পাঠাইতে হইবে।

পরিষদের সদস্যগণকে শতকরা ১০% কমিশন দেওয়া হইবে।

শিশু গ্রন্থাগার : মহামিলনের মৌন সেতুবন্ধ

মনোরঞ্জন জানা

গ্রন্থ হল দেবতা, গ্রন্থাগার হলো নর দেবতার মন্দির। হাজার হাজার বছরের চিন্তাধারা, বিচিত্র সাধ—কল্পনা ও ভাবধারা গ্রন্থের পাতায় পাতায় শব্দের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এই শব্দের কল্লোল যেন বহুযুগের ওপার হতে বর্তমানকালকে কত বিচিত্র এবং বৈচিত্র্যের আনন্দময় অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত করে আগামীকালের স্বপ্ন-কল্পনার আঙিনায় হাত বাড়িয়েছে।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে ভরা এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা যখনই মনে আসে—যখনই আমাদের বিচিত্র সাধের আশায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখনই মনে হয় এর উৎসের কথা—সৃষ্টির কথা।

শিশু গ্রন্থাগার সেই উৎসস্থল। মনে মনে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে শিশুরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্যে। শিশুমনের এক বিশেষ সত্তা. এক বিশেষ ভাব-কল্পনা এর মধ্যে অত্যন্ত নিঃশব্দে নিবিড়ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। জিজ্ঞাসু উৎসুক মন কল্পনাবিলাসের রঙীন চিত্র এদের কাছে নিত্যনতুন জগতের আলো এনে দেয়। জাতীয় জীবনে তাই শিশুগ্রন্থাগার হল মহামিলনের মৌনসেতুবন্ধ। সুতরাং নতুন কিছু জানবার আকাঙ্খা, কৌতূহল ও আগ্রহকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে একটি মননশীল ও সৃষ্টিশীল স্রোতে প্রবাহিত করার সুযোগ আজ এসেছে। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে অফুরন্ত আশা, আমাদের সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রকাশের আনন্দ আর আমাদের চিন্তার অন্তরালে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ তথা জগৎ গড়ার পরিকল্পনা। আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে সর্বাগ্রে চাই শিশু গ্রন্থাগার, চাই শিশু শিক্ষা।

এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের বাংলা দেশে যে কয়টি শিশু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তার মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ এবং গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের শিশু বিভাগ উল্লেখ-যোগ্য। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রান্থাগারেও একটি করে শিশু বিভাগ আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

জ্ঞানই সকল শক্তির মূলাধার, আর সেই জ্ঞানের অনন্ত উৎস হচ্ছে গ্রন্থাগার। যুগ-যুগান্তর ধরে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের চিন্তার ধারা গ্রন্থাগারের মধ্যে নিবদ্ধ আছে, সেই জ্ঞান সম্ভারে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সভ্যজগতে প্রতিযোগিতা চলেছে। সুতরাং জাতিকে জ্ঞান গৌরবে গরীয়ান করে তুলতে হলে শিশুগ্রন্থাগারের ওপর আমাদের আগে দৃষ্টি দিতে হবে।

আমাদের দেশে শিশুগ্রন্থাগার এখনও আলাদা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারছে না। কারণ শিশুদের নিয়ে যেখানে কাজ সেখানে যে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একথা বলা বাহুল্য মাত্র। মূল কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে—

১। সুন্দর পরিবেশযুক্ত গৃহ ও আসবাবপত্র ;
২। শিশু গ্রন্থ বা সাহিত্য নির্বাচন ;
৩। শিক্ষিত তথা সংবেদনশীল এবং শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান আছে এরূপ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ;
৪। গ্রন্থাগারের শৃঙ্খলা বজায় ;
৫। আকর্ষনীয় নিত্য নতুন বিষয়ের পরিকল্পনা সহযোগে শিশুমনে নবনব জ্ঞানের উন্মেষ সাধন।

শিশুমন চায় এমন একটা পরিবেশ যা তাদের মনকে সর্বদা একটা বৈচিত্র্যময় আনন্দের সাতসমুদ্রের তের নদীর পারে নিয়ে যায়। সুতরাং গ্রন্থাগার গৃহ এমন সুন্দর ও সুপরিকল্পিত হওয়া চাই—শিশুরা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করা মাত্রই যেন আকৃষ্ট হয়।

শিশু গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। শিশু গ্রন্থাগারের সকল শিশুই যেন সব সময় মনে করতে পারে যে এটা তাদেরই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের সমস্ত জিনিষপত্রও যেন তাদের। এজন্য শিশুগ্রন্থাগারের শেল্‌ফগুলি ছোট করে তৈরী করা হয় যাতে তারা নিজেরাই তার ব্যবহার করতে পারে। তবে এই অবাধ গতিবিধির ওপর এমন একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে যা তারা কোনরকমেই বুঝতে পারবে না।

শিশুরা দেশের ও জাতির ভাবী নাগরিক তাদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অতএব প্রথম হতেই তাদের শিক্ষার বনিয়াদ পাকা করতে হবে। জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে একমাত্র যেখানে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে শিক্ষালাভ করা যায় সেই প্রতিষ্ঠান হল গ্রন্থাগার। সে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারই হোক বা অন্য যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার হোক উদ্দেশ্য সেই এক—আমাদের শিশুদের আশা-আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত করে, জ্ঞানবলে বলীয়ান করে নবজাতি গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং শিশু গ্রন্থাগারে এমন সব পুস্তক নির্বাচন করা দরকার যা শিক্ষনীয় তো বটেই উপরন্তু চিত্তবিনোদক, যার উদ্দেশ্য হবে চোখ ভোলানো নয় চোখ ফোটাতে সাহায্য করা। নিজেদের পছন্দমত স্বাধীন সত্তার অনুশীলনের অবাধ সুযোগ পেয়ে তারা জ্ঞানলিপ্সু হয়। গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের সম্প্রীতি বাড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থপ্রীতিরও দ্রুত প্রসার ঘটে। কিন্তু বই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রন্থাগারিকের সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং গ্রন্থাগারের এমন সব বই নির্বাচন করতে হবে যেগুলো মানুষ গঠনের সহায়ক অর্থাৎ সব রকম দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার করা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে বড়দের যে সম্পর্ক ছোটদের সঙ্গে সে সম্পর্ক আশা করা যায় না। কারণ বড়রা নিজেদের বিবেচনা মত বই গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ছোটদের সে বিবেচনাশক্তি নেই সুতরাং একটু আগে সংখ্যায় অধিক শিশুগ্রন্থাগার নেই বলে যে দুঃখ প্রকাশ করছিলাম তা কিন্তু বাস্তবে এক কঠিন সমস্যামূলক কাজ ; কেননা শিশু গ্রন্থাগারের পরিচালনা যদি ভাল না হয় তাহলে দেশের একটা বড় জাতীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে—এ আশঙ্কা আমাদের অমূলক নয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি শিশুবিভাগ থাকা একান্ত আবশ্যক। অতএব শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর এবং

সবচেয়ে বেশী গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারিককে শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকতে হবে—এবং শিশু সাহিত্য সম্পর্কে পুরাজ্ঞান আয়ত্ব করতে হবে। নিয়মশৃঙ্খলা জ্ঞান, একটি সহিষ্ণু, মননশীল ও সাবেদনশীল মনোভাব, একটি সহানুভূতিশীল আগ্রহ, প্রীতি ও ভালবাসাই শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের গুণগত বৈশিষ্ট্য। শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের গ্রন্থাগারিকদের আজ দায়িত্ব নিয়ে দেশ গড়ার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে!

শিশু গ্রন্থাগারের নিয়ম-শৃঙ্খলা এমনভাবে রচিত হবে যে ছোটরা যেন বুঝতে না পারে যে তারা একটা নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তাদের যে নিয়মশৃঙ্খলাগুলোকে মেনে চলতে হবে সে গুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে তারা আস্তে আস্তে সকল কিছুই গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে—যেন সাপও না মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।

শিশুদের গ্রন্থাগারেরও বড়দের মতো Reference, Lending এবং Periodical বিভাগ থাকা চাই। সবুজের মনে আনন্দের নেশা জাগিয়ে তুলতে হবে—তাদের ভুল ভ্রান্তিকে খুব বড় করে না দেখে সব সময় সাহায্য করতে হবে। তাদের সাহায্যের জন্য, তাদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য, তাদের উৎসুক মনে হাসি ফোটানোর জন্য মাঝে মাঝে গল্পের আসর করতে হবে। অসীম কৌতূহল, অখণ্ড জ্ঞান পিপাসা এবং অবাক বিস্ময়ের অবতারণা করে গ্রন্থাগারিককে একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, গ্রন্থপাঠে শিশুদের উৎসাহ দেওয়া এ সবই উক্ত পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হবে।

জ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থাগারের দান যে অপরিসীম তা জানানই হল আসল কাজ। শিশুর মনোবৃত্তিকে, ব্যক্তিত্বকে, মেজাজকে মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। জ্ঞানের বৈদ্যুতিক স্পর্শে তাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। তবেই হবে শিশু গ্রন্থাগার একটি মহামিলনের মৌন সেতুবন্ধ।

Children's Library : a bridge of love
and friendship
by Manoranjan Jana

শিশু গ্রন্থাগার ঃ আদর্শ ও কর্মপন্থা

অমিতাভ বসু

সমাজের ভিত্তি হল শিশু—তার সামগ্রিক সত্তার পূর্ণ বিকাশেই আসবে সমাজের মঙ্গল। কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও কল্পনাপ্রবণতা শিশুর প্রাণধর্ম। এই প্রাণের ধর্ম যাতে মরে না যায়, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের দ্বারা যাতে শিশুজীবনের অভিব্যক্তি আপনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে, তার দায়িত্ব সমাজের। সমাজ তার এই দায়িত্ব পালন করে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, শিক্ষায়তনের পক্ষে তার সুনির্দিষ্ট ও সীমিত পরিসরের মধ্যে শিশুর মানসিক বিকাশের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। যে কোনও কারণেই হোক না কেন সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হলে পরিণামে সে শুধু শিশুরই নয়—সমগ্র সমাজের তথা সমগ্র জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতি। সমাজ কল্যাণের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র গ্রন্থাগার আজ তার সম্পদ, পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজসেবার মহান ব্রত নিয়ে এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে এসেছে। গ্রন্থাগার মনে করে সমাজের এই সঙ্কট মোচনে হয়ত সে কিছুটা সহায়তা করতে পারে।

আজকের দিনে গ্রন্থাগার নিছক অবসর বিনোদনের কেন্দ্র নয়। তার সেবাব্রত সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগার সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের এবং সকল বয়সের লোকের প্রতি তার সেবাব্রত সাধ্যমত প্রসারিত করতে চায়। শিশুমনের রহস্য অপরিসীম, তার হৃদয়ের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় নিত্যনূতন কল্পলোকের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে সর্বদাই প্রশ্ন জাগে, এইটা কি? এই রকম হয় কেন? এইটা যদি ঐরকম হত? গ্রন্থাগার শিশুর এই সক্রিয়, যুক্তিশীল ও আনন্দময় সত্তাকে সার্থক পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করার আগে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে শিশুরা কেন পড়তে চায়? অদম্য কৌতূহল, অগাধ কল্পনা এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা শিশু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর কোনও না কোনও একটির তাগিদে শিশু পড়ার আগ্রহ অনুভব করে। প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুরা স্বভাবতঃই খেলাধূলা ভালবাসে, পড়ার চেয়ে খেলাই শিশুর কাছে বেশী প্রিয়, সুতরাং খেলা ছেড়ে সে কি নিজে থেকেই পড়তে চায়? তার উত্তরে আমাদের—বক্তব্য—জীবনের নানা ঘটনা সবসময়েই শিশুর মনে কৌতূহলের সঞ্চার করছে। যখন একবার তার কাছে একথা প্রতিপন্ন হয় যে, বইয়ের মধ্য দিয়ে তার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত হতে পারে তখনই সে বুভুক্ষুর আগ্রহ নিয়ে পড়তে চায়। কখনও তার মনের চাহিদা এত প্রবল হয় যে সে খেলা ভুলে পড়ায় মেতে ওঠে।

পাঠস্পৃহা সঞ্চারিত হলে যে পরিমাণ পুস্তক শিশুমনের চাহিদা মেটাতে পারে ব্যক্তিগতভাবে কোনও লোকের পক্ষেই শিশুকে তা দেওয়া সম্ভব নয়। উপযোগী ও পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাবে

অনেক পরিণত বয়স্ক লোকও তাঁদের পক্ষে যতটা জানা ও পড়াশুনা করা উচিত তা পারেন না। ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ রাখা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। শিশুদের পক্ষে দুই একটির বেশী বই কেনা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় এলোমেলো ভাবে তারা দু'চারখানা বই পড়ে। এই জন্যই শিশুর পক্ষে সুন্দর, সুপরিকল্পিত একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজন, যেখান থেকে সে তার শিশু মনের উপযোগী খোরাক পাবে। বিভিন্ন বিষয়ের নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংস্পর্শে এসে তার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে, তার কল্পনা সঞ্জীবিত হবে, মনের প্রসার ঘটবে, তার আনন্দময় সত্তা সার্থক হবে।

শিশুগ্রন্থাগারগুলির প্রধান কর্তব্য—যে সকল শিশুর অক্ষর পরিচয় হয়েছে এবং যারা আরও পড়তে চায় তাদের বয়স উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তক পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দেওয়া। কিন্তু শিশুদের এই পুস্তক যোগান দেওয়ার পিছনে সংগঠনমূলক যে উদ্দেশ্যই থাকনা কেন শিশুগ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য শিশুর সঙ্গে বইয়ের একটি স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন শিশুর খেলার সঙ্গে পড়ার যেন কোনও বিরোধ না ঘটে। শিশুর অবসরের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের কাজের সময় নির্দ্ধারণ করতে পারলে ভাল হয়। সম্ভব হলে গ্রন্থাগারেরও কিছু কিছু খেলার ব্যবস্থা রাখা শ্রেয়ঃ। শিশুর যেন কখনও মনে না হয় যে আমরা তাকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে বই পড়ানোর জন্য গ্রন্থাগারে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি।

ছোটবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে যদি পাঠভীতির সঞ্চার হয় তাহলে পরিণত বয়সেও তার সংশোধন হওয়া কঠিন। শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে শিশু নিজে থেকেই গ্রন্থাগারে আসবে। বই পড়াটা তার কাছে যেন ভয়ের বস্তু না হয়ে আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে।

শিশুর মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশু গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন করা আবশ্যক। সঠিক ভাবে পুস্তক নির্বাচনের জন্য শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কোন্ ধরনের বই পড়া উচিত তা ভালভাবে জানা দরকার। নির্বাচিত পুস্তকের বিষয়বস্তু ও ভাষা শিশুর মানসিক গঠন ও ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু এখানেও শিশুর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন অনেক শিশু আছে যার সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা সাধারণতঃ যে বই পড়ে সে বই তার ভাল লাগেনা, সে আরও উন্নত ধরণের বই পড়তে চায়। গ্রন্থাগারে সে যেন কোনও রকম বাধা না পায়। শিশুদের জন্য কয়েকটি Standard ও Classic পুস্তক আছে। কিন্তু সেই বইগুলোই যে সবসময় শিশুদের কাছে সমাদৃত হবে তার কোনও অর্থ নাই। যদি কোনও একটি সুবিখ্যাত রূপকথার বইয়ের পরিবর্তে 'পোকামাকড়ের কথা' বইটি একটি শিশুর কাছে প্রিয় হয় তাহলে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। সুতরাং Standard ও classics বইয়ের সঙ্গে অন্যান্য নানা বিষয়ের ও নানা ধরনের বই শিশুগ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। যে বই শিশুর ভাল লাগে না তাকে সেই বই পড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

পুস্তকের মান নির্দ্ধারণের সময় তার অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রশ্নকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের, বিশেষতঃ শিশুর সহজাত। সুতরাং শিশুদের জন্য

নির্বাচিত প্রতিটি পুস্তক চিত্ররাশির সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে যাতে সবদিক থেকে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের বড় কথা এই যে যেন কোন মতেই জোর করে শিশুর মনের উপর কোনও শিক্ষণীয় বিষয় চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

শিশুগ্রন্থাগারের পক্ষে পুস্তকের পরেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার অবস্থান, পরিবেশ ও ভবন (Building)। যেখানে অত্যধিক যানবাহনের আনাগোনা, লোকজনের ভীড় সেখানে শিশুদের পাঠানো বিপজ্জনক। কাজেই তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি গ্রন্থাগার স্থাপনই শ্রেয়ঃ। শিশুগ্রন্থাগারের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান থাকা প্রয়োজন। সুসম্পূর্ণ এক একটি ছোট বাড়ীই শিশুগ্রন্থাগারের পক্ষে উপযোগী। গ্রন্থাগারের সামনে অথবা চার পাশে একটি সুন্দর বাগান রঙীন মাছের একটি ছোট চৌবাচ্চা অথবা aquarium, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত পাঠকক্ষ যার দেওয়াল গুলি রঙবেরঙের বিচিত্র ছবিতে সুসজ্জিত—শিশুগ্রন্থাগারকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তোলে। শিশুরা পরিবেশ ' সৌন্দর্য্য সম্পর্কে খুব সজাগ ও সমবেদনা শীল। সুতরাং শিশুগ্রন্থাগারে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুগ্রন্থাগারের আসবাব পত্রগুলিও সুন্দর ও শিশুদের উপযোগী হওয়া উচিত। চেয়ারগুলি ১৪" ইঞ্চির বেশী ও আলমারী ও শেল্‌ফ্‌গুলো ৫" ফুটের বেশী উঁচু হলে চলবেনা।

শিশুগ্রন্থাগারের অবারিতদ্বার প্রথা 'Open Access System'এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই প্রথায় তারা পুস্তকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে। 'Open Access System তাদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ সঞ্চারের পক্ষে সহায়ক। মোট কথা গ্রন্থাগারে শিশুর স্বচ্ছন্দগতি কোথাও যেন বাধা না পায়—এই পরিবেশ তার যেন ঘরোয়া বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের কোনও একটি আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি শিশুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"It is a kind house ৷"

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়—শিশুগ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ কি ধরণের হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, শিশুরা যাতে বাড়ীতে বই নিয়ে গিয়ে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, তারা যাতে গ্রন্থাগারে বসে পড়তে পারে তার সবরকম সুযোগ-সুবিধা রাখা। শিশুদের উপযোগী সাময়িক পত্রিকাও রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ, শিশুদের উপযোগী কতকগুলি অনুসন্ধান সহায়ক পুস্তকও রাখতে হবে। যাতে শিশুমনের অজস্র জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে শিশু গ্রন্থাগারে কি ধরণের গ্রন্থসূচী (Catalogue) হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। বয়স্কদের গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাগারে (Research Libary) গ্রন্থসূচীর প্রয়োজন যতটা গুরুত্বপূর্ণ শিশু গ্রন্থাগারে ততটা নয়। শিশু গ্রন্থাগারে বিষয়ের ব্যাপ্তি সীমিত। অবারিত দ্বার শিশুগ্রন্থাগারে পুস্তকের পরিচয় প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে সহজলভ্য। সুতরাং শিশু গ্রন্থাগারে গ্রন্থসূচী যেন লেখ্য-বিন্যাসে ভারাক্রান্ত না হয়, সহজ ও সরল হয়। শিশুরা যাতে ছোট বেলা থেকেই গ্রন্থসম্ভারের সাথে গ্রন্থসূচীর সম্পর্কটা বুঝতে পারে, তাহলেই যথেষ্ট।

শিশুর জ্ঞান যাতে কাল্পনিক ও বাস্তব-সম্পর্কশূন্য না হয় সেইজন্য একটি Audio-visual বিভাগের একান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগে রেডিও, চলচ্চিত্র, ম্যাজিক-ল্যান্টার্ণ, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে ভুল বা অস্পষ্ট ও দুর্বল ধারণা থাকে তাহলে সেই ধারণার সংশোধন করা কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া শিশুর জ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্পর্শে না এসে কল্পনাশ্রিত হয়ে থাকে তাহলে তার উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আশা করা যায় না।

বস্তুতঃপক্ষে শিশুগ্রন্থাগার নিছক গ্রন্থাগার নয়। শিশুমনের সামগ্রিক বিকাশ ও প্রকাশের পথে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অনেক। সুতরাং শিশুগ্রন্থাগারে বই ছাড়া অন্যান্য যে সকল পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ পরিবেশিত হয় সেই সম্প্রসারণ কার্যের একান্ত প্রয়োজন। শিশুদের গল্প শোনাতে হবে, গল্প বলতে দিতে হবে, তাদের গান শোনাতে হবে, অভিনয়, আবৃত্তি ও আলোচনার সুযোগ দিতে হবে, ছবি আঁকতে দিতে হবে প্রশ্ন করতে দিতে হবে, তাদের নিজেদের কৃতিত্বের কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহিত করতে হবে। এক কথায় শিশুগ্রন্থাগার হবে শিশুদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কল্পনা ও আনন্দের জগৎ। এখানে শিশুরা পাবে আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন, আপনার বিকাশ ও প্রকাশের বিচিত্র সুযোগ ও ব্যবস্থা।

শিশুগ্রন্থাগারের সাফল্য ও উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের উপর। সাধারণতঃ অধিকাংশ শিশুগ্রন্থাগারেই মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়। এই কারণে যে, শিশুর প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ তাঁদের সহজাত। কিন্তু শিশুকে শুধু ভালবাসলেই চলবে না, শিশুর সরলতা ও প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে। শিশুর প্রতি অগাধ স্নেহ ও সহানুভূতি এবং অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁকে শিশুর সব কথা শুনতে হবে, তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সে যা জানতে চায় বা যে বই পড়তে চায় তাকে তাই দিতে হবে। শিশু-গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেকটি শিশুর দিকে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুগ্রন্থাগারিককে এমন মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিশু নিঃসঙ্কোচে তাঁকে তাদের বন্ধুর মত ভালবেসে নিজেদের মনের কথা বলতে পারে। গ্রন্থাগারের শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের—কিন্তু সেইজন্য কখনও তিনি কোনও শিশুর প্রতি রূঢ় হবেন না।

বৃত্তিকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে শিশুগ্রন্থাগারিকের শিশু-মনস্তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁকে শিশুর মানসিক গঠন, তার পছন্দ-অপছন্দ, তার সদ্‌গুণ ও দুর্বলতা কি তা জানতে হবে। শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শিশু গ্রন্থাগারিককে নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে। তাঁকে দেখতে হবে শিশু কোন্ অবস্থার মধ্যে মানুষ হচ্ছে, সেই অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে হবে।

নিছক শিক্ষাগত যোগ্যতাই কোনও গ্রন্থাগারকর্মীকে সুদক্ষ করে তুলতে পারে না। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিশুগ্রন্থাগারিকদের বিশেষভাবে শিক্ষা (Specialised Training) দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নিকট আমাদের আবেদন যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে চিন্তা করেন।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে যে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দায়িত্ব যখন শিক্ষায়তনের তখন পৃথকভাবে শিশুগ্রন্থাগার স্থাপন না করে উন্নততর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুরা যাতে গ্রন্থাগারের সকল সুযোগ সুবিধা পায় সেই চেষ্টা করলেই শিশুগ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধন হয়। যুক্তির দিক দিয়ে এই ধারণা খুব ভ্রান্ত না হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষে শিশু গ্রন্থাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থার মধ্য দিয়ে শিশুকে পরিচালিত করতে হয়। এই সুনির্দিষ্ট কার্যধারার মধ্যে শিশু-গ্রন্থাগারের কাজ করতে হলে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। পাশ্চাত্য-দেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি অনেক উন্নত ধরণের কিন্তু সেখানেও শিশু গ্রন্থাগারের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখন গঠনের পথে। শিশুগ্রন্থাগারের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। উন্নতধরণের কয়েকটি শিশুগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। সুষ্ঠু শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবে সমাজের, দেশের তথা সমগ্র জাতির সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে সত্বর অবহিত হন এবং এই গঠনমূলক প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন।

পরিশেষে একটি কথা বলব। শিশু গ্রন্থাগারে আমরা যাদের সেবা করি শৈশব অবস্থা পার হয়ে তারা যখন বয়ঃসন্ধি (Adolescence) স্তরে উপনীত হয় তখন তাদের মধ্যে একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের আভাস দেখা যায়। বয়ঃক্রমের এই স্তরে শিশুগ্রন্থাগার অবান্তর, আবার বয়স্কদের গ্রন্থাগারের পক্ষেও তারা সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি পৃথক বিভাগ অথবা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বয়ঃসন্ধিস্তরের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই দিকটি উপেক্ষিত হলে শিশু গ্রন্থাগারে এত যত্ন ও চেষ্টায় যে পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তোলা হয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাগারের প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলবে।

Children's Library : its aims and working procedure
by Amitabha Basu

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুরের অনন্তপুর হাইস্কুলে গত ৩০শে ও ৩১শে মে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু।

উদ্বোধনী অধিবেশন

৩০শে মে; ১৯৬৫ সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রবীন্দ্রলাল সিংহ। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন—আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই তা এখনো বহুদূর। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টায় জনসাধারণের সেবা করে চলেছেন। এঁদের যতটুকু আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার আমরা দেবার চেষ্টা করছি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোকে পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নেবার জন্যে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করছেন। কিন্তু তা করতে গেলে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে গ্রন্থাগার কর্মীরা যাতে কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করতে পারেন তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

শিক্ষিত কর্মীছাড়া জনসাধারণের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যা করছেন তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি পরিষদকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা পরিষদের অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করছি, তাঁরাও যেন সরকারের অসুবিধাগুলো বুঝবার চেষ্টা করেন। আজও আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারিনি। একে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানে আমার সহকর্মীদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে পরিষদের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন:—পরিষদের সভাপতিরূপে আমি শ্রীমুরারিমোহন মান্না ও স্থানীয় অধিবাসী-দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। আমি অর্থমন্ত্রী হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ সমস্যার কিছুটা আমরা সমাধান করব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ, সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় তিনটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়।

এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমুরারীমোহন মান্না বলেন—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণের

এক জায়গায় বলেছেন—একসময় ছিল যখন কলকাতা থেকে কাশী যেতে যত সময় লাগত তার চেয়ে বেশী সময় লাগত কলকাতা থেকে শ্যামপুর আসতে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু আজ শ্যামপুরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখানে এখন অনেকগুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চবিদ্যালয় আছে। ১টি কলেজ ৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ১৪০টি ছোট ছোট পাঠাগারও এখানে আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় এরিয়া লাইব্রেরী আছে। শ্যামপুরে একটা এরিয়া লাইব্রেরী করার অধিকার আমাকে যাতে দেওয়া হয় তার জন্যে সরকারের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করার পর উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

ঐ দিন বেলা ৩টেয় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সূচনায় পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মূল আলোচ্য প্রবন্ধ "পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম, তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্ম-প্রণালী" উত্থাপন করেন।

প্রবন্ধের উপর আলোচনার সূচনায় শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন—গ্রন্থাগারের সংখ্যা কিছু বেড়েছে সুতরাং পাঠস্পৃহাও কিছু বেড়েছে বলেই মনে হয়। কোন কোন বিষয়ে কতজন কি কি বই পড়লেন এটা আমরা পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা করলে সহজেই জানতে পারব।

'কি ধরণের বই পাঠকরা বেশী পড়তে চায়' সভাপতির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—জাতীয় গ্রন্থাগারের আমি নিয়মিত পাঠক, জাতীয় গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি ছাত্ররা এবং অধিকাংশ পাঠকরা অর্থনীতির বই বেশী পড়তে চায়, কারণ জীবন সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে তারা অর্থনীতিতে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে বলেই আমার মনে হয়।

শ্রীমতী বাণী বসু এর প্রতিবাদে বলেন :—গুরুদাসবাবুর এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিছু সংখ্যক পাঠক অর্থনীতির বই পড়ে বটে কিন্তু সমস্ত পাঠকের তুলনায় এদের সংখ্যা খুবই কম, জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে আমি অন্তত এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছি।

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন :—জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পাঠকের পাঠস্পৃহা সম্পর্কে জানা যাবে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকের পাঠস্পৃহা সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা করা উচিত। একটা পাড়ার গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই পাঠকদের পাঠরুচির পরিবর্তন ও মানোন্নয়ন করা সম্ভব।

এ ছাড়াও আলোচনায় শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুয়া, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীমনোরঞ্জন জানা, ও শ্রীগোপালচন্দ্র পাল অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

৩১ শে মে সকাল ৭টায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। শিশুগ্রন্থাগারের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ বসু, শ্রীমতী গীতা মিত্র, শ্রীমতী অমিতা

চট্টোপাধ্যায় বলেন :—শিশুরা কি হতে পারে এবং কি হতে পারে না সেদিকে দৃষ্টিরেখে অগ্রসর হতে পারলেই শিশুগ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

সভাপতি শিশুগ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত কর্মীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান।

শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় বলেন :—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি শিশুমন অত্যন্ত গতিশীল। সুতরাং মানচিত্রের সাহায্যে ও স্ট্যাম্প-অ্যালবামের সাহায্যে এদের মধ্যে ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ানো যেতে পারে।

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :—কসবা মণিমেলা, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর শিশু বিভাগ ও কানাই স্মৃতি পাঠাগারের শিশু বিভাগ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কানাই স্মৃতি পাঠাগার ও মণিমেলার কাজ ভালই হয় বলে আমার ধারণা।

শ্রীনীতিশ বাগচী বলেন :—শিশুরা গল্পের আসর ভালবাসে। পরীক্ষা করে দেখেছি বড়রা গল্প করলে শিশুরা আকর্ষিত হয়। শিশুদের মধ্য থেকেও গল্প বলার লোক খুঁজে বার করা যেতে পারে। আরামবাগ সাব-ডিভিশনের একটা গ্রন্থাগারে আমি দেখলাম গ্র্যাণ্ট বাড়ানো সত্বেও পাঠকের সংখ্যা কমে গেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীবিজয় নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন :—দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর শিশু বিভাগে আমি প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছিলাম। শিশুদের মধ্যে পাঠস্পৃহা সহজাত নয়, তাই চেষ্টা করে এদের মধ্যে পাঠস্পৃহা বাড়াতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নীতিশ বাবু বলেছেন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোন লাভ হবে না। তাই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আমাকে বলতে হচ্ছে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রবর্তন করায় কিছু অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু সুবিধার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (রুরাল লাইব্রেরিয়ান) বলেন :—আমি নীতিশ বাবুর কথায় প্রতিবাদ জানাতে চাই। আমাদের কিছুই অবনতি হয়নি। সরকার এবং পরিচালক বর্গের ত্রুটি এ বিষয়ে যথেষ্ট বলেই আমি মনে করি। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমার মনে হয় বহু পাঠক গ্রন্থাগারে পড়তে আসবে।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় বলেন :—শিশু গ্রন্থাগারে Audio visual ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। কিন্তু যদি সে ব্যবস্থা না থাকে তাহলেও চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। সরকারী সাহায্য আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। সরকারী গ্র্যাণ্ট না পেয়ে আগে যে কাজ হত আমার মনে হয় এখন তা হচ্ছে না।

শ্রীঅতীন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত বলেন :—বালী সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে কোন চাঁদ নেওয়া হয়না, শিশু-বিভাগ শিশুরাই পরিচালনা করে। ওয়ার্ড মেকিং, বিল্ডিং ব্লক এবং গান শেখানোর ব্যবস্থাও এখানে আছে।

শ্রীজয়দেব বিশ্বাস বলেন :—দেউলপুর (হাওড়া) দিনে ৮ ঘণ্টা শিশুদের মধ্যে বাস করে আমি দেখেছি বড়দের কাছে ছোটরা ভয়ে ভয়ে থাকে মন খুলে বড়দের সঙ্গে তারা মিশতে

পারে না। তাই এদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—বরোদার শিশু বিভাগ দেখে আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে ছোটদের পরিচালনা করতে হবে, আর এ ব্যাপারে মহিলা-রাই বেশি উপযুক্ত।

নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য বলেন :—বৈষ্ণবচকে রেলওয়ে ম্যাপ, গল্প দাদুর আসর সংবাদপত্র পাঠ প্রভৃতির সাহায্যে শিশুদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীরুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী বলেন :—রহড়া জেলা গ্রন্থাগারে হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি শিশুদের বেশিদিন লাইব্রেরীতে ধরে রাখা যায় না। সংসারের কাজের জন্য অনেক সময় শিশুরা গ্রন্থাগারে আসতে পারে না। এ সমস্যার কি কোন সমাধা করা যায় না? শিশুদের উপযোগী বই ও বেশি পাওয়া যায় না, এটাও একটা সমস্যা।

শ্রীমতী বাণী বসু বলেন :—শিশুদের গ্রন্থাগারে বেশিদিন আটকে রাখা যায় না এর কারণ সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা। শিশু সাহিত্য যথেষ্ট বেরুচ্ছে কিন্তু সত্যিকারের আশাপ্রদ বই খুব বেশি বেরুচ্ছে না। জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটি খুব ভালভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ছবি আঁকা ভয়ানক পড়ার ব্যাঘাত ঘটায়। রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারের শিশু বিভাগে সম্প্রতি গল্পের আসর খোলা হয়েছে। কলকাতার চারটি অঞ্চলে যদি চারটি আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায় তাহলে অনেক উপকার হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন :—শিশুদের প্রতি দরদী কর্মীর অভাবেই শিশু গ্রন্থাগার উন্নতিলাভ করছেনা। স্কুলে লাইব্রেরী আওয়ারস প্রবর্তন করতে পারলে শিশু গ্রন্থাগারের সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে।

সভাপতির অভিমত

আপনারা পাঁচজন প্রবন্ধ পড়েছেন ও ১২জন আলোচনায় যোগদান করেছেন এর মধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম অনেকের মতামত প্রায় একই রকম। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু বলবেন যা থেকে এ বিষয়ে কিছু উপকার হতে পারে। নির্মলবাবু বলেছেন যদি মাহিনার অবস্থা ও সমাজের অবস্থার কিছু পরিবর্তন করা যায় তা হোলে নিশ্চয়ই উপকার হবে। আপনারা বলেছেন ছেলেদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা উচিত। সরকারের উপর ত আমাদের মোটেই আস্থা নেই তবে কেন সরকারের উপর আমরা ভরসা করব? আমরা ছেলেদের মনকে আকৃষ্ট করব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বই সম্পর্কে ছেলেদের একটা ভীতি আছে এর কারণ অত্যধিক পড়ার চাপ। এর হাত থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে? এত বই পড়াবনা একথা কি শিক্ষক মশাইরা কখনো চিন্তা করেছেন? একটা ঘরের মধ্যে সবকিছু করা বাঞ্ছনীয় নয়, শিশুদের জন্যে আলাদা গ্রন্থাগার হওয়া উচিত এটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। শ্রীমতী বসু যেমন বলেছেন সেই ভাবে কলকাতার চারটে অঞ্চলে চারটে মডেল শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারলে ভালই হয়। তবে একথা ভেবে আপনারা

সাহিত্যের সমস্তাটাও নেহাৎ কম সমস্তা নয়। ছোটদের বই যারা লেখেন তাঁদের ছোটত্ব থাকে না। নানাদিকে বিফল মনোরথ হয়ে এঁরা এসব লাইনে আসেন। সুতরাং এদের কাছে খুব বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এটা পারতেন। আমাদের মধ্যে সাধনার খুবই অভাব। শিশুর মনস্তত্ব আমরা বিলেতী বই পড়ে শিখি সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত শুধু বই পড়া লোক দিয়ে কোন ভাল কাজ পাওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থ অধিবেশন

ঐ দিন বেলা বারোটায় চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় এবং নিম্নে উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার অন্ততঃ তিনটি করিয়া গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হউক যেন তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারের এক মাসের সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ পরিসংখ্যানে পড়িতে দেওয়া গ্রন্থের বর্গ হিসাবে পৃথক পৃথক সংখ্যা, পাঠকের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার বিবরণ দিতে হইবে। (গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ পরিসংখ্যান এবং সমীক্ষা হইতে বাংলাদেশের পুস্তক-পঠন সম্বন্ধে একটি সঠিক বিবরণ রচনা করিবেন)। অধিকন্তু নমুনা সমীক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থা গারকে গ্রন্থগার পত্রিকার মারফত অনুরোধ করা হউক যে বিগত এক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা কোন্ কোন্ সামাজিক সাংস্কৃতিক, জাতীয় বা অন্যবিধ উৎসব এবং পুস্তক প্রদর্শনী স্বয়ং পালন করিয়াছেন, কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে পালন করিতে সহায়তা করিয়াছেন। এই প্রাপ্ত সংবাদ সমূহ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একত্র করিয়া প্রকাশ করিবেন।

৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, গ্রন্থাগার পত্রিকার মারফত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হউক যেন তাঁহারা নিরক্ষর লোকদের নিকট গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করেন, যেখানে সম্ভব ছায়াচিত্রাদি সহযোগে তাঁহাদের নানা বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্যের একটি বিবরণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের নিকট পাঠাইতেও তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিষদ ঐ সমস্ত সংবাদ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিবেন।

ভ্রম সংশোধন

'গ্রন্থাগার'-এর এই সংখ্যার ৪৩ পৃঃ থেকে ৫০ পৃঃ পর্যন্ত ভুলক্রমে ১ পৃঃ থেকে ৮ পৃঃ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

— সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

সম্পাদকীয়

সম্মেলন প্রসঙ্গে

গত ৩০শে ও ৩১শে মে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুরের অনন্তপুর হাইস্কুলে উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়ে গেল। এবারের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ছিল "পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির কার্যক্রম; তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্মপ্রণালী"। এছাড়াও শিশু গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা হয়েছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ডি, এস, ই, ও বলেছিলেন হুগলী জেলার আরামবাগ সাব ডিভিসনের কোন একটা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারে তিনি দেখেছেন পাঠকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, এর কারণস্বরূপ তিনি কর্মিদের গাফিলতিকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এইসব গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য না পেলে অর্থ সংগ্রহের জন্যে সভ্য সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নজর দিত, ফলে বেশী চাঁদা সংগৃহীত হত এবং গ্রন্থাগারের কাজ ভালভাবে চলত। সুতরাং বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার কোন যুক্তিই তাঁর কাছে বিশ্বাস যোগ্য নয়। জনৈক গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এ কথার প্রতিবাদও করেছিলেন।

সম্মেলনের এই সব আলোচনা থেকে আমাদের প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে সোসাল এডুকেশনের অঙ্গ হিসাবে যদি গ্রন্থাগারকে রাখতেই হয় তাহলে এই সব ডি, এস, ই, ও দের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আগে শিক্ষিত করে তোলা উচিত তারপর এঁদের হাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কারণ যে সব দেশে সুন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেই সব দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই চাঁদার বাধা অপসারণ করবার জন্যে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন। গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে তাঁরা বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার সহজলভ্য হয়েছে। বইয়ের ব্যবহার বেড়ে গেছে। শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার এবং বই পড়বার অধিকার স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি আজও আমাদের পশ্চিম বাংলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি এবং তাকে বাধ্যতামূলকও করা যায়নি।

শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের অবদানকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও অবৈতনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। সম্প্রতি পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি সরকারী গ্রন্থাগারে বিনা চাঁদায় পড়বার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রন্থাগার দরদীই আজ বিশ্বাস করেন যে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যেই বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হবে, একথা আমরা বলছি না। সরকার যদি সব গ্রন্থাগার গুলোর ভার নিজ হাতে গ্রহণ করে পাঠকদের চাঁদার দায় থেকে মুক্তি দেন তাহলেও আমরা কম আনন্দিত হব না। দেশের আপামর জনসাধারণ বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাক, এই আমাদের একান্ত কামনা।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

শ্যামপুর : হাওড়া

বাম দিক থেকে
অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সভাপতি, সম্মেলনের সভাপতি
ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক।

গ্রন্থাগার

পঞ্চদশবর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ় : ১৩৭২

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-১২

শচীন্দ্রনাথ রুদ্রের জীবনাবসান

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার যুগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রাক্তন সহঃ-সভাপতি এবং পরিষদের আজীবন সদস্য শচীন্দ্রনাথ রুদ্র গত ১১ই জুন পরলোকগমন করেছেন।

শচীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালের ১৭ই নভেম্বর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, কিন্তু স্যার আশুতোষের আগ্রহে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে বি.এল, পাশ করে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান এবং ফিরে এসে ১৯৩২ সালে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় সুরু করেন। পরে তিনি কলকাতার সিটি করোনার এর পদে যোগদান করেন। এর পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অব ল'এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্বর্গত কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের আগ্রহে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে যুক্ত হন। ৺মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পরিষদের সভাপতি থাকাকালে এবং পরবর্তীকালে একাধিকবার তিনি পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বৎসরেও তিনি পরিষদ গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতি ছিলেন। পরিষদের পক্ষ থেকে যখনই তাঁর কাছে কোন পরামর্শের জন্য যাওয়া হয়েছে তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর খুব কম বার্ষিক সভাতেই তিনি অনুপস্থিত থেকেছেন। গত বছরও তিনি পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন।

তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তার সংগে যুক্ত হন।

তিনি শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একখানা ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা চালাতেন এবং ছাত্রপাঠ্য কয়েকখানি আইনের বইও লিখেছিলেন। ইংরেজী ছাড়া হিন্দী, পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'ঠাকুর বক্তৃতা-মালায়' যোগদান করে 'ঠাকুর পদক' লাভ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ট্রাস্টের একজন সদস্য এবং মহাবোধি সোসাইটি, রেড ক্রশ, মূক বধির বিদ্যালয়, আফটার কেয়ার সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা, আকাশবাণী প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন।

তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং বিধবা পত্নীকে রেখে গেছেন।

বই সনাক্ত করা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

একখানি বই কিভাবে তৈরি হয় সে সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হলো। এখন একখানি বইকে কিভাবে ভালো করে দেখে নিতে হয় এবং কিভাবে একখানি বইয়ের বর্ণনা দিতে হয় তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

১। প্রথম বইখানিকে সনাক্ত করা অর্থাৎ বইখানি কি বই তা জানা দরকার।

২। দ্বিতীয়ত বইখানি কে কোথায় কবে ছেপেছে তা জানা দরকার এবং কোন সংস্করণের বই তা ঠিক করা।

৩। বইখানি সেই সংস্করণের নিখুঁত কপি কি না তা ঠিক করা।

একখানি বইকে সনাক্ত করা:

সাধারণতঃ একখানি বইয়ের নামের পাতা থেকেই একখানি বইকে সনাক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি বইয়ের নামের পাতা ছাপার রীতি বই ছাপার গোড়ার দিকে ছিল না। নামের পাতা নিয়মিত ভাবে ছাপার রীতি শুরু হয় ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সুতরাং পুরাণ বইয়ে নামের পাতা যে থাকবেই এমন কোন মানে নেই। নামের পাতা পাওয়া না গেলে, বই শুরুর প্রথম কয়েকটি কথা দেখতে হবে। পুরাতন বইয়ের শুরুকে বলে incipit অর্থাৎ Here begins (excipit—Here ends)। এখানেও যদি বইয়ের নাম, লেখকের নাম তারিখ ইত্যাদি পাওয়া না যায় তা হলে বইয়ের শেষে Colophone-এ দেখতে হবে। উৎসর্গ পত্রে লেখকের স্বাক্ষর থাকতে পারে তা ছাড়া বইয়ের ভিতরে নানা কথার দ্বারা লেখকের নাম গোপন করা থাকতে পারে। যে সব বইয়ের ভিতরে কোন স্থানেই লেখকের নাম না পাওয়া যায় সে বইগুলি সাধারণতঃ লেখকের নামহীন পুস্তক। এ ধরণের বইয়ের লেখক ঠিক করতে গেলে লেখকের নামহীন পুস্তকের কোষের সাহায্য নিতে হয় এবং তাতেও যদি লেখকের নাম ঠিক করা সম্ভব না হয় তা হলে বহু গবেষণার প্রয়োজন।

দুখানি বই এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে থাকলে বা খরচ কমাবার জন্যে একের অধিক বই একসঙ্গে বাঁধান হয়ে থাকলে দুইখানি বইকে আলাদা করা প্রয়োজন। আগেকার দিনে একের অধিক বই একসঙ্গে বাঁধান হতো কিন্তু এখন আর সে রীতি নেই। যখন একের অধিক বই বিভিন্ন নামের পাতা না দিয়ে, বিভিন্ন পৃষ্ঠা শীর্ষক, স্বাক্ষর ইত্যাদি না দিয়ে একসঙ্গে বাঁধান হয়েছে তখন বইখানিকে ভালোভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। তবে উপরে উল্লিখিত নিদর্শনগুলির মধ্যে বইয়ের ভিতরে অন্তত স্বাক্ষর পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ একখানি বইয়ের শুরুতে নতুন ধরনের স্বাক্ষর থাকবে। তবে যদি একখানি বই একটি ফরমার মধ্যে শেষ হয় এবং আর একখানি বই সেই ফরমা থেকেই শুরু হয় তা হলে বুঝতে হবে দুখানি

বই একই সংস্করণের ফলে পুস্তক বিজ্ঞানের দিক থেকে দুখানি বইকে আলাদা করা সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের দুখানি বইকে যে আলাদা করে কেটে ফেলে আলাদা করে বাঁধাই হয় না তা বলা যায় না—সেটা নির্ভর করে বইয়ের মালিকের খেয়ালের উপর।

সংস্করণ সনাক্ত :

সংস্করণ কাকে বলে তা আমরা পূর্বে বলেছি। নামপত্র, Colophone, পুস্তকের গোড়াকার বিষয়বস্তু, বইয়ের শুরু, উৎসর্গ পত্র, বই ছাপবার অনুমতি (cum-licencia) এসব দেখে বইয়ের সংস্করণ ঠিক করা যায়। মুদ্রাকর, লেখক, সম্পাদক, কোথায় ছাপা হয়েছে, কে ছেপেছে এ সব সংবাদ যদি বইয়ের ভিতরেই গোপন করা থাকে তা হলে তা খুঁজে বার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু ছাপার দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তবে সুখের বিষয়—এই যে এ সব বিষয়ের উপর বহু বই আছে এবং এ সব বইয়ের সাহায্যে একখানি বইয়ের সংস্করণ ঠিক করা অনেক সময় সম্ভব হয়।

একই বইয়ের দুইখানি কপি একই সংস্করনের কিনা তা ঠিক করবার কয়েকটি পন্থা : দুইখানি বইয়ের স্বাক্ষর যদি এক হয় তা হ'লে আশা করা যায় কপি দুখানি একই সংস্করণের এবং এইরূপ ক্ষেত্রেই বই দুখানি একই সংস্করণের কি না সে সম্বন্ধে স্থির করতে গেলে নিচের কয়েকটি বিষয় বিচার করে দেখা দরকার :—

(১) কয়েকখানি পাতার Catchword লক্ষ্য করা দরকার।

(২) বইয়ের মধ্যের বিভিন্ন স্থানের কয়েকখানি পাতার দশ বার লাইনের শেষের কয়েকটি কথা লক্ষ্য করা দরকার। দুইখানি কপি একই সংস্করণের হলে কথাগুলি দুইখানি কপিতে সমান হবে। কিন্তু বই দুখানি একই সংস্করণের না হলে কথাগুলি দুখানি বইয়ে—অন্ততঃ কয়েকটি কথা—একই স্থানে থাকবে না কারণ Compositor যতই চেষ্টা করুক লাইনগুলির সমতা কিছুতেই বজায় রাখতে পারবে না।

(৩) স্বাক্ষরগুলির অবস্থান অর্থাৎ শেষের লাইনের কোন কথার নিচে স্বাক্ষরগুলি আছে।

(৪) অনুচ্ছেদের শুরুতে বড় অক্ষর ও অলঙ্কার।

(৫) ভাঙ্গা অক্ষর—দুখানি বইয়ে একই স্থানে যদি একই ভাঙ্গা অক্ষর থাকে তা হলে বুঝতে হবে বই দুখানি একই সংস্করণের, না হ'লে বুঝতে হবে বই দুখানি বিভিন্ন সংস্করণের। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে ছাপতে ছাপতে অক্ষর ভেঙ্গে যেতে পারে সুতরাং একই বইয়ের কিছু কপিতে কয়েকটি অক্ষর ভাঙ্গা থাকতে পারে এবং কয়েকখানি কপিতে সেই একই অক্ষর ভাঙ্গা না থাকতে পারে। এ ছাড়া একটি হরফ সত্যই ভাঙ্গা কি ঠিক ছাপ ওঠেনি তা অনেক সময় ঠিক করা সম্ভব হয় না।

(৬) এই কটি বিষয় বিচার করে দেখার পরও যদি সন্দেহ থাকে তা হলে—আর একটি কাজ করতে পারা যায়। আট দশ লাইন অন্তরে দুটি বিরাম চিহ্ন দিন। এখন একটি ruler নিয়ে একটি বিরাম চিহ্ন থেকে আর একটি বিরাম চিহ্ন পর্যন্ত ফেলুন। দেখুন ruler টি কোন কোন কথাকে কাটছে। এইবার অন্য কপির পাতায় rulerটি ঠিক একই ভাবে

ফেলুন দেখুন সেই একই অক্ষরগুলি কাটছে কিনা। যদি একই অক্ষর না কাটে তা হলে বুঝতে হবে দুখানি বই একই সংস্করণের নয়।

(৭) খুঁজে দেখুন একখানি বইয়ের কোন পৃষ্ঠা টাইপ বিন্যাসের মধ্যে নদীর সৃষ্টি হয়েছে কিনা এবং যদি এরূপ নদী পাওয়া যায় তা হলে দেখুন অন্য কপিতে ঐ একই স্থানে নদী আছে কিনা, যদি না থাকে তা হলে বুঝতে হবে দুখানি বই বিভিন্ন সংস্করণের।

এক ভাষার দেশের নামকে অনেক সময় আর এক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তেমনি এক দেশীয় নাম আর এক ভাষায় অনুবাদ করা থাকে। নাম সাধারণ Latin বা Greek ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সুতরাং এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অর্থাৎ Greek বা ল্যাটিন ভাষায় নাম অনুবাদ করলে সে নাম কি রূপ ধারণ করে তা জানা দরকার।

এ ছাড়া নানা ভাবে নাম বা স্থানকে রহস্যজনক করে তোলা হয়। অনেক সময় নামকে নানা বাক্যের দ্বারা গোপন করে প্রকাশ করা হয়। লেখকের পরিচয় অনেক সময় গ্রন্থের মধ্যে বিশদভাবে দেওয়া থাকে। একটি উদাহরণ সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত দুর্গামঙ্গলের লেখক অন্ধ ভবানী প্রসাদ রায়। তার পরিচয় বইয়ের ভিতরে বহুভাবে দেওয়া আছে যেমন :—

ভবানী প্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল॥
কাটালিয়া গ্রামে করবংশে উৎপত্তি।
নয়ানকৃষ্ণ নামে রায় তাহার শন্ততি॥

প্রথম সংস্করণ :

কোন পুরান বইয়ের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা পুস্তক প্রেমিকদের একটা খেয়াল। অবশ্য প্রথম সংস্করণের বই হলেই যে তার বিশেষ মূল্য থাকবে তা ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়। তবে কোন বইয়ের প্রথম সংস্করণের বিশেষ একটা মূল্য আছে কারণ একখানি বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ বিচার করে লেখকের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারা যায়। প্রথম সংস্করণের মূল্য সব চেয়ে বেশী সেইখানে, যেখানে দুই তিনখানি একই বইকে প্রথম সংস্করণ বলে চালান হয়। যে পাণ্ডুলিপি থেকে বই ছাপা হয়েছে—ছাপার পর সে পাণ্ডুলিপির আর প্রয়োজন থাকে না বলে পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলা হয়। ফলে কোন বইয়ের প্রথম সংস্করণে পাণ্ডুলিপির বিষয় বস্তুকে যথাযথ বজায় রাখা হয়েছে তা ধারণা করে নিতে পারা যায়। পরবর্তী সংস্করণে প্রত্যেক বারই লেখক, সংশোধন ও নতুন বিষয় সংযোজন করতে পারেন এবং ধরে নেওয়া যায় লেখকের দেখা শেষ সংস্করণই আসল বই এবং লেখকের মৃত্যুর পর যদি সেই বইয়ের পুণর্মুদ্রণ হয় তা হলে সেই বইয়ের শেষ সংস্করণকেই পুনর্মুদ্রিত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

ছাপার প্রথমদিকে লেখকের proof দেখতে দেওয়ার রীতি ছিলনা। প্রথম বই ছাপার সময় লেখক উপস্থিত থাকতেন, পরে লেখকের উপস্থিতির পরিবর্তে তাকে proof পাঠানো হতো।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর যে সব বইকে সংস্করণ বলে চালান হতো সেগুলি বেশীর ভাগই পুনর্মুদ্রণ এবং নতুন মুদ্রণে নতুন ছাপার ভুল দেখা যায়।

অনেক সময় একই সংস্করণের বিভিন্ন কপির পাঠ্যের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এধরণের দু খানি কপি অনেক সময় পাঠ্য-সমালোচনার (Textual criticism) ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু ছাপার প্রথম দিকে কিভাবে ছাপা হতো তা বিচার করে দেখলে একই সংস্করণে পাঠ্যের মধ্যে পরিবর্তন কেন সম্ভব হয় তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

একই বইয়ের একই সংস্করণের দুখানি কপিতে যা পরিবর্তন দেখা যায় তার কারণ দুইটি: আগেকার দিনে বিন্যাসিত হরফ যে আধারে (Chase) এঁটে ছাপা হতো সে আধার আধুনিক আধারের মত ছিল না ফলে বিন্যাসিত হরফকে যথা সম্ভব শক্ত করে আটা সত্বেও ছাপার সময় টাইপের হরফ উঠে যেত এবং মুদ্রাকর উঠে যাওয়া হরফকে নয় যথাস্থানে রাখত না, না হয় ঠিক হরফটি যথাস্থানে না বসিয়ে হাতের কাছে যে হরফ পেত সেই হরফই বসিয়ে দিত। অনেক সময় ছাপতে ছাপতে কোন ভুল ধরা পড়লে সে ভুল সংশোধন করা হতো ফলে একই সংস্করণের কিছু বইয়ে ভুল থেকে যেত এবং কিছু বইয়ে ভুল সংশোধিত হতো না হয় ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নতুন ভুল হতো।

ছাপতে ছাপতে বা বিন্যাসিত হরফে কালি লাগাবার সময় টাইপ উঠে যাওয়ার দরুন যে ভুল হতো তা সাধারণতঃ একটি হরফের ভুল।

ছাপার ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয় বই ছাপার সময়, অনেক সময় লেখক উপস্থিত থাকত। অনেক সময় ছাপার জন্যে বিন্যাসিত হরফ প্রস্তুত হওয়ার পর লেখক উপস্থিত না হলে মুদ্রক লেখকের জন্য অপেক্ষা না করে ছাপা শুরু করত। ইতিমধ্যে লেখক যদি এসে পড়ত এবং যে form ছাপা হচ্ছে তাতে যদি ভুল ধরা পড়ত তা হলে মুদ্রক ছাপার কাজ বন্ধ করতো এবং ভুল সংশোধন হলে আবার ছাপার কাজ শুরু হতো।

১৬শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব বই ছাপা হতো সেই সব বইয়ের ভিতরে এধরণের ভুল খুব বেশী দেখা যায়। আজকালকার বইয়ে এধরণের ভুল বড় একটা দেখা যায় না। বই ছাপতে ছাপতে ভুল ধরা পড়ার প্রথমত কোন কারণ নেই, কারণ ছাপা শুরু করবার পূর্বে লেখককে একটি Machine proof দেওয়া হয়। তা সত্বেও ছাপতে ছাপতে যদি ভুল ধরা পড়ে তা হলে সে ভুল পরিবর্তন করবার একান্ত প্রয়োজন না হলে ছাপার কাজ বন্ধ করা হয় না। এবং ভুল সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন হলে যে পাতায় ভুল হয়েছে সেই পাতাগুলি নতুন করে ছেপে বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

On indentification of books,
by Rajkumar Mukhopadhyaya

পুঁথি-পত্রের সংরক্ষণ ও সংস্কার প্রসঙ্গে

পঙ্কজ কুমার দত্ত

গ্রন্থাগারে পুঁথি-পত্রের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কর্মীদের প্রতিদিনের ভাবনা। ধূলো-বালি ও কীট-পতঙ্গের উৎপাত এবং আলোক ও তাপের আধিক্য থেকে এগুলিকে বাঁচাতে হবে; আর্দ্রতা নিবারণ করতে হবে অথচ শুষ্ক হলে চলবে না—এই সব নানারকমের ভাবনায় কর্মীরা প্রায়ই হিমসিম খেয়ে যান। এরপরেই আছে প্রাচীনত্বের জন্য স্বাভাবিক জীর্ণতা প্রাপ্তি। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পুঁথি-পত্রগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। অথচ যথোপযুক্ত ভাবে সংস্কার করতে পারলে গ্রন্থগুলি আবার নবজীবন পায়। পাশ্চাত্য দেশে সংস্কার কার্যে অনেক আধুনিক পদ্ধতির ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা হয়। সত্য বটে, এইগুলির কোন কোনটি খুবই ব্যয়বহুল; কিন্তু কতকগুলি মোটেই ব্যয়বহুল নয়। গ্রন্থ-প্রেমিক ও বিজ্ঞানের ছাত্র যে কেউই কিছু চেষ্টা করলেই এই সব পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন। নব-জীবন যদি নাও দিতে পারেন—অকাল জীর্ণতার হাত থেকে পুঁথি-পত্রগুলিকে রক্ষা করতে পারেন। অবশ্য সংরক্ষণ ও সংস্কার দুটি দিকেই একই সংগে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

পুঁথির কাগজের উপাদান পুঁথির স্থায়িত্বের জন্য অনেকখানি দায়ী। কীটপতঙ্গের আক্রমণই হোক বা সাধারণ জীর্ণতাই হোক অথবা অন্য কোন উৎপাতই হোক প্রতিটিই কাগজের উপাদানের এবং উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়। গুণগত উৎকৃষ্টতা ও স্থায়িত্ব কাঁচামালের উপরেই নির্ভর করে। কাগজ তৈরীর জন্য নানারকমের উদ্ভিজ্জ তন্তু (cellulose fibres) ব্যবহার করা হয়। তুলা ও লিনেন (linen) থেকে geletine "size"এর সাহায্যে হাতে তৈরী কাগজ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত—এক কথায় উৎকৃষ্টতম। কাষ্ঠখণ্ড থেকে কলে তৈরী যে সমস্ত কাগজে "size" রূপে rosin এবং aluminium resinate ব্যবহৃত হয় স্থায়িত্বের দিক থেকে সেগুলি নিকৃষ্টতম। অন্যান্য "ক" শ্রেণীর কাগজের স্থায়িত্ব মাঝামাঝি ধরণের। কাষ্ঠমণ্ড থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে লিগনিন (lignin) এবং প্রাকৃতিক রজন (resin) বিদূরিত "সালফাইট" মণ্ড (sulphite pulp) থেকেই সাধারণ শ্রেণীর কাগজ তৈরী হয়। হাফটোন ব্লক ও সাধারণ ছাপার কাজে এই কাগজই প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। নিরেস কাষ্ঠমণ্ডের সঙ্গে অল্পমাত্রায় সালফাইট মণ্ড মিশিয়ে নিউজ প্রিন্ট তৈরী হয়—এগুলির অস্থায়িত্বের কথা পাঠকদের সকলেরই জানা আছে। অল্পদিনেই এগুলি হলদে বা লালচে হয়ে পড়ে এবং মড়মড়ে বা ভঙ্গুর হয়ে হয়ে যায়। কোন পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্রের সংরক্ষণের কথা ভাবতে গেলে এইজন্যই তার কাগজের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং উৎপাদন পদ্ধতির কথাও জানা প্রয়োজন। ডাক্তারেরা যেমন রোগের নিদান দেবার আগে রোগীর কাছ থেকে আনুপূর্বিক সব কথা শোনেন, ঠিক তেমনি সংরক্ষণের জন্য আনীত পুঁথি-পত্রের আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কোন্‌দেশের পুঁথি কবে লেখা হয়েছিল, কি

কালিতে লেখা, এতদিন কার কাছে ছিল, কেমন ভাবে রক্ষিত হয়েছিল এগুলি জানা থাকলে পুঁথিটি সংস্কার করতে অনেক সুবিধা হয়। যে সমস্ত কারণে পুঁথিটির এমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল সেই সমস্ত ক্ষতিকর কারণে যাতে ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব।

কাগজের প্রধান উপাদান হল তন্তুদ বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ পদার্থ। এছাড়া অল্প পরিমাণে গন্ধক, কষ্টিক সোডা, সোডা-অ্যাশ, চূণ, ক্লোরিণ, ফিটকিরি, রোজিন, ব্যরাইট, দস্তা এবং টাইটিনিয়ামের যৌগ কাজে লাগে। রঙ্গীন কাগজ তৈরীর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর aniline জাতীয় রঙ ব্যবহার করা হয়। তন্তুদ কাঁচামাল থেকে যান্ত্রিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে মণ্ড প্রস্তুতির জন্য কষ্টিক সোডা, চূণের জল অথবা ক্যালসিয়াম সালফাইট ব্যবহার করা হয়। লেখার বা ছাপার উপযোগী সাদা কাগজ তৈরীর জন্য মণ্ড ব্লিচ (bleach) বা পরিস্কৃত করা প্রয়োজন। এই কাজে ক্ষারজাতীয় বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ব্লিচড্ বা পরিস্কৃত হয়ে যাবার পর ব্লিচিং উপাদান ধৌতকরণের দ্বারা বিদূরিত করা হয়। কাগজের ঔজ্জ্বল্য, মসৃণতা, ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য নানারকমের খনিজ বস্তু মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এগুলিকে loading বা filling উপাদান বলে। clay, chalk. talc, baroytes প্রভৃতি loading বা filling উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "Size" উপাদান সমূহ পোকা-মাকড়ের প্রিয় খাদ্য এবং ছত্রাক জন্মানোর পক্ষেও খুবই প্রশস্ত ক্ষেত্র। অবশ্য ব্লিচ করা কাগজে ছত্রাক বা কীট-পতঙ্গের আক্রমণের ভয় অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ব্লিচকরা কাগজে অন্য ভয় আছে। যদি ধৌতকরণের দ্বারা ব্লিচিং বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত না হয়ে থাকে তবে ঐ কাগজ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। কাগজ যত পুরাতন হতে থাকে ততই তার মধ্যে অম্লতা দেখা দিতে থাকে। যে সমস্ত কাগজে alum বা ফটকিরী ব্যবহার করা হয় (যথা rosinএর সাহায্যে 'size' করা কাগজ সেই সমস্ত কাগজে প্রথম থেকেই অম্লতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ দ্রবীভূত ফিটকারী অল্প পরিমাণে আম্লিকধর্ম পায়। সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে কাগজ সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিল্পাঞ্চল অথবা ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের বাতাসে দহনজাত সালফার-ডাই-অক্সাইড যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং এই জন্য ঐসব অঞ্চলে গ্রন্থাগার বা পুঁথিশালার পুঁথি-পত্রগুলি সহজেই জীর্ণ হয়ে পড়ে। ধূলোবালির সহিত যে সমস্ত ধাতুকণা থাকে তাদের অনুঘটক বা প্রভাবক জনিত প্রভাবের ফলেই (catalytic effect) কাগজের মধ্যেই সালফার-ডাই-অক্সাইড থেকে সালফিউরিক এসিড তৈরী হয় এবং ঐ এসিডই কাগজের জীর্ণতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। হাতে-লেখা যে সমস্ত পুঁথিপত্রে লৌহঘটিত কালি ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত কালিতে অল্পপরিমাণে সালফিউরিক এসিড থাকেই; এর ফলে যেখানে যেখানে কালির ছোঁয়া আছে সেই সমস্ত জায়গার কাগজই মুড়মুড়ে হয়ে যায় এবং কালক্রমে খসে পড়ে। নানারকমের বিক্রিয়ার ফলে এসিড বা অম্লের মাত্রা অনেক সময় এমন পরিমাণে এসে পড়ে যে এসিডের ক্রিয়াতেই অক্ষরগুলি সছিদ্র হয়ে যায়। এসিড ঘটিত এই "খেয়ে যাওয়া" বা সছিদ্রতার অন্য কারণও অবশ্য থাকতে পারে। Aspergillus নামে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু

যদি কাগজের উপর বাসা বাঁধে এবং দ্রুতগতিতে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে ঐ জায়গায় একধরণের এসিড তৈরী হয় আর তারই ফলে কাগজ ফুটো ফুটো হয়ে যায়। অম্ল বা এসিড সৃষ্টির ব্যাপারে ভুষোকালী কিন্তু একেবারেই নির্দোষ। অম্লতা পুঁথিপত্রের জীর্ণতা ত্বরান্বিত করে। পরীক্ষায় (accelerated aging test) দেখা গেছে যে প্রশমিত (neutral) কাগজ অনেক বেশী ভাঁজ সহনে অক্ষম অন্যদিকে অম্লতা প্রাপ্ত কাগজের ভাঁজ সহন ক্ষমতা আনুপাতিক হারে অনেক কম।

সূর্যালোকে পুঁথিপত্রের অনেক ক্ষতি হয়। সূর্যের আলো লাগার ফলে খবরের কাগজের বিবর্ণতা এবং ভঙ্গুরতা অল্প-বিস্তর সকলেরই নজরে পড়েছে। এমন কি মাত্র কয়েক ঘণ্টা সূর্যের আলোয় ফেলে রাখলেই এই বিবর্ণতা বেশ চোখে পড়ে। শুধুমাত্র নিউজ-প্রিণ্টের ক্ষেত্রেই যে এমনটি ঘটে তা নয়, ভাল জাতের কাগজও সূর্যের আলোয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিবর্ণতা একটুও নেই অথচ কাগজ খুবই অমজবুত হয়ে পড়েছে আলোকের অভাবে। সূর্যের আলোর অতি বেগুনি রশ্মিই মূলতঃ এসবের জন্য দায়ী। আর জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি একাজে তাকে সাহায্য করে।

কাগজ পত্র পুরানো হয়ে গেলে শুধু যে মড় মড়ে হয়ে পড়ে তা নয়, ব্লটিংপেপার বা চোষ কাগজের মত জল শোষণ ও ধরে রাখবার ক্ষমতা পায়। শোষিত জলকণা বাতাসের সংস্পর্শে cellulose ও "size" কে জারিত (.oxidised) করতে থাকে—loading উপাদানগুলির ক্রমশঃই পচন হতে থাকে এবং কালক্রমে কাগজটি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যে সমস্ত কাগজে loading material হিসাবে calcium carbonate ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত কাগজ সহজে জীর্ণতার খপ্পরে পড়ে না। তার কারণ সময়ের সঙ্গে কাগজ যে অম্ল আহরণ করে calcium carbonate সেই আহরিত অম্লকে পরিমাণে প্রশমিত করতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে ছাপার কালিও কাগজের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ছাপার কালিতে যে তেল থাকে সেই তেল প্রায়ই বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়ে যায়, এবং সেই স্থানে এক রকমের ক্ষতিকর অম্ল উৎপন্ন হয়। Title page বা অন্যান্য যে সব জায়গায় বড় বড় মোটা, মোটা হরপে ছাপা হয় সেই সব জায়গায় এটা বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। সব কাগজেই কিছু পরিমাণে লৌহ-যৌগ থাকেই এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লৌহ জারিত হয়ে ওঠায় কাগজে একটা লালচে ভাব দেখা যায়।

আমাদের দেশের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়া পোকা-মাকড় ও ছত্রাক জন্মানো ও বৃদ্ধির একান্ত অনুকূল। তার উপর যদি পুস্তক ভাণ্ডারগুলি হয় ঘুপসি অন্ধকার ও স্যাঁতসেতে এবং ঘরের মধ্যে মুক্ত বাতাস চলাচলের অভাব থাকে তবেত পোকা-মাকড় ছত্রাকদের পোয়াবারো। এ সম্বন্ধে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠকদের প্রত্যেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর, অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

বারান্তরে পুঁথিপত্রের উপর বিভিন্ন উৎপাত ও আক্রমণ প্রতিবিধানের উপায় ও ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুগুলির সংস্কারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

On preservation and mending of library materials,
by Pankaj Kumar Datta.

পাঠ ও জীবন

দিলা মুখোপাধ্যায়

'পাঠ'কে সাধারণতঃ দুটি স্তরে ভাগ করা যায়। বিচক্ষণ বিচারকের মন নিয়ে পড়া এবং পড়ার জন্যে পড়া। বিচারকের মন নিয়ে যারা পড়ে তারা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করে কি অবস্থায় কি কারণে লেখক লিখছে, কি সে বলতে চায়, কি তার উদ্দেশ্য। কেবল পড়ার জন্যে যারা পড়ে তারা পাঠে সত্যিকারের কোন অংশ গ্রহণ করে না। তাকে যা দেওয়া হয়েছে তারই স্বাদ সে গ্রহণ করে। সে স্বাদ তার ভালো লাগল কি মন্দ লাগল সেইটাই সে ঠিক করে। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইখানি তার কাছে পুরান হয়ে যায় কিন্তু যারা সমালোচকের চোখ নিয়ে পড়ে বই তাদের কাছে পুরান হয় না, কারণ বিষয়বস্তুর রেখা-চিত্র তার মনের ফলকে আঁকা হয়ে যায়। প্রথম ধরণের পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের পাঠ সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয় যদি কে, কি অবস্থায়, কোন বা কি ধরণের বই পড়ে তা অনুসন্ধান করে দেখা যায়। ধরা যাক স্ত্রী-পাঠকের কথা। সমাজের সকল স্তরের মেয়েদের অবস্থার কথা যদি চিন্তা করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে তাদের সকলের অবস্থাই সমান; অন্ততঃ একথা বললে হয়তো অন্যায় হবেনা যে পুরুষ পাঠকের প্রত্যেকের অবস্থা যেমন বিভিন্ন ধরণের, স্ত্রী পাঠকের অবস্থা সেরূপ বিভিন্ন ধরণের নয় অন্ততঃ তাদের অবস্থার মধ্যে একটা সমতার সন্ধান পাওয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে দেখা যাবে সাধারণতঃ পড়া হচ্ছে "ফাঁকি"র (evasion) পড়া অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, ও আবেগময় উপন্যাস এবং এদের মধ্যে সম্ভবতঃ মেয়ে লেখকেরই প্রাধান্য থাকে বেশী। তবে মেয়েদের বয়েস যত বাড়তে থাকে তাদের পাঠের ধারাটাও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। তার কারণ বয়েস বাড়ার সঙ্গে তারা সংসারের কাজ থেকে এবং আধুনিক চাকুরীজীবী মেয়েরা চাকুরী থেকে যখন অবসর পায় তখন পাঠে মন দেবার সময়ও তারা যথেষ্ট পায় এবং মনের আবেগময় অবস্থাও কতকটা কমে যেতে থাকে। মেয়েদের পাঠ সম্বন্ধে যা বলা হলো তার অনুসন্ধানগত ভিত্তি কিছু নেই। তবে পাঠকের পাঠ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধান করলে জনসাধারণের পাঠ সম্বন্ধে কতগুলি ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

মেয়েদের পাঠ সম্বন্ধে যা বলা হলো তা থেকে দেখা যায় পাঠ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে বই কেনা (consumption) এবং বই পড়া এ দুটি এক জিনিষ নয়। পড়বার জন্যেই যে বই কেনা হয় তা সত্যি নয়। বই ঘরে সাজিয়ে রাখবার জন্য ঐতিহ্যের লক্ষণ হিসাবে কেনা হতে পারে। কোন একখানি বই বিরল বলে কেনা হতে পারে। এমনও হতে পারে যে বই কেনা কারো স্বভাব তাই সে বই কেনে, কোন বিশেষ লেখকের লেখা বলে বই কেনা হতে পারে; আবার, বিশেষ ধরণের বাঁধাই বা ছাপার জন্যে বই কেনা হতে পারে। বইয়ের এইসব ধরণের ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন

নেই কারণ এ ধরণের ব্যবহারের সংখ্যা অতি নগণ্য। পড়বার জন্যে যে সব বই ব্যবহার করা হয় তার আবার দুটি স্তর আছে: বইকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা এবং বইকে সাহিত্য হিসাবে ব্যবহার করা। এই দুই ধরণের পাঠের কারণ বিভিন্ন।

প্রথম ধরণের পাঠের কয়েকটি কারণ আমরা এখানে উল্লেখ করব।

প্রথমতঃ সংবাদের জন্য পড়া, এবং ব্যবসায়ের জন্য পড়া (Professional reading)। সত্যিকারের সাহিত্যকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার (functional reading) উদ্দেশ্য জটিল। এ ধরণের পাঠের একটা চরিত্র হচ্ছে বইকে ওষুধের মত ব্যবহার করা। কেউ এ ধরণের বই ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে আবার কেউ মানসিক বা শারীরিক শ্রান্তি দূর করবার জন্যে পড়ে অর্থাৎ মানসিক বা শারীরিক relaxation-এর জন্যে এ-ধরণের বই পড়ে। আবার কয়েক ক্ষেত্রে এই ধরণের পাঠ-স্নায়ুর উপরে সোজাসুজিভাবে ওষুধের বড়ির মত কাজ করে। ভীতিজনক পাঠ, কৌতুকময় পাঠ এবং আবেগময় পাঠ বিশেষ করে যৌন উত্তেজনা জনক পাঠ এধরণের কাজ করে। শেষোক্ত ধরণের পাঠ খুব বেশী দেখা যায়। আর এক ধরণের পাঠ আছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে নানা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। এধরণের পাঠের জন্য বই হচ্ছে নানা ধরণের Teach your self series বা self taught series। এধরণের বই আনন্দ পাবার জন্যে পড়া হয় না।

সাহিত্যের জন্য পাঠের কথা আমি "গ্রন্থাগারে" প্রকাশিত "সমাজ ও গ্রন্থাগার" নামক প্রবন্ধে বলেছি এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বই যখন উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন সে পাঠকে সাহিত্যের জন্য পাঠ বলা যায় না। সে পাঠ হলো কোন কার্য সম্বন্ধীয় পাঠ (functional reading)।

অবস্থা অনুযায়ী পাঠ

এখন ধরে নেওয়া যাক গ্রন্থাগারে সব রকম পাঠের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বই রাখা হয়েছে এবং পাঠকের বই পাওয়ার দিক থেকে সকল প্রকার সুবিধা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি অবস্থায় এবং কোন স্থানে পাঠকেরা বই পড়বে? একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সকল প্রকার পাঠের সুবিধা থাকলেও, এবং পাঠের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাঠের জন্য অবস্থা ও স্থান বিপর্যয়ের জন্য পাঠ সম্ভব হয় না। আজকালকার মানুষের সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে রেখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যেটুকু অবসর পায় সে অবসরটুকু অন্যান্য কাজে, আমোদে এবং খেলাধুলায় কেটে যায়। যুবক অবস্থায় নানা কাজ এবং আমোদ প্রমোদ সত্ত্বেও মানুষ বই পড়ে কিন্তু এ অবস্থায় পাঠের গণ্ডি থাকে সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ। প্রৌঢ় অবস্থায় জীবনের অস্থিরতা এবং কাজের চাপ যত কমতে থাকে পাঠের গণ্ডি তত প্রসারিত হতে থাকে। এ বয়সটা ধরা যেতে পারে ৩৫ থেকে ৪৫। কে কি ধরণের কাজ করে, কি অবস্থায় কাজ করে, সংসারের অবস্থা কিরূপ, জলবায়ু ইত্যাদি নানা বিষয় পাঠের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। তবে বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত মানুষের পড়বার জন্যে বাড়তি সময়কে ৩টি স্তরে ভাগ করা সম্ভব; বাসে বা ট্রেনে যাতায়াতের সময়, কাজের শেষে দিনান্তের অবসর, কর্মবিহীন অবসর (যেমন ছুটির দিন অসুখের সময় এবং অবসর প্রাপ্ত অবস্থা)।

প্রথমোক্ত অবস্থার পাঠ হচ্ছে সংবাদপত্র যা আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই ট্রেন যাতায়াতের সময়। তবে ট্রেনে যেতে যেতে আর এক ধরণের পাঠ হচ্ছে "ট্রেনে পড়বার মত উপন্যাস" অর্থাৎ সে সব বই কেবল সময় কাটাবার জন্যে পড়া হয়। যে-সব Daily passenger-দের যাতায়াতে প্রায় এক ঘণ্টা বা তারও অধিক সময় লাগে তাদের হাতেই আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হালকা ধরণের উপন্যাস দেখা যায়। আমাদের দেশে যাতায়াতের পথে পড়বার উপযুক্ত করে বই ছাপান হয় না। কিন্তু ইউরোপের বহুদেশে এ ধরনের বই ছাপা হয়—নানা ধরনের Digest-গুলি কেবল এই কারণেই খুব বেশী প্রচলিত। আমাদের দেশের প্রকাশকরা এ ধরণের বই ছাপায় মন দিলে সম্ভবতঃ তাদের ব্যবসার উন্নতি করতে পারে। যাতায়াতের পথে পড়বার জন্যে বিশেষ করে বিলাতে Omnibus volume-এর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই বইগুলির আকার এত বড় যে যাতায়াতের পথে তা নিয়ে যাওয়া কষ্ট কর হয়ে দাঁড়ায়।

কাজের শেষে দিনান্তে যে অবসরটুকু পাওয়া যায় সে অবসর সময়ে মানুষ বই পড়তে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত বাসস্থানের অবস্থাটা এ-ধরণের পাঠের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ পাঠকেরই সে অবস্থা নেই তবে কাছাকাছি যদি কোন গ্রন্থাগার বা Book club থাকে তা হলে তারা এ সময়টুকু বই পড়ে কাটাতে পারে। কিন্তু এ সময়টুকু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রেডিও শুনে কেটে যায় এবং টেলিভিশন চালু হ'লে এ সময়ে বই পড়াটা সম্ভবত উঠেই যাবে। বই পড়ার পরিবর্তে আসবে Audio-visual পাঠ। এ ধরনের পাঠেরও উপকারিতা আছে কিন্তু এ ধরণের পাঠে ব্যক্তিগত কোন সংযোগ থাকে না কারণ এ ধরণের পাঠ হচ্ছে অন্যের দ্বারা পরিচালিত পাঠ।

রাতের বেলা পড়ার কতগুলি বিশেষ চরিত্র আছে। রাতে পাঠ করা যাদের অভ্যাস তাদের মাথার কাছেই পাঠের উপযুক্ত বই থাকে। এ বইগুলিকে সাধারণতঃ "শিয়রের বই" বলা যেতে পারে। পাঠকের একলা শোবার মত যদি ঘর থাকে তা হ'লে বলতে হ'বে এ অবস্থায় সাহিত্য হিসাবে বই পড়া সম্ভব কারণ পাঠক সম্পূর্ণ একা। তার ব্যক্তিত্বকে ঘরের নির্জনতায় সম্পূর্ণভাবে সমষ্টি থেকে গুটিয়ে নিয়ে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে। এ অবস্থার পাঠ থেকেই পাঠকের ব্যক্তিগত পাঠের রুচি সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায়, কারণ ঘরের নির্জনতায় Taboo'র প্রভাব ও সামাজিক বাধা বর্তমান থাকে না। এই সময়ে এবং এই অবস্থায় সাধারণতঃ পাঠের জন্য মানুষ বেশী সময় দিয়ে থাকে।

অসুখের সময় বা অসুখ থেকে সেরে ওঠবার পর পড়ার একটা বড় সুযোগ। পাঠের ব্যবস্থা ঠিক মত থাকলে এ সুযোগটা নেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এ অবস্থায় functional reading সম্ভব হয় বেশী। দুঃখের বিষয় এ অবস্থায় পড়বার মত সুযোগ অন্ততঃ আমাদের দেশে খুব কম।

রবিবারের পড়ার জন্যে আছে রবিবারের সংবাদপত্র। আমাদের দেশের রবিবারের সংবাদপত্রে পড়বার মত খুব বেশী কিছু থাকে না। কিন্তু ইংলণ্ড বা আমেরিকায় কিংবা ইউরোপের অন্যান্য দেশের রবিবারের সংবাদপত্রের কলেবর বেশ বড় হয় এবং তা একদিনে শেষ করা যায় না।

লম্বা ছুটি বা অবসর গ্রহণের পর কি ধরণের পাঠে মানুষ মনোনিবেশ করে তা বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

উপরে নানা ধরণের পাঠের আমরা যে বর্ণনা দিলেম তা সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ একটি রেখাচিত্র মাত্র। এ বিষয়ে ঠিকমত একটা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারব আমাদের দেশে পাঠের চাহিদা, পাঠের রুচি। কেবল তাই নয়, দেশে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে, পাঠের ক্ষেত্রে সেগুলি কতদূর কার্যকরী হচ্ছে, জনসাধারণের গ্রন্থাগারের চরিত্র অনুযায়ী সে-সব গ্রন্থাগার কাজ করছে কি না তাও জানা যাবে॥

মনে হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে এ ধরণের একটা অনুসন্ধান চালাতে পারলে ভালো হয়। এ অনুসন্ধানের জন্য কতগুলি প্রশ্ন সম্বলিত কিছু কাগজ ছাপিয়ে নিয়ে কেবল জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠিয়ে দিলে সে কাগজগুলি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক তার পাঠকদের মধ্যে প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য বিলি করে দিতে পারে এবং পাঠকের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ফেরৎ পাঠাতে পারে। প্রশ্নগুলি হবে এইরূপ :—

নাম.....................
ঠিকানা.................
পেশা...............　　(কোন পেশা না থাকলে লিখুন "নাই" ;
　　　　　　　　অবসর প্রাপ্ত হলে লিখুন "অবসর প্রাপ্ত")

বয়স...............
কোন সময়ে বই পড়েন ?...............
কি ধরণের বই পড়েন ?...............
কোন্ লেখকের বই পড়তে ভালোবাসেন ?............
বই পড়ার উদ্দেশ্য কি ?........
কি অবস্থায় বই পড়েন :

১। কর্মস্থানে যাতায়াতের সময় ?.........
২। ছুটির দিনে ?.........
৩। রাত্রে ঘুমাবার পূর্ব্বে ?.........

কোন্ স্থানে বই পড়েন :

১। ট্রেনে ?.........
২। বাসে ? ....
৩। বাড়ীতে ?.........
৪। গ্রন্থাগারে ?

এ ধরণের কয়েকটি প্রশ্ন থাকলেই চলবে। অর্থাৎ প্রশ্নগুলি এমন হওয়া চাই যাতে পাঠকের বয়েস অনুযায়ী ও বাস্তব জীবনের অবস্থা অনুযায়ী পাঠের চরিত্রটা ধরা পড়ে।

এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য কি তাও এই প্রশ্নপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। পাঠকের সুবিধার জন্যই যে এ অনুসন্ধান করা হচ্ছে তা পাঠককে জানিয়ে দিতে হবে তা না হলে যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে না।

প্রকাশনায় নতুন আদল

গোলোকেন্দু ঘোষ

(১)

বই। এই কথাটার সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। যেমন যেমন ধরুন, ইটালিতে একশত পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট নয়—এমন বইকে বই বলে গণ্য করা হয় না, অথচ ভারতবর্ষে আমরা এটিকে বই বলে গণ্য করি; বেশির ভাগ দেশই পৃষ্ঠা-সংখ্যা দিয়ে বইয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করে থাকে; বিলেতে কিন্তু সর্বনিম্ন দামের ওপর বইয়ের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। বইয়ের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকার ফলে বিশ্ব-প্রকাশনার পরিসংখ্যাণ ও বিশ্লেষণের কাজটা গবেষকদের কাছে খুবই কঠিন ও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাহোক, বইয়ের যে-কোন সংজ্ঞাই নেওয়া যাক না কেন, প্রকাশন-ক্ষেত্রে কয়েকটি 'বৃহৎ'-এর আবির্ভাব ঘটেছে; ছ'টি দেশ বছরে বিশ হাজারের বেশি বই (শিরোনাম) প্রকাশ করে থাকে: রাশিয়া, চীন*, ইংলণ্ড, জার্মানি (পশ্চিম-জার্মানি এককভাবে ধরে বা পুর্ব-জার্মানির সঙ্গে যুক্তভাবে ধরে) জাপান এবং আমেরিকা। আর ছ'টি দেশ প্রায় দশ হাজার বই প্রকাশ করে থাকে: ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, স্পেন, ইটালি, নেদারল্যাণ্ডস্ ও চেকো-শ্লোভাকিয়া। ইউনেস্কোর হিসাবে ১৯৬৩ সনে পৃথিবীতে চার লক্ষর মত বই প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বারটা দেশ তার চারভাগের তিনভাগ বই প্রকাশ করেছে।

১৯৫২ সন থেকে ১৯৬২ সনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে বইয়ের মোট প্রকাশন শতকরা চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পেলেও কয়েকটি দেশে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য 'বৃহৎ'-গুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া এই হ্রাস আর কোন দেশে ঘটে নি। মাঝারি আকারের প্রকাশক-দেশগুলির মধ্যে বেলজিয়ামে শতকরা পঁচিশভাগ হ্রাস পেয়েছে এবং ইটালিতে শতকরা ষোলভাগ হ্রাস নথিবদ্ধ হয়েছে। বিশ্ব-প্রকাশন সংখ্যার অনুপাতে (অর্থাৎ শতকরা চল্লিশভাগ বৃদ্ধির অনুপাতে) যে-সব দেশে হ্রাস বৃদ্ধির শতকরা হারের বিশেষ তারতম্য ঘটেনি সেগুলি হল—ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জাপান ও ইংলণ্ড।

চীনে বই প্রকাশনা দশ বছরে দশগুণ বেড়েছে। আমেরিকায় বেড়েছে শতকরা পঁচাশীভাগ। প্রকাশনা ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থান অধিকারের জন্যে আমেরিকা এখন জাপানের প্রতি-যোগী। দশ বছর আগে আমেরিকা ছিল ষষ্ঠ, তখনকার ফ্রান্সের প্রায় সমপর্যায়ে। উত্তর আমেরিকার প্রকাশনা ক্ষেত্রে এই বিস্তারের ফলশ্রুতি পাওয়া যায় কানাডার প্রকাশনা-ক্ষেত্রে, দশ বছরের মধ্যে কানাডায় ছ'শ চুরাশীখানা বই থেকে তিন হাজার ছ'শ' বই প্রকাশিত হয়েছে—বৃদ্ধি হল শতকরা চার শ'ছাব্বিশ-ভাগ। স্পষ্টত বোঝা যায় যে প্রধান কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটছে, তবে এখনও পূর্ববিন্যাসের বিশেষ তারতম্য ঘটে নি।

* এই প্রবন্ধে চীন অর্থে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড অধিকৃত চীনকে বোঝান হয়েছে।

পরিসংখ্যাণ বিশ্লেষণ করলে জোট বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—এর মধ্যে প্রধান হল ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী।

ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী

পাঁচ কোটির বেশি লোকের ব্যবহৃত বারটি ভাষা আছে। ক্রম-অনুযায়ী সেগুলি হল: চীনা, রুশ, ইংরেজি, হিন্দী, স্পেনীয়, জার্মান, জাপানী, বাংলা, আরবী, ফরাসী, পর্তুগীজ এবং ইটালীয়।

জাপানী, ইটালীয় এবং পর্তুগীজ ভাষাগুলি সম্বন্ধে আপাততঃ আলোচনার প্রয়োজন নেই কারণ এই ভাষাগুলির বই সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহারের জন্যেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। চীন সম্বন্ধেও এই কথাটা প্রযোজ্য, তা ছাড়া চীনের তথ্যাদি বড় অপ্রতুল। চীনের ভূখণ্ডের ও জনসংখ্যার বিস্তার সত্ত্বেও চীনকে বলা চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের এবং আরবরাষ্ট্রের ভাষাগুলি সম্পর্কে বলা চলে যে এই দেশগুলিতে প্রকাশন-শিল্প এত ছোট ও বিক্ষিপ্ত যে 'গোষ্ঠী' কথাটা এসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়. অবশ্য এই দেশগুলিতে প্রভূত সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটেছে। আর রুশ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে এই ভাষায় সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে কথাবার্তা বলা যায়। এই ভাষাটিকে স্বীকৃত-জাতীয়ভাষা হিসাবে বিবেচনা না করে স্বতঃপ্রচলিত জাতীয় ভাষা হিসাবে বিবেচনা করাই সঙ্গত হবে।

এবার রইল 'বৃহৎ চারটি পশ্চিমী স্বীকৃত জাতীয়ভাষা: ইংরেজি. জার্মান, স্পেনীয় ও ফরাসী। বিশ্ব-প্রকাশনার হিসাবে ১৯৫২ সনে তাদের যে ক্রম নির্ণীত ছিল, ১৯৬২ সনেও সেই রকমই আছে। মোট কথায়, যদি বিশ্ব-প্রকাশনের ১৯৫২ সনে সংখ্যা ধরি আড়াই লক্ষ, তাহলে এই চারটে ভাষার মোট প্রকাশন হার হয় শতকরা চৌত্রিশভাগ; আর ১৯৬২ সনে সাড়ে তিন লক্ষ বিশ্ব-প্রকাশন সংখ্যা ধরলে এদের হার হয় শতকরা ছত্রিশভাগ।

সামুহিক বিন্যাসের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও ভাষাগোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে স্থান-সাম্যের ব্যত্যয় ঘটেছে। যদিও কোন একটি ভাষাগোষ্ঠীর প্রকাশন পুরোপুরি হ্রাস পায় নি, তবুও ভাষাগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক ব্যবধান বেড়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫২ সনে বিশ্ব প্রকাশনের শতকরা তেরভাগ ছিল ইংরেজি ভাষাগোষ্ঠীর প্রকাশন; ১৯৬২ সনে বেড়ে হয় শতকরা ষোলভাগ—এই অগ্রগতি হল শতকরা প্রায় সত্তরভাগ এবং বিশ্ব-গড়ের দ্বিগুণ। আবার, ফরাসী ভাষাগোষ্ঠীর প্রকাশন বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা সাতভাগ, অর্থাৎ অনুপাতে হ্রাস পেয়েছে। জার্মান ও স্পেনীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলি তাদের ক্রম বজায় রেখেছে।

মাতৃভাষার দেশগুলিতে কর্মব্যস্ততা—

এই সব পরিবর্তনগুলির প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হবে যদি কোন ভাষাগোষ্ঠীর ভেতরের অবস্থা ব্যাখ্যাত হয়। ফরাসী, জার্মান, এবং স্পেনীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলির বিষয় বলা যায় যে মাতৃভাষার দেশগুলিতে প্রকাশন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে; এই সব দেশগুলিতে প্রকাশন বাড়তির পথে অথচ অন্যত্র প্রকাশন কমে যাচ্ছে। যেমন জার্মানি, স্পেন ও ফ্রান্সে প্রকাশন বাড়ছে, কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও মনাকোতে প্রকাশন কমছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রকাশন তুলনায় একই রকম আছে।

ইংরেজি ভাষাগোষ্ঠীর ভেতরের পরিবর্তন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইংরেজি ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান প্রকাশন-কেন্দ্র দুটি—ইংলণ্ড ও আমেরিকা। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আমেরিকা ক্রমেই ইংলণ্ডের শীর্ষস্থান অধিকার করতে অগ্রসর হচ্ছে। এই ঘটনাটা, ডিকেন্স যখন ইংরেজ-প্রকাশকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমেরিকা যান, সেদিন থেকে ইংরেজ-প্রকাশকরা ভয় করে আসছে।

১৯৫২ সনে ইংরেজরা আঠার হাজার ছ'শ' বই প্রকাশ করে; ইংরেজিতে মোট প্রকাশন পরিমানের অর্ধেকেরও যথেষ্ট বেশী অংশ এটা। ১৯৬২ সনে ইংলণ্ড প্রায় পঁচিশ হাজার বই প্রকাশ করে, তবু মোট ইংরেজি বই প্রকাশন পরিমাণের অর্ধেকের কিছু কম এটা। আমেরিকা প্রায় বাইশ হাজার বই প্রকাশ করে ইংলণ্ডের নিকট অনুগামী। আমেরিকার এই দ্রুত অগ্রগতি প্রধানত নরম মলাটের বই প্রকাশনার জন্যে।

যাই হোক, আরো একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝোঁক দেখা যায় কমনওয়েল্থ দেশগুলির প্রকাশনা-ক্ষেত্রে—১৯৫২ সনে এদের প্রকাশন ছিল নগণ্য কিন্তু দশ বছর পরে এই দেশগুলিতে সাড়ে ছ'হাজারেরও বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে।

রুশ-জোট ও আফ্রো-এশিয়গোষ্ঠী—

এবার অপর একটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করা যাক—রুশভাষাকে কেন্দ্র করে একে ভাষাভিত্তিক জোট সঠিকভাবে বলা যায় না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে এই গোষ্ঠী। এই দেশগুলির মধ্যে নিয়ত এবং নিয়মিত বিনিময় হয় যার ফলে বলা চলে যে এদের প্রকাশনা পরস্পর-নির্ভর। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলের যে ১৯৬২ সনে এই দেশগুলিতে (চীন বাদ দিয়ে) যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তা চারিটি পশ্চিমী ভাষাগোষ্ঠীর প্রকাশন-পরিমাণ অর্থাৎ সওয়া লক্ষের মত বই বা বিশ্ব-প্রকাশনের শতকরা ছত্রিশভাগের প্রায় সমান। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বই প্রকাশনা দ্রুততর হয়েছে, দশ বছর আগে ছিল শতকরা তিরিশভাগ।

গত দশ বছরে আফ্রো-এশিয় দেশগুলিতে প্রকাশন কমতির দিকে—শতকরা, ছত্রিশভাগ থেকে আটাশভাগে নেমে এসেছে। ভবিষ্যতে এই ঝোঁকের হয়ত পরিবর্তন ঘটবে। গত দশ বছরে প্রায় বিশটি জাতি তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং আশা করা যায় যে এদের সংখ্যা বাড়বে এবং প্রকাশনও বাড়বে। একতিরিশটি আফ্রো-এশীয় দেশের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সনের মধ্যে এদের প্রকাশন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা তেত্রিশ ভাগ। ভাষাভিত্তিক জোট ও আদর্শগত জোটে এই কেন্দ্রীভবন সম্ভবত শীঘ্র শেষ হবে এবং নবীন জাতিগুলিতে প্রকাশনা বিস্তৃতি লাভ করবে। সেদিন সারা পৃথিবীর প্রকাশনা-চেহারায় আদল বদলে যাবে।*

From "The New Look in Book Publishing",
by Robert Escarpit.

*"ইউনেস্কো কিচার"-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। এই লেখকের লেখা ফরাসী ভাষায় "La Revolution du Livre" ইউনেস্কোর দ্বারা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বইটির ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশন অপেক্ষায়। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রথম কিস্তি, আরো দুটি কিস্তি প্রবন্ধ প্রকাশিতব্য।

মহীশূরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চদশ সম্মেলন

ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়

গত ১৭ই জুন, ১৯৬৫ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা কলেজের শতবার্ষিকী কক্ষে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তিনদিন ব্যাপী নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পরিষদের প্রথম অধিবেশন আজ হইতে বত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৩ সালে কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অধিবেশনে ডাঃ এম ও টমাস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথা লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই জয়পুর, বরোদা, নাগপুর, ইন্দোর ও হায়দ্রাবাদে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল এবং গত বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রী ডি, এন, মার্শালের সভাপতিত্বে ইহা পাটনাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সম্মেলন কখনও সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে হয় নাই। তাই এবারকার অধিবেশন মহীশূরে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। যদিও এখানে সকল প্রদেশ হইতে আসা ব্যয় ও কষ্ট সাপেক্ষ তথাপি প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৫।২০ জন মহিলা ছিলেন। এখানকার আবহাওয়া শীতল ও আর্দ্র এবং ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল; মনে হইতেছিল যেন মহীশূর রাজ্য আমাদের স্বাগত জানাইবার জন্য এই সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহীশূর রাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯৫৬ সাল কর্ণাটকের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মহীশূর রাজ্য, বোম্বাই কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদের কর্ণাটক, ছোট কূর্গ এবং মাদ্রাজের কর্ণাটক অঞ্চল নিয়ে নূতন মহীশূর রাজ্যের পত্তন হয়। এই রাজ্য শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-রূপায়নে প্রাগ্রসর রাজ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুইজন খ্যাতনামা পুরুষ ডাঃ এস, আর, রঙ্গনাথন এবং শ্রী বি, এস, কেশবন এই মহীশূরের অধিবাসী। সুতরাং এইখানে এই সম্মেলনের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হইত প্রতিদিন প্রাতঃরাশের পর, মাঝখানে মধ্যাহ্ন ভোজের পর ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম দিয়াই আবার শুরু হইত বৈকালীন অধিবেশন। সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় অধিবাসিদের প্রচেষ্টায় গান-বাজনার আসর বসিত।

সভার প্রারম্ভে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রী কে, আর রামচন্দ্রন, আই, এ, এস সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া সুন্দর জল হাওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা, দিবার আশ্বাস দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ কে, এল. শ্রীমালী সভার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে,

দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আছে। এইগুলির উন্নতি বিধানের জন্য প্রচুর অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। পূর্বে গ্রন্থাগারগুলির ঐতিহ্যের কথা বলিয়া তিনি বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনা-মানের অবনতির কথা উল্লেখ করেন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের যথা, বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধানের উপর বিশেষ জোর দেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগারবিদ্যা প্রসারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে যাহাতে সকলপ্রকার গ্রন্থাগারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহার জন্য আশা প্রকাশ করেন।

যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভি কে আর ভি রাও সভাপতির ভাষণে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গত ৩০।৩২ বৎসরের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিদ্যার মাধ্যমে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়ের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিষদের সহযোগিতায় গ্রামীন ও নাগরিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। যে শিক্ষা পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের স্থান নাই তাহার মতে সেই পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ। শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাতে যে এতদিন গ্রন্থাগারগুলিকে স্থান দেওয়া হয় নাই তাহার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৭০ কোটী টাকা বরাদ্দের মধ্যে বিশেষ-ভাবে গ্রামীন অঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য কুড়ি কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইতেছে বলিয়া তিনি জানান। তিনি আশা করেন যে, এই বন্টনে বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যে দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছে তাহাতে ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে। তিনি বলেন যে, দেশে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কী অর্থনৈতিক অগ্রগতি কি সামাজিক উন্নয়ণ দুইই তার উপর নির্ভরশীল। গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইতে পারে সেইজন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার-আইন থাকা বিশেষ দরকার। অথচ অনেক রাজ্যেই এই ব্যাপারে কোন কাজ হয় নাই বলিয়া ডঃ রাও মন্তব্য করেন। এই পরিকল্পনাতে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আরও উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি জানান। সেখানে ভাল বই, বই রাখার জায়গা ও বসিয়া বই পড়ার জায়গা সব কিছুরই অভাব। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হইলেও ভারতে বহু রাজ্যে এখনও সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা হয় নাই।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক যে "মডেল পাবলিক লাইব্রেরী বিলটি" প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান এবং এই বিলের রদবদল করিয়া যাহাতে প্রত্যেক রাজ্যে গ্রন্থাগার-আইন প্রণয়ন করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলেন। কেননা ইহা ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থাগার আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। পরিষদের সভাপতি শ্রীপি এন গৌড় সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সরকার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে এই পরিষদকে সাহায্য করিতে পারেন তাহার জন্য অনুরোধ করেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে "গ্রন্থাগারসমূহ ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" নামক একটী আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন এবং তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। পরিষদের কর্মসচিব এবং দিল্লী সাধারণগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীডি আর কালিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধের সারাংশটি পাঠ করিয়া আলোচনার সূত্রপাত করেন। সর্বশ্রী বি এস কেশবন, এন সি চক্রবর্তী, প্রমীল বসু, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ-চন্দ্র সরকার, পি এস পট্টনায়ক ও কে পি গণপতি প্রভৃতি আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন মতামত পেশ করেন। যাহাতে আলোচনার সুপারিশগুলি যোজনা কমিশনে পেশ করা যায় তাহার জন্য সর্বশ্রী বি এস কেশবন, ডি আর কালিয়া, কে এ আইস্যাক, কে এস দেশপাণ্ডে ও পি কে পাতিলকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হয়, আলোচনা-চক্রের শেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকদিগকে সব সময়ে সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া তাঁহাদের দাবী আদায়ের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আজ পর্যন্ত ইউ জি সি প্রস্তাবিত বেতনের হার দুই একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন স্থানে কার্যকরী করা হয় নাই। তিনি এইবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীআর এস সাকসেনা গ্রন্থাগার বিদ্যাশিক্ষার দিকে যথেষ্ট জোর দেওয়া হইতেছেনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার মানের অবনতির কথা উল্লেখ করেন। যাহাতে এই বৃত্তিতে যথার্থ শিক্ষিত এবং মেধাবী ব্যক্তিরা আসিতে পারেন তাহার জন্য সাধারণ বিভাগীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার সংশোধন করিবার জন্য সম্মেলনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রী বি এস কেশবনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হইবার প্রাকালে এই প্রকার এক সর্ব-ভারতীয় সম্মেলনের গুরুত্ব খুব বেশী; বিশেষতঃ যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ ভি কে আর ভি রাও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগার সমস্যা লইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাদের বার্ষিক সম্মেলনে বহুবার বহু বিষয়ে বিশেষতঃ, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধতা, স্থায়িত্ব এবং সম্পূর্ণতার জন্য গ্রন্থাগার আইন এবং সমস্ত মহকুমা, সহর এবং পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগার প্রবর্তনের জন্য বহু আন্দোলন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, যোজনা কমিশন সমস্ত রাজ্যে যাহাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হয় চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে তাহার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি খসড়া কর্মসূচী তৈয়ার করার প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে।

বার্তা বিচিত্রা

প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত একটি কর্মিদল (working group) দেশের গ্রন্থাগার গুলির উন্নতি বিধানের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। দিল্লীতে এদের প্রথম সভা হবার কথা। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারগুলির রূপ কিরূপ হবে এবং জনসাধারণকে গ্রন্থ সম্পর্কে কি করে আগ্রহী করে তোলা যায় এই বিষয়ে এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শাখার উদ্বোধন করেন।

কেরালায় মোট ৩০০০ লাইব্রেরী আছে এবং এদের সবগুলি মিলে মোট ৫ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। এই টাকার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং কেরালা গ্রন্থগার পরিষদ আগামী আগস্ট মাসে অর্থ সংগ্রহের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এ থেকে অন্যান্য রাজ্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান ইউনিটে সম্প্রতি আরও দুইখানি গ্রন্থযান বাড়ানো হয়েছে। এতে আরও ১৫০০০ পাঠকের পাঠের সুযোগ ঘটল।

চণ্ডীগড়ে ১৯৬৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ৪ মাসের একটি লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা কোর্সের ক্লাস চলছে। এটি এই শিক্ষা প্রকল্পের পঞ্চম কিস্তি এবং এটিতে ৩০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

উত্তর প্রদেশের সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির কর্ম প্রণালী পর্যালোচনা করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি এখন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে পাঠক, প্রকাশক এবং গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

—Unesco Information Bulletin.

আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থার (FID) বার্ষিক কংগ্রেস ; ওয়াশিংটন, ১৯৬৫

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদমীর (National Academy of Sciences আহ্বান আগামী ১১-১৬ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থার কংগ্রেস ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় নিম্নোক্ত ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :—

১। ডকুমেন্টেশনবিদ্‌দের শিক্ষা ও শিক্ষণ।

২। ডকুমেন্টেশনের জন্য তথ্য-সংগ্রহ সংগঠিত করা

৩। ডকুমেন্টেশন পদ্ধতিগুলির রূপকল্প

৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য

৫। সমাজের প্রয়োজনীয় তথ্য

৬। ডকুমেন্টেশনের মূলনীতি

পূর্বে এই সংস্থার কংগ্রেস ইয়োরোপের বিভিন্ন শহরে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম। FID-র ত্রিংশৎ সম্মেলন ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দি হেগে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেন্টারের (DR TC) তৃতীয় বার্ষিক সেমিনার, বাঙ্গালোর, ১৯৬৫

ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের পরিচালনায় আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেন্টারের (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত) তৃতীয় বার্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয়—"Depth classification এর রূপ-কে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে :—

১। .Depth classification-এর রূপকল্প

২। বর্গকরণ তালিকার মান

৩। বিষয়-শিরোনামের মান

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, ভারতের বাইরে থেকেও অনেক প্রতিনিধি এই সেমিনারে যোগদান করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন ; মহীশূর, ১৯৬৫

গত ১৭ই ও ১৮ই জুন মহীশূরে ডঃ ভি কে আর ভি রাও-এর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কে এল শ্রীমালী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ রাও বলেন, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাবলিক লাইব্রেরী—বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য ২০ কোটির অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখনও ভারতের অনেক রাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়নি এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শুধু গ্রন্থাগার আইন পাশ করাও আবার যথেষ্ট নয় পুস্তক প্রকাশনের প্রশ্নও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ পরিকল্পনায় পুস্তক উৎপাদনের জন্যও ২০ কোটি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ডঃ রাও আরও বলেন যে, দেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তা না হওয়া পর্যন্ত যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের ১৮০০ কলেজের গ্রন্থাগার বাজেটের ব্যয় এবং পুস্তক ও সাময়িক পত্র, গ্রন্থাগার ভবন, পাঠকক্ষ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা কেমন সে সম্পর্কে অবিলম্বে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সম্মেলন ১৮ই জুন শেষ হয়। প্ল্যানিং কমিশনকে চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষার মোট ব্যয়ের শতকরা৫%ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করতে এবং পাবলিক লাইব্রেরিগুলির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে অনুরোধ জানান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে একটি বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্যও সম্মেলন থেকে অনুরোধ জানান হয়।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের (IASLIC) ষষ্ঠ সম্মেলন, ১৯৬৫

আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের ষষ্ঠ সম্মেলন ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এই সম্মেলন অক্টোবরে মহীশূরে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন গত জুন মাসে মহীশূরে হয়ে যাওয়ায় এই সম্মেলনের স্থান এবং সময় পরিবর্তন করতে হয়েছে। গত ১৯৬৩ সালে পরিষদের পঞ্চম সম্মেলন পুণা এবং ১৯৬৪ সালে তৃতীয় সেমিনার লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ—

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং স্টুডেণ্টস হোমের কর্মিদের বেতন ও মর্যাদার দাবীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল (১৯৬৫) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ছে স্টুডেণ্টস হোমের কর্মিদের বেতন ও মর্যাদার দাবীতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন :—স্বাধীনতা অর্জন করবার পর সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করেছেন। দেশে অনেক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরী শুধু সাজিয়ে রাখলেই চলবেনা সত্যিকারের শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর এখানে প্রয়োজন। শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না পান তাহোলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হওয়া কষ্টকর। শিক্ষকদের মত বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগার কর্মিদের এখনো দেওয়া হয়নি এটা দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। মানুষের বেঁচে থাকবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার অনেক কিছু থেকেই এরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলে কর্মিরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারছেন না। তাই সরকারের এ বিষয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত। আপনাদের দাবী আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি আপনাদের সাহায্য করতেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অনিল দত্ত বলেন :—গ্রন্থাগার আন্দোলন আমরা যাতে ভালভাবে গড়ে তুলতে পারি সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের বেতন ও পদমর্যাদার সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আমরা আহ্বান করেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন :—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সারা বাংলার সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে সবসময়ই চিন্তা করছেন। সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই; তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারকে প্রত্যেকেরই অভাব অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে। আমাদের এই ন্যায্য দাবী সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু এর প্রতিকার হচ্ছে না। স্পনসর্ড লাইব্রেরী তুলে দিয়ে সোজা-সুজি সরকারী লাইব্রেরী হবার জন্যে দাবী করলে আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারিদের মত সবরকম সুযোগ সুবিধা আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন।

শ্রীশান্তিময় ভট্টাচার্য বলেন :—পশ্চিমবাংলা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমার মনে হয় আলাপ আলোচনার দ্বারা কোন সমস্যার সমাধানই সম্ভব নয়। জাতির স্বার্থের জন্যে আপনাদের আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে হবে। সরকারী কর্মচারিদের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা সব সময়ই আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের পক্ষ থেকে শ্রীরণমিত্র সেন বলেন :—পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরি-চালিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মচারিদের মধ্যে ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের কর্মচারিদের যুক্ত করা হয়েছে। এক একটা ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমে গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ ছাত্র পড়েন। ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের কর্মিদের অবস্থা অনেকটা জেলা গ্রন্থাগারের কর্মিদের মত। এখানে কোন বেতনক্রম নেই, কোন সার্ভিস রুল নেই, কোন ভাতা নেই এবং চাকুরীর কোন স্থায়িত্ব নেই। বছর বছর নিয়োগপত্র দেওয়া হয় এরকম ডে-ষ্টুডেণ্টস হোমের কথাও আমি জানি। এর ফলে কর্মিদের মনে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটা সকলেই অনুমান করতে পারেন। আমরা যদি জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থা-গারের সাথে এক সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি তাহোলে আমার মনে হয় আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (রুরাল লাইব্রেরীয়ান) বলেন :—সরকার বলেছেন অর্থ নেই—কিন্তু একথা বললে চলবে কেন? এতদিন ধরে আমরা যে নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করছি এটা কি সরকারের পক্ষে গৌরবের কাজ হচ্ছে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হওয়া সত্বেও আমাদের এই দুর্দশা কলঙ্কজনক।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রী হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন :— আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন বলে আমি যথেষ্ট গৌরব বোধ করছি। আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হিসাবে অনেক কিছুই জানি। আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। আমার মনে হয় লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটা আইন হওয়া উচিত। এই আইন প্রণয়ন করতে পারলে সরকারের দায়িত্ব এসে যাবে। এই সব অ্যাসোসিয়েসানকে সরকারের আওতায় আনতে হবে এবং স্ট্যাটিউটারী বডিতে রূপান্তরিত করতে হবে, তাহোলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা দেশে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন তার

প্রশংসা না করে উপায় নেই। বাংলাদেশে যতদিন না গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে পে-স্কেল ও সার্ভিস রুল তৈরী হচ্ছে ততদিন গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়। আমার মনে হয় সরকারের এ বিষয়টিকে ন্যাশনালাইজ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত সরোজ হাজরা সম্মেলনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৪ই এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

Report of the conference held by the workers of District, Rural, and Day Students' Home Library regarding pay and Status.

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির ১৩—২৭শে জুন, ১৯৬৫

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় গত ১৩ই থেকে ২৭শে জুন গ্রন্থাগার কর্মীদের এক শিক্ষণশিবির থেকে ২৭জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা শেষ করেছেন। ১৩ই জুন শিবিরের উদ্বোধন করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধান ডঃ শচীদুলাল দাশগুপ্ত। গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত ইংরাজীতে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। কলিকাতা কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষণ সমাপ্তি দিবসেও অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নদীয়ার ডি.এস.ই. ও শ্রীকামিনী কুমুদ চৌধুরী এবং ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানশিক্ষণবিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতির অনুরোধে প্রধান অতিথি শ্রীফণিভূষণ রায় ডিউই ও কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। এছাড়া 'নবদ্বীপ বার্তা'র সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু গ্রন্থাগারে স্থানীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ, প্রত্নবস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য গ্রন্থাগারিকগণকে অনুরোধ জানান। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সহঃ-সম্পাদক অধ্যাপক চৈতন্য চন্দ্র গোস্বামী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই শিবিরের শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, নির্মল চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সিংহ এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযশোদা গোপাল গোস্বামী।

নবদ্বীপ ও তার আশেপাশের অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থাগার উৎসাহী যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত, কিন্তু তাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্ষনে অনভিজ্ঞ। তাঁদের

অসুবিধার কথা চিন্তা করে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় এই শিক্ষণশিবিরের ব্যবস্থা করেন। শ্রীতিনকড়ি বাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহী এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত বহুদিন থেকে যুক্ত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তদানীন্তন গ্রন্থাগারিকের উৎসাহে ১৯৫৭ সালেও নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে এক শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। নিম্নলিখিত ছাত্র-ছাত্রী এবারের শিক্ষণ শিবিরে সাফল্যের সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করে অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করেন :—

অঞ্জলি রায়
অমূল্য চন্দ্র সাহা
অনিমেষ মজুমদার
কমলেশ ভৌমিক
দিলীপ কুমার ভৌমিক
ধীরেন্দ্র কুমার সাহা
নিত্যগোপাল মালাকার
নিতাই চন্দ্র পোদ্দার
বেনীমাধব লস্কর
বাণী সরকার
বসন কুমার দাস
বংশীধর মোদক
মিনতী সাহা
মধুমঙ্গল সাহা
কানাই লাল দাস
জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
দিলীপ কুমার বসাক
দিলীপ কুমার সাহা
মনোরঞ্জন গোস্বামী
মণিকা দত্ত
রবীন্দ্রনাথ দাস মোহান্ত
শান্তিপদ দাস
শুভ্রা মজুমদার
সুধীর কুমার হালদার
সন্ধ্যারাণী মুন্সী
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
হৃষিকেশ দাশ গুপ্ত

Librarianship Training Camp
at Nabadwip.

অন্যান্য প্রদেশ—

পুণা লাইব্রেরী

পুণার ৬০ বছরের পুরানো "সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র লাইব্রেরীতে গত ৭ই জুন এক আনুষ্ঠানিক সভার পর খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ ডি আর গ্যাডগিলের সম্প্রতি প্রকাশিত "Planning and Economic Policy" পুস্তকখানি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করায় পুস্তক সংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সোসাইটির সভাপতি পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে, যে সকল ছাত্র সমাজসেবার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী তাদের কাছে এই গ্রন্থাগার বরাবর প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে থাকবে। সোসাইটির

একজন সদস্য বলেন যে, এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের অন্যান্য বিষয়ের সংগে অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে পুস্তক এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলপত্রও রয়েছে। এই গ্রন্থাগারের সবচেয়ে পুরানো বই হচ্ছে Machiavelli–রচিত সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি বই।

Poona Library (—The Hindu, 8-6-65)

কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্রাজ
(ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী)

কন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কন্নেমারার (১৮৮৬-১৮৯১) নামানুসারে স্থাপিত হয়। এটি ইন্দো-সেরাসেনিক স্টাইলে নির্মিত। ৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক এর উদ্বোধন হয়।

১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে "মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরীজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮" অনুযায়ী এটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাররূপে গণ্য হয়। ১৯৫৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে এই গ্রন্থাগারটিকে ভারতের তিনটি পাবলিক লাইব্রেরীর একটি বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের সংশোধিত "ডেলিভারি অব বুকস্ এণ্ড নিউজ পেপারস (পাবলিক লাইব্রেরীজ) অ্যাক্ট" অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের ২০শে মে থেকে ভারতে প্রকাশিত সমস্ত জিনিষগুলি পাবার অধিকারী হয়েছে। এটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিশেষ সংস্থা ও শাখা সংগঠনের প্রকাশনসমূহের ভাণ্ডার বিশেষ।

এতে প্রায় ১৮,১০০ ফুট বইয়ের তাকের জন্য জায়গা আছে এবং ২৭,০০০ স্কয়ার ফুট চলাফেরার জন্য খালি জায়গা আছে। এখানে একসঙ্গে ২৫০ জন পাঠক বসে পড়তে পারে। বর্তমানে এই লাইব্রেরীতে ৪,১১৫টি সাময়িক পত্রিকা এবং ২৫৪টি সংবাদপত্র আসে। গ্রন্থাগারের মোট কর্মীর সংখ্যা ৫৮। জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫-৩০ মোট ৯½ ঘণ্টা এবং বছরে মোট ৩০৪ দিন খোলা থাকে। এই গ্রন্থাগার থেকে মাদ্রাজ রাজ্যের তামিল ভাষায় প্রকাশিত "শিশুসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী—মাসিক তালিকা"—১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এবং "মাদ্রাজ রাজ্যের গ্রন্থপঞ্জী (তামিল)—মাসিক তালিকা" ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৪-৬৫ সালে এই গ্রন্থাগারে মোট ১,২২,৭৫৭২ টাকা মূল্যের বই এসেছে। মোট ১,৫২,৫৬৩ জন পাঠক গড়ে দৈনিক ৫০২ জন, ৫,৮১,৫৫১ টি বই অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১,৯১৩টি বই পড়েছে এবং ৮,০৮৩ জন সদস্য ১,২৩,৯৪৩টি বই অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪০৮ খানি বই বাড়ী নিয়ে গেছে। এতে প্রতি বই পিছু ০·২১ টাকা এবং পাঠক পিছু ০·৮০ টাকা খরচ হয়েছে।

১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা, পাঠক, সভ্য সংখ্যা এবং ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

মাস	পুস্তক সংখ্যা	পাঠক সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা	বাড়ী নিয়ে যাওয়া বইয়ের সংখ্যা	লাইব্রেরীতে ব্যবহৃত হয়েছে	মোট
এপ্রিল	১,৬৪,৩৩১	১৩,১২৩	৫,৭৩৭	১০,৪৯২	৩৯,৩৬৯	৪৯,৮৬১
মে	১,৬৪,৮১৫	১৩,১১৭	৫,৭৫৯	৯,৫৪২	৩৯,৩৫৮	৪৮,৮৯৩
জুন	১,৬৫,২২০	১২,৫০০	৫,৭৭৯	৮,৯৯৮	৩৭,৫০০	৪৬,৪৯৮
জুলাই	১,৬৫,৭০৪	১৩,৯৮২	৫,৮৬২	১০,০৮৫	৪১,৯৪৬	৫২,০৩১
আগস্ট	১,৬৬,২৩৪	১৪,৭৫৩	৫,৯১১	১১,৩৫৮	৪৪,২৫৯	৫৫,৬১৭
সেপ্টেম্বর	১,৬৬,৮৮২	১৩,০৮৮	৫,৯৫৬	১০,৪৮২	৩৯,২৬৪	৪৯,৭৪৬
অক্টোবর	১,৬৭,৭৮৮	১১,১৭৩	৫,৯৮১	১০,১৬৩	৩৩,৫১৯	৪৩,৬৮২
নভেম্বর	১,৬৮,২৪৭	১১,৩৮৯	৬,০১১	১০,৮৬১	৩৪,১৬৭	৪৫,০২৮
ডিসেম্বর	১,৬৯,৬০৩	১২,৯৫৪	৬,০২৭	১০,৭২৮	৩৮,৮৬২	৪৯,৫৯০
জানুয়ারী	১,৬৯,৯৭৮	১২,০২৯	৬,০৩২	১০,৫৩৪	৩৬,০৮৭	৪৬,৬২১
ফেব্রুয়ারী	১,৭০,৩৯৫	১১,৬১৮	৬,০৭৬	৯,৬৭৯	৩৪,৮৫৪	৪৪,৫৩৩
মার্চ	১,৭১,৭৩২	১২,৮১০	৬,০৮৩	১১,০১২	৩৮,৪৩০	৪৯,৪৪১
মোট	১,৭১,৭৩২	১,৫২,৫৩৬	৬,০৮৩	১,২৩,৯৪৩	৪,৫৭,৬০৮	৫,৮১,৫৫১

—[গ্রন্থাগারিকের ১-৫-৬৫ তারিখের বিবৃতি হইতে অনূদিত]

Connemara Public Library
—Librarian's statement ; 1-5-65

গ্রন্থ সমালোচনা

নিঃসঙ্গ হৃদয়। পরিমল মুখোপাধ্যায় মানস প্রকাশনী, ৬৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কবি শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নবাগত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিঃসঙ্গ হৃদয় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ২৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কবিতাগুলোর মধ্যে একটা মধুর বিষাদের অনুভূতি পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। একটা রোমান্টিক কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায় কবিতাগুলো আবৃত্তি করে। আধুনিক কাব্য সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। নিঃসঙ্গ হৃদয়ের কবির উপরেও জীবনানন্দ দাশের প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়েছে। তবে এর মধ্য থেকেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রয়াস প্রশংসা-যোগ্য। কবি আশাবাদী তাঁর বিশ্বাস আছে পরবর্তীকালে কোন উত্তর সূরী হয়ত তাঁর সৃষ্টিকে উপভোগ করবার চেষ্টা করবে। সেই "কোন এক উত্তরসূরীকে" তিনি বলেছেন :—

আগামী সে সন্ধ্যায় একবার তবু তুমি বোলো
পৃথিবীর সব গান সে যুবক ভালবেসেছিলো।

চ. কু. সে.

Nishanga Hriday : A collection of Poems.

Bulletin of Museums Association, West Bengal

Editor Kalyan Kumar Ganguli, M. A. D. Phil. Calcutta Museums Association, West Bengal, 14. Cornwallis Street, Calcutta-6

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মিউজিয়াম পরিষদের মুখপত্র এই "বুলেটিনের" কয়েকটি সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে পশ্চিমবঙ্গের মিউজিয়াম সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কর্মরত কুশলী কর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে নিয়ে কিছুকাল হল পশ্চিম বঙ্গে মিউজিয়াম পরিষদ গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মিউজিয়াম-বিস্তার সংগঠন ও জনসাধারণের মধ্যে মিউজিয়াম আন্দোলনের প্রসারের জন্য এই পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগ, সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইজারী বোর্ড অব মিউজিয়ামস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যেগোযোগ রেখে কাজ করে যাবেন। এই পরিষদের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ও বুলেটিনের সম্পাদক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং বুলেটিনের সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক সন্তোষ কুমার বসু। তাছাড়া পরিষদের সহঃ-সভাপতি রূপে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, অধ্যাপক ষোড়শী কুমার সরস্বতী, অধ্যাপক মীনেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতির নাম দেখা গেল।

মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালার মত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। জনসাধারণের অজ্ঞতা তথা অবহেলার ফলে দেশের কতদিকে যে কত প্রত্নকীর্তি ধ্বংসের পথে চলেছে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মানব সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিংশ শতকে এসে পৌছেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বিভিন্ন যুগের প্রচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ, অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্র, অলংকার এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিষ পত্র পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপে রেনেসাঁসের ফলে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতার প্রতি যে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরবর্তীকালে তার ফলেই মিউজিয়ামগুলি গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত ভারতেও সুদূর অতীত কালের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়ো, হড়প্পায় (বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত) খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ বছরের পুরানো সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া রাজগৃহ নালন্দা, পাটলিপুত্র ও সারনাথে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বাংলা-দেশেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে কয়েকটি জায়গায় যেমন—চন্দ্রকেতুগড়, রক্তমৃত্তিকা বিহার, দুর্গাপুরের কাছে নডিহাতে প্রচীন যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতে ইংরাজ রাজত্বেই দেশের ইতিহাস, প্রত্নবস্তু, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্সের

প্রচেষ্টায় "বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় যাদুঘর গড়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বহু মূল্যবান প্রত্নবস্তু রক্ষিত আছে। তাছাড়া পর্বত গাত্রে, মন্দিরের গায়ে, শিলাফলকে বা তাম্র ফলকে ইতিহাসের অমূল্য উপাদান এবং ভারতের সভ্যতা ও শিল্পকলার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বাঘ, অজন্তা ইলোরা, এলিফ্যান্টা, কাহ্নেরী প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্রাবলী, খাজুরাহো কণারক এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দির গুলিতে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রত্নকীর্তি, প্রত্নবস্তু ও প্রত্নস্থল সংরক্ষণের ভার অবশ্য সরকারের ; কিন্তু জনসাধারণকে যদি এ বিষয়ে সচেতন না করা যায় তবে এ ব্যাপারে সুফল পাওয়া যাবেনা। মিউজিয়াম পরিষদ তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুলেটিনে যে ঘোষণা করেছেন তা থেকে অনুমিত হয় যে এই দিকটিতে তাঁদের যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে। বুলেটিনের কয়টি সংখ্যাই এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের রচনায় সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের রচনা হলেও প্রবন্ধগুলি সাধারণের বোধগম্য (অবশ্য ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত জনসাধারণের নিকটেই একমাত্র বোধগম্য)। এছাড়া মিউজিয়াম সংক্রান্ত খবরাখবর, পরিষদ -সংক্রান্ত সংবাদ, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি বিভাগ এতে আছে।

সংগ্রহশালা কেবলমাত্র প্রত্নবস্তু বা শিল্পকলা নিয়েই হবে তার কোন মানে নেই। বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয়ের সংগ্রহ নিয়েও সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা-গুলির একটি তালিকাও এই বুলেটিনের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বুলেটিন পরিষদ সদস্যগণ বিনামূল্যে পান। সদস্য না হলে প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৲টাকা। পরিষদের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্য ফি ১২৲টাকা এবং ছাত্র সদস্যদের জন্য ৪৲টাকা ধার্য হয়েছে।

নি. মু.

Book Reviews

ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় 'গ্রন্থপরিক্রমা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সমালোচনায় প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয় নি বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন তাই তাঁদের অবগতির জন্যে জানান হচ্ছে পত্রিকাটির সম্পাদক নিজেই এর প্রকাশক এবং ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ থেকে এটি প্রকাশ করা হয়।

গত বৈশাখ সংখ্যায় ভুলক্রমে শিল্পী যামিনী রায়ের আলোক চিত্র শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এঁর নাম শ্রীঅমল সেনগুপ্ত।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আহ্বানে নবদ্বীপে সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৫দিন ব্যাপী ক্যাম্প ট্রেনিং হয়ে গেল। এখানে উনত্রিশজন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এর আগেও বিভিন্ন ক্যাম্প ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের সাথে অনেককে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই এই ক্যাম্প ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও প্রতি বছর পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষণ ব্যবস্থায় ১৮০ জন করে শিক্ষালাভ করছেন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি লাইব্রেরী স্কুল খুলবার চেষ্টা করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর ৮০ জন শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর থেকে "বি লিব এসসি" কোর্সে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এবছর থেকে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েরও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারগুলোও মাঝে মাঝে শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন সুতরাং এর ফলে যথেষ্ট শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন।

উপরি উক্ত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে সার্টিফিকেট থেকে ডিপ্লোমা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। এটা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তবে এই সাথে এটাও চিন্তা করবার বিষয় যে, এই সব শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারবিজ্ঞানরূপ কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষালাভ করে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করবার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাবে কি? যদি সেটা না পায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মিদের বেকার সমস্যার ভয়াবহতার মধ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং একটা হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এই সমস্যার হাত থেকে এদের উদ্ধার করবার একমাত্র উপায় দেশে আরো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা এবং বর্তমান গ্রন্থাগার সমূহকে সম্প্রসারিত করে উন্নতি বিধান করা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে আমরা অনুরোধ করছি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের যথেষ্ট প্রসার দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত পূর্বাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত M. Lib. Sc. কোর্স খোলা সম্ভব হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সম্প্রতি M. Lib. Sc. কোর্স খুলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিন্তু সেটা যে কতদিনে কার্যকরী হবে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। দু তিন বছর ধরে M. Lib. Sc. কোর্স চালু হবার কথা আমরা শুনে আসছি। অবশেষে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। কিন্তু এটা কার্যকরী হতে আরো দু তিন বছর যাতে পার হয়ে না যায় অর্থাৎ যাতে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা যায় তার জন্যে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও M. Lib. Sc. কোর্স খোলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী বছর থেকেই তাঁরা এটা চালু করতে সক্ষম হবেন। সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৪   ১৩৭২, শ্রাবণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

পরিষদের মুখপত্র প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' গত বৈশাখে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী তো বটেই গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চয়ই এতে আনন্দিত হবেন। পঞ্চদশবর্ষে 'গ্রন্থাগার'-এর এযাবৎকালের সাফল্যের পরিমাপ করা এবং একে কি করে পাঠকদের কাছে আরও উপযোগী, আরও আকর্ষণীয় এবং পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম করে তোলা যায় সে কথা বিবেচনা করা নিশ্চয়ই উচিত হবে।

প্রথমেই দেখতে হবে 'গ্রন্থাগার' কি ধরণের পত্রিকা এবং এই পত্রিকা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই পত্রিকা যখন গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্পর্কীয় তখন একে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকা বলে অভিহিত করতে বাধা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকা সাধারণতঃ তিন রকমের হয়ে থাকে: (১) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক—বা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-বিষয়ক; (২) কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞান-বিষয়ক। (৩) বিজ্ঞানের সাধারণ-জ্ঞান বিষয়ক বা পপুলার সায়েন্সের পত্রিকা। গ্রন্থাগার পত্রিকাটি এর কোন শ্রেণীতে পড়ে? এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র বিশুদ্ধ গবেষণা বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আবার পরিষদের-কাজের-বিবরণী-মাত্র-সম্বল বুলেটিন জাতীয় পত্রিকাও এটি নয়। পরিষদের মুখপত্র নানা স্তর পার হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজী বুলেটিন, তারপর নবপর্যায়ে ত্রৈমাসিকরূপে 'গ্রন্থাগার'-এর আত্মপ্রকাশ এবং সর্বশেষে এর মাসিকে পরিণতি নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় নানাভাবে বহুবার ঘোষিত হয়েছে। পত্রিকার সমস্যা সম্পর্কেও অতি সম্প্রতি এক সম্পাদকীয়তে (১৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল। পঞ্চদশ বর্ষে পত্রিকার সাফল্য-অসাফল্যের পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা আমাদের বহু ঘোষিত নীতিগুলিকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারি এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজন বোধে নতুন লক্ষ্য স্থির করতে পারি কিংবা আমাদের পুরানো লক্ষ্যকেই পুনর্বার জোরের সংগে ঘোষণা করতে পারি। পত্রিকা প্রকাশ করতে এবং উপযুক্ত লেখা পেতে যতদিন পর্যন্ত বেগ পেতে হবে ততদিন পর্যন্ত পত্রিকার সম্প্রসারণের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। এক একটা বিভাগ সুরু করে কিছুদিন পরে যদি তা তুলে দিতে হয় তবে সেটা সুরু না করাই ভাল। যে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার অগ্রগতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে তার সম্প্রসারণের কথা খুব সতর্কতার সংগেই বিচার করা উচিত। ধাপে ধাপে অগ্রগতির মধ্যে কোন নাটকীয়তা নেই বলে সেই অগ্রগতি সহসা নজরে পড়ে না। কিন্তু 'গ্রন্থাগার' যে নিশ্চিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে তার লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাতৃভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে সহায়তা করছে, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের অগ্রগতির বার্তা পৌছে দিচ্ছে সেই সব গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে যাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অধীত বিদ্যার চর্চা না থাকলে সে বিদ্যা লোপ পেতে বাধ্য। গ্রন্থাগারিক যত সুশিক্ষিতই হোন না কেন, অপরের অভিজ্ঞতার কথা এবং বিদ্যা-প্রয়োগ-কৌশলগত সমস্যাগুলি যদি পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে না জানতে পারেন, তাঁর বিদ্যা যদি পরীক্ষা পাশ করার পর সেখানেই থেমে থাকে এবং তার নিজস্ব বৃত্তির উন্নয়নের জন্য যে পরিষদ রয়েছে তার সংগে যদি তাঁর কোনই যোগ না থাকে তাহলে এর চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিদ্যাচর্চা এবং যোগাযোগ অব্যাহত থাকে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না।

অবশ্য বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত কেউ কেউ মনে করেন টেকনিক্যাল এবং গবেষণা-গ্রন্থাগারে যাঁরা রয়েছেন "গ্রন্থাগার" পত্রিকা থেকে তাঁদের কিছু শিক্ষণীয় তো নেইই, বরং এটা পড়ে তাঁদের সময়ের অপব্যয় হয়ে থাকে। নিজেদের প্রয়োজনে এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবর রাখবার জন্য তাঁদের সবসময়েই ইংরেজী ভাষায় হালের প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই এবং পত্র-পত্রিকা পড়তেই হয়। সেই সকল বিষয় আর একবার "গ্রন্থাগার"-এর পৃষ্ঠায় অস্পষ্ট অনুবাদের মাধ্যমে পড়ে তাঁদের বিশেষ লাভ হয় না। তাহলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা কাদের জন্য ? কলকাতার পাড়ার পাড়ায় গড়ে ওঠা 'পাবলিক' লাইব্রেরী এবং জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্যই কি ?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন আধুনিক গবেষণা-গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে উল্লিখিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মহানগরী ও শহরের পাড়া লাই-ব্রেরীর অনেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য এবং নিয়মিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি পেয়ে থাকেন।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, যে সব ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত সদস্য নিয়মিত "গ্রন্থাগার" পান তাঁরা তা পড়েও থাকেন তবে গ্রন্থাগারের পাঠকগোষ্ঠী নিতান্ত মন্দ নয় (এঁদের সংখ্যা ১৫০০ এর বেশিই হবে)। "গ্রন্থাগার"-এর এই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠীর পাঠরুচি এবং প্রয়োজন কখনো একই ছাঁচে ঢালা হতে পারে না। অবশ্য কোনরূপ সমীক্ষা না করে এই পাঠরুচি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে মন্তব্য করাও ঠিক হবে না। কিন্তু একটা জায়গায় এঁদের সকলের মধ্যে হয়তো একটা মিল আছে সেখানে বোধ হয় হরিপদ কেরাণীর সংগে আকবর বাদশাহের কোন প্রভেদ নেই—ক্ষুদ্র বৃহৎ, বিশেষ গ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগার যাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে তাঁদের কর্ম ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এবং 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন' এদের যোগসূত্র রক্ষা করেছে। বর্তমানে সেই যোগসূত্র যদি ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেটা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

বিগত চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের কিছুটা সম্প্রসারণ হয়েছে। পরিবর্তিত পটভূমিতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষিতের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঔৎসুক্য ও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিতদের সংখ্যা লক্ষণীয়রূপে বেড়েছে সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠক চরিত্রেও কিছু পরিবর্তন যে হয়েছে সেকথা মনে করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিত পরিষদ সদস্যরা কি মনোযোগ সহকারে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি পড়ে থাকেন? গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকগণের কাছে কি পত্রিকাটি অপরিহার্য বলে মনে হয়? এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এঁরা যদি 'গ্রন্থাগার'-এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন তাহলে হয়তো অনেক সময়ে শুধুমাত্র লেখার অভাবে পত্রিকার প্রকাশ বিলম্বিত হত না। সম্পাদকের দপ্তরে জমে ওঠা লেখার সংখ্যা বেশী হলে প্রয়োজন হয় নির্বাচনের, লেখা কম হলে যা পাওয়া যায় নির্বিচারে তাই-ই ছাপতে হয়। দীর্ঘকাল নিষ্ঠা সহকারে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন এমন লেখকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে নতুন লেখকের অনেকেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্র; গ্রন্থাগারবিজ্ঞান পড়তে এসে এই দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সাময়িক উৎসাহের বশে দু'একটি লেখা তাঁরা লিখেছেন। কিছু লেখা অপেক্ষাকৃত ভাল বলে কিংবা কিছু হয়তো লেখককে উৎসাহ দেবার জন্যে ছাপা হয়েছে। অধিকাংশ লেখা এই জাতের হলে পত্রিকার মান আর উঁচু থাকে না। নতুন লেখকদেরও নিজেদের সম্পর্কে কোন ধারণা হয় না। প্রচুর যত্ন, শ্রম, অধ্যবসায় ও নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া লেখক সাফল্যলাভ করতে পারেন না। নতুন লেখককে নিজের লেখার মান উন্নত করার জন্য অনেক নেপথ্য সাধনাই করতে হয়। তা সে লেখা সাহিত্যের বিষয়েই হোক আর জ্ঞানবিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল বিষয়েই হোক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেখা হলেই সেটা সব সময়ে নীরস এবং দুর্বোধ্য হবে এমন কোন কথা নেই। জ্ঞানের গভীরতা এবং চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা না থাকলেই বরং অনেক সময়ে লেখা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয় না। কিন্তু সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস-গল্প-কবিতা ও রম্য-রচনার সঙ্গে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের লেখার

কায়দা-কানুনে কিছুটা পার্থক্য আছে একথা বলাই বাহুল্য। যথার্থ পরিভাষার অভাবে অনেক সময় টেকনিক্যাল বিষয় সাধারণের উপযোগী করে লেখা কঠিন হয়ে ওঠে।

পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার দায়িত্ব সম্পাদকের। কিন্তু নিয়মিত লেখার জোগান না থাকলে স্বভাবতঃই পত্রিকার প্রকাশ তারিখ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। পত্রিকার মান বজায় রাখতে হলে লেখা যথেষ্ট আগে থেকে সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌছা দরকার। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা প্রেসে গেলে সেগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন এবং সম্পাদনার অসুবিধা ঘটে থাকে। তাছাড়া কোন বির্তকমূলক প্রবন্ধ হলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ রেফারীদের (referee) দ্বারা অনুমোদন করিয়ে প্রকাশ করতে হলে ঐ সময়ের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঘন ঘন সম্পাদক পরিবর্তনেও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। 'গ্রন্থাগার'এর সম্পাদকের পত্রিকার কাজটা বুঝে নিতে এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বেশ কিছুটা সময় চলে যায়। তারপর প্রেসের অসুবিধাও আছে। প্রেসের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; খুব আগে থাকতে ছাপতে না দিলে সময়মতো প্রেস থেকে পত্রিকা বার হয়ে আসে না। পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ সম্পাদনার ও বিভাগীয় কাজ করবার জন্য যেমন অন্যান্য পত্রিকায় সহযোগী থাকে—এখানেও যদি দায়িত্ব নিয়ে একটা টিম কাজ করে যায় তবে সম্পাদকের ভার অনেকটা লাঘব হয়।

যাঁরা গ্রন্থাগার-মনা বলে পরিষদের সদস্য হয়েছেন এবং পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটিকে ভালবাসেন, গ্রন্থাগারবৃত্তিকে যারা বৃত্তি হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন তাঁদের অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকও যদি নিষ্ঠা সহকারে তাঁদের আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্যে কাজ করে না যান তবে আমাদের আশা নিরাশায় পরিণত হবে।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ৪০ বছর আগে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়েছিল সেই পরিষদ তার লক্ষ্যে পৌছাবার আশা নিয়ে আজও অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে বহু পরিবর্তন এসেছে—পরিষদের কাজে বহু কর্মী এসেছেন, তাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মশক্তি দিয়ে পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বা আজও যাচ্ছেন। গোড়ার দিকে যাঁরা পরিষদের কাজে এসেছিলেন তাঁদের অনেকে এখন লোকান্তরিত; কেউ বা বৃদ্ধবয়স বা অসুস্থতার জন্য এখন পরিষদের কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে অক্ষম। পুরানো কর্মীদের অনেকে কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলে গেছেন—কারো বা পরিষদের কর্মধারার সংগে যোগাযোগ আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পরিষদের ঐতিহ্য গৌরব-ময়; আর নতুন নতুন কর্মী এসে এই প্রতিষ্ঠানকে বরাবর জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল করে রেখেছে। সেই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। একটি নিরলস কর্মধারা ও নিরবচ্ছিন্ন সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার'-এর জয়যাত্রা হবে। আগামী এক-একটি বছরে যেন তার এক এক পদ অগ্রগতি হয়।

পুস্তক বর্ণনা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

পুর্বের পরিচ্ছেদে বলা হ'য়েছে বইয়ের গঠনের বর্ণনা। বইখানির ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং বইখানিকে সনাক্ত করার কথা। এখন বইখানির বর্ণনা দেওয়া দরকার।

একখানি বইয়ের বর্ণনা নির্ভর করছে বর্ণনার উদ্দেশ্যের উপর। বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। এ ধরণের বর্ণনা সাধারণতঃ পুস্তক তালিকায় দেওয়া হয়। তবে বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া হক আর বিস্তারিত ভাবেই দেওয়া হক বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বইখানির বর্ণনা থেকে যাতে বইখানিকে চিন্‌তে পারা যায়। বইখানি সনাক্ত করা না হোলে বুঝতে হবে বইখানির বর্ণনা ঠিক মত দেওয়া হয় নি।

লেখকের নাম ও বইয়ের নাম বর্ণনার মধ্যে থাকলে অনেক সময়ে কাজ চলে। কিন্তু অনেক পাঠক বইখানির অবয়ব, ছাপার তারিখ, সংস্করণ, কোথায় ছাপা হয়েছে, কে ছেপেছে এ সব বিষয় জানতে চাইতে পারে কারণ এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

আধুনিক বইয়ের তালিকায়, বই যদি খুব বড় আর খুব ছোট না হয় তা হ'লে, বইয়ের মাপ দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

তবে একখানি বইয়ের বর্ণনা ব্যক্তিগত খেয়াল খুসী মত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, বর্ণনা সংক্ষেপেই দেওয়া হক বা বিস্তারিত ভাবেই দেওয়া হক তার একটা মান থাকা দরকার :—

সংক্ষেপে মানের বর্ণনা :—

১। শীর্ষক — লেখকের নাম এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে নাম দেখে লেখককে চিনতে পারা যায়।

২। নাম-পত্র—নাম-পত্রে পুস্তকের নাম যেমন দেওয়া আছে পুস্তকের নাম সেইভাবে দিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে সংক্ষেপ করা চলে তবে সংক্ষেপিত অংশে (...) তিনটি বিন্দু ব্যবহার করতে হবে; সংস্করণ, সম্পাদকের নাম, অনুবাদকের বা চিত্রকরের নাম থাকলে লিখতে হবে এবং নাম-পত্রে না থাকলে বাক্স বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া প্রয়োজন।

পুস্তকের বর্ণনা :—পৃষ্ঠা, ফর্মা, স্বাক্ষর, ছবি ও পট (plate)।

মুদ্রন :—প্রকাশকের নাম, প্রকাশের স্থান ও প্রকাশের তারিখ।

পুরাণ বইয়ে :—

(১) মুদ্রাকরের নাম এবং মুদ্রণের স্থান ;

(২) পুস্তকের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকলে তা উল্লেখ করা.

এবং (৩) কোন গ্রন্থাগারের তালিকায় : বাঁধাই, পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে টিকা, আগে পুস্তকের কে মালিক ছিল এবং বইয়ের ভিতরে যদি কোন দোষ থাকে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন :—

TASSO (Torquato) Aminta, favola boscareccia...Ristampata... da Nicolo Ciangulo, Maestro Italiano in questa celebre Universita d' Utrecht.

Per Pietro Muntendum Stampador Italiano. Utrecht. 1725.

12°. *, A – L⁴(pp. 96), + pl [Front] + I – VII

Dedicated to Sir Francis Head, Bart. Wants $C_{2,3}$.

Mottled Calf, Contemporary. Bookplate of Thomas Philip, Earl de Grey

[Library press-mark]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে :—

(ক) পুস্তকের পরিচয় (Identity) ও সংস্করণ

(খ) সম্পাদকের নাম এবং তার গুণাগুণ

(গ) তারিখ

(ঘ) পত্রগুচ্ছ, গোড়ায় * একখানি পাতা এবং স্বাক্ষর যুক্ত A—L পত্রগুচ্ছ।

(ঙ) কাগজের ভাঁজ

(চ) কতগুলি ছাপা পৃষ্ঠা আছে

(ছ) কতগুলি ছবি আছে এবং ছবির সংখ্যা কি ভাবে দেওয়া আছে

(জ) বইখানি হল্যাণ্ডে ছাপা হলেও উৎসর্গ করা হয়েছে একজন ইংরেজ Baronetকে।

যে বইখানির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সে বইখানির যদি কোন দোষ না থাকে তা হলে উপরের বর্ণনার পর আর যে সব বর্ণনা দিতে হবে তা যে-কপির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেই কপির মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, বইয়ের বাঁধাই, বইয়ের আগেকার এবং উপস্থিত মালিকদের নাম, এই সব বিষয় সম্বন্ধে টিকা দিতে হবে। বর্ণনার মধ্যে যত বেশী জটিলতা আসবে তত বেশী প্রয়োজন বর্ণনাকে দুটি ভাগে ভাগ করা। প্রথম ভাগে থাকবে প্রত্যেক সম্পূর্ণ কপির বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ভাগে থাকবে যে কপিটি হাতে রয়েছে অর্থাৎ একখানি কপির বর্ণনা।

সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা :—

এ ভাবে একখানি বই বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বইখানিকে পাঠকের কাছে উপস্থিত না করে এমন ভাবে বইখানির বর্ণনা দিতে হবে যাতে বইখানি পাঠকের হাতে তুলে দিলে যা কাজ হতো, পাঠক বইখানির বর্ণনা পড়ে সেই একই কাজ করতে পারে।

এ ভাবে বর্ণনা দিতে গেলে প্রয়োজন :—

১। নাম-পত্র যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে লিখতে হবে এমন কি নাম-পত্রে যদি কোন অলঙ্কার বা বর্ডার থাকে তাও উল্লেখ করতে হবে।

২। মুদ্রাকরের পরিচয় বা Colophon-এর বর্ণনা দিতে হবে।

৩। বইয়ের আকারের বর্ণনা দিতে হবে।

৪। পাতার সংখ্যা সমেত স্বাক্ষরের বর্ণনা দিতে হবে।

এই কয়টি বিষয়ের বর্ণনার সহিত Catchword, পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের সূচি, পাঠের পূর্বে কি কি বিষয় আছে, কোন পাতা থেকে পাঠ্য এবং পাঠ্যের পূর্বের বিষয়গুলি সুরু হচ্ছে, পুস্তকের ভিতরের অলঙ্কার এবং ছবি এ সবের বর্ণনা দিতে হবে। বিরল বইয়ের বর্ণনায় বইখানি কোথায় আছে তা উল্লেখ করা দরকার।

নাম-পত্র। নাম পত্রের বর্ণনা দেবার সময় বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য সব সময় মনে রাখতে হবে। প্রয়োজনের বেশী কিছু উল্লেখ করা কোন কাজের হবে না কারণ তাতে জটিলতা বেড়ে যাবে এবং এ-কথা মনে রাখা দরকার যে নাম পত্রের প্রতিলিপি যে ভাবেই করা হ'ক না কেন সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করা কিছুতেই সম্ভব নয়, উপরন্তু কোন পাঠকের কতটুকু বর্ণনার প্রয়োজন তা ধারণা করা সম্ভব নয়। এমন কি নাম-পত্রের ফটোগ্রাফও পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ প্রতিলিপি না হতে পারে কারণ তাতে জলছাপ, ছাঁচের তারের দাগ ইত্যাদি থাকে না।

Mc Kerrow'র An introduction to bibliography থেকে একটি নাম পত্রের বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো। বইখানি হলো Agrippa'র লেখা De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium-এর James Sandford-এর ১৫৬৯ সালের অনুবাদ [Within a rule, within a border of type ornaments] ¶ Henrie Cornelieus A- | *grippa, of the Vanitie and* | Vucertaintie of Artes and | Sciences, Englished by | Ia, San. Gent | *Eccle-Sias stas.1.* | All is but moste vaine vanitie : and | all is most vaine, and but plaine | Vanitie | ¶ Seene and allowed according to | the order appointed. | ¶ Imprinted at London, by | Henry Wykes divelling in Fleete streat | at the Signe of the blacke | Elephant | ANNO. 1569 |

উপরে নাম-পত্রের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সে বর্ণনার মধ্যে লক্ষ্য করবার কয়েকটি বিষয় :—

(ক) নাম-পত্রের নানা আকারের হরফ ব্যবহার করা হ'তে পারে। কিন্তু নাম-পত্র হুবহু নকল করবার সময় হরফের আকার বজায় রাখবার প্রয়োজন নেই কারণ তা করতে গেলে নাম-পত্রের আকারও বজায় রাখতে হয়। কোন লাইনে একই আকারের বড় অক্ষর থাকলে তা বড় অক্ষরেই লিখতে হবে। কোন লাইনে Capitals ও Small capitals ব্যবহার করা হয়ে থাকলে নকল করবার সময় দুরকমেরই বড় অক্ষর ব্যবহার করতে হবে। নাম-পত্রের প্রত্যেক লাইনটিকে সম্পূর্ণ একটি আলাদা লাইন ধরে নিতে হবে।

(খ) কোন লাইন মোটা ও কালো অক্ষরে ছাপা থাকলে সেই লাইনে মোটা ও কালো অক্ষরেই লিখতে হবে। কালো অক্ষরে লেখা সম্ভব না হলে লাইনটির নিচে কয়েকটি বিন্দু দিয়ে একটি রেখা দিতে হবে।

(খ) | দাঁড়ি প্রত্যেক লাইনের শেষের চিহ্ন অর্থাৎ একটি লাইন শেষ হলে একটি / চিহ্ন দিতে হবে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকের অনেক বইয়ের নামপত্রে ছাপা লাইনের সহিত একটি বা একটির অধিক রুল আড়া-আড়ি ভাবে দেওয়া থাকে। নাম-পত্রের প্রতিলিপিতে সেই লাইনগুলিও দেখান দরকার। লাইনগুলিকে নানাভাবে দেখান যেতে পারে | — | তুইটি বিভাগ চিহ্নের মাঝে একটি আড়াআড়িভাবে রুল দেওয়া যেতে পারে। ||| কিংবা তুইটি লম্বের মাঝে আর একটি লম্ব দেওয়া যেতে পারে, না হয় তুইটি লম্বের মাঝে একটির অধিক রুল থাকলে একটির অধিক রুল দেওয়া যেতে পারে। না হয় লেখা যেতে পারে, একটি দাঁড়ি, তুটি দাঁড়ি বা তিনটি দাঁড়ি ইত্যাদি। আর এক কাজ করা যেতে পারে! বিভাগ চিহ্নগুলি / হেলান ব্যবহার করা যেতে পারে এবং রুলগুলি | লম্ব হিসাবে ব্যবহার করে উপরে রুল গুলির সংখ্যক দেওয়া যেতে পারে যেমন / | /, /২/, /৪/ ইত্যাদি। তবে খুব বেশী পুরান বইয়ে এভাবে চিহ্ন ব্যবহার করার মুস্কিল আছে কারণ তখন বিরাম চিহ্ন ছিলনা এবং বিরাম চিহ্নের পরিবর্তে / দাঁড়ি ব্যবহার করা হতো।

কি পন্থায় রুলগুলির বর্ণনা দিতে হ'বে তা যিনি বর্ণনা দিচ্ছেন তিনিই বর্ণনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা ঠিক করে নিলে ভালো হয় কারণ বর্ণনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে।

(গ) অলঙ্কার, মুদ্রাকরের নিদর্শন চিহ্ন ইত্যাদি থাকলে তা বর্ণনায় উল্লেখ করতে হ'বে। বর্ণনার সহিত মাপ থাকলে ভালো হয়।

(ঘ) অন্যান্য চিহ্ন যেমন অনুচ্ছেদ চিহ্ন, তারকা চিহ্ন ইত্যাদি নামপত্রে থাকলে তা বর্ণনায় উল্লেখ করতে হবে। অনুচ্ছেদের চিহ্নের জন্য ¶ চিহ্ন এবং তারকা চিহ্নের জন্য * চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় ᗡ একটি উল্টা D অনুচ্ছেদের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এরূপ ক্ষেত্রে ¶ চিহ্ন ব্যবহার করা ভালো।

(ঙ) কোন কথা সংক্ষিপ্তভাবে থাকলে তা সংক্ষেপেই লিখতে হবে না হয় Italics-এ পুরাপুরি বানান করে লিখতে হবে।

মুদ্রণের বিবরণ—Colophone নামের পাতার বর্ণনার পর Colophone-এর বর্ণনা দিতে হ'বে। Colophone-এর বর্ণনা যেমন আছে ঠিক তেমনি, লাইনগুলিকে | চিহ্নের দ্বারা বিভক্ত করে বর্ণনা করতে হবে।

পুস্তকের আকার—(Format) পুস্তকের আকার কাগজের ভাঁজ অনুযায়ী সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে বর্ণনা দিতে হবে। যেমন: Fol, 4° বা 4^TO, 8° বা 8^VO ইত্যাদি। ভাঁজ না করা কাগজের চিহ্ন b.s বা 1°।

স্বাক্ষর (Collation) স্বাক্ষর সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ ভাবে বলেছি। একখানি বইয়ের কতগুলি পাতা আছে তা স্বাক্ষরের দ্বারা বর্ণনা করার পর, বইয়ের পৃষ্ঠাসমষ্টিও উল্লেখ করতে হ'বে। গোড়াকার ও শেষের পাতা আলাদা করে চিহ্নিত করা থাকলে তা সেই ভাবেই + চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে হ'বে এবং রোমীয় ও আরবীয় সংখ্যা ব্যবহার করা হ'য়ে থাকলে রোমীয় ও আরবীয় সংখ্যা ব্যবহার করতে হ'বে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা না থাকলে সংখ্যা গুনে নিয়ে [ ] মধ্যে দিতে হ'বে।

ছবিঃ—ছবিগুলি যদি বইয়ের পত্রগুচ্ছের পৃষ্ঠাতে ছাপা হ'য়ে থাকে তা হ'লে কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় ছবি আছে তা উল্লেখ করা দরকার। ছবিগুলি যদি আলাদা কাগজে ছেপে বইয়ের সহিত সংযুক্ত করা থাকে তা হ'লে কোন্ পৃষ্ঠার পর ছবি আছে তা উল্লেখ করতে হ'বে। প্রয়োজন বোধে নতুন অনুচ্ছেদে ছবির বর্ণনা দিতে হ'বে।

একখানি পৃষ্ঠায় ক'টি লাইন আছে এবং পৃষ্ঠা শীর্ষক ও catch word থাকলে তা উল্লেখ করে লিখতে হ'বে। পৃষ্ঠায় লাইনগুলি দুটি স্তম্ভে সাজান থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে এবং একখানি পাতায় বিন্যাসিত হরফের লম্বা ও চওড়া মাপ দিতে হ'বে।

পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। বইয়ের এক একটি অংশে কি কি বিষয় আছে তা উল্লেখ করতে গেলে কোন্ পৃষ্ঠা থেকে কি বিষয় সুরু হ'চ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের অন্তর্গত কোন একখানি পাতা বইয়ের অন্তর্গত কোন পাতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে তা বইয়ের অংশ বলে ধরে নিতে হবে। কেবল দপ্তুরির দ্বারা সংযুক্ত-করা খালি পাতাকে বইয়ের অন্তর্গত বলে ধরা চলবে না। সুতরাং সে পাতাগুলিকে বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

পৃষ্ঠার উল্লেখ করবার জন্য স্বাক্ষরই ব্যবহার করতে হ'বে তবে সংখ্যা অক্ষরের উপরে না দিয়ে নিচে দিতে হবে এবং কোন পাতা কোন পৃষ্ঠা থেকে সুরু হ'চ্ছে তা নির্দেশ করবার জন্যে a (recto), b (verso) ব্যবহার করতে হ'বে। যেমন A_2b।

মনে রাখতে হ'বে A^2 মানে দুই পাতার বা চার পাতার পত্রগুচ্ছ আর A_2 মানে A পত্র-গুচ্ছের দ্বিতীয় পাতা এবং A_2b হ'চ্ছে A পত্রগুচ্ছের দ্বিতীয় পাতার ডান দিকের পৃষ্ঠা (verso).

১৬৩৫ সালের পূর্বের বইয়েয় বর্ণনা দেবার সময় I, j, ও w, v লেখবার সময় গোলমাল বাঁধতে পারে। I, j দুটি একই হরফ তবে i এর পরে i থাকলে j ব্যবহার হ'তো কিন্তু আমরা নিয়মিত ভাবে j-র পরিবর্তে i ব্যবহার করব যেমন xij লেখা হ'বে xii।

U ও v'র ক্ষেত্রে মনে রাখতে হ'বে কোন্ কথার গোড়ায় v ব্যবহার হ'তো এবং কথার শেষে বা মাঝে u ব্যবহার হ'তো। ল্যাটিন ভাষায় W না থাকায় ইংরাজীতেVVvv ব্যবহার করা হ'তো।

Ij, vu, W লেখবার সময় দেখা দরকার মুদ্রাকর কিভাবে এ অক্ষরগুলি ব্যবহার করতো এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী এই অক্ষরগুলিকে লিখতে হ'বে।

১৬শ শতাব্দীর অনেক বইতে I-এর পরিবর্তে F অক্ষরটি ব্যবহার করা হ'তো। এখনকার ছাপার হরফে Fটি নেই সুতরাং Fএর পরিবর্তে I ব্যবহার করাই ভাল। কিন্তু বড় অক্ষরে I এর পরিবর্তে এ সময়ে J ব্যবহার করা হতো—এটি I-এর Gothic রূপ। সুতরাং I এর পরিবর্তে J'ও ব্যবহার করতে পারা যায় তবে Jmprint এর স্থলে Imprint লিখলেই ভালো হ'বে বলে মনে হয়।

পুস্তকের বর্ণনা দেবার সময় "পাতা" (leaf) ও "পৃষ্ঠা" (page) এ দুটি কথার ব্যবহারে যেন ভুল করা না হয়।

পুস্তকের বর্ণনার সহিত পুস্তকের বিষয় বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয় না—তবে বইয়ের বিষয় বস্তুর মধ্যে এমন কোন উল্লেখ যোগ্য বিষয় যদি থাকে যার জন্যে বইখানির প্রয়োজন বৃদ্ধি পেতে পারে তা হ'লে তা পুস্তক বর্ণনায় উল্লেখ করা দরকার। মনে রাখতে হ'বে যিনি বইখানির বর্ণনা দিচ্ছেন তার নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য নেই।

Description of a book,
By – **Rajkumar Mukhopadhyay.**

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনুসন্ধান

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই। চর্মচক্ষুর দ্বারা মানুষ তাহার আশপাশের বস্তুনিচয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু পার্থিব প্রয়োজনের তাগিদ ও তাহার চর্মচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বস্তুসমূহের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের আত্যন্তিক আকুলতায় শুধু সম্মুখের বস্তু দেখিয়া ও তাহার আকৃতিপ্রকৃতি জানিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে না। দূরের জিনিসকে জানিবার ও দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে। তখনই তাহার মন ছুটিয়া চলে পরোক্ষ জ্ঞান আহরণের সন্ধানে। এই পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ করে মানুষ পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে। পুঁথিপুস্তকের গর্ভে লিপিবদ্ধ থাকে মানবসমাজের যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানসম্ভার, তত্ত্ব, তথ্য ও নব নব চিন্তাবলী। তাই বিদ্যার্জন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ বিদ্যারূপ চক্ষু দ্বারাই এক স্থানে বসিয়া সে জগতের সকল জিনিস দেখিতে পায়।

পুঁথিপুস্তক মানুষের জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্তকের জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অক্ষর জ্ঞানের। অক্ষর জ্ঞান দানের তাগিদেই সৃষ্টি হইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং ততোধিক উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ; পুঁথিপুস্তক লইয়াই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কারবার। এইগুলিতে পুঁথিপুস্তকের যত বেশী সদ্ব্যবহার হয় ততই

আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া চলে এবং জাগতিক দিক দিয়াও আমরা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাধিকারের প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায় বর্তমানে এই প্রদেশে ২৪৮২টী ছোট উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩০৬টী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১২৯৬টী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে অতীতে বিদ্যালয়গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা-বিবেচনা চলিয়াছিল। কিন্তু কার্যের অগ্রগতির দিক দিয়া সামান্য উন্নতিই পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত তিনচার বৎসর যাবৎ এদিকে যাহাতে আরও অধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

বিদ্যালয়গ্রন্থাগারের সহিত পরিষদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নাই। কারণ বিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান। কাজেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা ব্যতীত ইহার গ্রন্থাগার-গুলির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ, ইহার উন্নতির পথে নানাবিধ অন্তরায় দূরীকরণ, বিজ্ঞানসম্মত নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন-প্রভৃতি সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গ্রন্থাগারসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য পরিষদ প্রথমতঃ প্রশ্নাবলী রচনা করিয়া প্রায় আড়াই হাজার বিদ্যালয়ে পাঠান এবং শিক্ষকদিগকে এই প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাত্র ৫টী বিদ্যালয় এই আহ্বানে সাড়া দেয়।

এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় পরিষদকে নূতন পন্থায় অগ্রসর হইতে হয়। কি কার্য-করী পন্থা অবলম্বন করিলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার কাজ সুসাধ্য হয় তৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি। তাঁহারা আমাদিগকে প্রশ্নাবলীর পুনর্মুদ্রণের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে সেই মুদ্রিত প্রশ্নাবলী তাঁহারা তাঁহাদের কার্যালয়-সংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে যথাবিহিত নির্দেশ দিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সহযোগিতার এই আগ্রহে আমরা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হই এবং তাঁহাদের হিসাবমত ২২০০ মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমাদের মুদ্রিত প্রশ্নাবলী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

আমরা আশা করিয়াছিলাম আমাদের পূর্ব প্রচেষ্টা হইতে এই প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু তাহা না হইলেও পূর্বাপেক্ষা অধিক সাড়া পাওয়া গিয়াছে—যদিও এই সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যানুপাতে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমরা এই যাত্রায় ৯৩টী বিদ্যালয়ের নিকট হইতে আমাদের মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর উত্তর পাইয়াছি– কলিকাতা ৫, চব্বিশ পরগণা ১৯, মেদিনীপুর ২৬, বাঁকুড়া ৩, বর্দ্ধমান ১১, বীরভূম ৪, হাওড়া ৯, হুগলী ৭, নদীয়া ৭, মুর্শিদাবাদ ২, মালদহ ২, ত্রিপুরা ১। উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রদত্ত উত্তর হইতে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গ্রন্থাগারের একটি আংশিক চিত্রই মাত্র দেওয়া যাইতে পারে। মোট ৩৪টি প্রশ্নের উত্তর লইয়া আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আরও অধিক বিদ্যালয়ের তথ্য পাওয়া গেলে সেই সম্পর্কে ভবিষ্যতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে বটে কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে

বর্তমানে প্রাপ্ত উত্তরাবলী হইতে আমরা তিনটি প্রধান বিষয় বাছিয়া লইয়াছি। তাহার মধ্যেই আমাদের বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিলাম।

এক-একটি বিদ্যালয়ের এক-এক রকম অবস্থা। যথা—কোনও বিদ্যালয়ে করণিক গ্রন্থাগারের কাজ চালান, কোথায়ও বা একজন শিক্ষক ইহার ভার নেন, কোথায়ও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, কোথায়ও বা দেওয়া হয় না, শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক তো দূরের কথা। কোথায়ও বই কিনিবার জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয় কোথায়ও বা বরাদ্দের টাকা অতি নগণ্য, কোথায়ও বা ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে গ্রন্থাগারের জন্য চাঁদা নেওয়া হয়, কোথায়ও বা নেওয়া হয় না। কিন্তু ছাত্রদের পাঠরুচি সম্পর্কে প্রায় সব বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা মিল রহিয়াছে। কোন্ বিষয়ের বইয়ের চাহিদা বেশী এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সাধারণ উপন্যাস, গল্প, ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার দিকেই ছাত্রদের ঝোঁক বেশী। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কারণ সর্বদেশেই সাধারণ মানুষের নিকট লঘুসাহিত্যের আদরই বেশী।

ইহা কোন দেশের পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। অবসরবিনোদনের জন্য কখনও কখনও লঘু সাহিত্য পাঠ সমর্থন করা যাইতে পারে এবং প্রয়োজনও হয় বটে কিন্তু ইহার প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি থাকা ব্যক্তি ও দেশ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। লঘু সাহিত্য পাঠ পাঠকদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়; আর ইহা হইতে দেশের কল্যাণ-জনক কোন কিছু আশা করা বৃথা। কাজেই লঘুসাহিত্যের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তির প্রশ্রয় ও উৎসাহ না দিয়া ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের দিক হইতে ইহার গতিরোধ করাই সর্বোত্তম পন্থা। মন্দের ছোঁয়াচ যেমন মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া নেয় তেমনই ভালোর ছোঁয়াচও মানুষের জীবনকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তোলে। ছাত্রদের জীবনে ভালর ছোঁয়াচ লাগানই আমাদের কাজ। তাহাদের স্বাভাবিক পাঠরুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রয়োজনানুরোধে রুচি বদলাইবার পরামর্শ দেওয়াই গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকের কর্তব্য। হয়ত বিদ্যালয়গুলির বর্তমান গ্রন্থাগারব্যবস্থায় আজই ইহার কোন সুফল পাইবার আশা করা যায় না। কিন্তু চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে একেবারে ফল পাওয়া যাইবে না এমন নয়। এইজন্য অসীম ধৈর্য, কায়িক শ্রম, চিন্তার প্রয়োজন। ব্যক্তি বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের পক্ষে হয়ত এক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যাইবে না।

ইহা স্বীকার্য যে, নানাবিষয়ক জ্ঞানদানের উপযোগী কিশোরসাহিত্য এখনও আমাদের দেশে সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পূর্ব হইতে যে অধিক কিশোরসাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচুর্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া যাহা আছে তাহারই যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথম প্রয়োজন ছাত্রদিগকে পাঠ্যবিষয়ের সহায়কপুস্তক পাঠে উৎসাহ দেওয়া। একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের পুস্তক আছে। কিন্তু সব পুস্তকই সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। কোন কোন পুস্তকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত অধিকতর মনোজ্ঞ আলোচনার সন্ধান দিয়া ছাত্রকে তাহা পড়ায় উৎসাহিত করা। এছাড়া পাঠ্যাতিরিক্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠের দিকে ছাত্রের মনকে আকৃষ্ট করার কথাও ভাবিতে হইবে। এইভাবে ক্রমশঃ পাঠরুচি বদলাইবার চেষ্টা করিলে আশা করা

যায় যে সুফল ফলিবে। আসল কথা এই যে, বইকে ভয় না করিয়া যেদিন ছাত্রেরা বইকে ভালবাসিতে পারিবে সেদিনই তাহাদের শিক্ষা সার্থক হইয়াছে এই কথা বলা যাইবে। বই পড়ার আনন্দের স্বাদ তাহাদিগকে দিতে হইবে।

পৃথক গ্রন্থাগারগৃহ বা ছাত্রছাত্রীদের বসিয়া পড়িবার ঘর আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই গ্রন্থাগারগৃহ ও পড়িবার ঘরের অভাব আছে বলিয়া জানাইয়াছে। যদি এই অবস্থা হয় তাহা হইলে ছাত্রেরা পুস্তক পাঠের সুযোগ পাইবে কোথা হইতে? যাহাদের পাঠস্পৃহা থাকে তাহাদেরও পাঠস্পৃহা মন্দীভূত ও লুপ্ত হইয়া যায়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন পাঠাভ্যাসে রত থাকে। অবসর সময়ে যদি অন্যবিধ পুস্তক পাঠের সুযোগ না পায় তবে তাহার সেই পড়ার ইচ্ছার ইন্ধন যোগাইবে কিরূপে? বিদ্যালয়ের আর্থিক দৈন্যের দরুনই হয়ত একাজ করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু এজন্য হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে কোন ফলোদয়ই হইবে না। দৈন্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

ছুটির মধ্যে ছাত্রদিগকে বই বাড়ীতে নিতে দেওয়া হয় কিনা ইহার উত্তরে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই জানাইয়াছে 'না'। ছুটির সময়েই ছাত্রেরা পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ পায়। কি কারণে বিদ্যালয়গুলি তাহাদিগকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা বুঝা গেল না। হয়ত পুস্তকের সংখ্যা কম বা ছুটিতে বই দিলে বই খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্যই বিদ্যালয়গুলি এই ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রের পাঠস্পৃহা বাড়িতে তো পারেই না পরন্তু দমিতই হইয়া থাকে। যদি বইয়ের সংখ্যা কম হয় তবে কম ছাত্রকেই সেই বই ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ; আর যদি বই খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহার ঝুঁকি লইয়াই তাহাদিগকে বই বাড়ীতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃপণের ধনের মত গ্রন্থাগারে বই মজুত করিয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে যদি তাহা ছাত্রদের ব্যবহারেই না লাগিল? বই যাহাতে খোয়া না যায় তাহার জন্য মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সময়ে ছাত্রদের সততার উপর বিশ্বাস করিলে আশ্চর্যজনক সুফলও পাওয়া যায়। এইজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের একটি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে অবাধে পুস্তক ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কোন শিক্ষক তাহাদের গতিবিধির উপর কোন নজর রাখেন না। তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে একখানা বইও খোয়া যায় নাই এবং বইগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হয়। যদি দোষেগুণে গঠিত ছাত্রদিগকে লইয়া একটি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়া থাকে তবে অন্য বিদ্যালয়েই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? ছাত্রদিগকে মানুষ করাই শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সেই মানুষ করার কাজে সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়া যদি কাহারও ত্রুটির জন্য বৃহত্তর সমাজের বিরাট ক্ষতি হয় তবে কি সহ্য করা কর্তব্য? লাভের সঙ্গে ক্ষতি থাকিবেই। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ হইতে লাভের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবেই জাগতিক দিক দিয়া আমরা পরম লাভবান হইয়াছি মনে করিতে হইবে।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ সভা—১৯৬৫

১১ই জুলাই, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান—মহাবোধি সোসাইটি হল।

সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

সভার সূচনাতে শচীন্দ্রনাথ রুদ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সকলে ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গত বৎসরের বার্ষিক সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও এ বৎসরের বার্ষিক বিবরণী সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আলোচ্য বৎসরের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত ও গৃহীত হবার পর আগামী বৎসরের জন্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন পর্ব সমাধা হয়। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ :—

সভাপতি—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতিবৃন্দ—সর্বশ্রী (১) অনাথ বন্ধু দত্ত (২) অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত (৩) প্রমীল চন্দ্র বসু (৪) ফণিভূষণ রায় (৫) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সহঃ-সম্পাদক—শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক—শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাউন্সিল সদস্য

সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) অরুণ রায় (৩) গণেশ ভট্টাচার্য (৪) গীতা মিত্র (৫) গোবিন্দভূষণ ঘোষ (৬) গোবিন্দলাল রায় (৭) চঞ্চলকুমার সেন (৮) দিলীপ কুমার বসু (৯) পার্থসুধীর গুহ (১০) বাণী বসু (১১) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (১২) সুকুমার কোলে (১৩) সুনীলবিহারী ঘোষ (১৪) সুভ্রাংশু কুমার মিত্র (১৫) স্নেহময় নন্দী।

জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য

(ক) কলিকাতা—(১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী (৩) হাইড রোড ইনষ্টিটিউট

(খ) কুচবিহার—কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগার

(গ) চব্বিশ পরগণা—(১) তারাগুণিয়া বীণাপানি পাঠাগার (২) ব্রতী সংঘ, বজবজ

(ঘ) জলপাইগুড়ি— মাতেলি পাবলিক লাইব্রেরী

(ঙ) দার্জিলিং—দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার

(চ) নদীয়া—কান্দোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার

(ছ) পশ্চিম দিনাজপুর—[কোন নাম প্রস্তাবিত হয়নি]

(জ) পুরুলিয়া—বরাভূম পাবলিক লাইব্রেরী

(ঝ) বর্দ্ধমান—জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

(ঞ) বাঁকুড়া—ধ্রুব সংহতি, বাল্‌সী

(ট) বীরভূম—বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার

(ঠ) মালদা—চণ্ডীপুর পাবলিক লাইব্রেরী

(ড) মুর্শিদাবাদ—দক্ষিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি

(ঢ) মেদিনীপুর—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

(ণ) হাওড়া—(১) ডুইল্যা মিলন মন্দির, (২) সাতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী

(ত) হুগলী—(১) ত্রিবেনী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী (২) বকসা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্য

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (২) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (৪) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (৫) জাতীয় গ্রন্থাগার (৬) পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংস্থা পরিষদ (৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (৮) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ (৯) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি (১০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১১) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১২) বিশ্বভারতী (১৩) মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ (১৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৫) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

নব নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা

নব নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা গত ২৫শে জুলাই পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়, ৩৩ হুজুরীমল লেনে বেলা ২ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

গত কাউন্সিল সভার বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৫ সালের বাজেট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজেট যথারীতি অনুমোদিত হয়।

বর্তমান বছরের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা স্থির হয় যে পরিষদের প্রথম সম্পাদক ৺সুশীল ঘোষের নামে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রথম বক্তা হবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। গ্রন্থাগার বিল ও গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এবং কাউন্সিল সভায় গঠিত বিভিন্ন সমিতিগুলির কর্মপ্রণালী উন্নততর করার চেষ্টা করা হবে।

কাউন্সিল সভ্যদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত ৭ জন কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন :

সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) গণেশ ভট্টাচার্য (৩) চঞ্চলকুমার সেন (৪) পার্থসুবীর গুহ (৫) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৬) বাণী বসু (৭) মঙ্গল প্রসাদ সিংহ।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে কাউন্সিলে কো-অপ্‌ট করা হয়।

(১) আশুতোষ কলেজ (২) চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) (৩) ভাটপাড়া হাইস্কুল (৪) মেদিনীপুব জেলা গ্রন্থাগার (৫) সুতাহাটী থানা গ্রন্থাগার।

ঐ সভায় যে সব উপ সমিতি গঠিত হয় তা নিম্নরূপ :—

(ক) কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীপার্থসুবীর গুহ

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) অর্পণা বসু (২) অমিতা মিত্র (৩) অমিতাভ বসু (৪) কমল গুহ (৫) কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় (৬) গীতা মিত্র (৭) গীতা হাজরা (৮) চঞ্চল কুমার সেন (৯) জ্যোতির্ময় বসাক (১০) নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায় (১১) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (১২) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (১৩) মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় (১৪) মায়া বসু (১৫) রঞ্জিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৬) শিবানী ঘোষ (১৭) স্নেহময় নন্দী।

(খ) গৃহ-নির্মাণ সমিতি

সভাপতি—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (২) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৩) বাসুদেব লাহিড়ী (৪) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (৫) শান্তিপদ ভট্টাচার্য (৬) শৈলেন্দ্রনাথ সেন।

(গ) গ্রন্থগার ও পাঠকক্ষ সমিতি

সভাপতি—শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক—শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) অরুণ রায় (২) ক্ষিতিশ প্রামাণিক (৩) দিলীপ কুমার বসু (৪) পার্থসুবীর গুহ (৫) সুকুমার কোলে (৬) স্নেহময় নন্দী

(ঘ) গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী (১) অমিতাভ বসু (২) গীতা মিত্র (৩) গোবিন্দলাল রায় (৪) চঞ্চল কুমার সেন (৫) পার্থসুবীর গুহ (৬) ফণিভূষণ রায় (৭) রাধাবিনোদ সুরাল (৮) সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(ঙ) গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি ও পরিচালক—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্পাদক—শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী (১) অজিতকুমার ঘোষ (২) অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত (৩) আদিত্য কুমার ওহদেদার (৪) এইচ এন আনন্দরাম (৫) এম এন নাগরাজ (৬) কেশব ভট্টাচার্য (৭) গণেশ ভট্টাচার্য (৮) গোবিন্দলাল রায় (৯) নচিকেতা মুখোপাধ্যায় (১০) নীহার কান্তি চট্টোপাধ্যায় (১১) প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২) ফণিভূষণ রায় (১৩) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (১৪) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৫) বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-চৌধুরী (১৬) শান্তিপদ ভট্টাচার্য (১৭) সুনীলবিহারী ঘোষ (১৮) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।

(চ) প্রচার সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত

সম্পাদক—মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী (১) গোবিন্দ মল্লিক (২) দেবজ্যোতি বড়ুয়া (৩) নন্দিতা দে (৪) নিতাই ঘোষ (৫) মীরা মণ্ডল (৬) রাধাবিনোদ মুরাল।

(ছ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী (১) গোপালচন্দ্র পাল (২) নিমাইপ্রসাদ দত্ত (৩) বাসুদেব লাহিড়ী (৪) সুভ্রাংশুকুমার মিত্র।

(জ) সভ্যবৃদ্ধি সমিতি

সভাপতি—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসুনীলভূষণ গুহ

সভ্যবৃন্দ সর্বশ্রী (১) অরুণ ঘোষ (২) অশোক বসু (৩) জ্যোতির্ময় বসাক (৪) দীপক চক্রবর্তী (৫) মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ (৬) রণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় (৭) রাধাকান্ত দত্ত।

(ঝ) সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি—শ্রীফণিভূষণ রায়

সম্পাদক—শ্রীঅমিতাভ বসু

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) অরুণ রায় (২) কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩) ক্ষিতিশ প্রামানিক (৪) গুরুশরণ দাশগুপ্ত (৫) জগমোহন মুখোপাধ্যায় (৬) জ্যোতির্ময় বসাক (৭) দীপক চক্রবর্তী (৮) মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় (৯) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (১০) সুকুমার কোলে (১১) কাউন্সিলের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগত সভ্যবৃন্দ।

(ঞ) হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) গোবিন্দলাল রায় (২) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৩) ফণিভূষণ রায়।

এছাড়াও গত সম্মেলনের (উনবিংশ) প্রস্তাবসমূহকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ একটি পরিচালক সমিতি (ষ্টিয়ারিং কমিটি) গঠন করা হয়।

সভাপতি—শ্রীনির্মলকুমার বসু

সম্পাদক—শ্রীফণিভূষণ রায়

সভ্যগণ সর্বশ্রী (১) গণেশ ভট্টাচার্য (২) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (৩) সুনীলবিহারী ঘোষ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্ট-লিব কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মিলন অনুষ্ঠান

গত ১লা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণের শিক্ষা সমাপ্তির পর সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন কোর্সের জাতীয় গ্রন্থাগার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের এক মিলন অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সার্ট-লিব-শিক্ষণ বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই এম মুলে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে শিক্ষাকালীন নানা অসুবিধার কথা আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে পরিষদের তরফ থেকে এদিকে নজর দেওয়া হয় তার জন্য সভা থেকে অনুরোধ জানান হয়।

শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ঃ চুয়াত্তর বৎসরে পদার্পণ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে জুলাই তিয়াত্তর বৎসর পূর্ণ করে চুয়াত্তরে পদার্পণ করেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারিকগণের মধ্যে যাঁরা স্বকীয় চিন্তায় এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয়ই প্রথম সারিতে। ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত রূপে তিনি যে "বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তা ভারতের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমার তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী নিরলসভাবে জ্ঞানের সাধনা করেছেন। চারখণ্ডে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রজীবনী' ছাড়াও 'নবজ্ঞান-ভারতী' 'ভারত-পরিচয়' প্রভৃতি তাঁর যে ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ। পরিষদের জন্মকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই জ্ঞান-তপস্বীকে আমরা এই উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য-গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত ওহদেদার ইতিপূর্বে জাতীয়গ্রন্থাগারের সহকারী-গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান (সার্ট-লিব্ কোর্স) শিক্ষণ-বিভাগের একজন শিক্ষকরূপে তিনি বহুকাল ধরেই পরিষদের সংগে যুক্ত আছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সিমলাস্থিত 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি'র ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন।

বাংলা শিশু সাহিত্যঃ গ্রন্থপঞ্জী

'বাংলা শিশু সাহিত্যঃ গ্রন্থাপঞ্জী' ডাক যোগে পেতে ইচ্ছুক সকলকে অতিরিক্ত ২.১৫ টাকা ডাকমাশুল সহ বইয়ের দাম মণিঅর্ডার যোগে পাঠাতে অমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভি পি তে বই পাঠাবার অনেক অনুরোধ আমরা প্রায়ই পাচ্ছি। কিন্তু ভি পি ফেরৎ এলে পরিষদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। যাঁদের কলকাতা আসবার সুযোগ আছে তাঁরা ছুটির দিন ব্যতীত বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে পরিষদ অফিস থেকে বই নিতে পারেন। তাছাড়া ৩নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের 'দে বুক স্টোরে' এখন থেকে বই পাওয়া যাবে। পুস্তক বিক্রেতাদের ২৫% ও পরিষদ সদস্যদের ১৫% কমিশন দেওয়া হবে।

'গ্রন্থাগার'-এর অপ্রকাশিত বর্ষসূচী

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ১৩৬৯, ১৩৭০ ও ১৩৭১ এই তিন বৎসরের বার্ষিক সূচীপত্র প্রস্তুত করা হয়নি বলে এতকাল প্রকাশ করা যায়নি। পরিষদের বহু সদস্য 'গ্রন্থাগার'-সম্পাদকের সংগে দেখা করে কিংবা পত্রযোগে জানতে চেয়েছেন যে এই সূচীপত্র বার করা হবে কিনা। তাঁদের সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, 'গ্রন্থাগার'-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার সেনের উদ্যোগে এই তিন বৎসরেরই সূচীপত্র প্রস্তুত করার কাজ শেষ হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যে যন্ত্রস্থও হয়েছে। আশা করি, অচিরকালমধ্যেই একযোগে তিনখণ্ড সূচীপত্র পেয়ে 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকপাঠিকাদের মুখে হাসি ফুটবে।

Association Notes

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

জাতীয় গ্রন্থাগার। কান্তকবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনী

গত ১২ই শ্রাবণ ১৩৭২সন (ইংরেজী ২৮শে জুলাই ১৯৬৫) তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে কান্তকবির উপর একটি মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

প্রদর্শনীটি অলঙ্কৃত করে আছে কবির একটি প্রতিকৃতি। কবির রচনাসম্ভার, কবিপ্রসঙ্গে লিখিত বিভিন্ন প্রখ্যাত সাহিত্যসেবিগণের রচিত গ্রন্থাবলী এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু মূল্যবান সমালোচনা। প্রদর্শনীতে উৎসর্গিত দ্রব্যগুলির মধ্যে কবি-হস্ত লিখিত ডায়েরিটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে কবি বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলেন। হাসপাতালে এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান কালে কবি এই ডায়েরিটি রচনা করেন।

প্রদর্শনীটি জনসাধারণের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে।

নজরুল পাঠাগার। কলিকাতা-৯

গত ১লা আগষ্ট ১৯৬৫ অপরাহ্ণ ৫-৩০টায় ডাঃ কে পি ঘোষের সভাপতিত্বে নজরুল পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের বার্ষিক কার্যবিবরণী ও পাঠাগারের ১৯৬৪-৬৫ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণের পর আগামী বসরের জন্য পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও কর্মকর্তারা নির্বাচিত হন। নতুন কার্যকরী সমিতির ডাঃ আবুল আহ্‌সান সভাপতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শীতাংশু মৈত্র সম্পাদক এবং শ্রী অনিন্দ্যকুমার সেন গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি পদাধিকারবলে কার্যকরী সমিতিতে আছেন।

সম্পাদকের কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে পাঠাগারে ১৯২ জন সদস্য আছেন। নতুন এসেছেন ৩৮জন সদস্য, ছেড়ে গেছেন ৮জন। পাঠাগারে বর্তমানে ৩৯৫৭টি বই আছে; এ বছরে সংযোজন হয়েছে ১৮৩টি বই, ৫খানা বই দান হিসাবে পাওয়া গেছে। পাঠাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষে ৪খানি দৈনিক পত্রিকা, ৮টি সাপ্তাহিক, ২টি মাসিক, ২টি ত্রৈমাসিক এবং অন্যান্য ৪টি মোট ২০টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের সদস্যগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তক সংখ্যা ১২, ৮৯৩।

২৪ পরগণা

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার

গত ২১ শে জুন (১৯৬৫) পাঠাগারের ৪৮শ তম বার্ষিক সাধারণ সভা পাঠাগারের সহঃ-সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ নাগচৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব ও হিসাবপরীক্ষকের রিপোর্ট গৃহীত হয়। বার্ষিক বিবরণীতে দেখা

যায় যে, সকল বিভাগেই পাঠাগারের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারের সভ্যসংখ্যা ১৬৮ হয়েছে; গত দুই বছরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৬ ও ১৫১। মোট সভ্যের মধ্যে ৪৭ জন অর্থাৎ প্রায় ২৮% অন্য গ্রামের। এর থেকে এই অঞ্চলে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান বৎসরে পাঠাগারের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা:—বিশিষ্ট সভ্য—১, সাধারণ সভ্য ১৪৮, ছাত্র-ছাত্রী সভ্য—১৭, বিনা চাঁদার সভ্য—২।

বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ২৩২৪টি। এ বছরে পুস্তক বৃদ্ধি হয়েছে ২৮৪টি। গত দুই বছরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮০ ও ২৫৮। পুস্তকবৃদ্ধির মাসিক গড় ২৩·৬৪ পূর্বের দুই বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ২৫·৫০। বর্তমান বৎসরে সরকারী সাহায্যে (কন্টিজেন্সি সহ) ৯৮টি ও পাঠাগারের তহবিল থেকে ২৫টি বই কেনা হয়েছে এবং ১৪১ খানা বই উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে। বই ইস্যুর সংখ্যা ৭৮১০; পঠিত পুস্তকের শতকরা ৫৮·৭৯ খানা উপন্যাস। গত দুই বছরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ৫৮। উপন্যাস ছাড়া পঠিত অন্যান্য পুস্তকের সংখ্যা ৩২১৮। এছাড়া ফিডার পাঠাগারেও ১৫৫খানা পুস্তক আদান-প্রদান হয়েছে।

পাঠাগারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৩,২৬৭·০৫ ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০৪·৭৬ টাকা।

পাঠাগারটি পশ্চিমবঙ্গসরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগাররূপে গণ্য হয়েছে এবং পাঠাগার বর্তমানে এর নিজস্ব সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থিত।

দি পানিহাটি ক্লাব। পানিহাটি

১৯৬৪-৬৫ সালে ক্লাবের পঞ্চাশ বৎসরপূর্তি উপলক্ষে গত ২৩শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৫ পর্যন্ত সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩১.৩.৬৫ তারিখে ক্লাবের সাধারণ বিভাগে সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৬ জন ৩১।৩।৬৪ তারিখে এই সংখ্যা ছিল ১৪২ জন। এই বৎসর নূতন সভ্যের সংখ্যা ৪০ জন। ক্লাব বর্তমান বৎসরে পানিহাটি পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৲টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ১০০৲ টাকা সাহায্য পেয়েছে। ক্লাবের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে গ্রন্থাগার বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে বর্তমান বৎসরে পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৩০৪ টাকা এবং সাময়িকপত্র ক্রয়ের জন্য ১৫১·৯ টাকা খরচ করা হয়। চারদিন-ব্যাপী জুবিলী উৎসব ছাড়াও এ বৎসর ক্লাবের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রতিরোধান দিবস, বিজয়া সম্মিলনী, নেহেরু-স্মরণে সভা, নেতাজী জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। তাছাড়া খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্ঠবপ্রদর্শন, নাট্যাভিনয় ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

দার্জিলিং

ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার। কার্সিয়ং

সম্প্রতি পাঠাগারের ১৯৬৪-৬৫ সালের যে কার্যবিবরণী পরিষদের কার্যালয়ে এসেছে তা থেকে দেখা গেল আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের আসবাবপত্রের জন্য ৩,৭৮২ টাকা এবং বই কেনার জন্য ২,৪৫৫.০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ

পর্যন্ত পাঠাগারের মোট বইয়ের সংখ্যা ২,৯৯২টি। নতুন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকরূপে কাজ করে যাবেন শ্রীসরল কুমার রায়।

পাঠাগারের উদ্যোগে এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ, ভানুভক্ত, তুলসীদাস, শরৎচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালিত হয়। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, হাসপাতাল দিবস প্রজাতন্ত্র দিবস এবং সরস্বতীপূজা এই উৎসবগুলিও পালিত হয়। ১৯৬৪ সালের ১৫ই মার্চ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। কার্সিয়ং-এর এস ডি ও পদাধিকারবলে এই সমিতির সভাপতি। তাছাড়া দু'জন সহঃ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, অপর ছ'জন নির্বাচিত সদস্য এবং স্থানীয় পুষ্পরাণী স্কুলের প্রধানশিক্ষক, সেন্টজোশেফ স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা, কার্সিয়ং-এর পৌরপ্রধান, জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক, কার্সিয়ং-এর স্কুলসমূহের সহকারী-পরিদর্শক এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসেবে একজন মনোনীত সদস্য নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত।

পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যনির্বাহের জন্য সাংস্কৃতিক, পুস্তক নির্বাচন, খেলাধূলা ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটি উপসমিতিও গঠন করা হয়েছে।

মেদিনীপুর

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্যপুর। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

বিগত ২৬শে জুলাই ১৯৬৫ পাঠাগারের পক্ষ থেকে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বসু পৌরহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীআনন্দমোহন গুহ। সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য উপস্থিত সুধিবৃন্দ কবির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবির কয়েকটি ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমোহিনীমোহন প্রামাণিক।

২৯ শে জুলাই শহীদ পাঠাগারের বিবেকানন্দ পাঠচক্রের আহ্বানে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকুমারচন্দ্র জানা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহকুমা প্রচার-অধিকারিক শ্রীসুফল মণ্ডল। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন পার্বতী মাইতি। পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীতুষার সিন্‌হা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং শ্রীসূর্যকুমার চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠ করে শোনান। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়দ্বয় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমোহিনী মোহন প্রামানিক ও শ্রীশ্যামাপদ রায়।

উক্ত আসরেই ২০ মিঃ বিরতির পর 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমোহিনীমোহন প্রামানিক ও শ্রীতুষার সিন্‌হার পরিচালনায় পার্বতী মাইতি, শোভা চক্রবর্তী, ছবি সিন্‌হা, পদ্মা মাইতি, ভারতী সিন্‌হা প্রভৃতি কথায় ও গানে বর্ষাবরণ করেন। সভাশেষে উপস্থিত সকলকে লঘু জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

হাওড়া

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারের বার্ষিক সভায় ১৯৬৫-৬৬সালের কার্যকরী সমিতিতে ২১জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দাশ সভাপতি, শ্রীদিলীপকুমার টাট্ ও শ্রীহরিদাস মখার্জী

সহঃ-সভাপতি, শ্রীঅজিতকুমার মজুমদার সাধারণ-সম্পাদক, শ্রীশ্যামল গুপ্ত কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীশরদিন্দু ঘোষ গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া সমাজ-শিক্ষা বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ, মেয়েদের বিভাগ, খেলাধূলা বিভাগ ও ছোটদের বিভাগ প্রত্যেক বিভাগের একজন করে সম্পাদক আছেন। স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি কমিটিতে আছেন।

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। গুড়াপ। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ৮ই ও ৯ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ২২শে ও ২৩ মে '৬৫) গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার দর্শক উপস্থিতি ছিলেন। শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেহেরু-স্মৃতি-পাঠচক্রের (পাঠ্যপুস্তক বিভাগ) উদ্বোধন করেন এবং এই পাঠচক্র ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও পল্লী উন্নয়নব্রতী শ্রীকেশবচন্দ্র নাগকে তাঁহার আজীবন নিরলস কর্ম ও সাধনার জন্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাঠাগারের কর্মসচিব শ্রীঅনিল কুমার হালদার পাঠাগারের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বলেন বর্তমানে পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ১৪২ জন (আজীবন ৬০, সাধারণ ১৪৪ কিশোর ৩৮) পুস্তক সংখ্যা ২৭০২। শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পল্লী-সমিতির জন্ম হইতে বর্তমান পরিণতির উৎস কি তাহা ব্যক্ত করেন ও সকলকে পল্লী উন্নয়নের কার্যে সমবেত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত নিখিল রঞ্জন রায় ও প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র বাগচী যথাক্রমে তাঁহাদের অভিভাষণে এই পাঠাগারের ক্রমোন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ যে ৩৫০০ টাকার স্থলে স্থানীয় জন সাধারণের সহযোগিতায় ৮১৩৮ টাকা ব্যয় করিয়া দ্বিতল গৃহ সম্প্রসারণ করিয়াছেন তাহা অনুকরণীয়। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ যে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্মৃতি-বিজড়িত নেহরু-স্মৃতি-পাঠচক্র (Text Book Section) উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বিশিষ্ট সমাজসেবক, প্রখ্যাত গণিত-গ্রন্থকার ও মিত্র স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত নাগের কর্মজীবনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং এতদুপলক্ষে শ্রীদেবীপ্রসাদ নাগ সম্পাদিত স্মারক-গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। ২১শে মে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করেন। ২৩শে মে শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় অভিনীত "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। স্থানীয় মিলনী সিনেমা কর্তৃপক্ষ ৩০১ টাকা ও শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ ১০১ টাকা পাঠাগারকে দান করেন। উৎসবসমিতির সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র আষ কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

চিঠিপত্র

[পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' দায়ী নহেন। 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য আমরা পাঠকদের চিঠিপত্র পাঠাতে অনুরোধ করি। ছাপাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গা থাকলে পত্র ছাপানো হবে। পত্রিকায় লেখা পাঠাবার যে নিয়ম আছে সেইমতো কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রের দৈর্ঘ্য যেন কোনক্রমেই এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করে। প্রয়োজনানুযায়ী পত্রের সংশোধন ও সম্পাদন করবার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থাকবে।]

অবহেলিত গ্রন্থাগারকর্মী

মহাশয়,

সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থানগ্রহণ করিয়াছে। সমাজের সর্বস্তরের প্রশংসাও পাইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের কর্ম্মিগণ, যাহারা গ্রন্থাগারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ, বলিতে গেলে গ্রন্থাগারের আত্মা, তাহারা সর্বরকমে অবহেলিত ও অনাদৃত। এ বিষয়ে কোন চিন্তা কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থাগারকর্ম্মিগণ তাঁহাদের দুর্ভাগ্যকে অতি সামান্য নির্দিষ্ট বেতনের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। সামাজিক জীবনেও তাহাদের মানমর্যাদা অসম্মানজনক। কেবলমাত্র জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারকর্মীর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূচনা হইতেই কাজ করিতেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সামাজিক ও আর্থিক মানের কোন উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের দিনে তাঁহারা যে সামান্য (নির্দিষ্ট) বেতন পান, তাহা জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইয়া বাঁচিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতে চাকুরীর কোন নিয়মাবলী বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগসুবিধা নাই, তাঁহাদের কোনরূপ ভাতা বা মেডিকেল রিলিফ দেওয়া হয় না। প্রায় ১৪ বৎসর চাকুরী করিয়াও গ্রন্থাগারকর্ম্মিগণ চাকুরীতে এখনও স্থায়ী হন নাই। পশ্চিম বাংলার উপেক্ষিত জেলা ও গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্ম্মিদের জন্য একটি সুষ্ঠু বেতনক্রম প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য।

১০।৭।৬৫ — গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক। হাওড়া।

ভুলি নাই

মান্যবরেষু,

নমস্কার। আপনাদের আসন্ন ১৯শ বার্ষিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে অতি গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনারা আমাকে এখনও যে ভুলতে পারেন নি তজ্জন্য জানাচ্ছি অন্তরের সাথে আপনাদিগকে ধন্যবাদ।

আমিও আপনাদের কথা বিশেষ করে—বাঁশবেড়িয়ার সম্মেলনে আতিথেয়তার ও সম্মান দানের কথা এখনও ভুলতে পারছি না। ভুলতে পারছিনা স্বর্গীয় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের, স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ও তৎকালীন আপনাদের সবারই মুখচ্ছবি। পাকিস্তানের গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলোতে যোগদানের ব্যাপারে প্রত্যেক বৎসর পেশওয়ার, লাহোর, করাচী ও ঢাকায় গিয়েছি, দেশের ও বিদেশের বহু গ্রন্থাগারিকের সাথে মিশেছি ও মিশবার এখনও সুযোগ পাচ্ছি কিন্তু আমার প্রথম জীবনে গ্রন্থাগারিক হিসেবে আপনাদের সাথে মেশায় যে মাধুর্য পেয়েছি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে সে মাধুর্য যেন বিরল মনে ঠেক্‌ছে। তাই আপনাদিগকে ভুলতে পারছি না। এ আমার অতিশয়োক্তি নয়।

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গ্রন্থাগারিকগণ সবাই ভিন্ন জগতের লোক। তাঁরা সবাই মানবপ্রেমিক। তাঁরা সবাই মানবতারই গান গেয়ে থাকেন; তাঁদের কোন গণ্ডি নেই। সমগ্র জগতের মানুষকে তাঁরা মানবহিতেরই জন্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। তাই আপনারা আমাকে বিদেশী জেনেও আপনাদের এই মহান সম্মেলনে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লা আপনাদের মঙ্গল করুন এবং আপনাদের সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করুন ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

আমাদের প্রকাশিত মাসিক "নওরোজ" পত্রিকার বিনিময়ে আপনাদের প্রকাশিত "গ্রন্থাগার" পত্রিকা আমাদের দিলে একটা যোগসূত্র রক্ষা করা যেত। এ বিষয়ে আলোচনা করে মতামত জানালে আনন্দিত হবো।

পুনরায় আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। নিবেদন ইতি—

বিনীত

মোহাম্মদ হেমায়েত আলী
নাজিমউদ্দীন হল এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী
দিনাজপুর (পূর্ব পাকিস্তান)।

১৮।৪।৬৫ ইং

Correspondence.

বার্তাবিচিত্রা

ভারতীয় মানক সংস্থার (ISI) নবম সম্মেলন : বাঙ্গালোর, ১৯৬৫

আগামী ১৩ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বর বাঙ্গালোরে ভারতীয় মানক সংস্থার যে নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে অন্যান্য বিষয়ের সংগে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্রের মান নির্দ্ধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরেই ভারতীয় মানক সংস্থা বা Indian standards Institute এর জন্ম হয়। এর প্রধান কার্যালয় হল নয়াদিল্লীর মথুরা রোডে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যত জিনিস প্রস্তুত হয়েছে সে গুলির গুণগত-উৎকর্ষ বজায় রাখা এবং মান ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থা এইভাবে মান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর ISI এর সিল দেবার জন্য লাইসেন্সও দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজারের মত এই স্টাণ্ডার্ড প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের জাতীয় পতাকার এক কোণেও ISI সিল দেওয়া আছে।

সূত্র : ISI : Circular of 13 May, 1965

ভারতীয় যাদুঘরে স্কলারদের জন্য গ্রন্থাগার

সম্প্রতি ভারতীয় যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ স্কলারদের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া তাঁরা একটি ষান্মাসিক বুলেটিনও বার করবেন—এতে থাকবে জনপ্রিয় বক্তৃতামালা বা পপুলার লেকচারের সংকলন।

মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা গ্যালারী স্থাপন করবেন। স্কুলের জন্য প্রোগ্রাম অবশ্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—এতে ফিল্ম শো দেখানো হবে এবং যাদুঘরের ছ'টি বিভিন্ন বিভাগ গাইড লেকচারের সাহায্যে ঘুরিয়ে দেখান হবে।

সূত্র : স্টেট্‌সম্যান, কলিকাতা

নেহেরু মেমোরিয়াল ষ্টাডি সেণ্টার

সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানান যে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি স্টাডি সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর জ্ঞান আহরণের কেন্দ্র হিসেবে একে গড়ে তোলা হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বর্তমানে অনেকেই দেশে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিদেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেছেন; তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই স্টাডি সেণ্টার স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া বর্তমানে দেশে অনুরূপ যে সকল সংস্থা আছে সেগুলির মানোন্নয়নেও এই সেণ্টার সাহায্য করবে।

সূত্র : টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই

বইয়ের প্যাভেলিয়ান

দিল্লী করপোরেশন সম্প্রতি ১০টি সুসজ্জিত প্যাভেলিয়ানে নামকরা প্রকাশকদের বই ও পত্র-পত্রিকার স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এখানে জনসাধারণ বই পড়তে পারবেন এবং ক্রয় করতে পারবেন।

এদের মধ্যে কয়েকটি দক্ষিণ দিল্লীতে এবং অপর কয়েকটি চাঁদনীচক ও দরিয়াগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এইসব প্যাভেলিয়ানের ব্লু-প্রিন্ট সম্প্রতি সাংবাদিকদের দেখানো হয়েছে।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইম্‌স, দিল্লী

বই আমদানির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখা থেকে অব্যাহতি

বিদেশ থেকে বই এবং পত্র-পত্রিকা আমদানির ব্যাপারে পুস্তকবিক্রেতাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 'ডিপোজিট স্কীমে' ২৫% জমা রাখতে হত। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জ কন্‌ট্রোল ডিপার্টমেণ্ট ভারতীয় পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশন সংস্থাকে জমা রাখা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার তাঁদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ভারতীয় পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকদের ফেডারেশন সম্প্রতি বই এবং পত্র-পত্রিকা আমদানীর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে কড়াকড়ি করছেন তার প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন। ফেডারেশন মনে করেন, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে না নিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে এবং পুস্তক ব্যবসায় ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুস্তকই এদেশে একমাত্র পণ্য যা ন্যায্যদরে বিক্রয় হয়। কিন্তু বর্তমানে পুস্তকবিক্রেতারা সেই সব পুস্তকই আমদানী করছেন যেগুলি ক্রয় করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। ফলে সস্তা এবং চটকদার বইতে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বইয়ের অভাবে তাদের ইউ জি সি গ্রাণ্টের টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। বিদেশ থেকে আমদানী পুস্তকের খরিদ্দারের ৯০% ভাগই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতির লাইব্রেরী এবং কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহ। ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিই ব্যাহত হবে।

সূত্র: টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই

ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

জার্মান ভাষার বিখ্যাত লেখক কাফ্‌কার বইগুলি দীর্ঘকাল পরে আবার পূর্ব-ইয়োরোপের লাইব্রেরীগুলির শেল্‌ফে দেখা যাচ্ছে। চেকোশ্লাভাকিয়ার এই ইহুদী লেখকের বই এতকাল ধরে পূর্ব-ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে নিষিদ্ধ ছিল। কাফ্‌কার শ্রেষ্ঠ রচনা এবং উপন্যাসগুলি এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এমন কি পূর্ব-জার্মানী পর্যন্ত কাফ্‌কার একখণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করেছে।

সূত্র: টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই।

বই ফেরৎ না দেওয়ার অপরাধে জরিমানা

গত ২৫শে মার্চ (১৯৬৫) ব্রুকলিনের আকাদমী অব মেডিসিন এবং লাইব্রেরী কমিশনের এক যুক্ত অধিবেশনে অনাদায়ী পুস্তক সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয় :—

যদি দু' সপ্তাহের মধ্যে বই ফেরৎ না আসে তবে পুস্তক গ্রহণকারীদের একটি নোটিশ দেওয়া হবে। তিন দিন পরে ১ ডলার জরিমানা ধার্য হবে। এরপর প্রত্যেক সপ্তাহ ও তার ভগ্নাংশের জন্য ১ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ৭ সপ্তাহ পরে পুস্তক গ্রহণকারীকে সমস্ত জরিমানা-সহ বইয়ের দাম দিতে হবে। এছাড়া অপরাধী যদি আকাদমীর সদস্য এবং নন-ফ্যাকাল্‌টি মেম্বর হয় তবে তার লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা তো কেড়ে নেওয়া হবেই উপরন্তু বোর্ড অব ট্রাষ্টিতে তার নামে রিপোর্ট করা হবে। আর ফ্যাকাল্‌টির মেম্বর হলে যতদিন পর্যন্ত বই ফেরৎ না আসে ততদিন তাঁর লাইব্রেরীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সূত্র : Bulletin of the Medical Society of the County of kings and Academy of Medicine of Brooklyns.

News Notes

গ্রন্থ-সমালোচনা

Indian Science Abstracts, V. I, No. 1, January, 1965. Editor S. Datta, Published monthly from the Indian National Scientific Documentation Centre, Delhi 12, Annual Subscription Rs. 50·00 (Inland) foreign $ 30·00 (U.S.A), £ 10 (others)

পারশ্য না কোন দেশের এক জবরদস্ত সম্রাটের একবার নিজ রাজবংশের ইতিহাস লেখাবার বাসনা হয়েছিল। সম্রাটের সাধ অপূর্ণ থাকবার কথা নয়। সভাপণ্ডিতেরা দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমের পর একদিন বেশ কয়েক-খণ্ডে সমাপ্ত রাজবংশের ইতিহাস উটের পিঠে চাপিয়ে রাজসভায় এনে হাজির করলেন। রাজকার্যে ব্যস্ত সম্রাটের পক্ষে সেই বিপুলায়তন ইতিহাস পড়া সম্ভব নয় বলে তাকে সংক্ষেপ করবার আদেশ হল। অতঃপর সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত নয় বলে সম্রাটের তাও পড়বার সুযোগ হল না। অবশেষে যথেষ্ট সংক্ষেপ করে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ডে যখন সেই ইতিহাস রচনা করে আনা হল সম্রাট তখন মৃত্যুশয্যায়। সম্রাটের সাধ অপূর্ণ থেকে যায় দেখে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বললেন, 'সম্রাট, আপনার বংশের ইতিহাস আমি আপনাকে অতি সংক্ষেপে শুনিয়ে দিচ্ছি—আপনার বংশের রাজারা জন্মগ্রহণ করেছেন, রাজ্য-শাসন করেছেন এবং তারপর, হে সম্রাট, তাঁরা একদিন আপনারই মত মৃত্যুবরণ করেছেন'।

জ্ঞানবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার রাজ্যেও এমনি সর্বদা 'সংক্ষেপ করো' 'সংক্ষেপ করো' রব। কারণ দিন দিন এইসব পত্রিকার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রত্যহই নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে; পুরাণো তত্ত্ব বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গা নিচ্ছে নতুন তত্ত্ব। বর্তমান শতাব্দীতে কোন একজন মানুষের পক্ষে সকল বিষয়ে তো বটেই নিজস্ব ক্ষেত্রেরও বিস্তারিত সংবাদ রাখা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অগ্রসর দেশগুলিতে বিশেষ করে ইংলণ্ড-আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলিতে এই সার-সংক্ষেপের (abstracting services) রীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদেশে অনেক পত্রিকাই অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধগুলির সার-সংক্ষেপ নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট'-এর পত্রিকাই ওসব দেশে অনেক বার হয়—যেমন Excerpta Medica, Abstracts of World Medicine, Chemical Abstracts, Biological Abstracts, Physics Abstracts ইত্যাদি।

আনন্দের বিষয় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে INSDOC থেকে Indian Science Abstracts বলে একটি মাসিক 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'-এর পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এতে বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ১৫,০০০ ডকুমেন্ট থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রায় ৫০০ ভারতীয় পত্রিকা, বিভিন্ন থিসিস, পেটেন্ট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, সম্মেলনের কার্য বিবরণী, রিপোর্ট মনোগ্রাফ এবং অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন প্রকাশনা থেকে এই ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া ভারতের বাইরে ভারতীয়দের প্রকাশিত রচনাও এতে স্থান পাবে। এই পত্রিকা প্রকাশের ফলে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী, পণ্ডিত এবং গবেষকদের অনেক-দিনের একটি অভাব ঘুচবে।

জ্ঞানবিজ্ঞানকে কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেখতে কোন বিজ্ঞানী বা গবেষকই আজ আর অভ্যস্ত নন। তবে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় ক্ষেত্রে কি কি কাজ হচ্ছে সেগুলির বিবরণ নিজেদের প্রয়োজনেও বটে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনে সংকলন করা কর্তব্য। তাছাড়া কোন একটা দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ এগিয়ে গেছে তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে সে দেশের জাতীয় Science Abstracts দেখে। অনেক অ্যাবস্ট্রাক্ট-এর রূপ আন্তর্জাতিক হলেও তাতে অ্যাবস্ট্রাক্টপ্রস্তুতকারী দেশের বিষয়গুলিই যে নানাকারণে প্রাধান্য পেয়ে থাকে একথা বলাই বাহুল্য। প্রবন্ধ নির্বাচনের নীতি বা সেগুলি পাওয়ার অসুবিধা থেকেও এটা হয়ে থাকে।

১৯৪৯ সালে প্যারিসে Science Abstracting-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাই প্রত্যেক দেশে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়গুলির যাতে জাতীয় ও আঞ্চলিক তালিকা এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রস্তুত করা হয় সেই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৬৩ সালে বাঙ্গালোরে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের (C.S.I R) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতীয় তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের (Information Scientists) এক সম্মেলন থেকেও অনুরূপ এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

Indian Science Abstracts-এর প্রথম সংখ্যাটিই আমরা দেখেছি। এটা কতদূর কার্যোপযোগী হবে এবং এর চূড়ান্তরূপ কি হবে তা এখনই বলা হয়তো সম্ভব নয়। Insdoc এর ডিরেক্টর শ্রী বি এস কেশবনের ভূমিকা থেকে মোটামুটি এর রূপটি কি হবে অনুমান করা যায়। যে সকল পত্রপত্রিকা থেকে এবং যে সকল সংস্থার রিপোর্ট ইত্যাদি অ্যাবষ্ট্রাক্ট করা হয়েছে তাদের দুটি পৃথক তালিকা, বর্গীকরণ সংখ্যাসহ একটি বর্গীকৃত বিষয়সূচী এবং বিষয়ের পরিচয়-জ্ঞাপক মূলশব্দ নিয়ে একটি সূচী (key-word index), তাছাড়া অ্যাবস্ট্রাক্টের ক্রমিক সংখ্যা-সহ একটি লেখক-সূচীও এতে দেওয়া হয়েছে। যে কোন অ্যাবস্ট্রাক্টই বিশেষ সতর্কতার সংগে সম্পাদিত না হলে খুব মূল্যবান প্রবন্ধের প্রতিও হয়তো পাঠকের দৃষ্টি না পড়তে পারে। অবশ্য সার-সংক্ষেপ করার নীতি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে পত্রিকাগুলির নিজস্ব বিবেচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী। কেউ কেউ মনে করেন 'সামারি' এবং 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'-এ যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সব সময়েই যে প্রবন্ধের যথাযথ সারসংক্ষেপ করে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। ইংরেজী ভাষার প্রবন্ধকে ইংরেজীতে যেখানে সার-সংক্ষেপ করতে হয় সেখানে অনেকস্থলে লেখকের কথা দিয়েই তা করা সম্ভব হয়। কিন্তু সংক্ষেপকারী পত্রিকার ভাষা যদি মূলের ভাষা থেকে ভিন্ন হয় তবে তার ভাবকে সংক্ষেপে অনুবাদ করে দিতে হয়। বিজ্ঞানী,

গবেষক ও পণ্ডিতেরা এই সব প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ পড়ে তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কোথায় কি হচ্ছে জানতে পারেন। সুতরাং দেখতে হবে কোন মূল্যবান পয়েণ্ট যেন বাদ না যায় এবং বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়ে তারা যাতে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারেন। কারণ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সময় কম; সার-সংক্ষেপের ওপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে তাঁদের সর্বদাই ধারণা করে নিতে হয় প্রবন্ধটি তাঁদের কাজে আসবে কিনা। Indian Science Abstracts-এর সম্পাদক এবং তাঁর সহকারিবৃন্দ বিশেষ যোগ্যতার সংগেই তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। অন্ততঃ এই সংখ্যার অ্যাবস্ট্রাক্টগুলি যে বাহুল্যবর্জিত এবং রীতিমতো দক্ষতার সংগে করা হয়েছে তা মূল প্রবন্ধগুলির সংগে অ্যাবষ্ট্রাক্টগুলি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

Indian Science Abstracts প্রকাশ করার জন্য INSDOC কর্তৃপক্ষকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

নি. মু.

Book Review

॥ স্মরণীয় ॥

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের জন্মদিবস ৩১শে জুলাই। আজ থেকে ৩০।৩২ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য আইন সভার ভেতরে ও বাইরে তিনি বহু আন্দোলন করেছিলেন। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন আজও বিধিবদ্ধ হয়নি। আমরা যে পর্যন্ত না তাতে সফলকাম হব ততদিন পর্যন্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে না।

৺ তিনকড়ি দত্ত

১লা জুলাই তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুদিন। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার অথচ গ্রন্থাগার জগতের সেবাই ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রকৃত বৃত্তি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে হারিয়েছি। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন ১লা জুলাই। বিধানচন্দ্র শুধু বাংলার প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না তিনি ছিলেন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

In memorium

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের B Lib Sc. (লাইব্রেরীয়ানশিপ) পরীক্ষার ফল

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে B Lib Sc. কোর্স প্রবর্তনের পর এই বৎসরই প্রথম লাইব্রেরীয়ানশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিম্নে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের গুণানুসারে বিন্যস্ত তালিকা দেওয়া হল :—

প্রথম শ্রেণী

তপন কুমার সেনগুপ্ত
কল্পনা দাশগুপ্ত
ইরা সান্যাল
রাণু চট্টোপাধ্যায়
অঞ্জলি ঘোষ
শান্তি গোপাল বসু
দেবেশ চন্দ্র রায়
অসীম কুমার বাঙ্গোর
রাধানাথ রায়

দ্বিতীয় শ্রেণী

বন্দনা দাশ
মঞ্জুলী সিংহ
মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য
মনীষা সেনগুপ্ত
রতন কুমার রায়
উর্মিমালা চৌধুরী
কমলা চক্রবর্তী
উষা গুহঠাকুরতা
উষা লেলে
কৃতঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
মঞ্জু দে
আশা চৌঃ
রমাপতি শীল
ল্যাডলী রায়
মালবিকা গুহ বিশ্বাস
শেলী সেন
ইলা সেন
অজিত কুমার চক্রবর্তী
বাণী ভট্টাচার্য

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের B Lib. Sc. কোর্সের পার্ট-টাইম লেকচারার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপরিচিত কর্মী এবং পরিষদ পরিচালিত সার্ট-লিব্‌ শিক্ষণ কোর্সের শিক্ষক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গত ১১ই জুলাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Lib Sc. কোর্স অধ্যয়নের জন্য দিল্লী গেছেন এবং সেখানে ভর্তি হয়েছেন। শ্রীরায়চৌধুরী সম্পর্কে অনেকেই খোঁজখবর করছেন এবং তাঁর ঠিকানা জানতে চেয়েছেন বলে নিম্নে তাঁর ঠিকানা দেওয়া হল :—

Shri Prabir Roychoudhury
Room No. 63A Gwyer Hall,
University of Delhi,
Delhi 7.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৫ ১৩৭২, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা হিসেবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের সাম্প্রতিক ধারণা ॥

—০—

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'—মৈত্র মহাশয়ের সাগর-সংগমে যাবার বার্তা নয়—সম্প্রতি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন মারফত ঘোষিত হয়েছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সেসন থেকেই গ্রন্থাগারবিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রি খুলছেন এবং যুগপৎ ছাত্র ও শিক্ষকের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই কোর্সের শিক্ষার্থীরূপে ভর্তি হবার জন্য শতাধিক আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের এই আগ্রহ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ১৯৪৭ সাল থেকেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি ও ডক্টরেট ডিগ্রি কোর্সের প্রবর্তন হয়। দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ও ডিগ্রি কোর্স খুলবার অনুমোদন লাভ করেছেন। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও এবছর থেকে ডিগ্রি কোর্স খুলছেন। পুর্বাঞ্চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বিলম্বে হলেও গ্রন্থাগারবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

এই নবপ্রবর্তিত ডিগ্রি কোর্সের রূপ কি হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু এখনও জানা যায় নি। তা হলেও এই ডিগ্রি কোর্স সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যাঁরা ইতিপুর্বে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে এক বছরের ডিপ্লোমা বা বি লিব এসসি পাশ করেছেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তাঁদের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ থাকবে না জেনে অনেকে হতাশ হয়েছেন। তাছাড়া এই কোর্সে ভর্তি হবার জন্য শিক্ষার্থীদের যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে সেটা শিথিল না করলে অনেকের পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এঁদের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা অথবা

বি লিব এসসি পাশ, কমপক্ষে ৫ বছর গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং কোন একটি বিদেশী ভাষার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হতে হবে। অবশ্য ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা খানিকটা শিথিল-যোগ্য যদি প্রার্থী শিক্ষাকালে ভাষা শিখে নেবেন এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন। অথচ এম্ এ বা এম এস সি-দের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবেনা। দেখা যাচ্ছে, ডিগ্রি কোর্সের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হবার যোগ্যতা যাঁদের নেই তাঁদের অনেকেই এই কোর্সের শিক্ষকতার জন্য আবেদন করতে পারেন। সুতরাং একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদের সঞ্চার হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান যে একটি বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যে রীতিমত পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে একথা শিক্ষা-জগতের লোকেদের বোঝাতে সময় সময় বেগ পেতে হয়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মনে করা হত যে গ্রন্থাগারে কাজ করবার জন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন নেই—যে কোন গ্রন্থাগারে কিছুকাল শিক্ষানবিসী করাই কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকল দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া কলেজে আধুনিক গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের জনক মেলভিল ডিউই প্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করেন। বৃটেনে ১৯২১ সালে 'লণ্ডন স্কুল অব লাইব্রেরীয়ানশিপ' স্থাপিত হওয়ায় প্রথম গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হয়। ভারতবর্ষে প্রথম গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সুরু করেন বরোদায় ডিউই-র প্রথম শিক্ষাশিবিরের ছাত্র বোর্ডেন সাহেব।

সময়ের তুলনায় খুব বেশী পরে সুরু না হলেও এবং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে থাকা সত্বেও ভারতবর্ষ যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ বলে বিবেচিত হয় তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি এবং একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বছর বা তার অধিককাল ধরে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে,—মাদ্রাজ (১৯৩১), বারাণসী (১৯৪১), বোম্বাই (১৯৪৪), কলকাতা (১৯৪৫) এবং দিল্লী (১৯৪৭)। ভারতের অনেকগুলি রাজ্য-গ্রন্থাগার পরিষদও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করছেন। কিন্তু গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কোন সর্বভারতীয় মান নির্দিষ্ট হয়নি। তাছাড়া বিদেশের অনুকরণে একদা যে শিক্ষাক্রম রচিত হয়েছিল আমাদের জাতীয় পটভূমিতে তার রূপ কি হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টি রাখাও প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে উচ্চতর শিক্ষা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ অপচয় না হয়। সে জন্য শিক্ষাদান মামুলি বা 'ষ্টিরিয়োটাইপড' না হয়ে 'ডাইনামিক' হওয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে বাস্তব জ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে একটি যুক্তিপ্রবণ, অনিসন্ধিৎসু ও বিজ্ঞানী মনের বিকাশ ঘটাবেন যাতে করে সে তার বৃত্তিতে দক্ষ হয়ে উঠবে এবং প্রয়োজন-

মত তার বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারবে। পরিবর্তিত পটভূমিতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি স্থির করতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং শিক্ষক ও ছাত্র নির্বাচনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। ছাত্র নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, পাঠক্রমের কি পরিবর্তন হবে বা পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি কি হবে এগুলি অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌দের বিচার্য। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক নির্বাচনে নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে তাঁদের এই বৃত্তির প্রতি আকর্ষণ আছে কি না। তাছাড়া গ্রন্থাগারবিজ্ঞান এমনই একটি বৃত্তি যাতে ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই গবেষণামূলক কাজকর্ম করার প্রবণতা থাকা উচিত।

অবশ্য এই নির্বাচনের সমস্যাটি অত্যন্ত কঠিন। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারবৃত্তিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে এই বৃত্তিতে কজন আসছেন? গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর একটি আদর্শ চিত্র মনে মনে ঠিক করা আর বাস্তবে তার সন্ধানলাভ করা ঠিক এক কথা নয়। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান পড়তে ছাত্ররা কেন আসে তার সঠিক জবাব পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাবে কেউ অভিভাবকের ইচ্ছায়, কেউ জীবিকার্জনের নিশ্চিত সহায়ক হবে ভেবে, কেউ শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, কেউ বা কোন একটা কিছু পড়তে হয় তাই এই লাইনে এসেছেন। শিক্ষার্থীর এই বৃত্তিতে প্রবণতা আছে কিনা তা নির্ণয় করার পদ্ধতি বিশেষজ্ঞরাই ঠিক করবেন—তবে খুব প্রতিভাধর ছাত্র ও শিক্ষককে হয়তো তৈরী করা যায় না; তাঁরা প্রতিভা নিয়েই জন্মান। কিন্তু সে কথা হয়তো এক-একজন ডিউই, বেরউইক সেয়ার্স বা রঙ্গনাথনের বেলাতেই প্রযোজ্য কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর প্রণবতা বিচার করবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা নানারকম 'টেস্ট'-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি কলেজী শিক্ষার স্তরে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকে অন্যতম বিষয়রূপে স্থান দেওয়া হয় তবে বোধ হয় পূর্ব থেকেই ছাত্ররা এই বৃত্তি নির্বাচন করবার সুযোগ পায়। তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লাইব্রেরী স্কুলগুলির বিকাশ, পরীক্ষা-পদ্ধতি, সিলেবাস, প্রশাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড বা ইউ জি সি-র লাইব্রেরী কমিটি চিন্তা করতে পারেন। তবে এই সকলের আলোচনায় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিশ্চয়ই রাখা উচিত।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার ৩টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন :—

(১) আধা-বৃত্তিকুশলী (Semi-Professionals) (২) বৃত্তিকুশলী (Professionals-Basic course) (৩) উচ্চতর শিক্ষা (Advanced course)। আধা-বৃত্তিকুশলীদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স, বৃত্তিকুশলীদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সের সুপারিশ করেছিলেন। বাংলাদেশে হয়তো এখনও অনেক আধা-শিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীর প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাই বলে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করে ব্যাঙের ছাতার মত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা-কেন্দ্র গজাতে দেওয়ার নীতি সমর্থন করা যায় না।

শিক্ষার মান কি করে উন্নত করা যায় এই নিয়ে চিন্তাশীল লোকেরা এবং শিক্ষাবিদেরা যখন মাথা ঘামাচ্ছেন শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন রাজ্যে সফর করছেন তখন পশ্চিম বাংলার মান উন্নত করা দূরের কথা, ব্যাপকহারে গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির উৎসাহে মান আরো নীচে নামাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। চাহিদা নির্ণয় না করে যদি শুধু নিম্নমানের গ্রন্থাগারকর্মী সৃষ্টি করে যাওয়া হয় তবে গ্রন্থাগারবৃত্তি তথা দেশের ক্ষতিই করা হবে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলিরই পরিচালনা করা উচিত।

বর্তমান যুগে যে কোন সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, কি কলেজী শিক্ষা কিংবা কারিগরী শিক্ষা সকল শিক্ষা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। যুদ্ধোত্তর কালে লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, মস্কো—দুনিয়ার সর্বত্র সামাজিক কাঠামো ভয়ানকভাবে বদলে যাচ্ছে। হনোলুলু কিংবা আমাদের কলকাতা সর্বত্র অর্থনীতি ও মতাদর্শের সংঘর্ষ ও বিপর্যয়—এক চরম উত্তেজনার যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সম্প্রতি স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারতবর্ষের মানুষ আমরা ; আমাদের বৈষয়িক উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষা যাতে সুপরিকল্পিত ও সবিশেষ উপযোগী হয় সেটা শিক্ষাজগৎ সংশ্লিষ্ট সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত।

বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি। এই চ্যালেঞ্জ একদিকে সামাজিক পরিবর্তনের আর অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতির। একদিকে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ ও চাহিদা যেমন পৃথিবীর সর্বত্র বেড়ে যাচ্ছে তেমনি আজ আমাদের শিক্ষানীতির পুরাতন আদর্শ আর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটে যাওয়ায় আজকের সমাজে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবৈজ্ঞানিক ও টেকনিসিয়ানদের চাহিদাই বেশি। তাছাড়া বর্তমানে পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে মেয়েরা হাজারে হাজারে উচ্চশিক্ষা এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে আসছেন এবং তাঁরাও যে পুরুষের মতই উচ্চস্তরের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন একথা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে পূর্বে যে কাজ নিষ্পন্ন হত তা যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হতে সুরু হয় ; আর আজ বিংশ শতাব্দীতে মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা পূর্বে যে কাজ নিষ্পন্ন হত তাই করে দিচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। কিন্তু 'মহাশূন্য যান' উদ্ভাবনকারী ও 'এটম' নির্মাণকারী বৈজ্ঞানিকেরও যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি কি প্রয়োজন নেই দার্শনিক, কবি, ভাবুক, সমাজবিজ্ঞানী বা মানবতাবাদীর? কারণ যন্ত্র নয় মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।

Editorial: Postgraduate teaching of Library Science as a modern concept of Professional and Technical Education.

পুস্তক তালিকার বিন্যাস

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

নানা প্রকার পুস্তক তালিকা আছে এবং সেই সমুদয় পুস্তক তালিকাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়— ১। প্রাথমিক পুস্তক তালিকা অর্থাৎ Primary bibliography ২। দ্বিতীয় স্তরের পুস্তক তালিকা বা Secondary bibliography।

প্রাথমিক পুস্তক তালিকা বলতে সেই সকল পুস্তক তালিকা যা অন্য কোন পুস্তক তালিকার সাহায্য নিয়ে করা হয় নি। অর্থাৎ এই ধরনের পুস্তক তালিকায় যে সমস্ত বইয়ের উল্লেখ থাকে সেই সকল বইয়ের আর কোথাও বা অন্য কোন পুস্তক তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এই সকল পুস্তক তালিকাকে বলা যেতে পারে মূল পুস্তক তালিকা।

প্রাথমিক পুস্তক তালিকার সাহায্য নিয়ে যে সব পুস্তক তালিকা করা হয় সেই সকল পুস্তক তালিকা হলো দ্বিতীয় স্তরের বা গৌন পুস্তক তালিকা। এই সকল পুস্তক তালিকায় অন্যান্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত পুস্তকে গবেষণার সুবিধার জন্য নতুন করে সাজান হয়। এদিক থেকে বিচার করলে পুস্তকতালিকার পুস্তক তালিকাকে Secondary Bibliography বলা চলে।

পুস্তক তালিকা থেকে বিষয় বস্তু সংগ্রহ করবার পর সেগুলিকে কোন একটি নিয়মে সাজাতে হবে। বিষয় বস্তু সাজাবার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে যে পুস্তক তালিকা করা হচ্ছে সেই পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য। পুস্তক তালিকা আক্ষরিক ভাবে সাজান যেতে পারে কিন্তু পুস্তক তালিকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিষয়ের উপর গবেষনার সাহায্য করা। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে পুস্তক তালিকা কেবল আক্ষরিক ভাবে সাজান থাকলে তা বিশেষ কাজের হবে না কারণ কোন বিষয়ের সমুদয় বই বা সেই বিষয়ের উপর যে কোন লেখা অনুসন্ধানকারী এক স্থানে পাবে না। সুতরাং কোন বিষয়ের জাতি বিচারের ছক অনুযায়ী পুস্তক তালিকা সাজান ভালো। কিন্তু কেবল মাত্র জাতি বিচারের ছকের উপর নির্ভর করে পুস্তক তালিকা সাজালেও কাজ হবে না, তবে কিছুটা সুবিধা হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন দেখা যাক বিভিন্ন ধরনের পুস্তক তালিকা কিভাবে সাজালে সুবিধে হয় :—

একজন লেখকের লেখা পুস্তকের তালিকা

একজন লেখকের লেখা নিম্নলিখিতভাবে বিন্যাস করলে ভালো হয় :—

(ক) রচনাবলী বা সংগৃহীত লেখা।

(খ) ছোট-খাট সংগ্রহ যেমন : "প্রেমের গল্প" "ছোট-গল্প" ইত্যাদি।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন লেখার ভিন্ন ভিন্ন বই আক্ষরিক ভাবে সাজান থাকবে। প্রত্যেক বইয়ের পর থাকবে সেই বই সম্বন্ধে অন্য বইয়ের উল্লেখ।

(ঘ) যে সব বই একই লেখকের বলে ধরে নেওয়া হয়।

(ঙ) নির্বাচিত লেখা।

(চ) ক থেকে ঙ পর্যন্ত যে সব বই থাকবে সে সব বইয়ের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ থাকলে প্রত্যেক বইয়ের পর সেই বইয়ের অনুবাদ থাকবে। প্রথম থাকবে যে ভাষায় তালিকা করা হচ্ছে সেই ভাষায় অনুবাদ পরে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ।

(ছ) লেখকের দ্বারা অনুবাদ করা অন্য লেখকের বই।

(জ) শেষে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে থাকবে লেখক ও তার লেখা সম্বন্ধে বই: প্রথমে সমালোচনা পরে জীবনী।

(ছ) শেষে "অন্যান্য"—অর্থাৎ যে সব বিষয় বস্তুকে উপরের কয়টি দফায় ফেলা যাবে না।

এইগুলি হলো সাধারণ নিয়ম এবং এই নিয়মগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, জানা, অজানা বা অল্প জানা বই সহজে খুঁজে বার করার সুবিধে করা। এইটি হলো প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু পুস্তক তালিকার আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে যেমন লেখকের চিন্তা ধারার কোন একটি দিককে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা বা সম্বন্ধযুক্ত বইয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এদিক থেকে গ্রন্থাগারের তালিকা করার এবং পুস্তকের জাতি বিচার করার অভিজ্ঞতা অনেক কাজে লাগবে।

অনেক সময় লেখক-জীবনের ক্রমবিকাশ গবেষনার জন্য কাজে লাগে; এদিক থেকে বিচার করে দেখলে পুস্তকের তারিখের সহিত একটা সম্পর্ক দেখান প্রয়োজন হয় এবং অনেক সময় লেখকের সমসাময়িক লেখার ভিতর লেখক সম্বন্ধে উল্লেখ থাকলে তা উল্লেখ করা দরকার হয়।

লেখকের লেখা পুস্তকাকারে বার হবার পূর্বে নানাবিধ পত্রিকায় সে সব লেখা বার হয়ে থাকতে পারে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা, পুস্তকাকারে বার হবার সময় নানাবিধ পরিবর্ত্তন হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক লেখার সহিত, সেই লেখা যে পত্রিকায় এবং যে তারিখে বার হ'য়েছে সেই পত্রিকা ও তারিখের উল্লেখ করা দরকার।

একই বইয়ের বহু সংস্করণ উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে তা মূল সংস্করণের পর উল্লেখ করতে হবে সংস্করণের তারিখের পর্যায়ক্রমে।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে লেখার পুস্তক তালিকা

একটি মানুষের জীবনকে তার কর্ম ক্ষেত্র হিসাবে ভাগ করা যেতে পারে যেমন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনীকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে: বিজ্ঞানী ও ব্যবসাদার কিংবা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ও ব্যবসাদার। একটি মানুষের জীবনকে তার জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী ভাগ করা যেতে পারে যেমন: শিশু অবস্থা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থা। কিংবা জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অনুযায়ী ভাগ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখিত বস্তু উপরিলিখিত নানা ভাবে সাজান যেতে পারে এবং

সেই ব্যক্তির দ্বারা লিখিত চিঠিপত্র সাধারণতঃ তার জীবনী হিসাবে ধরে নিয়ে তাও উপরিউক্ত নিয়মে সাজান দরকার।

কোন একটি স্থান সম্বন্ধে লেখা পুস্তকের তালিকা

(ক) প্রথম সম্পূর্ণ পুস্তক যা ঐ স্থান সম্বন্ধে লেখা হয়েছে।

(খ) পরে আসবে সেই সব বই যাতে স্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

(গ) পত্রিকা।

(ঘ) সেই স্থানের শাসন-সম্বন্ধীয় বই ও কাগজ-পত্র।

(ঙ) স্থান-সম্বন্ধীয় আইন।

(চ) স্থানের কোন বিশেষ অংশ সম্বন্ধীয় বই।

(ছ) স্থানের অধিবাসীর উপর লেখা বই।

নানা বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা করা যেতে পারে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিষয়গুলিকে কতকগুলি বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করে নিতে হয় এবং পরে প্রত্যেক ভাগটিকে পুনরায় বিষয় বস্তু অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভাগ করে নিতে হয়ঃ ধরুন ললিত কলা সম্বন্ধে তালিকা করতে হবে। প্রথম ভাগ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—প্রত্যেক ভাগটিকে যুগ অনুযায়ী ভাগ করতে হবেঃ শিশু অবস্থা, স্বর্ণ-যুগ, আধুনিক। এক একটি যুগকে আবার কলার Technique বা সম্প্রদায় হিসাবে ভাগ করতে হবে এছাড়া কলার বস্তু এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করবার প্রয়োজন হবে যেমনঃ রং-তুলি-কাপড়, পাথর, হাতীর দাঁত ইত্যাদি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের ছবি, still picture ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে পুস্তকের জাতি-বিচারের কোন ছকের সাহায্য নিলে বিশেষ কাজ পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে একখানি বইয়ের ভিতরে একটি বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর লেখা থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যথাস্থানে একখানি বইয়ের বিভিন্ন লেখার উল্লেখ করতে হবে।

Arrangement of Bibliographies
By Rajkumar Mukhopadhyay

সরকারী সাহায্য ও গ্রন্থাগার

অরুণকুমার ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উনবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে লাভ করে নিজেদের সত্যি ভাগ্যবান মনে করতে পারেন। অধ্যাপক বসু একাধারে নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বাংলা দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্যতম। রাজনৈতিক চিন্তায় ও কর্মে তিনি প্রকৃত গান্ধীবাদী। যে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের ঋজুতা অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে।

গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর সুচিন্তিত, প্রশ্নোদ্রেককারী, আন্তরিক ও স্পষ্ট অভিভাষণ এবং তৎসহ মূল্যবান আলোচনা সম্মেলনে উপস্থিত যে কোন সজাগ প্রতিনিধি জীবনে ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশের গ্রন্থাগারকর্মীরা যদি মাঝে মাঝে এইসব চিন্তাশীল ব্যাক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ লাভ করেন তবে আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলন যে সত্যিই শক্তিশালী হবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চিত।

আমার প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে এই ভূমিকা অনেকেরই কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। পাঠকের অবগতির জন্য তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমি এই প্রসঙ্গ আলোচনায় উৎসাহিত হয়েছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বসুর অভিভাষণটি পাঠ করে।

অধ্যাপক বসু তাঁর অভিভাষণের প্রথমাংশে গ্রন্থাগার পরিচালনায় আমাদের সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন। অর্থাৎ সরকারী সাহায্য ছাড়া জনসাধারণের সাহায্যের উপরই তিনি নির্ভর করতে বলেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে :—

১। বৃটিশ শাসনের সময় সরকারী সাহায্য বর্জন করে দেশের অর্থবান ভূস্বামীদের আর্থিক সাহায্য ও সাধারণ সাহিত্যানুরাগী গৃহস্থ পাঠকের প্রায় মুষ্টিভিক্ষার দ্বারাই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়েছে।

২। আজও বাংলা দেশে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা থেকে জনপরিচালিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা অনেক বেশী (প্রায় ৪০০০)

৩। জমিদারী প্রথার বিলোপ ও নূতন শিল্পপতি ও বানিজ্যপতিগণ সংস্কৃতির উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করছেন না বলে সাধারণ কর্মীদের মনে সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে দেশের মানুষ কলের অভাবে চরকা ও চরকার অভাবে তকলি দিয়েও সুতা কেটে কাপড়ের অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছে সে দেশে আত্মবিশ্বাসের শক্তিকে আশ্রয় করলে অঘটন ঘটানো যেতে পারে।

৪। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা রচনার চেষ্টায় রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দেশে সরকারী সাহায্য ছাড়া আমাদের আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করাই শ্রেয়।

৫। গ্রন্থাগার পরিচালনায় রাজনৈতিক আদর্শকে একেবারে বাদ দেওয়া না গেলেও একটি বিশেষ পথে মানুষের মনকে পরিচালিত করা তার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

পাঠকের সুবিধার জন্যই আমি সরকারী সাহায্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসুর মতামত সম্বন্ধে যতটুকু বুঝেছি ততটুকু উল্লেখ করলাম। এখন একজন সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মী হিসাবে ভেবে দেখা যাক যে তাঁর নির্দেশ আমরা কতটুকু পালন করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে একটি জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার থেকেই এই সমস্যাটি বিচার করছি।

১৯৪৭ সালের পরে আমাদের দেশের মানসিকতায় যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ শাসনে জনসাধারণের কোন প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য সুলভ ছিল না এবং জনসাধারণও সরকারী সাহায্য লাভকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন বলে সরকারী সাহায্য তাঁদের কাম্য ছিলনা। বিদেশী সরকার বলে ত' বটেই তাছাড়া তখনকার দিনে গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানগুলি বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বলে সরকারী সাহায্য লাভের আশাও ছিলনা। সরকারের কোপদৃষ্টির জন্যেই জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের সংগঠন মনে করে যথাসাধ্য সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখতেন কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। জনসাধারণ জাতীয় সরকারকে নিজেদের সরকার বলে মনে করল এবং সরকারও সমাজের সর্বাত্মক উন্নতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হল। এই সর্বাত্মক উন্নতির প্রতিশ্রুতিতে গ্রন্থাগারব্যবস্থাও বাদ রইল না। স্বভাবতঃই স্বাধীনতালাভের প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের মনে এই সব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার যে আগ্রহ ছিল তা দিনে দিনে স্তিমিত হতে থাকল। সরকার নিজস্ব গ্রন্থাগারব্যবস্থার কথা ঘোষণা ও কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার ফলে এবং বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে এককালীন কিছু কিছু অর্থসাহায্য দিতে আরম্ভ করায় জনসাধারণ আর্থিক সাহায্য করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে সরকারী সাহায্য লাভের ফলে কি গ্রন্থাগার সদস্যরা চাঁদা দেওয়া বন্ধ করলেন? না, তা করেননি বটে, তবে গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রেই জানেন যে চাঁদার অর্থে গ্রন্থাগারের বই বাঁধাইয়ের খরচাও ওঠেনা। তখন কেউ বলতে পারেন যে—সরকারী সাহায্য লাভের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীরা আর আগের মত জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করেন না। কথাটা ঠিক নয়। তার প্রমাণ হিসেবে আমি যে বেসরকারী গ্রন্থাগারের কর্মী তার উদাহরণ দিতে পারি। গ্রন্থাগারটি ১৯৫১ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান হয় গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য। খুব অল্প আয়াসেই প্রায় দুহাজার টাকা সংগৃহীত হয় এবং কিছুদিন পরে বিনামূল্যে সংগৃহীত একখণ্ড জমিতে নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। সেই

গ্রন্থাগারে ১৯৬৪ সালে যখন স্থানাভাব দেখা দেয় এবং নতুন গৃহের জন্য আবার স্থানীয় জনসাধারণ এবং পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বেশী সদস্যের কাছে অর্থ-সাহায্য বা সংগ্রহ করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন অধিকাংশের মতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের আশা বৃথা ; সেজন্য এমন চেষ্টা করা হোক যাতে সরকারী কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে গ্রন্থাগারটি যুক্ত করা যায়। উপরন্তু এই গ্রন্থাগারটির জন্য পূর্বে আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য যখনই জনসাধারণের ও সদস্যদের কাছে এককালীন সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে তখনই কিছু না কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের পর থেকে অনিয়মিত ভাবে বাৎসরিক ১০০৲ টাকা সরকারী ও ৫০৲ টাকা পৌরসভার সাহায্য লাভের পর থেকে তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জনসাধারণ যে সরকারী সাহায্যকে আর ঘৃণার চক্ষে দেখেন না বরং ন্যায্য দাবী বলে মনে করেন এই একটি উদাহরণই তার প্রমাণ। অধ্যাপক বসু যে ৪০০০ বেসরকারী গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করে বেসরকারী উদ্যোগের ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন তার বহু সংখ্যকেরই আজ এই অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিবর্তনশীল মানসিকতার কথা বাদ দিলেও যে মৌলিক প্রশ্ন অনুত্থাপিত থেকে যায় তা হোল আমরা বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছি ; সেই বিনাচাঁদার গ্রন্থাগারব্যবস্থা কি সরকারী উদ্যোগ ছাড়া সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যবস্থায় সম্ভব ? নিশ্চয়ই নয়। বরং আরও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী গ্রন্থাগারব্যবস্থা পরিচালিত না হওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করছি এবং জনসাধারণকে আরও সরকারনির্ভরশীল করে তুলছি।

অধ্যাপক বসু আর একটি মূল্যবান প্রশ্ন তাঁর ভাষণে উত্থাপন করেছেন তা হোল— "ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা রচনার চেষ্টায় উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের অধিকাংশ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছেন।" এবং এই অবস্থায় তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দেশে হয়ত আমাদের স্বাধীন সত্তাকে বজায় রাখার জন্য এই "কেন্দ্রীভূত করার" প্রচেষ্টার বাইরে থাকতে হবে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে। নীতিগতভাবে এই মতকে সমর্থন করেও বাস্তব অবস্থায় তা কতদূর সম্ভব আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে শুধু সরকার নয়, আমাদের দেশের দু'একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ছাড়া সমস্ত দলই প্রায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই মতের প্রতি ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছেন। বর্তমান জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই মতের পাশাপাশি অন্য কোন বিকল্প মত যে খুব বেশী কার্যকরী হবে তার আশা কম। অতএব এদিক থেকেও আমরা সরকারনির্ভরশীল হতে চাইছি এবং অনেকাংশে ইতি মধ্যে হয়েও পড়েছি।

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থায় জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারের দাবী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসারের মূলে গ্রন্থাগার

পরিচালনায় বেসরকারী কর্মপ্রচেষ্টা (যা এক সময়ে খুবই শক্তিশালী ছিল) ক্রমশঃই সঙ্কুচিত ও স্তিমিত হয়ে সরকার নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে।

সবশেষে অধ্যাপক বসু এই সরকারনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার যে আদর্শচ্যুতি ঘটতে পারে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে রাজনীতিকে একেবারে বাদ না দিয়েও মনে করেন যে মানুষের মনকে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে, যে কোন সৎ ও চিন্তাশীল গ্রন্থাগার কর্মী তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন।

গণতন্ত্রের 'পীঠভূমি' ইংলণ্ডে কি ঘটে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল অনেক সময়েই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের দলীয় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে থাকেন। এই অভিযোগ কোন একটী বিশেষ দল সম্পর্কে নয়, আমার মনে হয় যে—কোন রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতা লাভ করবেন তখনই এই প্রচেষ্টা চালাবেন। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তো সরাসরি সরকারী দলের হাতের মধ্যেই থাকে ; বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও যখন সরকারী সাহায্যলাভের প্রচেষ্টা আরম্ভ করে তখন সরকারের দলীয় প্রভাব অনেক সময়েই এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। এখানে একতরফা ভাবে সরকারী দলকেই দায়ী করে লাভ নেই, তারা না চাইলেও অনেক সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ নিজেরাই আগে থেকে নিজেদের 'চরিত্র অমলিন' রাখবার জন্য হয়ত সরকারবিরোধী মতামত পোষন করার জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন (যাঁর সাহায্য ও সাহচর্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল)। অপরপক্ষে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকেও হয়ত সম্মানপ্রদর্শন করে থাকেন শুধু এই কারণে যে তিনি সরকারী দলের একজন প্রভাবশালী সদস্য ; সব থেকে মজার ব্যাপার এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকে চাপে পড়ে নয় আগে থেকে হিসেব করে। গণতন্ত্র এক উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক প্রথার মধ্যেই এই ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে থাকে। এই জন্যেই বোধ হয় অধ্যাপক বসু আমাদের বার বার আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে বলেছেন।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যদি গ্রন্থাগারের প্রকৃত আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে হয় অর্থাৎ মানুষের সৎ ও স্বাধীন চিন্তাকে তার নিজস্ব পথে চলতে ও বিকাশলাভ করতে সাহায্য করতে হয় তবে আমার মনে হয় সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগারব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে গেলে বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে না। অর্থনৈতিক কারণে বৃহৎ ও আধুনিক গ্রন্থাগারব্যবস্থার জন্য নিশ্চয়ই সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তারই পাশাপাশি স্বাধীনভাবে পরিচালিত সম্পূর্ণ বেসরকারী সাহায্যে কিছু কিছু গ্রন্থাগার থাকবে যা নীতিগতভাবেই সরকারী সাহায্য লাভের চেষ্টা করবে না। এই অবস্থার একটা সুফল হয়ত এই হবে যে জনসাধারণের এক অংশ যাঁরা এখন সামান্য সরকারী সাহায্য লাভের জন্য বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে পূর্বের ন্যায় সাহায্য করতে উৎসাহিত হচ্ছেন না তাঁরা হয়ত আবার সাহায্য করার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

শুধুমাত্র সরকারী প্রভাবমুক্ত স্বাধীনভাবে পরিচালিত আদর্শ গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য। এইসব গ্রন্থাগারগুলির সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আকৃতিগত বিকাশের সম্ভাবনা হয়ত খুবই কম কিন্তু গুণগত ও আদর্শগত ভাবে এরা উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে এবং যার ফলে সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

[উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের অভিভাষণের সম্পূর্ণ পাঠ 'গ্রন্থাগার'-এর ১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে]

Libraries and Government grant.
By Arun Kumar Ghosh

অবহেলিত পাঠক

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য মনীষী রঙ্গনাথন কৃত পঞ্চবিধির অন্যতম দুটি বিধি—"Every reader his book" এবং "Save the time of the reader." এই দুটি বিধির লক্ষ্যস্থল বিরাট, বৈচিত্র্যময় পাঠক সমাজ। গ্রন্থাগার গ্রন্থসংরক্ষণ-কেন্দ্র নয়, তার সামনে সজীব, সদা-পরিবর্তমান পাঠকসমাজ রয়েছে—যাদের গ্রহণে বর্জনে, ভাললাগায়-মন্দলাগায় গ্রন্থাগারের গড়ে ওঠা অনেকাংশে নির্ভর করে।

আমাদের দেশের সর্বত্র সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে আজও প্রচলিত হয় নি, তার কিছু কারণ নিহিত আছে পাঠকের প্রতি অবহেলায়। গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য তার ব্যবহার-কারীদের তৃপ্তি সাধন করা। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্যকে অবহেলিত রেখে উপলক্ষ্য অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের খুঁটি-নাটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়জীবনে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যায় না। বাঁধা রুটিনে পড়া এবং পরীক্ষা এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে রাখতে বিদ্যালয়ের এগার বছর চলে যায়। বর্তমানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য।

বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে এসে প্রথম ছাত্ররা গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন হয়। সাধারণ কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্ণধার একজন শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। সহকারী হিসেবে যিনি থাকেন তিনি বই দেওয়া-নেওয়াই করে থাকেন। গ্রন্থাগারিককে একা হাতে গ্রন্থাগার পরিচালনার যাবতীয় কাজ করতে হয়। আবার ছাত্রসংখ্যা যত, প্রয়োজনীয় পাঠ্য বা সহকারী অন্য পুস্তক সংখ্যা তত নয়। সময় ও স্বল্প উপকরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে ছাত্রদের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। ওদিকে জিজ্ঞাসু মন প্রয়োজনের মুহূর্তে গ্রন্থাগার থেকে তার খোরাক না পেয়ে হয়ে ওঠে বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। নেহাৎই পরীক্ষার তাড়নায় তাকে বিরস বদনে ততোধিক বিষণ্ণ গ্রন্থাগারিকের মুখোমুখি হতে হয়।

পক্ষান্তরে, যে সব গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা নেই, সেখানেও পাঠকের প্রতি সমান ঔদাসীন্য। 'কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা' এ নীতি আর যেখানেই প্রযোজ্য হোক না কেন, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর পক্ষে মোটেই নয়। কোন একটি বিশেষ চাহিদা নিয়ে পাঠকরা আসেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের সেই চাহিদা পূরণ করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতি গ্রন্থাগারেই Demand Slip-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিভিন্ন কমিটির হাত পেরিয়ে Demand slip-এর বইগুলোর ক্রয়যোগ্যতার স্বাক্ষর অর্জন করা এবং পাঠকের সামনে আবির্ভূত হবার জন্য নেপথ্য সজ্জা যখন সারা হল পাঠক তখন হয়ত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। ফলে পাঠক সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় সম্পর্কে গভীর অনাস্থাই পোষণ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় বই থাকা সত্বেও সেগুলো জটিল charging প্রথার বেড়া ডিঙিয়ে পাঠকের হাতে আসতে অনেক সময় লাগে। বইয়ের চাহিদা জানিয়ে slip দেবার পর এত দীর্ঘ সময়ের অপব্যবহার পাঠকের ধৈর্যকে নষ্ট করে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সহজেই পাঠক মন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ।

সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্তরিকতার অভাব। আমাদের এই দারিদ্র্য-পীড়িত অশিক্ষিত দেশে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সৌভাগ্য অর্জন করেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা না থাকায় তাঁরা নিয়ম বহির্ভূত আচার-আচরণও করে থাকেন। যেমন, গ্রন্থাগারের পাঠগৃহের অভ্যন্তরে জোরে কথা বলা, আলোচনা করা, নিজেদের সঙ্গের জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে যাওয়া ইত্যাদি। গ্রন্থাগারকে উপযুক্তরূপে ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়াও গ্রন্থাগার পরিচালনার অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু এ শিক্ষায় চাণক্যের মত উপদেশের বেত্রদণ্ড আস্ফালন একান্ত নিষ্ফল। মনে রাখতে হবে, যাঁরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে আসেন, তাঁরা একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রম করেছেন এবং সেক্ষেত্রে কর্মীদের হতে হবে সহিষ্ণু।

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, পাঠকরা তাঁদের প্রয়োজন বা চাহিদা সম্পর্কে সচেতন নন। তাঁরা নিজেরা card catalogueএর মধ্যে থেকে সমস্যা পূরণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীর সহযোগিতা প্রয়োজন। একবার যদি পাঠক বুঝতে পারেন যে গ্রন্থাগার তাঁদেরই জন্য এবং গ্রন্থাগারকর্মীও সর্বদা তাঁদের সেবা করবার জন্য সোৎসুক, তাহলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় পাঠকদের নিয়ে অযথা সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর বিচিত্র সমস্যাকে সত্বর নিরসনের জন্য গ্রন্থাগারের পরিচালনপদ্ধতি সরলীকৃত হওয়া প্রয়োজন। পাঠক কী চায়, কেন চায় শুধু তাই জানলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তাদের প্রয়োজন মেটানো যায় তাও দেখতে হবে। পাঠকের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই পুস্তকক্রয়, পুস্তকপরিগ্রহণ, পুস্তকবিন্যাস প্রভৃতি করা উচিত।

(১) Demand slip-এর বইগুলির ক্রয়যোগ্যতার নির্বাচন যত শীঘ্র সম্ভব করা উচিত এবং কোন নোতুন বিষয়ের পুস্তকক্রয়ের পূর্বে তার Demand পাঠকমহলে আছে কিনা সে খোঁজ নেওয়া উচিত। Demand slip-এর বইগুলির পরিগ্রহণ সত্বর নিষ্পন্ন করাই বিধেয়।

(২) বই লেন-দেন প্রথা, যথাসম্ভব সরল করা উচিত, বিশেষতঃ ন্যূন কর্মীসংখ্যায়। বই দেওয়া-নেওয়ায় দেরী করে অযথা পাঠকের সময় নষ্ট করা উচিত নয়;

(৩) গ্রন্থাগার যে পাঠক-সাধারণের জন্য সর্বদা সজাগ, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "Display Work।" Display মানে যেমন তেমন করে কতকগুলো বইয়ের মলাট অনন্তকাল ধরে ঝুলিয়ে রাখা নয়। হয়ত প্রশ্ন উঠবে, গ্রন্থাগারের অর্থসংস্থান এত বেশী নয়, যা Display-র জন্য খরচ করা চলে;

Display-র জন্য অর্থ অপেক্ষাও যে বস্তুটি অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হ'ল সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথমতঃ, এমন স্থান Display-র জন্য নির্বাচন করতে হবে—যা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু একই জায়গায় বার বার Display করা ঠিক নয়—তাতে পাঠকের বিস্ময় বোধ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ সাজানোর পরিবর্তন করা দরকার। Display যেন একঘেয়ে হয়ে না যায়। নোতুন নোতুন ভঙ্গী, নোতুন নোতুন বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ পাঠকের দৃষ্টিকে ক্ষণকালের জন্যও আকৃষ্ট করবে।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন হলে বিশেষ কোন নোতুন বইয়ের মূল বক্তব্য লিখে দেওয়া দরকার।

এইভাবে গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলে পাঠকমন গ্রন্থাগারের সেবামুখিনতা সম্পর্কে সচেতন হবে।

(৪) পাঠক সম্পর্কে সচেতনতা গ্রন্থাগারের ক্রম-বৃদ্ধির সহায়ক—এ সত্য স্বীকৃত হয়েছে বলেই Open access ব্যবস্থার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

Open access প্রথায় পাঠক এবং পুস্তকের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। পাঠক তাঁর প্রয়োজনমত এবং রুচি অনুযায়ী পুস্তক স্বহস্তে নির্বাচনের সুযোগ লাভ করেন।

কিন্তু Open access প্রথা নীতিগতভাবে সমর্থিত হলেও কার্যত প্রচলিত হয় নি। কারণ,

(ক) গ্রন্থাগারে এমন পাঠকও আসেন, যাঁরা নিজেদের সময় ও শ্রম সংক্ষেপ করার জন্য মূল্যবান গ্রন্থের পাতা কেটে নিয়ে যান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল্যবান পুস্তক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে চুরিও করেন। Open access প্রথায় প্রতিটি পাঠকের বই বাছাই তীক্ষ্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, ফলে উক্ত দুষ্কার্যের মাত্রা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) পাঠক-সাধারণ নিজহাতে গ্রন্থ-নির্বাচনের সময় অনেক গ্রন্থ দেখে থাকে। যেহেতু, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ সেহেতু বইগুলি স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় না; নির্দিষ্ট স্থানে পুস্তক না থাকায় তা বহুজনের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় পাঠক আপন সুবিধার্থে পুস্তক ইচ্ছাকৃতভাবে স্থানভ্রষ্ট করে। বড় সংগ্রহশালায় তখন উক্ত পুস্তক খুঁজে বার করা যায় না।

(ঘ) উঁচু তাক থেকে বই নেওয়ার সময় গ্রন্থ ব্যবহারে অনভ্যস্ত পাঠক বইগুলোর ক্ষতি করে, তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যের হানি করে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Open access-এর এই অসুবিধাগুলো দূর করা একেবারে অসাধ্য নয়।

Open access-এর স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হল (ক) এই প্রথায় পাঠক স্বাধীনভাবে

বই বেছে নেবার সুযোগ পায়। ফলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে পাঠস্পৃহা দেখা দেয়। শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বই দেওয়া নেওয়া নয়। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হাসপাতালের চেয়েও বেশী, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আগেই বলেছেন। বাধ্যতামূলক পড়াশোনাকে আনন্দের পড়াশোনায় পরিণত করতে সাহায্য করে নিজে হাতে বই বেছে নেওয়া। যেখানে পাঠক নির্দিষ্ট একটি বা দুটি বইয়ের প্রার্থী, সেখানে যদি তাঁকে হাজার হাজার বইয়ের সামনে দাঁড় করানো যায় তবে নির্দিষ্ট বইটি না পেলেও কোন একটি তিনি পছন্দ করবেন। এই নিয়মে প্রতিটি পাঠক তার পুস্তক পায়, আবার প্রতিটি পুস্তক পায় তার পাঠক।

(খ) কারুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়, সম্পূর্ণ স্বইচ্ছায় বই ঘাঁটার আনন্দ ক্রমে ক্রমে উন্নত পাঠরুচি গড়ে তোলে। তাছাড়া কৌতূহলী পাঠক এবং গবেষকদের বই ঘেঁটে উপাদান আহরণের প্রবৃত্তিকেও তৃপ্তি দেয় এই প্রথা যা closed access-এ সম্ভব নয়।

(গ) Closed access-এ slip দিয়ে বই হাতে পাবার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করা ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিকর। Open access-এ পাঠক কখনও গ্রন্থাগারের প্রতি বিরক্তি বোধ করেন না। এই প্রথায় পাঠকের সময়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা সুবিচার করা হয়।

(ঘ) Open access-এ নির্দিষ্ট বইটি না পেলেও গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি পাঠক অবিশ্বাসী হন না। কিন্তু Closed access-এ পাঠক সহজেই কোন পুস্তকের অপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে কর্মীর আগ্রহ এবং অনুসন্ধানের অভাব ভেবে নেয়। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রকৃত কাজের ক্ষতি করে।

(ঙ) ভীড়ের সময় কর্মীরা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন পাঠকদের বই যোগাতে। সুতরাং বই বাছার কাজটি যদি পাঠকদের হাতে দেওয়া যায় তাহলে বই লেন-দেনের ব্যবস্থা আরও সুচারুরূপে শীঘ্র সম্পাদিত হতে পারে।

এই ব্যবস্থাকে প্রচলিত করতে হলে প্রথমে হয়ত আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে। তার কারণ পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব। গ্রন্থাগার কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সুতরাং তার সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ব্যবহারকারীরাই অসুবিধেয় পড়বে—এ বোধ সর্বাগ্রে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন। পাঠক সম্প্রদায়কে যথোচিত শিক্ষা দেওয়াও হবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। আরও দু'একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

যেমন, (ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলীর বিস্তৃত তালিকা তৈরী করে পাঠগৃহের সামনে রাখা যেতে পারে। কারণ, কর্মীদের পক্ষে প্রতি পাঠককে সব নির্দেশ প্রদান সবসময় সম্ভব হয় না।

(খ) পাঠকরা যাতে পুস্তকের সন্নিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়, তার জন্য Stack room-এর সামনে পুস্তকবিন্যাসের একটি chart টাঙানো উচিত। এ ব্যবস্থায় পাঠক জানতে পারবেন, তাঁর বইটি কোন স্থানে সংরক্ষিত আছে। পুস্তকগুলি যে তাঁদেরই সুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত—একথা বুঝলে পুস্তক স্থানভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

(গ) পুস্তকগুলির বিন্যাসের নির্দিষ্ট ক্রম যাতে ভঙ্গ না হয়, সেই জন্য পাঠকদের পঠিত বইগুলিকে তুলে রাখতে দেওয়া উচিত নয়। গ্রন্থাগারকর্মীরা বইগুলি স্বস্থানে সন্নিবেশিত করবেন।

(ঘ) বই যাতে চুরি না যায়, সেই জন্ম সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মনীষী রঙ্গনাথনের মতে –

"Rare and costly books, pamphlets and under-size books, books with too many plates and other weakly built books, are not to be given open access. They are kept in "closed access."

পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রন্থাগারব্যবস্থার উপরিউক্ত ত্রুটিগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষে বলি, গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল প্রবৃত্তি হওয়া উচিত সেবা। দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, দায়সারা কর্তব্যও নয় শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবা। সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহারই পারে মানুষকে স্বশিক্ষিত করে তুলতে। সুশিক্ষিত করানোর জন্মে গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু স্বশিক্ষিত হবার স্থান একমাত্র গ্রন্থাগার।

প্রকাশনায় নতুন আদল

গোলোকেন্দু ঘোষ

(২)

বিনিময়ে প্রধান ঝোঁক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বই একটি প্রধান সামগ্রী অবশ্যই নয়। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রধান উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে মোট রপ্তানির শতকরা এক ভাগেরও কম রপ্তানি হয় বই। ১৯৬১ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে বই রপ্তানির শতকরা অংশ ছিল এই রকম—ইংলণ্ড ০·৮১%; নেদারল্যাণ্ডস্ ০·৭১%; আমেরিকা ০·৫০%; ফ্রান্স ০·৪৩%; সুইজারল্যাণ্ড ০·৪১%; ফেডারেল জার্মাণী ০·২৫%। যা হোক, বইএর বাণিজ্য কিন্তু ক্রমেই বাড়তির দিকে। যদি বইয়ের দামকে হিসাবের মাপকাঠি না ধরে বই-এর ওজনকে হিসাবের মাপকাঠি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে বই-এর রপ্তানি গত দশ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

পশ্চিম ইউরোপ এবং নেদারল্যাণ্ডস্

পশ্চিম ইউরোপে তিন রকমের বাজার দেখতে পাওয়া যায়।

(১) স্থানীয় বাজার; যেমন জার্মাণী। অস্ট্রো-সুইস গোষ্ঠির মধ্যে এই বাজার সীমাবদ্ধ, অবশ্য পোলাণ্ড ও আমেরিকা সমেত অন্য দেশের জার্মানভাষাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য জার্মান ভাষার বইএর বাজার নামমাত্র বর্তমান।

(২) আন্তর্মহাদেশীয় বাজার, যেমন ইংল্যাণ্ড। ইংরেজী বইএর বাজার ইউরোপে তেমন কিছু নয়, তুলনায় সামান্য। আয়ের মোটা অংশ আসে প্রাক্তন-সাম্রাজ্যের বর্তমান রূপান্তর কমনওয়েলথ থেকে এবং একদা উপনিবেশ বর্তমান আমেরিকা থেকে।

(৩) মিশ্রিত বাজার; যেমন ফ্রান্স। ফরাসীভাষা-ভিত্তিক জোটের দেশগুলি এবং ফ্রান্সের প্রাক্তন উপনিবেশগুলি নিয়ে ফরাসী ভাষার বইএর এই বাজার। ইউরোপের অন্তর্গত ফরাসী ভাষাভাষী দেশগুলি (যথা—সুইজারল্যাণ্ড এবং বেনেলু দেশগুলি) যে সব উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে গেছে (যথা প্রাচীনতম ক্যানাডা ও সর্বশেষ আলজেরিয়া) তাদের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখেছে।

নেদারল্যাণ্ডস্-এর ব্যাপার স্বতন্ত্র। এই দেশের বই প্রকাশন ও বিক্রয়ের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সকল স্বাধীনচিন্তা প্রকাশের বাহক ছিল ডাচ বই। সুচিন্তিত নীতির জন্যে ডাচ-প্রকাশন আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাহক হতে পেরেছে।

নেদারল্যাণ্ডস্ নেয় প্রচুর—মোট প্রকাশনার ষোল ভাগ হল অনুবাদ; দেয়-ও অবশ্য প্রচুর। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬০ সনে বইএর রপ্তানি বেড়েছে তের লক্ষ ডলার থেকে তিন কোটি তিরিশ লক্ষ ডলারে। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ১৯৬০ সনে প্রকাশিত সাত হাজার

আটশত তিরানব্বুইটি বই (শিরোনাম)-এর মধ্যে এক হাজার একশ চল্লিশটি বই বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত; উদ্দেশ্য রপ্তানি করা। পৃথিবীর যে-কোন দেশের তুলনায় এই সাতে-এক অনুপাত (অর্থাৎ—প্রতি আটটি প্রকাশিত বইএর মধ্যে একটি বিদেশী ভাষায়) সর্বোচ্চ। নেদারল্যাণ্ডসএর জাতীয় ভাষা বিস্তৃত নয়, তা সত্ত্বেও ফ্রান্স বা ফেডারেল জার্মাণী থেকে নেদারল্যাণ্ডস বেশি বই বিদেশে রপ্তানি করে, অন্তত মূল্যের দিক থেকেও। এই বইয়ের বাজার পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত। বিস্তৃতি ও সুসমতায় তার জুড়ি নেই।

আমেরিকা ও রাশিয়া

ব্যবসায়ী দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা হল বই রপ্তানিতে নেতৃস্থানীয়। বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রচারের যে-নীতি আমেরিকা নিয়েছে, তার জন্যই এটা ঘটেছে।

রাশিয়া সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য, কিন্তু রাশিয়ার মুদ্রামান তুলনা করার অসুবিধা থাকার দরুন এর হিসাব ধরা শক্ত। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১র মধ্যে রাশিয়ার রপ্তানি আটচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার রুবল থেকে এক কোটি আটাশ লক্ষ দশ হাজার রুবলে উঠেছিল।

আমেরিকার বই-অনুবাদ কর্মসূচী ১৯৫০ সনে শুরু করা হয়। উদ্দেশ্য—আমেরিকান বইএর অনুবাদ সারা পৃথিবীতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ও প্রতিষ্ঠানে এবং আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস গ্রন্থাগারগুলিতে বিতরণ করা। ১৯৬০ সনে বিতরিত বইএর সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি লক্ষ তিরানব্বুই হাজার তিনশ' পঞ্চাশ।

রাশিয়ার সংখ্যার সঙ্গে আমেরিকার সংখ্যার তুলনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যানের মধ্যে আমেরিকার এই ধরণের মর্যাদা-প্রকাশনের রপ্তানি সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আমেরিকা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যে নানারকম কর্মসূচীও গ্রহণ করে, যেমন যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে ডলার বহির্ভুত এলাকা থেকে ডলার মূল্যের বই কেনার সুবিধা প্রদান এবং আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য অঞ্চলে অতি সস্তায় (দশ থেকে পনর সেণ্ট মূল্যের মধ্যে) বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

একটি বেশ মজার মিল দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৬০ সনে আমেরিকা বই অনুবাদ কর্মসূচীর দ্বারা তেত্রিশটি বিদেশী ভাষায় বই অনুবাদ করে এবং রাশিয়া (নিজ দেশের ব্যবহৃত ভাষাগুলি ছাড়া) বত্রিশটি বিদেশী ভাষার বই রপ্তানি করে। সংখ্যার মিল ছাড়াও দুই দেশের রপ্তানি করা ভৌগোলিক অঞ্চলেরও সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

রাশিয়ার রপ্তানি বইয়ের দশভাগের ন'ভাগ রপ্তানি হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমেরিকার রপ্তানির অর্ধেকের কিছু কম রপ্তানি হয় অন্য ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে; সে সব অঞ্চলে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংলণ্ডের সঙ্গে।

রাশিয়া ও আমেরিকা দুটি প্রধানশক্তির বই রপ্তানির পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ করলে সাধারণভাবে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, কোন্ কোন্ অঞ্চলে তারা নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদ দিয়ে অন্য যে সব অঞ্চলে রাশিয়া বই রপ্তানি করে তাদের শতকরা হার হল এই রকম: পশ্চিম ইউরোপ ৪১%। ইংরেজী ভাষাভাষী আমেরিকা

২১% ; দূর প্রাচ্য ১৬% ; ল্যাটিন আমেরিকা ৬% ; নিকট প্রাচ্য ৪% ; আফ্রিকা ৩% ; অন্যান্য ৭% ।

প্রধান জোরটা হল ইউরোপ এবং ইংরেজী ভাষাভাষী আমেরিকার উপরে। আশ্চর্য হবার কথা নয় যে আমেরিকার জোরটা হল দূর প্রাচ্যে এবং ল্যাটিন আমেরিকায়। ইংরেজী ভাষাভাষী জোটের অঞ্চল বাদ দিয়ে আমেরিকার বই রপ্তানির শতকরা হার হল এই রকম। দূর প্রাচ্য ৩৩% ; ল্যাটিন আমেরিকা ২৭%, ইউরোপ ২৫% নিকট প্রাচ্য ৮% আফ্রিকা ৪% ।

প্রকাশনে প্রেরণা যোগাবে পাঠকরা

এইসব অতিকায় বিতরণ-চক্রের আয়তন প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এর সুবিধা-অসুবিধা দুরকমই আছে। সুবিধাটা বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে উন্নতিকামী দেশগুলিতে প্রয়োগ বিদ্যার বই বিতরণের ক্ষেত্রে। আমদানীকারী দেশগুলির পক্ষে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই সব বই কোনমতেই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সাহিত্য প্রসঙ্গে বইএর ক্ষেত্রে এই কথাটা আদবেই প্রযোজ্য নয়। যত যাই বলা হোক না কেন, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রকৃষ্টতম বাহক হল সাহিত্য-প্রসঙ্গের বই। সাহিত্য-প্রসঙ্গের বইএর একটা বৈশিষ্ট্য হল যে এই সব বিষয়ের বই পাঠ করতে হলে পাঠকের সচেতন অনুষঙ্গ প্রয়োজন। স্থানীয় প্রকাশিত বা আমদানি-করা বই যা-ই হোক—পাঠককেই এই ধরণের বই প্রকাশনে উৎসাহ যোগাতে হবে।

গ্রহণকারী দেশের জন্য প্রকাশক-দেশগুলির অনুবাদ-কর্মসূচী অনুযায়ী প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক বইগুলি সম্পর্কে পাঠকের কিছু বলার সুযোগ থাকে না ; কাজেই এই ধরণের অনুবাদ কর্মসূচী দ্বারা জনসাধারণের জন্য লেখার মাধ্যমে প্রকৃত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের কোন সহায়তা হয় না, বরঞ্চ ব্যত্যয় ঘটে।

এই আশঙ্কার কথা দুইটি দেশই উপলব্ধি করতে পেরেছে। রাশিয়া নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে এখন বই প্রকাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কাজেই পাঠক সাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুবিধা হয়েছে।

১৯৬৪ সনে ওয়াশিংটনে প্রকাশনার উন্নতিকল্পে একটি সম্মেলনের অধিবেশন বসে। অধিবেশন অনুমোদন করে যে পাঠক-দেশগুলিতেই প্রকাশন-উন্নতির কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত এবং সেই-সব দেশের স্থানীয় প্রকাশনায় এবং বই বিক্রয়ে সাহায্য করা উচিত।

যাই যোক এখন দুনিয়ার প্রকৃত বইয়ের বাজারের জন্যে দরকার—মুদ্রিত বই আমদানি-রপ্তানির চেয়ে পাঠক সাধারণের নৈকট্যে এসে স্থানীয় অনুবাদে উৎসাহ প্রদান।

From "The New Look in Book Publishing"
by Robert Escarpit,

[বর্তমান প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি আষাঢ় মাসের 'গ্রন্থাগার'-এ (বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩) প্রকাশিত হয়েছে। —সঃ গ্রঃ]

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারকে সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ করি। গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার বিবরণ সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে লিখে পাঠাতে হবে। যাতে প্রেরিত সংবাদে বেশী পরিবর্তন এবং সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না ঘটে সেজন্য সংবাদদাতাদের 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদগুলির দিকে নজর রাখতে বলি।

এই প্রসঙ্গে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী "গ্রন্থাগার"-এর পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে ২নং ও ৩নং প্রস্তাবে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের প্রতি সম্মেলন যে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি আমি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ বাপারে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

কলকাতা

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার। চেতলা। কলকাতা—২৭

গত ১১ই জুলাই পাঠাগারের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ১৯৬৪-৬৫ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পঠিত ও গৃহীত হবার পর ১৯৬৫ সালের জন্য পাঠাগারের কর্মকর্তা ও কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচন করা হয়। পৌর-সভার স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রীমণি সান্যাল সভাপতি, শ্রী অমলকুমার গোস্বামী সম্পাদক ও শ্রীঅশোক দাস গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্তমান বৎসরে মোট পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৫২টি। গত এক বছরে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৬টি। পাঠাগারের জন্য সামান্য মাসিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই পারিশ্রমিকের কিছু অংশ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ স্বেচ্ছায় বহন করছেন। আলোচ্য বৎসরে পাঠাগারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৬৪'৭১ টাকা ও ৫২৩'৩৮ টাকা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পাঠাগারকে ১৫০৲ টাকা সাহায্য বাবদ দিয়েছেন।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার। কৃষ্ণনগর।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৪ঠা জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদের সম্পাদক শ্রীকামিনী কুমুদ চৌধুরীর (জেলা সমাজ-শিক্ষা অধিকর্তা) ১৯৬৪-৬৫ সালের কার্য বিবরণী থেকে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে পুস্তকসংখ্যা স্থানীয় বিভাগে ১১,২২৩টি এবং বুক মোবাইল বিভাগে ৬,৪৯৫টি। মোট ১৮,৭১৮ পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯,৯০৩টি ও ৬,২২৮টি এবং মোট ১৬,১৩১টি।

সদস্য সংখ্যা : প্রতিষ্ঠান সদস্য ১০০ জন, পদাধিকার বলে ৯ জন, ৩ জন, আজীবন ও ৩২১ জন সাধারণ—মোট ৪৩৩ জন।

পুস্তক আদান প্রদান : স্থানীয় বিভাগে বাড়ীতে পড়বার জন্য ১৯,৩৯২টি পুস্তক দেওয়া হয়েছে। এর ১৫,৪৪৫টি গল্প ও উপন্যাস এবং ৩,৯৪৭টি অন্যান্য শ্রেণীর। পাঠাগারে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ৫,৮২৩টি এবং পত্র পত্রিকা ১,২৪৩টি। ভ্রাম্যমান বিভাগে আলোচ্য বৎসরে মোট ৩৫,৭০৮টি পুস্তক ও পত্র পত্রিকা আদান-প্রদান হয়। পূর্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৩৭,২৩০। প্রতিষ্ঠান সদস্যদের ৯,১৮০টি পুস্তক দেওয়া হয়েছে।

এ বৎসর জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস, সদ্য-সাক্ষরদের জন্য লিখিত পুস্তকের প্রদর্শনী, সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার-বিষয়ের চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে বোর্ড-ডিসপ্লের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি পাঠকদের নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগারের জন্য এই বৎসর ১,৩৭০'২০ টাকা ব্যয়ে ষ্টীল র‍্যাক ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে নদীয়া জেলায় জেলা-গ্রন্থাগার ব্যতীত নবদ্বীপে একটি শহর গ্রন্থাগার ও রাণাঘাটে একটি মহকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ফুলিয়ায় বাংলা রামায়ণকার জাতীয় কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিসৌধ ও সংশ্লিষ্ট জনমিলন-কেন্দ্র ভবনের নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত-প্রায়। এ ছাড়া এই জেলায় সরকারী সাহায্যপুষ্ট মোট মঞ্জুরীকৃত ২৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৯টির কার্য পূর্ণভাবে চালু হয়েছে।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী। ত্রিবেণী।

'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

['হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরস্থ হিন্দুতীর্থ ও শহর ; বানডেল-বারহারোয়া লাইনে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল। ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী'—নবজ্ঞানভারতী]

পাঠাগারের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (১৯৬৪-৬৫) গত ১-৮-৬৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ এই দুই বৎসরের কার্য-বিবরণী থেকে তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব নীচে দেওয়া হল :—

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
সভ্যসংখ্যা—	৫৭৫	৩৬৮
পুস্তক সংখ্যা—	৩৭৯৯	৪১০৫
ইংরাজী পুস্তক—	৩৬০	৩৬৬
বাংলা পুস্তক—	৩৪৩৯	৩৭৩৯
বাঁধানো পত্র-পত্রিকা—	৩৫০	৩৫০
সাময়িক পত্রিকা—	১১২১	১৬৫৭
সভ্যগণকে প্রদত্ত পুস্তক—	২১,৮১৩	১৮৯৮৮

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতি—	২২	১০
[পাঠকক্ষে রক্ষিত রেজিস্টার-দৃষ্টে]		
নূতন পুস্তক ক্রয়=	৮৯৭.৯৫	৮৮২.৬৯
মোট আয়—	৪৩১৯.১৯	৩৫.৬২.০৯

[আয়ের উৎস সভ্যের চাঁদা, ভর্তি ফি ও জমার টাকা, পৌরসভা ও সরকারী সাহায্য এবং অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত]

মোট ব্যয়—	৪৩০১.৯৮	৩২৯৫.৮৯
পৌরসভার সাহায্য—	২৫০.০০	৮০০.০০
সরকারী সাহায্য (১৯৬২-৬৩)	৩০০.০০	×
কর্ম পরিষদের সভা—	১০	১৬

পাঠাগারে ১ খানি ইংরাজী ও ৩ খানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ৫ খানি সাপ্তাহিক ৫ খানি পাক্ষিক ও ১৩ খানি মাসিক পত্র মোট ২৩ খানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

নীচে পাঠাগারে গত দুই বৎসরে মোট সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিবরণ দেওয়া হল :—

শ্রেণী	১৯৬৩-৬৪ সালে মোট	১৯৬৪-৬৫ সালে সংযোজন	১৯৬৪-৬৫ সালে মোট
উপন্যাস	১২৯০	১৫০	১৪৪০
গল্প	১৫৮	৬	১৬৪
ভ্রমণ	৯৩	৭	১০০
প্রবন্ধ ও আলোচনা	২৫৯	৪	২৬৩
কাহিনী ও রম্যরচনা	১০০	৭	১০৭
জীবনী ও স্মৃতিকথা	১১১	৭	১১৮
ইতিহাস	৫৮	১	৫৯
কবিতা ও গীতিনাট্য	১৩৩	২	১৩৫
নাটক	১৫৪	×	১৫৪
ধর্ম	৮৫	২	৮৭
রহস্য উপন্যাস	২১৫	৩০	২৪৫
গ্রন্থাবলী-রচনাসংগ্রহ	১৬৬	৮	১৭৪
বিজ্ঞান*	৪৫	×	৪৫
সঙ্গীত	১৫	×	১৫
স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা	১২	×	৪
দর্শন	১১	×	১২
অর্থনীতি	৪	×	৪

বক্তৃতাবলী	৪	:	৪
ভূগোল	২	১	২
কিশোর ও শিশুসাহিত্য	৩	৭৫	৪৫৮
কোষগ্রন্থ ও অভিধান	১০	×	১০
বিবিধ	১২৬	৬	১৩২
মোট	৩৪৩৯	৩০৫	৩৭৩৯

এ বৎসর বাৎসরিক সাধারণ সভা ছাড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকা হয়। পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতিপালিত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভারতীয় সমাজ শিক্ষাদিবস, গ্রন্থাগারদিবস, পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাদিবস, নেতাজী জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্রজন্মোৎসব, নজরুলজয়ন্তী, জওহরলাল নেহেরুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ও সরস্বতীপূজা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বৎসরে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার সভাপতি, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীঅসীম কুমার বিশ্বাস গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন।

দুলালস্মৃতিসংসদ। খাজুরদহ। ধনিয়াখালি।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৯৬৪-৬৫) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বেরা সভাপতি, শ্রীঅজিত মোহন কুমার সাধারণ সম্পাদক, ও স্থানীয় এম. এল. এ. শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রধান উপদেষ্টারূপে কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন।
পাঠাগার বিভাগ :—পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫০৭টি এবং সভ্য সংখ্যা ৫৭জন। পাঠাগারে ৩ খানি দৈনিক ও ৭ খানি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা নেওয়া হয়। পাঠাগারটি পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬১ সালের ২৬ নং ধারানুসারে রেজেস্ট্রীকৃত। উপজাতি কল্যাণের জন্য নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা, শিশু কল্যাণ বিভাগ, শরীর চর্চা ও খেলাধুলা বিভাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য এই সংসদের অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলীও উল্লেখযোগ্য।

News from libraries.

বার্তা-বিচিত্রা

কবি য়েটসের জন্মশতবার্ষিকী

আয়র্লণ্ডের কবি উইলিয়াম বাটলার য়েটসের (W. B. Yeats) জন্ম হয়েছিল ১৮৬৫ সনে। সুতরাং এই বছর পৃথিবীর সর্বত্র কবি য়েটসের অনুরাগিবৃন্দ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করছেন।

য়েটসের পিতা ছিলেন একজন আইরিশ চিত্রকর। য়েটস নিজেও প্রায় তিন বৎসরকাল চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ক্লাসে অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে তিনি সাহিত্য-চর্চা সুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি আইরিশ থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ করে ইয়োরোপে তাঁকে পরিচিত করেছিলেন বলে কবি য়েটস আমাদের দেশে বিশেষভাবে পরিচিত;

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ডের রাজনৈতিক বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে য়েটস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আয়র্লণ্ড স্বাধীনতা লাভ করার পর তিনি এর সিনেটের একজন সদস্যও হয়েছিলেন।

তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাকার্তায় বইয়ের বহ্ন্যুৎসব

দেশকে সাংস্কৃতিক ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি জাকার্তায় এক 'দেশপ্রেমিক' জনতা প্রায় ১৩ কোটি টাকা (ইন্দোনেশীয়) মূল্যের বই ও রেকর্ড পুড়িয়ে দিয়েছে। গত ১৬ই আগষ্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে এই কাণ্ড ঘটে। ভস্মীভূত বই পত্র ও রেকর্ডগুলির মধ্যে বীটলদের গানের রেকর্ড এবং আমেরিকার কয়েকটি গায়ক দলের 'রক্-এন্-রোল' গানের রেকর্ড উল্লেখযোগ্য।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (১৭ই আগষ্ট)

কেরালায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত পুস্তক

সম্প্রতি ২৩৩টি মালয়ালম পুস্তক কেরালার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে রাখার অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে। নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির মধ্যে ১৫১টি উপন্যাস, ৩১টি কাব্য, ৮টি ইতিহাস ও জীবনী, ৬টি বক্তৃতা ও ভ্রমণ কাহিনী, ১৭টি নাটক, ৮ খণ্ড ভল্লাথল গ্রন্থাবলী, ৩টি ছোট গল্প, ১টি ডিটেকটিভ এবং ৮টি অন্যান্য পুস্তক আছে।

অনুপযুক্ত এই বইয়ের তালিকায় কে. এম. পানিকরের 'নির্বাচিত কবিতা' এবং 'ইন টু চায়নাজ,' জোসেফ মুন্দাসেরির 'চীনা মুন্নোত্তু,' সি, অচ্যুত মেননের 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড,', ই. এম. এস. নম্বুদ্রিপাদের 'ন্যাশন্যাল প্রব্লেম ইন কেরালা', খাজা আহমদ আব্বাসের 'দি চায়না আই স' ড. মুলুক রাজ আনন্দ-এর 'কুলি' এবং 'সোয়ান সং অব অ্যান্ এম এ' ও বিখ্যাত কবি ভল্লাথলের 'বিলাস লতিকা' বইটিও আছে।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (৭ই আগষ্ট)

তামিলভাষায় শিশুদের জন্য বিশ্বকোষ

তামিল আকাদমী ৭ খণ্ডে শিশুদের জন্য একটি বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া সংকলন করছেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিশ্বকোষের একটি নমুনা পুস্তিকা সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন।

চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য এই কোষগ্রন্থটি রচিত হবে। অফ্‌সেট মুদ্রণ পদ্ধতিতে মুদ্রিত এই বিশ্বকোষের প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে ১৪৪ এবং একে যাতে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেজন্য এতে বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র ও নানারূপ অলংকরণ সংযোজন করা হবে। এই বিশ্বকোষের সম্পূর্ণ সেটের জন্য খরচ হবে ১২ লক্ষ টাকা—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যয় বহন করবেন। বিশ্বকোষ সমাপ্ত হতে সাত বছর লাগবে। প্রথম খণ্ডটির কাজ শেষ করতে ১৮ মাস লাগবে এবং এটির মোট ১০,০০০ কপি ছাপানো হবে। প্রতিখণ্ডের দাম ঠিক করা হয়েছে দশ টাকা। তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সহযোগিতা করলে দাম আরো কমানো যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা যাতে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল হয় সেজন্য এই কোষগ্রন্থে বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বহুকাল পূর্বেই বাংলাভাষায় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ১০ খণ্ডে 'শিশুভারতী' নামে শিশুদের বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (১৭ই আগস্ট)

কুরালের রচনাবলীর উর্দু অনুবাদ

তামিল সাহিত্যের বিখ্যাত ক্লাসিক লেখক থিরু কুরালের রচনাবলীর উর্দু অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে অন্ধ্রের গবর্ণর শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই বলেন যে, তামিল সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিরও উর্দু অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন জাতীয় সংহতি রক্ষা কেবলমাত্র হিন্দী শিখলেই হবে না—এজন্য অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হতে হবে। অনুবাদের কাজ সাহিত্য-আকাদমীর উদ্যোগে করা হয় এবং ত্রিচিনাপল্লীর জামাল মহম্মদ কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হসরৎ সুরাবর্দী এই রচনাবলী অনুবাদ করেন।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (১০ই আগষ্ট)

দিল্লীতে টেলিভিশন কেন্দ্রের উদ্বোধন

সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাত্যহিক টেলিভিশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন যে, দেশের বিভিন্ন অংশের প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখিয়ে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে হবে। আমাদের দেশের নরনারীর গুণগত পরিবর্তনে এই টেলিভিশন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে; তাঁদের কদর্য রুচিসম্পন্ন করে তোলা এর উদ্দেশ্য নয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলকাতাতেও এই টেলিভিশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে। পশ্চিম জার্মাণ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতায় টেলিভিশনের এইরূপ সর্বাধুনিক ষ্টুডিয়ো নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (১৭ই আগস্ট)

যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকাদির প্রদর্শনী

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ৭ হাজার কারিগরী ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের প্রদর্শনী শীঘ্রই ভারতের বড় বড় শহরে খোলা হবে। আগামী ১০ই থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর কনট সার্কাসের কাছে নতুন ওয়াই এম সি এ-র ভবনে এই প্রদর্শনী চলবে। পূর্তবিদ্যা, স্থাপত্যশিল্প, শিল্পগত প্রযুক্তি বিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, কৃষিশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, ভূগোল-বিজ্ঞান, ইলেক্‌ট্রনিক্‌স ও ইলেক্‌ট্রোটেক্‌নিক্‌স ইত্যাদি হরেকরকমের পুস্তক এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক বই-এর প্রদর্শনী বোম্বাই, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজ শহরেও খোলা হবে।

সূত্র: আমেরিকান রিপোর্টার (২০শে আগস্ট)

কারিগরী বিজ্ঞানের পুস্তকাদির আন্তর্জাতিক ষষ্ঠ প্রদর্শনী

এই বৎসর বুদাপেস্তের আন্তর্জাতিক মেলায় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কারিগরি বিজ্ঞানের পুস্তকের প্রদর্শনীতে ১৩টি দেশ থেকে ৭২টি প্রকাশক অংশগ্রহণ করছেন। এই প্রদর্শনীতে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেই ২০টি প্রকাশনসংস্থা যোগ দিচ্ছেন। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই নামকরা প্রকাশকরা এখানে আসছেন এবং এঁদের ভেতর ম্যাগ্রোহিল, অ্যাকাডেমি পাবলিসার্স, অ্যাডিশন ওয়েস্‌লে, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পারগামন প্রেস, স্যর আইজাক পিটম্যান এণ্ড সন্স ইত্যাদি ইংরেজী বইয়ের প্রকাশকরা ছাড়া জার্মান, সুইস, চেক প্রভৃতি প্রকাশকরাও আছেন। ১৯৬০ সালে প্রথম এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সুরু হয়।

সূত্র: হাংগ্রোপ্রেস-ইকনমিক ইনফরমেশন (১৯ শে জুন)

অজন্তার ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্রাবলী-সংরক্ষণের ব্যবস্থা

ভারত সফররত এক ইউনেস্কো মিশন সম্প্রতি অজন্তা ও এলোরার ভাস্কর্য ও ম্যুরালগুলি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক কলাকৌশল ও সংরক্ষণ পদ্ধতির সুপারিশ করেন। এই মিশনে 'ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার ফর দি প্রিজারভেশন অ্যাণ্ড রেস্টোরেশন অব কালচারাল প্রপার্টি'র ডিরেক্টর শ্রীযুত হ্যারল্ড প্লেণ্ডারলিথ এবং বেলজিয়মের 'রয়াল ইনষ্টিটিউট ফর দি প্রিজারভেশন অব কালচারাল প্রপার্টি'র প্রধান শ্রীযুত পল কোরমান্‌স আছেন।

মিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে অজন্তা এবং এলোরার চিত্রাবলী ও ভাস্কর্য কতকটা নৈসর্গিক কারণে এবং কতকটা সংরক্ষণকারীদের অবিমৃষ্যকারিতায় নষ্ট হতে চলেছে।

সূত্র: হিন্দু, মাদ্রাজ (৭ই আগস্ট)

চিঠিপত্র

[পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' দায়ী নন। 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য চিঠি যে-কেউ দিতে পারেন। ছাপাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গা থাকলে পত্র ছাপানো হবে। পত্রিকায় লেখা পাঠাবার যে নিয়ম—চিঠির বেলাতেও ঐরূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পত্রলেখকের পুরা নাম-ঠিকানা দিতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রের দৈর্ঘ্য যেন কোন ক্রমেই এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করে। প্রয়োজনানুযায়ী পত্রের সংশোধন ও সম্পাদন করবার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থাকবে।]

জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ ১৪ বছর পরে গ্রন্থাগারিকদের সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায় বেতনক্রম চালু করেছেন। এতদিন যাবৎ গ্রন্থাগারিকরা বাঁধা (Fixed) বেতন পেতেন। সাধারণ শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এক নয়। সুতরাং সাধারণ শিক্ষকের মতো গ্রন্থাগারিকের বেতন হার এক হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। নিম্নে সাধারণ শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের কাজ-কর্মের প্রভেদ দেখাচ্ছি।

(১) কার্য-সময় :—শিক্ষকদের কার্য সময় গ্রন্থাগারের মতো ৭ ঘণ্টা নয়।

(২) ছুটি-ছাটা :—বিদ্যালয়ে ছুটি প্রচুর। যেমন—গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটি। কিন্তু, গ্রন্থাগার সরকারী ছুটির দিনই বন্ধ থাকে।

(৩) বাড়তি-আয় :—প্রাইভেট পড়ানো, পরীক্ষার খাতা দেখা ও গার্ড দেওয়া ইত্যাদির জন্য শিক্ষকের বাড়তি আয় আছে। কিন্তু, গ্রন্থাগারিকের কোন বাড়তি আয় নেই।

(৪) গুরু দায়িত্ব :—গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতই গ্রন্থাগারিকের ওপর ন্যস্ত থাকে। প্রধান শিক্ষকের মতোই তাঁর অসীম দায়িত্ব বহন করতে হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার গ্রন্থাগারিকদের সাধারণ শিক্ষকদের মতো বেতন হার চালু করেছেন। আঞ্চলিক (Area) ও গ্রামীন (Rural) গ্রন্থাগারিকদের কোন দুর্মূল্য ভাতা কিংবা মহার্ঘ ভাতার ব্যবস্থা সরকার আদৌ করেন নি। এ ছাড়া, গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীর বেতন-হারও নৈরাশ্যজনক।

এজন্য আমি মাননীয় শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রীদ্বয়কে অতি সত্বর ভেবে দেখবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি—

শ্রীমদন মল্লিক

গ্রন্থাগারিক, তরুণ পাঠাগার রুরাল লাইব্রেরী,
আসাননগর, নদীয়া।

[আলোচ্য গ্রন্থাগারকর্মীদের নতুন বেতনক্রম নিম্নরূপ (১লা এপ্রিল, ১৯৬৪ থেকে) হয়েছে—জেলা গ্রন্থাগারিক : (অনার্স সহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা) ২১০-১০-৪৫০৲। ভাতা ২৫৲ টাকা। (অনার্স নেই অথচ ডিপ্লোমা আছে তাঁদের জন্য): ১৬০-৭-২২৩-৮-২৯৫৲। ভাতা ২৫৲ টাকা। জেলা গ্রন্থাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ানের (বর্তমানে ১টি জেলা গ্রন্থাগারেই ঐ পদ আছে) জন্য শেষোক্ত বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে। লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, এরিয়া লাইব্রেরী ও রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক (যোগ্যতা-স্কুল ফাইনাল ও গ্রন্থাগারবিদ্যায় ট্রেনিং) ৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২০। কোন ভাতা নেই।—সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার']

পরিষদ কথা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কমিশনের সফর

গত ২২শে থেকে ২৮শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ ডি এস কোঠারীর সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন। কমিশন জাতীয় স্তরে একই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার মান পর্যালোচনা করে দেখছেন। এঁরা আসাম, উড়িষ্যা ও কেরালা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজ্য সফর ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করেছেন। আগামী ১লা মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এঁদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

কলকাতায় শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও গত ২৮শে আগস্ট কমিশনের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। এই স্মারকপত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গ্রন্থাগারসমূহের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পর্ক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজের সময়, আসবাব পত্র, গৃহ, পুস্তকসম্ভার, কর্মী-সমস্যা, পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক উৎপাদন প্রভৃতি সমস্যা ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন এবং মর্যাদার প্রশ্নটিও স্মারকপত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাছাড়া কমিশনের রিপোর্ট যাতে কার্যকরী করবার ব্যবস্থা হয় তার জন্যও অনুরোধ জানান হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, বিমলেন্দু মজুমদার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিষদের বিভিন্ন সমিতির কর্মোদ্যম

গত ২৫শে জুলাই কাউন্সিলের সভায় পরিষদের বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে সে সংবাদ 'গ্রন্থাগার'-এর 'শ্রাবণ' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১৮ই আগষ্ট শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি'র সভা হয়। ১৮ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন (৪জন অনুপস্থিত)। সভায় বর্তমান সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাস সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমিতির সম্পাদক শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। সমিতির পরবর্তী সভায় (১৭ই সেপ্টেম্বর) এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘকাল পরে পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের সিলেবাসে এইরূপ মৌলিক পরিবর্তন হতে চলেছে।

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিকের সভাপতিত্বে 'হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি'র সভা হয়। সভায় পরিষদের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে পরিষদের 'কার্যকরী সমিতি'র প্রথম অধিবেশন হয়। শিক্ষা কমিশনের নিকট স্মারকপত্র, এম লিব কোর্স সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট স্মারকলিপি, জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের সাম্প্রতিক বেতনক্রম, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন, সেমিনার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। সভায় শিক্ষা কমিশনের নিকট পেশ করা স্মারকপত্র অনুমোদিত হয়, উপাচার্যের নিকট স্মারকপত্রটি পরে বিবেচনা করা হবে বলে স্থির হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম হতাশাজনক বলে মত প্রকাশ করা হয় এবং এ সম্পর্কে শীঘ্রই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে পরিষদের বক্তব্য জানান হবে বলে স্থির হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'গ্রন্থাগার'-এর বর্তমান সম্পাদক পূর্ববর্তী সম্পাদকগণের মত যোগ্যতাসম্পন্ন নন। নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলেই তার ওপর এই গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। সে সময়ে পরিষদের অনেকেই তাকে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে তার দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর করেছিলেন। কাছাকাছি যাঁরা আছেন তাঁরা সর্বদাই পরামর্শ দিয়ে সম্পাদককে সাহায্য করছেন। দূরে যাঁরা আছেন তাঁরাও অনেকে পত্রযোগে সম্পাদককে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া লেখা পাঠাবার আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই লেখা পাঠিয়েছেন এবং পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পরিষদ এবং তার মুখপত্রকে ভালবাসেন বলেই তাঁরা যে তা করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্পাদক যে একক নন, সমগ্র পরিষদ যে তার পেছনে আছেন এই অনুভূতি তাকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধে অভিভূত করে তুলেছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় আমাদের ভূমিকা

বর্তমান পাকিস্থানী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রাখায় দেশের প্রতিটী গ্রন্থাগার তথ্য-কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়, দেশের জরুরী অবস্থায় লোকের কি জানা উচিত, এই সম্পর্কে তথ্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি ভাবে তা ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে গ্রন্থাগারগুলি পথ-নির্দেশ করতে পারে। দেশবাসীকে দেশরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এখন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে আমরা সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা দ্বারা অ-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে পারি পরিষদ তাঁর সকল সদস্যদের কাছে সেই আবেদন জানাচ্ছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

আধি-ব্যাধি, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬৫। সম্পাদকমণ্ডলীঃ— নীহারকুমার মুন্সী, জ্যোতির্ময় মজুমদার, সমর রায়চৌধুরী প্রকাশক—হেলথ পাবলিকেসনস্, পি-৫, সি আই টি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা; বার্ষিক ৬ টাকা।

আধি-ব্যাধি বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্য-বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা। ভীতিপ্রদ ও কঠিনতম ব্যাধির হাত থেকে কি ভাবে সাধারণ মানুষ রক্ষা পেতে পারে, কি ভাবে সহজ এবং অনাড়ম্বর চিকিৎসায় মানুষ রোগমুক্ত হতে পারে এবং চিকিৎসা জগতের নবতম আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হতে পারে তার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এই পত্রিকার মধ্যে। জন্ম থেকেই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে মানুষ। সুখাদ্যের অভাব, পারিবারিক অর্থাভাব, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের অভাব শিশুর জন্ম থেকেই শিশুকে ঘিরে ধরেছে; তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে বড় হতে হচ্ছে। এই সব প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কি ভাবে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায় তার প্রচেষ্টা আধি-ব্যাধির লেখক গোষ্ঠীর লেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৬৫) চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

যক্ষ্মা চিকিৎসার সহজ উপায়—ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাতৃ দুগ্ধ ও তার বিকল্প—ডাঃ জ্যোতিপ্রভা দেব

রোগ বিনাশে রবি রশ্মি—ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সিংহ

ক্যান্সার প্রসঙ্গে—ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ সকলেই কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। এছাড়াও নিয়মিত বিভাগ 'আসর' 'পাঠকের দপ্তর', 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' ও কয়েকটি অনুবাদ উক্ত সংখ্যায় স্থান লাভ করেছে। প্রবন্ধগুলির ভাষা সহজ, সরল এবং বক্তব্য স্বচ্ছ ও সহজ বোধ্য। এই প্রসঙ্গে 'চিকিৎসা-জগৎ'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক এই পত্রিকাটিও অনেকদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে বর্তমান পত্রিকাটি ও 'চিকিৎসা-জগৎ' ঠিক এক জাতীয় পত্রিকা নয়।

গ্রীক দার্শনিক ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬০-৩৬৭) চিকিৎসকদের যে প্রতিজ্ঞা পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন বাংলা দেশের চিকিৎসকরা যদি তাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে পালন করবার চেষ্টা করেন তাহলে এ ধরণের পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সব পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন এবং সাধারণ মানুষের মন থেকে আধি-ব্যাধির ভীতিকে অপসারিত করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের সংকল্পকে মহান বলে আখ্যা দিলে হয়ত অতিশয়োক্তি হবে না।

পত্রিকাটির মধ্যে কিছু নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। অধিকাংশ লেখকই রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে এবং হালকা সুরে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি উপভোগ্য হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও এই লেখক গোষ্ঠীর যে যথেষ্ট দখল আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা বিস্তারে এই পত্রিকা যে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চমৎকার ফটোগ্রাফ ও সুন্দর স্কেচ পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

চ. কু. সে.

Book Review

ভ্রম সংশোধন

'গ্রন্থাগার'-এর 'শ্রাবণ' সংখ্যায় কয়েকটি মারাত্মক ভুল হয়েছে। 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের B Lib Sc. পরীক্ষার ফল' শীর্ষক সংবাদে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থানাধিকারিণী রমা চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভ্রমক্রমে রাণু চট্টোপাধ্যায় রূপে ছাপা হয়েছে এবং সপ্তম স্থানাধিকারী অসীম কুমার 'বঙ্গ' 'বাঙ্গার' হয়েছেন। নবম স্থানাধিকারিণী অঞ্জলী ঘোষের নামটি পঞ্চম স্থানে এসেছে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বশেষ নামটি কৃতান্তজয় ভট্টাচার্যের স্থলে 'কৃতঞ্জয়' হয়েছে এবং দশম স্থানে এসে গেছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী মঞ্জরী সিংহের নাম 'মঞ্জুলী' রূপে ছাপা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে একাদিক্রমে এতগুলি ভুল হওয়ায় আমরা দুঃখিত। এই সংখ্যায় ছোটখাট আরও দু'একটি মুদ্রণ প্রমাদ হয়েছে সেগুলির আর উল্লেখ করলাম না। তবে 'চিঠিপত্র' বিভাগে শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্যের পরিচয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরূপে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ 'মুদ্রাকর প্রমাদ' বলে সব ভ্রম সংশোধন করা আমাদের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে সব ভ্রমই 'মুদ্রাকর প্রমাদ' নয় সম্পাদকীয় প্রমাদও যে কিছু কিছু আছে সেকথা অকপটে স্বীকার করা ভালো। পত্রিকায় অত্যন্ত ছোটখাট ভুলও পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে ; লেখকরাও ছাপার অক্ষরে তাঁদের লেখার দুরবস্থা দেখে মর্মাহত হন। 'ভ্রম সংশোধন' ব্যাপারটি যাতে পত্রিকার একটি নিয়মিত বিভাগে দাঁড়িয়ে না যায় তার জন্য সম্পাদক সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এই আশ্বাসই সংশ্লিষ্ট সকলকে দেওয়া যেতে পারে।

Carrigenda

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৬ | ১৩৭২, আশ্বিন

॥ সম্পাদকীয় ॥

পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও মর্যাদা

—০—

অবশেষে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা, গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের বহু আকাঙ্খিত বেতনক্রম সংক্রান্ত ঘোষনাটি সংশ্লিষ্ট সকলকে হতাশ করেছে। গত কিছুকাল ধরেই উল্লিখিত গ্রন্থাগার কর্মী এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে বহু আবেদন-নিবেদন, স্মারকপত্র, বিবৃতি, সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে এঁদের নানাপ্রকার অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলেছিল। তাছাড়া এই গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে যে স্মারকপত্র পেশ করা হয়েছিল তাতে সরকারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রচলিত বেতনক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত সংযতভাবে একটি বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছিল। এতে জেলা গ্রন্থাগারিকদের জন্য জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের অনুরূপ বেতন অর্থাৎ ২৭৫৲-৬৫০৲ টাকা, জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের জন্য ১৫০-২৫০৲ টাকা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিকদের ১৭৫-৩২৫৲ টাকা. লাইব্রেরী অ্যাটেন্ডান্ট এবং ফিডার লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকদের ১২৫-২০০৲ টাকা এইরূপ বেতনক্রমের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া ড্রাইভার ১৫০-২৫০৲ টাকা এবং ক্লিনার, নাইটগার্ড, পিওন প্রভৃতি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৮০-১০৫৲ টাকা বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছিল।

কিন্তু সম্প্রতি সরকার যে বেতনক্রম প্রবর্তন করতে চলেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে জেলা গ্রন্থাগারিকদের জন্য দুরকম বেতনক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে—যাঁদের অনার্স এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আছে তাঁদের জন্য ২১০-১০-৩৫০৲ এবং যাঁদের অনার্স নেই অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আছে তাঁদের জন্য ১৬০-৭-২২৩-৮-২৯৫৲ টাকা। উভয়

ক্ষেত্রেই ২৫৲ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। জেলা গ্রন্থাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ানের জন্য শেষোক্ত বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে—অবশ্য বর্ত্তমানে ঐ পদ একটি জেলা গ্রন্থাগারেই রয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের ৮০-১-৯০-২-১১০-৩-১২০৲ টাকা বেতনক্রম স্থির হয়েছে এবং এঁরা কোনরূপ ভাতা পাবেন না। এঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা যদিও স্কুল ফাইনাল পাশ ও গ্রন্থাগার বিদ্যায় ট্রেনিং তবে বর্তমানে অনেক গ্রাজুয়েটও এই পদে কাজ করছেন বলে জানা গেছে। এই বেতনক্রম ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে এবং এর ফলে বর্তমান কর্মীরা সামান্য কিছু অতিরিক্ত টাকা পাবেন; আর ট্রেনিং প্রাপ্তদের একটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁরা ট্রেনিং প্রাপ্ত নন তাঁদের পুরানো বাঁধা বেতনেই থেকে যেতে হবে। এই সব গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে পাঁচ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে সকল কর্মী রয়েছেন এবং এতকাল বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাঁদের সম্পর্কে এই বেতনক্রমে কোনরূপ বিবেচনাই করা হয়নি। তাছাড়া এই দুর্মূল্যের দিনে মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা প্রভৃতির প্রশ্ন একেবারেই বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং এই বেতনক্রম যে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে কোন আশারই সঞ্চার করতে পারবে না একথা বলাই বাহুল্য।

যে কোন বৃত্তির বেলাতেই কোন বেতনক্রম নির্ধারণের সময়ে নিশ্চয়ই সেই কাজের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত যোগ্যতাবলীর বিচার করা হয়। প্রায় দশ বছর পূর্বে (১৯৫৬-৫৭) কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের রিপোর্টে (১৯৫৯) এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যে বেতনক্রমের সুপারিশ করেছিলেন তাতে দেখা যায় চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের ৫০৲ টাকা, ছোটখাট শহরের গ্রন্থাগারিক ১০০৲ টাকা, বড় শহরের গ্রন্থাগারিক ২৪০৲ টাকা, ব্লক লাইব্রেরীয়ান অর্থাৎ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্মীদের ২৭০৲ টাকা, জেলা গ্রন্থাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরী-য়ান ৩১২৲ টাকা, জেলা গ্রন্থাগারিক ৪৭০৲ টাকা এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের জন্য ৬৮০৲ টাকা বেতনের সুপারিশ করা হয়েছিল।

এই রিপোর্টে ছোট শহর বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হিসাবে তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা ভাতার সুপারিশ করা হয়েছিল। ব্লক লাইব্রেরীয়ান, বড় শহরের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তি কুশলী সহকারীগণ এবং ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীয়ান প্রভৃতির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ট্রেন্ড গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সমান মর্যাদা; বড় গ্রন্থাগারের প্রধান এবং ব্রাঞ্চগুলির তত্ত্বাবধায়ক এবং ছোট-খাট নগর গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা পাবেন বলে বলা হয়েছিল। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের ক্লাস ওয়ান এডুকেশন সার্ভিসের এবং জেলা ও নগর গ্রন্থাগারিকের জন্য ক্লাস টু এডুকেশন সার্ভিসের সমান বেতন ও মর্যাদার সুপারিশ করা হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পূর্বের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির এই সুপারিশ অনুসারে বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দিনে এই গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন

আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত একথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ যদি একথা উপলব্ধি করতেন তবে নবপ্রবর্তিত বেতনক্রম কখনই এরূপ হতাশা জনক হতনা। আর প্রাথমিক শিক্ষকের বেতনের হার যদি এই রূপই হয়ে থাকে তবে সেটাও শোচনীয় বই কি!

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগারের যে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে—যাঁদের ওপর আমাদের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ভার পড়েছে তাঁরা সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাশীল নন। অথচ আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সংবিধানে আছে যে ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার করবেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কাজ বলে মনে না করে একে অত্যাবশ্যক বলেই বিবেচনা করা উচিত। স্কুল এবং গ্রন্থাগার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে চলবে এ ধারণা ঠিক নয়। আর শিক্ষা খাতে ক্রমাগতঃ ব্যয়বৃদ্ধির জন্য আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। আপাতঃ দৃষ্টিতে আমদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষাখাতে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধি হয়ে চলেছে বলেই মনে হবে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় পর্যাপ্ত নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৭৩ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা (সব মিলিয়ে ৭৩০ কোটি টাকা) এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ১৫,৬২০ কোটি টাকার মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে ১৪৯ কোটি টাকা এবং লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য ২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতেই রাজ্য সরকারগুলির নিকট সুসংবদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় গ্রামীন গ্রন্থাগার, ব্লক,মহকুমা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলি এইভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল। পরে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি তাদের রিপোর্টে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট টাকা ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ৯০ লাখ টাকা (৪% ভাগ) গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল (মোট বরাদ্দ ছিল ১৮৬-৪২ লাখ টাকা কিন্তু সমস্ত টাকা খরচ করা হয়নি)। পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেছেন ১৯৬১—৬২ সালে ৯১ লাখ টাকা, ১৯৬২—৬৩ সালে ৯০ লাখ টাকা, ১৯৬৩—৬৪ সালে প্রায় ৮৫ লাখ টাকা এবং ১৯৬৪—৬৫ সালে ৮১ লাখ টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে। হয়তো মনে হতে পারে এজন্য আমরা বিপুল ব্যয় করে চলেছি। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যখন চতুর্থ পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ অদলবদল করা হবে তখন হয়তো এই খাতের বরাদ্দে টান পড়বে।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণ শিক্ষা একান্তই পুঁথিগত এবং বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে। আমাদের কর্ম সংস্থান ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। চাষীর ছেলে স্কুলে পড়াশুনো করে আর লাঙ্গল ধরতে চায় না বা গরু চরানোকে হীন ব্যবসায় বলে মনে করে। গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা বাস্তবধর্মী। অন্যান্য দেশেও প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

এখনও আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোকই নিরক্ষর। ১৯৬৪ সালের হিসেবে দেখা যায় ভারতের প্রায় ৪৬ কোটি লোকের ৩৪.৫ কোটি অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ লোকের অক্ষরজ্ঞানের অভাবে পড়াশুনা করবার কোন উপায় নেই। যে অল্পসংখ্যক লোক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের মধ্যেও পড়াশুনার চর্চা কম। দেখা গেছে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবে সদ্য সাক্ষরেরা পর্যন্ত নিরক্ষরে পরিণত হয়ে যায়। ইংলন্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি প্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতে পাবলিক লাইব্রেরীগুলি এখন একাধারে গবেষণার কেন্দ্র ও তথ্যকেন্দ্র; সেখানে জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা মেটাবার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে এবং চমৎকার পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে তো একশ বছর আগেই প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫০ সালে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না। তবে ১৯২০ সালের দিকে বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যে নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।

এছাড়া ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অল্প কয়েকটি বৃহৎ নগরী ছাড়া ভারতে পাবলিক লাইব্রেরী ছিল না বললেই চলে। যাও বা ছিল সেগুলি আধুনিক পাবলিক লাইব্রেরীর সংজ্ঞা অনুসারে পাবলিক লাইব্রেরী নামের যোগ্য নয়। ১৯৫৮ সালে ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যে প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী আইন বিধিবদ্ধ হয়। এরপর ১৯৬০ সালে অন্ধ্র প্রদেশের আইনসভা অনুরূপ একটি আইন পাশ করেন। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন এবং ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আদর্শ লাইব্রেরী বিলের খসড়া করেছেন এবং রাজ্যগুলির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করছেন।

কিন্তু ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র এবং মহীশূর রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্যেই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এমন কি কলকাতার মত শহরে আজ পর্যন্ত একটি আদর্শ পাবলিক লাইব্রেরী নেই। কলকাতায় অবশ্য ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত। কিন্তু তাতে পাবলিক লাইব্রেরীর প্রয়োজন এতটুকুও কমেনি।

(শেষাংশ ২০৯ পৃষ্ঠায়)

* পুস্তক সূচীর ইতিহাস ঃ ১৬শ শতাব্দী

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা হ'লো পুস্তক বিজ্ঞানের একটি দিক। পুস্তক বিজ্ঞানের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যায় প্রথম দিকে পুস্তক-বিজ্ঞান বলতে বোঝাত পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা। পুস্তক-বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা কিন্তু তা নয়। Bibliography'র সংজ্ঞার ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছিল তা আমি ১৩৭০ সালের ১২শ সংখ্যা "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় বর্ণনা করেছি। এখানে সে বিষয়ের আর কোন উল্লেখ করব না।

পুস্তক-তালিকা-বিজ্ঞান হ'লো পুস্তক বিজ্ঞানের সেই অংশ যে অংশের কাজ হ'চ্ছে কোথায় এবং কবে কি বিষয়ের উপর কি বই বার হ'য়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং মুহূর্তের মধ্যে তার সন্ধান দেওয়া। এদিক থেকে বিচার করলে পুস্তক তালিকাকে বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানের সাহায্যকারী বিজ্ঞান হিসাবে ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যকারী বিজ্ঞান বলা যেতে পারে তার কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুস্তক তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পুস্তক-তালিকা-বিজ্ঞান পুস্তক বিজ্ঞানের অংশ হ'লেও, পুস্তক তালিকা-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে বিচার করা যেতে পারে কারণ পুস্তক-তালিকা-বিজ্ঞানের কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম আছে। সেই কারণেই পুস্তক তালিকাকে Concrete science বলা যেতে পারে।

আধুনিক যুগে গবেষণার ক্ষেত্রে পুস্তক তালিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কারণ পুস্তক তালিকা থাকার জন্য গবেশককে সব কিছু পড়তে হয়না, তার যেটুকু পড়া প্রয়োজন পুস্তক তালিকা তাকে ততটুকু পড়তে সাহায্য করে। উপরন্তু পুস্তক তালিকা তার পাঠকে সাহায্য করে এবং সহজ করে দেয়।

১৫দশ শতাব্দীতে পুস্তক তালিকার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। সে সময়ে যে কয়েকখানি পুস্তক তালিকার সৃষ্টি হ'য়েছিল তার মধ্যে বিশেষ কয়েকখানির উল্লেখ আমি উপরিউক্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় উল্লেখ করেছি।

১৫দশ শতাব্দীতে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে পুস্তক তালিকার অস্তিত্বের কোন কারণ ছিলনা কারণ সে সময়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল কম। জনসাধারণের পাঠের প্রয়োজন ছিল না এবং বই ছিল সমাজের বিশেষ কয়েক জনের সম্পত্তি। আমাদের স্বতঃই এই ধারণা হ'তে পারে যে বই ছিল বলে বইয়ের তালিকার সৃষ্টি হ'য়েছিল। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

---

*(Georg Schneider—Handbuch der Bibliographie ও L.-N. Malcles—La Bibliographie—এই দুইখানি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে)

বইয়ের জন্যে বইয়ের যে তালিকার সৃষ্টি হয়নি তা বেশ বোঝা যাবে পুস্তক তালিকার ক্রমবিকাশ বিচার করে দেখলে।

১৫দশ শতাব্দীতেও মানব মনের উপর বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেনি। সেই কারণে সমালোচকের চোখ দিয়ে মানুষের চিন্তাধারাকে বিচার করে দেখবার প্রয়োজন হয়নি। অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ যা হ'তো তার ভিত্তি ছিল কল্পনা (speculation)। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ তখনও গবেষণার ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়নি।

ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার ফলে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। মানুষের চিন্তাধারা পুস্তকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো। মানুষের কর্মজীবনে এলো নতুন যুগ—এ যুগ হ'লো মানবীয়তার যুগ। মানুষের কাজ হ'লো জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলা। ধর্মের গণ্ডী কেটে বার হ'লো মানুষের চিন্তাধারা। সুরু হ'লো নানা ধরণের গবেষণা।

পুস্তক মুদ্রকেরা ছিলেন বিদ্বান্ গোষ্ঠীর। এরা প্রথম সুরু করলেন পুস্তকের ব্যবসার প্রসারের জন্য পুস্তকের বিজ্ঞাপন এবং নতুন পুস্তকের সূচী ছাপতে। Frankfurt-এ Easter-এর সময় পুস্তক প্রদর্শনী হ'তো এবং এই প্রদর্শনীতে নুতন পুস্তক এবং পুস্তকের সূচী প্রদর্শিত হ'তো। পরে Leipzig-এ এ ধরণের পুস্তক প্রদর্শনী হ'তো। জার্মানীর এই দুটি শহর ছিল পুস্তক ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এই সকল প্রদর্শনীর পুস্তকের যে সূচী বার হ'তো সেগুলিকে বলা হ'তো Meszkatalog। সুতরাং এই Meszkatalog-গুলিই যে Bibliography'র সূত্রপাত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জার্মানীই বই ছাপা সুরু করে এবং পুস্তক সূচী সুরু করে এবং এখান থেকেই ক্রমশঃ বই ছাপা এবং পুস্তক সূচী দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রথম যে সকল সূচী ছেপে বার হয় সেগুলি জীবনীমূলক এবং এই জীবনীমূলক সূচিপত্র থেকেই ক্রমশঃ সত্যিকারের পুস্তক সূচীর সৃষ্টি হয়। এদিক থেকেও জার্মানী প্রথম এবং Johannes Tritheim প্রথম Liber de scriptoribus ecclesiasticis (১৪৯৪)

১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে গবেষণার কাজ সুরু হয় বিশেষ করে আইনের দিক থেকে, পরে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণার আধিক্য দেখা দেয়। পুরাকালের পুঁথিপত্রের কথা মানুষ প্রায় এক রকম ভুলেই গিয়েছিল। গ্রন্থাগারের অভাব ছিল। ব্যক্তিগত সংকলনের অভাব ছিল না কিন্তু তা কেবল সংকলন করার জন্যই গড়ে উঠেছিল—পাঠের জন্য বা গবেষণার জন্যে নয়। ১৬শ শতাব্দীতে এই সমুদয় বই পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। এই সকল বই নিয়ে সমালোচনা ও টীকা-টিপ্পনি চলতে লাগল। এই সময় যাঁরা পুস্তক সংকলন করতেন তাঁরা বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর লোক। তাঁরাই বই লিখতেন এবং তাঁরাই বই পড়তেন। এঁদের মধ্যে পুস্তক সূচীর

Nevizzano ও Conrad Gesner-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Giovanni Nevizzano ছিলেন আইনজীবী ও Conrad Gesner ছিলেন Naturalist। এঁদের পরে আসেন ধর্মবিদ ও দার্শনিকেরা।

প্রথম যাঁরা পুস্তক সূচী তৈরি করেন তাঁরা দেশ বিদেশের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান—ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও বাদ পড়ে না।

প্রথম দিকে যে সমুদয় পুস্তক সূচী বার হয় সেগুলি ছিল জীবনীমূলক এবং এগুলি Bibliotheca, Scriptoria, Catalogus, নামে অভিহিত হ'তো। এই সব বইয়ে লেখকের জীবনীর উপর যত বেশী জোর দেওয়া হ'তো পুস্তকের বর্ণনার উপর তত বেশী জোর দেওয়া হ'তো না। জীবনী অপেক্ষা পুস্তকের বর্ণনা যে পুস্তকের ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয় সে ধারণা সূচীকারদের ছিল না।

এ সময়ে যে সকল সূচীপত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল সেগুলি বিচার করলে দেখা যায় যদিও বিশেষ কোন নিয়মানুসারে সেগুলি বিন্যাসিত হয়নি, তা হ'লেও সূচী থেকে লেখক এবং তার লেখা সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যেত। সকল বিষয়ের উপর পুস্তক সূচি প্রকাশিত হ'য়েছিল। পুস্তকের লেখনগুলিকে বিন্যাস করবার নানা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হ'তো—আক্ষরিক ভাবে, তারিখ অনুযায়ী এবং প্রণালীবদ্ধভাবে।

বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তক সূচী

Johann Tritheim (১৪৬২-১৫১৬)। ইনি ছিলেন Spanheim-এর ধর্মমন্দিরের একজন পুরোহিত। ইনি in-folio আকারের Liber de Scriptoribus ecclesiasticis নামে ৩০০ পৃষ্ঠার একখানি সূচী প্রণয়ন করেন। এই সূচী Basle-এর, প্রকাশক Amerbach ১৪৯৪ সালে প্রকাশ করেন। এই সূচীতে প্রায় ১০০০ পুরোহিত লেখকের জীবনী এবং তাঁদের লেখার উল্লেখ আছে। এ সূচী জীবনীমূলক। লেখকের লেখার উল্লেখমাত্র আছে। এই সূচী তারিখ অনুযায়ী বিন্যাসিত। ১৫৯১ সালে এই লেখকের Catalogus illustrium virorum Germanie প্রকাশিত হয়। এই সূচী জাতীয় পুস্তক সূচী। এই দুইখানি সূচী বিচার করলে দেখা যায় Tritheim পুস্তক সূচী-কারদের পূর্বপুরুষ।

Giovanni Nevizanno (†১৫৪০)। ইনি লেখেন আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক সূচী—ছেপে বার হয় Lyon সহরে ১৫২২ সালে। বইখানির নাম Inventarium librorum in utroque jure hactinus impressorum। এই সূচীখানির উল্লেখ Bibliographie Lyonnaise du XVIe siecle-এ পাওয়া যায়না তবে একখানি জীর্ণ এবং অঙ্গহীন কপি Florence-এ Bibliotheque nationale-এ রক্ষিত আছে। এ বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৫২৫ সালে Venice-এ। প্রত্যেক

সংস্করণে বই খানির কলেবর বৃদ্ধি পায়। এই পুস্তকসূচীর মুখবন্ধে কি ভাবে সূচী-উল্লিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান করেছিলেন, Giovanni Nevizanno তার বর্ণনা দিয়েছেন।

Otto Brunfels (১৪৮৮—১৫৩৪) ইনি ছিলেন জার্মান এবং Strassbourg-এর চিকিৎসক, পরে Berne-এর চিকিৎসক এবং বেসল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপক। ইনি ১৫৩০ সালে Strassbourg-এ প্রকাশ করেন Catalogus illustrium medicorum sive de primis medicinae scriptoribus—৭৮ পৃষ্ঠার চিকিৎসা-পুস্তকের একখানি পুস্তক সূচী। এই বই খানিতে প্রায় ৫০০ চিকিৎসকের জীবনী তারিখ অনুযায়ী সাজান আছে এবং তাঁদের লেখা বইয়ের উল্লেখ মাত্র আছে। জীবনী গুলি চিকিৎসকদের বিশেষজ্ঞতা অনুযায়ী সাজান। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রথম বিষয়ের জাতিবিচার অনুযায়ী বিন্যাসিত পুস্তক সূচী।

Joachim Libehard বা Kammermeister, ওরফে Camemarus (১৫৫৪—১৫৯৮)। ইনি ছিলেন Nuremberg এর লোক, চিকিৎসক এবং naturalist। ইনি প্রকাশ করেন De rustica opusculas nonnulla. in-4° মাপের ৫৫ পৃষ্ঠার একখানি বই। এই বইয়ের মধ্যে আছে একটি সূচী: Catalogus authorum quorum scriptatam extant quam desiderantur qui aliquid in georgicis, re herbari et similibus scripserunt। এই বইয়ের ২য় সংস্করণ বার হয় Nuremberg-এ ১৫৯৬ সালে। এই সূচীতে লেখকের সংখ্যা ৫০০। এই সূচী হ'লো প্রথম ভেষজ সম্বন্ধীয় সূচী।

Hans Jacob Fries (1541-1611) Zurich বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন এবং ধর্মের অধ্যাপক, Conrad Gesner-এর শিষ্য। ইনি প্রথম প্রকাশ করেন দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক সূচী। Bibliotheca philosophorum classicorum authorum chronologica। এই সূচীতে খৃঃ পূঃ ৩০০ সাল থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত দর্শন সম্বন্ধীয় সকল লেখার উল্লেখ আছে। এই সূচির ২য় খণ্ডে ১১৪০ সাল পর্যন্ত ধর্মমন্দিরের পুরোহিতদের লেখার উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ডে ১৫০০, এবং ২য় খণ্ডে ৬০০ লেখার উল্লেখ আছে।

১৬শ শতাব্দীর যে কয়খানি সূচীর উল্লেখ করা হ'লো সেই ক'খানি প্রধান। এগুলি ব্যতীত আরও কয়েকখানি সূচী প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেই সকল সূচীর মধ্যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য :—

Sixte de Sienne (১৫২০-১৫৬৯) Bibliotheca Sancta ex praecipuis Catholicae ecelesiae autoribus collecta : ১০০০ পৃষ্ঠার বই। প্রথম ছাপা হয় ভেনিসে। এই সূচির ১৫৭৫, ১৫৭৬, ১৫৮৬ ও ১৫৯৩ সালে পনমূদ্রণ হয়।

Paschal Lecoq (Paschalus Gallus) (১৫৬০-১৬৩২) Basle-এ ১৫৯০ সালে চিকিৎসকদের জীবনী ও তাদের লেখা সম্বন্ধে একখানি সূচী প্রকাশ করেন। পরে Israel

Spach (১৫৬০-১৬১০) এ সূচীর Nomenclator Scriptorum medicorum নামে একখানি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

সাধারণ সূচী (Universal bibliographie) বা সাধারণ আন্তর্জাতিক সূচী

Conrad Gesner (১৫১৬-১৫৬৫)। ১৬শ শতাব্দীতে Conrad Gesner-ই প্রথম সাধারণ আন্তর্জাতিক সূচী লেখেন। Conrad Gesner-এর জন্ম Zurich-এ। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে Lausanne-এর আকাদমিতে গ্রীক ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গ্রন্থাগারে ঘুরে মনস্থ করেন, দেশ-বিদেশে কোথা কি বই আছে তার একটি প্রণালীবদ্ধ সূচি করবেন।

Bibliotheca Universalis sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus liuguis, latina, greca et hebraica প্রথম Zurich-এর প্রকাশক Froschuver ১৫৪৫ সালে ছেপে বার করেন। বইখানি in-folio'তে ছাপা ৬৩১ পৃষ্ঠা। মোটামুটি ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত ১২,০০০ লেখার বর্ণনা দেওয়া আছে।

সূচী লেখকের surname-এর আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজান। ১৫৪৮ সালে এই বইয়ের একটি প্রণালীবদ্ধ সূচী বার হয়। এই সূচীতে সমুদয় পুস্তক গুলিকে বিষয়ানুযায়ী ২০টী ভগে ভাগ করা হয়েছে।

Gesner ১৫৫৫ সালে Appendix Bibliothecae প্রকাশ করেন। এই Appendinx-এ আরও ৫০০০ বইয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে। Gesner-এর মৃত্যুর পর তার বইয়ের বহু সংস্করণ হয় এবং পরিবর্ধিত আকারে বইখানি প্রকাশিত হয়।

Gesner-এর পুস্তক সূচীকে আন্তর্জাতিক পুস্তক সূচী বলা চলেনা যদিও Schneider তার Handbuch der Bibliographie-নামক বইয়ে Gesner-এর Bibliotheca Universalis কে, আন্তর্জাতিক পুস্তক সূচীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বইখানিতে কেবলমাত্র উপরিউক্ত তিনটি ভাষায় লেখা ছাপা বই ও কিছু পুঁথি সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বইখানিকে সাধারণ পুস্তক সূচী হিসবে ধরা যায় কারণ সকল বিষয়ের বই এই বইয়ের ভিতরে স্থান পেয়েছে।

Gesner-এর পূর্বে যে সকল পুস্তক সূচী তৈরি হ'য়েছিল সেগুলি তৈরি হয়েছিল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে; পুস্তকের প্রয়োজনে নয়। অর্থাৎ সে সব বইয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য ছিল বেশী পুস্তকের প্রাধান্যটা ছিল দ্বিতীয় স্তরের। Gesner ছিলেন পুস্তকের অনুরাগী এবং সেই অনুরাগের বশেই তিনি দেশ-বিদেশে বিক্ষিপ্ত বইগুলির পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

Gesner তাঁর বইয়ে সংকলিত পুস্তকগুলির কেবল উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি।

বহু ক্ষেত্রে বইগুলির সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন এবং বইগুলির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি Gesner-ই সূত্রপাত করেন আধুনিক পুস্তক তালিকার।

জাতীয় পুস্তক তালিকা

John Leland (†1552) ইনি Commentarii de scriptoribus Britanicis নামে একখানি সূচীর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। কিন্তু বইখানি ছাপা হয় ১৭০৯ সালে। বইখানি প্রকাশ করেন Oxford-এর Anthony Hall.

John Balc (১৪৯৫—১৫৬৩) Illustrium majoris Britanniae hoc est Angliae, Cambriae ae Scotiae summarium (Gippeswiei, J. Overton, 255pp)। এ বইখানি ইংরাজ লেখকদের কালানুক্রমিক সূচী। John Bale হ'লেন ইংলণ্ডের সব চেয়ে প্রাচীন নাট্যকার। ইনি এই সূচীতে ইংরাজী লেখকদের নাম কালানুক্রমিক ভাবে সাজান এবং লেখকের forenamee অনুযায়ী একটি সূচী আছে। এই সংস্করণ ১৫৪৯ সালে পুনর্মুদ্রণ হয়। Basle-এ ১৫৫৭—১৫৫৯ সালে ২ খণ্ডে এই সূচীর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এই সংস্করণে সূচীর নাম কিছুটা পরিবর্তিত হয়ঃ Scriptorum illustrium majori Brytanniae······Catalogue। ১৪০০ লেখকের নাম এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রায় ২০০০ লেখার নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে। পরে Balc-এর সংকলিত আর একখানি সূচী ১৯০২ সালে Reginald Poole, প্রকাশ করেন; Index Britanniae Scriptorum quos ex variis Bibliothecis non parvo labore collegit Johannes Baleus cum aliis (Oxford, XXXVI—580 p)

John Pits (১৫৬০-১৬১৬): The lives of the kings, bishops, apostolicae men and writers of England. এই বইখানির চতুর্থ খণ্ড ছেপে বার হয় ১৬১৯ সালে। ছাপান W. Bishop, সূচীর নাম: Relationum historicarum de rebus Anglicis। এ বইখানির বেশীর ভাগ অংশই Bale-এর বই থেকে নেওয়া।

Antoine Françoise Doni (১৫১৩-১৫৭৪)। জন্ম Florence-এ। বহু বইয়ের লেখক। ইনি সখ করে পুস্তক সূচী প্রণয়ন করেন। ইনি Libreria নামক একখানি পুস্তক সূচী সংকলন করেন। বইখানি ছেপে বার হয় ১৫৫০ সালে—ভেনিসে ছাপা হয়। বইখানির বহু সংস্করণ হয়।

Corneille Loos ওরফে Callidius (১৫৪৬-১৫৯৫)। ১৫৮২ সালে Mainze সহরে Illustrium Germaniae scriptorum catalogus, ২৩৭ পৃষ্ঠার একখানি সূচী প্রকাশ করেন। এই সূচীতে ১৫০০-১৫৮১ সালের মধ্যে ১০০ লেখকের প্রায় ১০০০ লেখার সূচী সন্নিবেশিত।

François de la Croix du Maine ও Antoine du Verdier (১৫৫২-১৫৯২ ও ১৫৪৪-১৬০০)-এঁদের দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিলনা কিন্তু দুজনেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই নামে দুইখানি পুস্তক সূচী লেখেন : Bibliotheque françoise, একখানি সূচী প্রকাশিত হয় Paris-এ ১৫৮৪ সালে এবং অন্যখানি প্রকাশিত হয় Lyon সহরে ১৫৮৫ সালে। প্রথম সূচীতে লেখক সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত সংবাদ সম্বলিত এবং দ্বিতীয় সূচীতে প্রত্যেক বইয়ের সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত। দুইখানি বইয়েই দেশী এবং বিদেশী লেখকের ফরাসী লেখা এবং ফরাসী ভায়ায় অনুদিত বই সংকলিত হয়েছে। লেখকের নাম অনুযায়ী দুখানি বইই বিন্যাসিত। প্রথম বইখানি in-folio ৫৩৮ পৃষ্ঠা। বইয়ের শেষে লেখকের নামের ও পুস্তকের নামের সূচী। দ্বিতীয় বইখানি in-folio'য় ছাপা, ১,২৩৩ পৃষ্ঠা ও একখানি ক্রোড় পুস্তক ৬৮ পৃষ্ঠা। শেষের দিকে পুস্তকের নামের ও লেখকের নামের সূচী।

Andre' Maunsell। ইনি সত্যিকারের একখানি জাতীয় পুস্তকতা-লিকা প্রস্তুত করেন : Catalogue of English printed books। Andre Maunsell নিজে বিদ্বান গোষ্ঠির লোক ছিলেন না। ইনি ছিলেন লণ্ডনের একজন Draper। Gesner-এর মত Maunsell-এর উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশে প্রকাশিত পুস্তকগুলিকে উদ্ধার করা। পূর্বে যে সকল পুস্তক সূচী যে নিয়মানুসারে প্রস্তুত করা হয়েছিল ইনি সে সকল নিয়মের বশবর্তী না হ'য়ে লেখক অপেক্ষা পুস্তকের বর্ণনার উপর জোর দেন বেশী অর্থাৎ একখানি বইয়ের যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন পুস্তকের বর্ণনায় সেই বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করেছেন। ইনিই প্রথম পুস্তক বর্ণনায় একটি Technique-এর উদ্ভাবন করেন। লেখকের নামের যথাযথ অনুলিপি, বিশদভাবে পুস্তকের নাম, পুস্তকের আকার (format) ইত্যাদি সকল প্রকার বর্ণনা ইনি তাঁর সূচীতে দিয়েছেন। Catalogue of English Printed Books তিন ভাগে প্রকাশিত হয়—প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫৯৫ সালে। প্রথম খণ্ড ধর্ম সম্বন্ধীয় ১২৩ পৃঃ in-folio —২৫০০ পুস্তকের সূচী; দ্বিতীয় খণ্ড বিজ্ঞান ও সঙ্গীন সম্বন্ধীয়, ২৭ পৃঃ in-folio, ৩০০ পুস্তকের বর্ণনা সম্বলিত। বইগুলি বিষয় ও রূপ (form) অনুযায়ী সাজান। একথা বলা যায় যে William London-এর পূর্বে ইনি ইংলণ্ডে সত্যিকারের বিবলিও-গ্রাফীর সৃষ্টি করেন। এর পাদাঙ্ক অনুসরনে পরে অন্যান্য দেশ পুস্তক সূচী প্রকাশ করতে সুরু করবে।

১৬শ শতাব্দীর পুস্তক সূচীগুলি বিচার করলে দেখা যাবে কোন সূচীই কোন নিয়মের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়নি। নিয়ম যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত। যারা প্রথমের দিকে পুস্তক সূচীর সংকলন করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বিজ্ঞানের লোক এবং তাঁরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পুস্তকের সূচী তৈরি করেছিলেন—সূচী তৈরী করবার সাধারণ কোন নিয়ম তখনও গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ প্রথম যাঁরা সূচী করেন

তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ মৌলিক ধরণের ; কারণ তাঁরা কোন সূচী পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। তৃতীয়তঃ সূচীগুলি বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় লেখকই ছিলেন প্রধান। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বইয়ের মূল্য ছিল দ্বিতীয় স্তরের। অর্থাৎ পুস্তকের প্রয়োজনে পুস্তকের সূচী তৈরি হয়নি। প্রয়োজনটা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত। ক্রমশঃ ব্যক্তি ও বই এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রধান এবং কোনটির প্রয়োজন বেশী তা পরের যুগে স্থিরীকৃত হ'বে। লেখকের পরিবর্তে ক্রমশ পুস্তকের প্রাধান্য দেখা দেবে এবং পুস্তকের বর্ণণা দেওয়া ক্রমশঃ হ'য়ে দাঁড়াবে পুস্তকসূচীর প্রধান বিষয় বস্তু।

গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগ

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রত্যেক কর্মী পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে মিলে মিশে কাজ না করলে কাজকর্ম যেমন মসৃনভাবে চলবেনা তেমনি এর উদ্দেশ্যও সার্থক হবেনা। একথা অবশ্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই সত্য। আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই উচ্চপদে আসীন মুষ্টিমেয় কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁদের নির্দেশ, বিচার বা খেয়াল মতোই কাজ চলে। এমনকি কার্যনির্বাহের জন্য যেখানে সমিতি বা কমিটি আছে—আজকাল যার বহুলতা সরকারী বেসরকারী সব সংস্থাতেই দেখা যায়—সেখানে সেটি শুধু নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকে। আসল কাজ যাঁর বা যাঁদের চালাবার তাঁর ই চালান এবং তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে নেন। এর মধ্যে দোষের কিছু থাকেনা যদি কর্মীদের সবাইকে নিয়ে তাঁদেরও মতামতের মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কাজ চালানো হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিকে যাতে সকলেই তাঁর নিজের বলে ভাবতে পারেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এইটিই যৌথ পরিচালনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু গণতন্ত্রের মস্তবড় অবদান নির্বাচন বা ভোট, এবং ভোট-রঙ্গের কথা কে না জানেন। ভোট সংগ্রহ করে নিজের কোলে ঝোল টানা রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্থা ও দপ্তরনীতির সহজতম প্রাথমিক অধ্যায়। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে প্রত্যেক দপ্তরে বা প্রতিষ্ঠানে দুই বা বহু ভাগে কর্মীদল বিভক্ত হয়ে পড়েন, কাজ করে যান দায়-সারা গোছের, প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে ভাবতে পারেননা,—সেরকম শিক্ষা বা প্রেরণা পান না। কেবল-মাত্র বক্তৃতা দিয়ে, শীলধর্ম বা সদাচারের পাঠ দিয়ে সে ভাব আনা যায় না। তার জন্য সকলকে নিয়ে সকলের আস্থা অর্জন করে যেভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত তার অভাব সর্বত্রই দেখা যায়। ফলে দেশসেবী দেশকে নিজের বা কাজকে দেশের বলে মনে করেননা, সরকারী কর্মচারী মনে করতে পারেননা দেশ আমার নিজের, ব্যবসায়ী ভাবতে পারেননা দেশের দশজনা তাঁরই নিজের লোক। ইংরেজ আমলে সরকার বিদেশী ছিল বলে তারা যেমন দেশকে নিজের বলে ভাবেনি, আমরাও তেমনি ভেবেছি যা পারা যায় লুটে পুটে নেওয়া যাক। এবং সেই লুণ্ঠনের ভাব এখনো মন থেকে যায়নি।

কিন্তু এ হল ধান ভানতে শিবের গীত। আমি দেশজোড়া শিথিলতার সমালোচনা করতে বসিনি। বলতে বসেছি গ্রন্থাগারে কর্মীসহযোগের কথা। প্রথমেই বলেছি, গ্রন্থাগারের কাজ মসৃনভাবে চালাতে এবং উদ্দেশ্য সফল করতে সকল কর্মীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝায়? এক কথায় আমরা বলতে পারি, বিশেষ বা সাধারণ যে কোনো গ্রন্থাগারেরই উদ্দেশ্য শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচারে-প্রসারে এবং সংস্কৃতি ও রুচির গঠনে-ধরণে সহায়তা করা। সেজন্য গ্রন্থাগারের প্রতিটি কর্মী যদি

বিশেষ দৃষ্টি সম্পন্ন না হন তাহলে কাজের সঙ্ঘবদ্ধতায় অন্তরায় সৃষ্টি হবে। অপরদিকে গ্রন্থাগারিক যদি সহযোগিতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হন তাহলেও কাজের বিঘ্ন ঘটবে। পারস্পারিক এই সহযোগিতার বিষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। যেমন, কর্মীসহযোগে কর্মীদের উপরে কী ধরণের প্রভাব পড়ে, গ্রন্থাগারিকের উপরে এর ক্রিয়া কিরকম এবং সেই সূত্রে গ্রন্থাগার-পরিচালক মণ্ডলীর উপরে তার প্রভাব, গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যাপারে এর অবদান কোন ধরণের, এবং সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার-কর্মীদের শিক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে—সেই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ বা কর্মীসম্মেলনের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কিছু আছে কিনা।

কর্মীসহযোগের ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপরে এর প্রভাব সর্বাধিক সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। 'সহযোগ' ও 'প্রভাব' বলতে বুঝি তাঁদের কাজের জ্ঞানগত উৎসাহ এবং প্রয়োগজনিত অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদান। গ্রন্থাগারের কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তা আমরা জানি। এই বিশেষ শিক্ষা যে যে কেন্দ্রে হয় সেগুলিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়না। কেবলমাত্র বর্গীকরণ এবং সূচীকরণের বিষয়ে কিছু পরিমান হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের যদি চালু গ্রন্থাগারের নানাবিধ বিভাগে কিছুটা করে চাকুরি-বিকল্প বা নিয়োগানুবর্তী (in-service training) শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে গ্রন্থাগার জগতে কর্মী হিসেবে প্রবেশের পূর্বেই তাঁরা কাজ সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হয়ে আসতে পারেন। এই সূত্রে বলতে পারি, শিক্ষাক্রমের মধ্যে যদি সমস্যা সাজিয়ে পরিচালনার ভূয়া-প্রকল্পের (arranged case studies) ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হতে পারে। এমনকি তিন দিনের পাঠক্রম ঐ একটি দিনের ভূয়া-পরিচালনায় রপ্ত হয়ে যেতে পারে। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক সমিতি কিভাবে কাজ করবে তা বোঝাবার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সমিতি বা কমিটি খাড়া করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যদি বিষয় হয় তবে কেউ উপচার্য হিসেবে রইলেন। কেউ গ্রন্থাগারিক, কেউ কেউ বা বিভিন্ন বিভাগীয় অধ্যক্ষ হিসেবে। সমিতির কর্মসূচী খাড়া করে উপস্থাপন করা হল এবং আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহড়া চালিয়ে প্রকৃত কাজের একটা আন্দাজ শিক্ষার্থীরা পেতে পারেন।

গ্রন্থাগারের কর্মীরা যদি গ্রন্থাগারে সামগ্রিক কাজ-কর্ম ভাল-মন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন তবে গ্রন্থাগারের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি ক্ষতি কর্মীদেরও। একথা সত্য যে প্রতিটি কর্মীকে কোনো বিশেষ ধরনের কাজে লাগতে বা লাগাতে হয়। কেউ বা সূচীকরণের কাজে লিপ্ত থাকেন, কেউ বা বর্গীকরণের, কেউ ক্রীত পুস্তকের তালিকা প্রণয়নে, কেউ লেন-দেনের ব্যাপারে। কিন্তু এই সব কাজই একটি সূত্রে বাঁধা, একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই কারো পক্ষে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করা সম্ভবও নয় যুক্তিযুক্তও

নয়। সকলে মিলে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে হয়। সেই লক্ষ্য জ্ঞানের সীমা বিস্তারের সীমান্তে প্রসারিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই এবিষয়ে শৈথিল্য দেখা যায়। এই শৈথিল্যের জন্য সর্বাংশে কর্মীরা দায়ী নন। পরিবেশ অনুকূল না হলে তাঁদের পক্ষে কিছু করে ওঠা বা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শেষে একটা গা-ছাড়া ভাব আসে—চাকরি করছি তাই যেটুকু না করলে নয় করে খালাস হই। এই ভাব আসবার জন্য আমাদের অব্যবহিত এবং চূড়ান্ত কর্তাব্যক্তিরা কম পরিমানে দায়ী নন। প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্থাগারকর্মীদের চাকুরিগত শোচনীয় অবস্থার কথা। তাঁদের বেতনের এবং পদ গৌরবের যে অবস্থা করে রাখা হয়েছে তাতে তাঁদের কাছ থেকে উচ্চাদর্শময় দৃষ্টিভঙ্গির আশা করা যায়না। বিশেষতঃ আজকের বাস্তব পরিবেশে যেখানে সপরিবার জীবনরক্ষার জন্য নাজেহাল হতে হয়। জীবনযাপনের মানের উপর জীবনাদর্শের মান নির্ভর করে সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগারকর্মীর কাজ শিক্ষা এবং জ্ঞানের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে তাঁরা সমাজের বিশিষ্ট স্থান দখল করবার আশা করতে পারেন। অথচ কায ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা সাধারণ কেরানীদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞান নেবার পরেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করে এসে যখন কর্মস্থলে নামেন তখন দেখেন তাঁদেরই সঙ্গে তুলনীয় সমগোত্রীয় শিক্ষাবিদ অথবা দপ্তরবিদদের সঙ্গে তাঁদের বেতন ও মর্যাদার দুস্তর বিভেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরী আয়োগ সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের সমমর্যাদায় বেতনের সমবণ্টনের দিকে নজর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবিত ক্রমের মধ্যে যেমন ফাঁক আছে তার চেয়েও বেশি ফাঁক লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা এই বেতনক্রম এবং পদ-মর্যাদার সর্বাংশ প্রয়োগে অনিচ্ছুক বা উদাসীন। এবং দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তাঁরা এবিষয়ের কোনো ফয়সালা করেননি। মনে হয়, শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীদের একই দৃষ্টিতে দেখতে তাঁরা চান না এবং এমন মনে করা ও অস্বাভাবিক নয় যে আমাদের কর্তৃস্থানীয় বহু গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারের কাজ সম্পর্কে—এর বিশেষ স্থান এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না। গ্রন্থাগার যে শিক্ষা ব্যাপারে কত দিক দিয়ে কত রকম ভাবে সহায্য করতে পারে এবং শিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষকদের কাজ লাঘব ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের যদি চিন্তার দৈন্য ও ধারণার অভাব থাকে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক ও ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে ?

দেশজোড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। আজকাল 'পরিসংখ্যান' নামে একটি হাতিয়ার সরকার তরফে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তদ্দৃষ্টে মনে হতে পারে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকর্মের ব্যাপ্তিতে জনগনের মধ্যে পড়ুয়া হবার জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্ধানীরা জানেন অবস্থাটা কেমন। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার যদি বা আছে তো পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে

ঢিমে তাল চলেছে, গ্রন্থাগারিক যদি বা আছেন তো তাঁর স্বাধীনতা বা স্বাধীন চিন্তা-বিকাশের বা কর্মপন্থা গ্রহণের ক্ষেত্র নেই। জেলাশাসক মণ্ডলী সেখানে প্রধান এবং পরামর্শদাতা, গ্রন্থাগারিক অনেকাংশে নিমিত্তের ভাগীমাত্র। এই অবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর নূতন ভাবধারার প্রয়োগের সুযোগ বা কর্মে উৎসাহ আসে না। এই সব গ্রন্থাগার সমাজ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যে সব সমাজ শিক্ষাবিদ কর্ণধার হিসেবে থাকেন তাঁরাও নির্লিপ্ত বা নিরাসক্ত ভাবেই অবস্থান করেন। সরকার নির্ধারিত সাম্প্রতিক বেতনক্রমও গ্রন্থাগার কর্মীকে উৎসাহিত বা মর্যাদাবান করবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

এসব অবশ্য আমার প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। কর্মীসহযোগের পটভূমি হিসেবে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সে যাই হোক, আশা করব এই অবস্থার উন্নতি অদূর ভবিষ্যতে হবে। এখন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কর্মীদের অনুকূল স্বচ্ছন্দ পরিবেশ রচনায় গ্রন্থাগারিকের দায়-দায়িত্ব অনেক,—বলতে গেলে সবটাই। গ্রন্থাগারিক এর ভালোয় মন্দয় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। কেননা, এই কর্মীসহযোগের প্রবর্তন যেমন তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব তেমনি এর ফলাফলের ভাগীও মূলতঃ তিনিই। তাঁর কাজের সুসমঞ্জস বন্টনের সুফল যেমন তিনি এবং গ্রন্থাগার ভোগ করেন তেমনি এর কুফলের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু তিনি এজন্য তাঁর নিজস্ব মতের সপক্ষে সকলকে পরিচালিত করতে এবং দ্বিমতকারী মাত্রেরই প্রতি বিরূপ হতে পারেন না। গ্রন্থাগারিক যেমন পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারণ করেন, তেমনি তাঁর পক্ষে বিভাগীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক বসিয়ে আলোচনার দ্বারা সেই নীতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তেমনি গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিভাগ উপরিভাগের সুবিধা অসুবিধার কথা এবং উন্নয়নমূলক নীতি প্রবর্তনের বিষয় নিয়ে নিজ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা ঠিক করে নিয়ে তারপর সেটি পরিচালকমণ্ডলীর কাছে পেশ করা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে প্রতিটি কর্মী তাঁর নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে এবং সমগ্রভাবে গ্রন্থাগারের কাজ সম্পর্কে সচেতন হ'বার প্রেরণা পাবেন, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করে যৌথ দায়িত্বের ভার বহন করতে পারবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার খুঁটিনাটির মধ্যে কর্মীরা যদি এইভাবে না যেতে পারেন তাহলে ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিক তৈরির পথ খোলা থাকে না। বড় গ্রন্থাগারে কাজ করে তাঁরা সংগঠন ও পরিচালনার শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য ছোট বড় গ্রন্থাগারের পরিচালক হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় গ্রন্থাগারিক অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীরা সব কাজের চাবিকাঠি নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে সমস্ত শক্তির একীভূত আধার হয়ে থাকতে চান। শুধু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান, আয়োগ, সংস্থা, দপ্তর ইত্যাদির বেলায় লক্ষ্য করা যায় পরিকল্পনা বা দায়িত্ব সবই যিনি প্রধান তিনি নিজের কব্জার মধ্যে রাখেন, সব কিছু-কেই একটা গোপনীয়তার মোড়কে রেখে সর্বশক্তিমান হয়ে বসে থাকতে চান। এর ফলে

তাঁর অতি মূল্যবান পদটি যখন খালি হয় তখন উপযুক্ত লোকের জন্য চারদিক হাতড়ে বেড়াতে হয়, কেননা তিনি কাউকে বিশ্বাস করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি,—কাউকে ওয়ারিশ হিসেবে তৈরি করে যান নি। এই মনোভাবের ফলে কর্মীরা বরাবর অসন্তোষের মধ্যে দিন কাটান এবং অনিচ্ছুক ভাবে কাজ করে যান,—পুরো শক্তি নিয়োগ করতে নারাজ থাকেন,—যার ফলে তাঁদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা লুপ্ত হয় এবং গ্রন্থাগারেরও উন্নতির পথে ব্যাঘাত ঘটে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে এই রোগ আমাদের সমগ্র দেশকে কি ভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, সৃষ্টি করেছে নানান দলের এবং অসুস্থ পদ্ধতির। নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় এবং শুধুমাত্র নিজের উন্নতির রাস্তা খোলা রাখবার জন্য আমাদের অধিকাংশ কর্তাব্যক্তিরাই নিম্নতম কর্মীদের স্বীকৃতি দিতে নারাজ থাকেন এবং তাঁদের প্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। অথচ সহজ সত্য এই যে, নিজের বিভাগে গুণী এবং অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল কর্মী থাকলে তাঁর নিজ অধ্যক্ষতার সুনাম এবং প্রতিষ্ঠানেরই গৌরব বাড়ে, এবং মিশে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কাজ করলে পরিচালক হিসেবে তাঁরই বিশেষত্ব ও সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

কর্মী সহযোগ চর্চার আরেকটি ক্ষেত্র গ্রন্হাগার পরিষদ। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্হাগার কর্মীরা নানান সংস্হায় মিলিত হতে পারেন। আমাদের মধ্যে যেমন আছে বঙ্গীয় গ্রন্হাগার পরিষদ, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন, প্রভৃতি—এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও অনুসন্ধান গ্রন্হাগার পরিষদ (IASLIC) ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ সংস্হা। এই জাতীয় পরিষদের কাজ যেমন আলোচনা সভা বা পত্রিকাদি বার করা তেমনি গ্রন্হাগার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন ও পরিকল্পনা পেশ করে দেশের সরকারকে ও জনগণকে সচেতন করে তোলা। যেমন বেতনক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারী বেতন কমিশনের বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি রূপায়িত হল কিনা সে বিষয়ে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ইত্যাদি, কিন্তু আরো অভ্যন্তরে দৃষ্টি বিস্তার করে দেখা দরকার ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত সিদ্ধান্ত নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়ে থাকলেও কর্মীনির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত বেতনক্রম দেওয়া হচ্ছে কিনা অথবা দায়সারা ভাবে বেতনক্রমের নিয়ম রক্ষা হলেও সমবন্টন হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি। কর্মীকুলের সচেতনতাই এইসব ব্যাপারে পরিষদের সহায়ক হতে পারে। গ্রন্হাগারকর্মীরা পরিষদ মারফত যেমন নানান গ্রন্হনা গবেষণার কাজ হাতে নিতে পারেন তেমনি এখানে নিজেদের কাজকর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারেন। এভাবে পারস্পারিক সহযোগ রক্ষা করে নিজেদের দায় নিজেদের কাঁধে তুলে না নিলে ব্যক্তিগত বা সামগ্রিক উন্নতির সম্ভাবনা সাম্প্রতিক পরিবেশে দুরপরাহত হবে। গ্রন্হাগার পরিষদকে ট্রেড য়ুনিয়ন জাতীয় সংস্হা মনে করবার কোনো হেতু নেই। তবু কর্মী হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজন। কর্মীরা নিজ নিজ গ্রন্হাগারে নানান বিধিতে অথবা নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। সেখানে

তাঁদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিষদগুলিতে তাঁদের সেই বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক থাকে না। এখানে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র সত্তা এবং চিন্তার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। তাই পরিষদের গ্রন্থাগার মাধ্যমে এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের সূত্রে কর্মীরা নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। গ্রন্থাগারের বিবিধ সমস্যা নিয়ে এখানে যদি চাকুরি বিকল্প বা ভুয়া প্রকল্পের শিক্ষাচক্র বসানো যায় তাহলে প্রত্যেকেই তাতে অংশ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন। পরিষদের এই ধরণের শিক্ষা চক্রের সুযোগ তাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে রপ্ত হতে পারেন। গ্রন্থাগার পরিষদ এই ভাবে কর্মীসহযোগ সূত্রাবলীর দিকে নজর দিলে নূতন নূতন পথের হদিস মিলতে পারে, কর্মীবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ, কর্তব্যবোধ এবং কুশলতার সৃষ্টি হতে পারে।

গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান বিশেষ, এবং ক্রমপরিবর্তনশীল। বছরের পর বছর জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়ে চলে, গ্রন্থসম্পদও বর্ধিত হয়। নূতন নূতন চিন্তাধারার প্রসার এবং কল্পনা ও পদ্ধতির প্রবর্তনে-বিবর্তনে নানাবিধ পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। জাগতিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের জোয়ার গ্রন্থাগারকে স্বভাবতঃই স্পর্শ করে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। পুস্তকসম্পদ স্থিতিশীল, কিন্তু চিন্তাধারা বিচরণশীল। জ্ঞান সম্পদ এক মন থেকে আর এক মনে সঞ্চারিত হয়ে চলে। পুরানোকে সরিয়ে নূতন চিন্তাধারা অথবা পুরানোকে ভিত্তি করে নব রূপায়ণ যুগ থেকে যুগে চলতেই থাকে। এই নিত্য নবীনতাকে বরণ করে নিতে না পারলে পিছিয়ে পড়ে থাকতে হয়, থিতিয়ে যেতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানই চিরাচরিত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে না,—থাকলে বাড়তে পারেনা। গ্রন্থাগারিক অথবা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যদি নূতন নূতন ভাবধারাকে তুচ্ছ করেন তাহলে সেই গ্রন্থাগার মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণে লাগে না। এই নূতন চিন্তাধারা আসবে নূতন নূতন কর্মীদের কাছ থেকে। তাঁদের পরিকল্পনা পরামর্শকে যদি উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়া যায় তবে গ্রন্থাগার মৃত গ্রন্থাগার হয়ে পড়বে, গ্রন্থাগারিক যাবেন বিস্মৃতিগর্ভে তলিয়ে। গ্রন্থাগারে এই নবযৌবনের দলকে অগ্রাহ্য না করে ছোট ছোট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দিলে এবং তাঁদের মতকে রূপায়িত করবার ঝুঁকি নিলে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, এবং এই সহযোগিতায় কর্মীরাও উৎসাহিত বোধ করবেন। হয়ত ছোটখাট ভুল ত্রুটি প্রথম প্রথম দেখা যাবে,—তা আর কোথায় কবে না হয়ে থাকে,—কিন্তু গ্রন্থাগারিক তাঁর অভিজ্ঞতার হাল ধরে তাঁদের পরিচালিত করবেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ পরিচালক এবং চিন্তানায়ক তৈরি হবে, গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাজ ছন্দময় বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে, গ্রন্থাগারের প্রাণগঙ্গা থাকবে চিরপ্রবাহমান।

জীবিকা হিসেবে যাঁরা গ্রন্থাগারের কাজকে বেছে নেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিছক চাকরির প্রয়োজনেই এদিকে ঝোঁকেন সন্দেহ নেই। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই। তবে আমরা দেখতে পাই গ্রন্থাগারকর্মের দিকে সাধারণতঃ খুব কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ঝোকেন না, খুব কম ব্যক্তিই আদর্শের প্রেরণায় আসেন। তার মধ্যেও আবার অনেকেই গ্রন্থাগার

জগৎ থেকে সরে শিক্ষাজগতে বা অন্য উপজীবিকার ক্ষেত্রে চলে যান। তবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, হরিনাথ দের মতো মনীষিরা একদা গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এবং রঙ্গনাথন আজ এবিষয়ে ভারতের গৌরব,—বিশ্বের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর নাম। জীবিকার ক্ষেত্রে অনেককেই অনেক কাজে বাধ্য হয়ে ব্রতী হতে হয়, কিন্তু মনীষার ক্ষেত্রে তাঁরা পিছিয়ে থাকেন না। গ্রন্থাগার-জীবিকার আকর্ষণ হীনতার জন্য কর্মীরা দায়ী নন। বরঞ্চ তাঁদের মধ্যে থেকেই নূতন নূতন চিন্তাশীলের আবির্ভাব ঘটে। গ্রন্থাগারের কাজকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সরকার পক্ষের গরজ বড় একটা নেই, এবং কৃতীদের আকর্ষণ করবার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই এই অবস্থা। বিজ্ঞান বা মানবিক শিক্ষার বেলায় যে ধরণের যত্নের ব্যবস্থা আছে তা শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, গ্রন্থাগারের বেলায় নেই এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। তবু গ্রন্থাগারের কাজকে বিশেষত্বে মণ্ডিত করে আজ তাকে এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে উন্নীত করেছেন গ্রন্থাগার কর্মীরাই। তাঁদেরই আভ্যন্তরীন তাগিদ ও আদর্শের প্রতি অবিচলতার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। যদিও বেতনের হার কম, যদিও স্বীকৃতির মান নগন্য তবু তাঁদের চেতনা বা চৈতন্য কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। যাবার হেতুও নেই। স্বল্প বেতনে বিদ্যালয়াদির শিক্ষকরা যেমন শিক্ষাদানে কার্পণ্য করেননা এবং বিদ্যাদানের গৌরবে উন্নত-মস্তক, তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীরা অনুরূপ জ্ঞান বিতরণের গৌরবে গর্বান্বিত বোধ করতে পারেন। পারিপার্শ্বিক বাধা বা ঔদাসিন্য তাঁদের বিচলিত করতে পারবেনা যদি তাঁরা পারস্পরিক এবং সামগ্রিক সহযোগ বজায় রেখে কাজ করে যেতে পারেন। দেশ-জোড়া গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীর সঙ্গে তাঁদের লেন-দেন এবং কর্মে ও চিন্তায় যোগাযোগ রেখে চলতে হবে, হতে হবে এক লক্ষ্য। একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাঁদের যাত্রা—এই উপলব্ধি থাকলে কর্মী সহযোগের পথ সহজ হবে সরল হবে, সুষ্ঠু হবে পরিচালনার ধারা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫—১৯৪৩) ঃ গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তক ও প্রবন্ধাদির বর্গীকৃত সূচী

শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুরাজকৃষ্ণ মণ্ডল সংকলিত

আজীবন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭১—১৩ই আশ্বিন, ১৩৫০) এরূপ তথ্যজ্ঞ ও ধীর-স্থির সাহসী মন্তব্যের লোক ছিলেন যে সংবাদপত্র জগতে তিনি অগ্রনী বলিয়া সারা ভারতে সম্মানার্হ ছিলেন।

এই পঞ্জিকা প্রণয়নে রামানন্দবাবুর পুস্তকাদি ও বেশীর ভাগই সঙ্কলন পত্র পত্রিকাদি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বিষয়গুলি নিম্নোক্ত ডিউই দশমিক বর্গ সংখ্যায় প্রশস্তভাবে বর্গীকৃত অবস্থায় সুসজ্জিত করা হইয়াছে ঃ

০ সাধারণ জ্ঞান
১ দর্শন
২ ধর্ম
৩ সমাজ বিজ্ঞান
৪ ভাষা
৫ বিজ্ঞান
৬ প্রয়োগ বিজ্ঞান
৭ শিল্পকলা
৮ সাহিত্য
৯ ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও জীবনী।

এই পঞ্জিকা রামানন্দ বাবুর রচনার আংশিক প্রচার মাত্র, ইংরেজী রচনাদি এখানে গৃহীত হয় নাই। বঙ্গভাষায় তাঁহার আরো রচনা অন্য পত্র পত্রিকাতে ভবিষ্যৎ পঞ্জিকার উপজীব্য হইয়া রহিল। এই সামান্য সাধ্য সঙ্কলনেই রামানন্দ বাবুর মনোমানস ও চিন্তাজগতের বিস্তৃতি উপলব্ধি হইবে।

যে বিষয়গুলি তারকা চিহ্নিত তাহা রামানন্দ বাবুর রচিত, সম্পাদিত বা সঙ্কলিত পুস্তক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাদবাকিগুলি সাধারণ অক্ষরে পত্র-পত্রিকায় রামানন্দ বাবুর রচনা বা তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ-কবিতাদি।

বাঙ্গালা সালের শেষের তিনটি সংখ্যা বৎসর গণনায় গৃহীত হইয়াছে—এবং মাসের হিসাব ও সংখ্যা গণনায় যথা—শ্রাবণ, ১৩৫০ সন = ৪.৩৫০. ইংরেজী সন স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে স্থানে স্থানে।

৭ বর্গে রামানন্দবাবু ও অন্যান্য মহাত্মার ফটোর এক তালিকা ও কোথায় প্রাপ্তব্য তাহা সূচিত হইয়াছে।

০—সাধারণ জ্ঞান

দাসী [মাসিক] : দাসী খ. ৪-৫. সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৮৯৫, ১৮৯৬. দাসাশ্রমের মাসিকপত্র। ন্যা. লা. 182. Qc. 896. 1-3

প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার : সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৬. ৩৫১ পৃ. ৪১৮

প্রবাসী [মাসিক] : প্রবাসী। বৎসর ১-৪৩— ১৩০৮-১৩৫০—ইং ১৯০৩-১৯৪৩— । এলাহাবাদ, কলিকাতা, প্রবাসী কার্যালয়, ১৯০৩-১৯৪৩—২৫ সেঃ
ন্যা. লা. 182. Qb, 903, 12

* প্রবাসী। ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ; ১৩৬৭ (ইং ১৯৬১). কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ইং ১৯৬১. ৮৪৮পৃ. ২৫ সেঃ

যোগেশ চন্দ্র বাগল : রামানন্দ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু। জয়শ্রী, ১.৩৭২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : প্রবাসীর বয়স। প্রবাসী, ১.৩৪৭, পৃ. ১২২

: বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গ ভাষা (সচিত্র)। চন্দননগরে নৃত্য গোপাল স্মৃতি-মন্দির পুস্তকাগারের ৫৮তম বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।
প্রবাসী, ৪.৩৩৮, পৃ. ৫০৮-৫১০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সম্পা : দাসী। খ. ৪-৫. ১৮৯৫, ১৮৯৬.
ন্যা. লা. 182. Qc, 896. 1-3

শান্তা দেবী : প্রবাসীর কথা। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭. পৃ. ৪-১০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলার উৎকর্ষ ও প্রবাসী। প্রবাসী, ১৩৩৩, পৃ. ৯৭-১০২

: ষষ্টি পূর্তি। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭. পৃ. ১২-১৪

সূর্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী : মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৭.৩৫২, পৃ. ৭৮-৮০

হুমায়ুন কবির : প্রবাসীর শত বৎসর। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭.
পৃ. ২২-২৩

১—দর্শন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : অভ্যাস ত্যাগ। প্রবাসী, ৪.৩২৩. ৬.৩৭১. পৃ. ৭৭৪

: মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ। প্রবাসী, ৩.৩২৮. ৫.৩৭১, পৃ ৫৭৬-৫৭৮

: সত্যের বিরোধ ও সামঞ্জস্য। প্রবাসী, ১১.৩৭১ পৃ. ৬০৯-৬১০

২—ধর্ম

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : ধর্মরাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ। ১৩২৫ সালে ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসবে (১৯১৮ ইং) পঠিত। প্রবাসী, ৬.৩২৫ পৃ. ৫১৭-৫২৮

৩—সমাজ বিজ্ঞান

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : ঐক্যের একটি পথ। বঙ্গলক্ষ্মী, ১.৩৩৯, প্রবাসী, ৩.৩৩৯, পৃ. ৪০৬-৪০৭

: কেশব সেনের জাতি গঠন চেষ্টা। (সচিত্র) প্রবাসী, ৮.৩৪০, পৃ. ২৯৮-৩০৬

: ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির উন্নতির উপায়। প্রবাসী, ১.৩৩১, পৃ. ১১৩-১১৪

: চন্দননগরে দুই চারিটি কথা। পাল পাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের বাৎসরিক সম্মেলনে চন্দননগর হরিহর শেট লজে ৬ই মে ১৯২৮ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। প্রবাসী, ৩.৩৩৫

: ছেলেমেয়েদের একত্র বিদ্যাশিক্ষা। প্রবাসী, ৯.৩৪০, পৃ. ৪০৭-৪০৯, বঙ্গলক্ষ্মী, ৮.৩৪০

: দেশ ভক্তি। প্রবাসী, ১৩২১, ৬.৩৭১, পৃ. ৭৭৫

: প্রবাসী সম্পাদকের বক্তৃতায় বাধাদানের কারণ ও স্বরূপ। প্রবাসী, ২.৩৪৭, পৃ. ২৪৩-২৪৪

: প্রবাসী সম্পাদকের সভাপতি হইবার অনিচ্ছার কারণ। প্রবাসী, ২.৩৪৭, পৃ. ২৪২-২৪৩

: বাঁকুড়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা। প্রবাসী, ৬.৩৩৪, ৮৯৯-৯০২

: বাঁকুড়ার উন্নতি। (সচিত্র) প্রবাসী, ১.৩৩১, পৃ. ১১৪-১৩০

: ভারত শাসনের প্রস্তাবিত মূল বিধি। প্রবাসী, ৮.৩৩৪, পৃ. ২৬৪-২৬৬

: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা। প্রবাসী, ৪,৩৫৪

: ময়মনসিংহ জেলার যুবক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। সুধেন্দু রঞ্জন রায়ের বক্তৃতার নোট। প্রবাসী, ৬.৩৩৪, পৃ. ৮৬৪-৮৬৭

: মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। বঙ্গলক্ষ্মী, ৬.৩৩৯, প্রবাসী, ৯.৩৩৯

: মাতৃত্বের কার্যক্ষেত্র। নব্যভারত, ১.৩২৯, প্রবাসী, ৩.৩২৯, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮

: রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙ্গালীর কর্তব্য। প্রবাসী, ২.৩৪৮

: 'রামানন্দ বাবুর বিবৃতি'। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৭ তারিখের আনন্দবাজারে 'রামানন্দ বাবুর বিবৃতি'র উত্তরে সম্পাদকীয় মন্তব্য। প্রবাসী, ৩.৩৪৭, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

: বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান ও প্রবাসীর সম্পাদক।
প্রবাসী, ৬.৩৪৭, পৃ. ৮২০

: বঙ্গে উন্নতির বোধ। প্রবাসী, ৮.৩৩৪, পৃ. ২৫৮-২৬৪

: বঙ্গে মুসলমান ও অমুসলমান। (সচিত্র)
প্রবাসী, ১০,৩৩৭, পৃ, ৪৭৯-৪৮৭

: বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার লজ্জাকর অবস্থা। প্রবাসী, ৮ ৩৩৪, পৃ. ২৬৬-২৬৯

: বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা। প্রবাসী, ১২.৩৩০, পৃ. ৮৪৩-৮৫০

: বঙ্গের প্রতি গভর্ণমেণ্টের অবিচার। প্রবাসী, ৪ ৩৩৪, পৃ. ৬০৯-৬১৬

: বন্যা রিলিফ কমিটির কার্যপ্রণালী। আচার্য স্যর পি সি. রায়ের পত্রের উত্তরে সম্পাদকীয়। প্রবাসী, ২.৩৩০, পৃ. ২৫৫

: বাঙ্গালা দেশের লৌকিক তথ্য। প্রবাসী, ৪.৩৩০

: বিধবা বিবাহ সমস্যা। বিশ্ববাণী, ১.৩৩৪ প্রবাসী, ৪.৩৩৪,
পৃ. ৫২৩-৫২৪

: বীরভূম জেলা সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা।
প্রবাসী, ১০.৩৩১, পৃ. ৫৩৪-৫৩৯

: 'বেদান্তের চাষ' সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ। প্রবাসী, ৬.৩২৩, পৃ. ৬৩১-৬৩২

: শান্তিনিকেতনের শ্রীভবন। (সচিত্র)।
প্রবাসী, ২.৩৩৬, পৃ. ২৫৬-২৬২

: স্ত্রী শিক্ষার প্রকার ও মাত্রা। বঙ্গলক্ষ্মী, ৪.৩৩৫, প্রবাসী, ৫.৩৩৫,
পৃ. ৭০৪-৭০৫

: স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগযাত্রা।
প্রবাসী, ১.৩১৫, পৃ. ৯৬-১০৫

: স্বরাজের যোগযাত্রা। প্রবাসী, ২.৩৩৫, পৃ. ২৭৯-২৮৫,
—৩.৩৩৫, পৃ. ৪৫৯-৪৬৫

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি।
প্রবাসী, ৯.৩৫০, পৃ. ২৭০-২৭৭

সুবোধ চন্দ্র রায় : ভারতের অন্ধ শিক্ষায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান।
প্রবাসী, ৮ ৩৫০, পৃ. ১৬১-১৬২

৪—ভাষা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রণালী। মানিকগঞ্জে বক্তৃতা।
প্রবাসী, ৯ ৩৩৪, পৃ. ৩৮০-৩৮৪

: মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। প্রবাসী, ৯.৩৩৯, পৃ. ৩৯৭-৩৯৯

: বঙ্গের পত্রকালয় ও বঙ্গভাষা। (সচিত্র)। চন্দননগরে নৃত্যগোপাল

স্মৃতি মন্দিরের ৫৮তম অধিবেশনে বক্তৃতা।

প্রবাসী, ৪.৩৩৮, পৃ. ৫০৮-৫১০

: বাংলা বানান। প্রবাসী, ৪.৩২৩, পৃ. ৪০৬-৪০৭

* সচিত্র বর্ণবোধ। খঃ ১-২. (সাহিত্য পঞ্জিকা, ১৩২২, সম্পাদক: যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় গ্রন্থ তালিকায় প্রাপ্ত।)

৬—প্রয়োগ বিজ্ঞান

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ঃ নয়াদিল্লীতে বাঙ্গালীর ব্যবসা। প্রবাসী, ১১ ৩৪২, পৃ. ৭০১-৭০৩

৭—শিল্পকলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ।

প্রবাসী, ৯.৩৫০, পৃ. ২৬১-২৬২

নন্দলাল বসুঃ রামানন্দ ও ভারতীয় চিত্রকলা। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ. ১৫

ফটোঃ অধ্যাপক উইন্টারনিৎস্‌জ, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, লেইজনি। প্রাগে ইং ১৯২৬ সালে গৃহীত। প্রবাসী, ১১.৩৪৩, পৃ. ৭৭১

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে স্টীমারে প্রীতি সম্মিলনী (১৩৪১)।

প্রবাসী, ১১ ৩৪১, পৃ. ৭১৫

: রাজেন্দ্র প্রসাদ…কালিদাস নাগ। বেনারসী দাস চতুর্বেদী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে…'রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালা' পুস্তক উপহার দান…কালিদাস নাগ। প্রবাসী, ৯.৩৫৮, পৃ. ৫৩১

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৭ ৩৬৮, পৃ. ১২৫

ইং ১৮৯৯, ১৯০৫, ১৯১২ ও ১৯৩৬ প্রবাসী, ৮.৩৫০, পৃ. ১২০

ইং ১৮৯৮, ১৯২৩ ও ১৯৩৮—সতেন্দ্রনাথ বিশী গৃহীত।

১৯৩৯—দেবেন্দ্র সত্যার্থী গৃহীত।

১৯৪০—শ্রীরাম শর্মা (২) গৃহীত। প্রবাসী, ৯.৩৫০, পৃ. ২৬০

— প্রবাসী, ৭.৩৫২, পৃ. ৭৯

— প্রবাসী, ৩.৩৬৯, পৃ. ২৫৬

— প্রবাসী, ৬ ৩৭১, পৃ. ৬৪১

— (নেগেটিভ শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে)

প্রবাসী, ২.৩৩৬, পৃ. ৩০০

— এস. এস. পিলসনা জাহাজে রামানন্দ।

প্রবাসী, ৬.৩৩৩, পৃ. ৯৩৭,

— উত্থান সম্মেলনে প্রবাসীর সম্পাদক (প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন)। প্রবাসী, ১১.৩৪২, পৃ. ৭২৩

— তালকোটরা উত্থান সম্মেলনে প্রবাসী সম্পাদকের একটি কাগজ দর্শন। (প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন)
প্রবাসী, ১১ ৩৪২, পৃ. ৭১৮

— তালকোটরা উত্থান সম্মেলনে সভাপতি সহ প্রতিনিধিবর্গ (প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪২)।
প্রবাসী, ১১.৩৪২, পৃ. ৭১৫

— দেওঘর বিত্থাপীঠের ছাত্রগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রবাসী সম্পাদকের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। প্রবাসী, ১২.৩৪৭, পৃ. ১৩৮

— দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিত্থাপীঠে রামানন্দ।
প্রবাসী, ১২,৩৪১, পৃ. ৮৭৩

— নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনে··· রামানন্দ। প্রবাসী, ১১৩৪১, পৃ. ২৯৯

— পান্নালাল শীল বিত্থা মন্দিরের শিক্ষকগণ ও প্রবাসীর সম্পাদক।
প্রবাসী, ২.৩৪১, পৃ. ২৮৬

— প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। প্রবাসী,১০.৩৪৩, পৃ. ৬০৬

— প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। প্রবাসী, ১০,৩৪৩, পৃ. ৬০৫

— বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজী বিত্থালয়ের রজত রঞ্জনোৎসব উপলক্ষে সভায়···রামানন্দ। প্রবাসী, ২.৩৪২, পৃ. ২৪৯

— বালুরঘাটে। প্রবাসী, ২ ৩৪২, পৃ. ২৫১

— বোম্বাই রেলওয়ে ষ্টেশনে···রামানন্দের অভ্যর্থনা।
প্রবাসী, ৮.৩৪১, পৃ. ২৯৯

— মজঃফরপুর জি বি. কলেজের বাঙ্গালা সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং প্রবাসীর সম্পাদক। প্রবাসী, ৩ ৩৪০, পৃ ৪২৬

— মজঃফরপুর বাঙ্গালী ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও প্রবাসী সম্পাদক।
প্রবাসী, ৩ ৩৪০, পৃ ৪২৭

— রাজ মহেন্দ্রী বীরেশ লিঙ্গম্ বিধবাশ্রমে অধিবাসিবৃন্দ মধ্যে······ রামানন্দ। প্রবাসী, ৩.৩৪৩, পৃ. ৪২৩

— রোলাঁ পরিবারে রামানন্দ। প্রবাসী, ৭ ৩৩৩, পৃ. ১৭১

— সভাপতি রামানন্দ···নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পুস্তকাগারে উৎসব ৫৮তম বৎসর, চন্দননগর। প্রবাসী, ৪,৩৩৮, পৃ. ৫০৯

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি, শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিকী বিভাগ, রাঁচী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। প্রবাসী, ৯. ৩৪৩, পৃ. ৪৬০

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু সি. এফ এণ্ড্রুজ। শম্ভু সাহা কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে। শান্তিনিকেতন ইং ১৯৪০ সালে গৃহীত।
প্রবাসী, ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭.

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রোম্যাঁ রোলাঁ। প্রবাসী, ৭. ৩৩৩, পৃ. ১৭০

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বোম্বাইয়ে।
প্রবাসী, ৬. ৩৩৩, পৃ. ৯৩৬

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : বাঁকুড়ার প্রস্তাবিত মিউজিয়াম।
প্রবাসী, ৩. ৩৪৭, পৃ. ৩৬০-৩৬৩

৮—সাহিত্য

করুণাময় বসু : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। (কবিতা) প্রবাসী, ৮. ৩৫০, পৃ. ১৭৮

কুমুদরঞ্জন মল্লিক : প্রবাসী। (কবিতা)। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ. ২৮-২৯

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। (কবিতা)। প্রবাসী, ১২. ৩৫৪, পৃ. ৫৪৭

কৃষ্ণধন দে : স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম দিনে। (কবিতা)।
প্রবাসী, ৩. ৩৬৮, পৃ. ৩৭২

গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (সচিত্র)
প্রবাসী, ১১. ৩৪০, পৃ. ৬৮৫-৬৯৭.

দিলীপ দাশগুপ্ত : প্রবাসী—নতুন ধ্যান। (কবিতা)। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ, ৭৯২

'দীপ ও ধুপ' : আলো ও ছায়া রচয়িত্রীর 'দীপ ও ধুপ' কবিতার সমালোচনা।
প্রবাসী, ৭. ৩৩৬, পৃ. ১৩৭-১৪১.

নীলরতন দাস : মুক্তি সাধক রামানন্দ স্মরণে। (কবিতা)।
প্রবাসী, ২. ৩৫৬, পৃ. ১৪১

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত : রামানন্দ বন্দনা। (কবিতা)। প্রবাসী, ৯. ৫৩০

মদনমোহন ঘোষ : বাংলা সাহিত্য ও রামানন্দ বাবু। প্রবাসী, ৮, ৩৬০, পৃ. ১৭০-১৭২

মহাদেব রায় : চিরঞ্জীবী রামানন্দ। (কবিতা)। প্রবাসী, ১১, ৩৫০, পৃ. ৪৬০.

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র : রামানন্দ প্রশস্তি। (কবিতা)। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে পঠিত।
প্রবাসী, ৭. ৩৫২, পৃ. ৩৮.

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : জন্মভূমি। দাসী, মে, ১৮৯৫. প্রবাসী, ১১. ৩৭১

: প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। (সচিত্র)।
প্রবাসী, ১১. ৩৪২, পৃ. ৭১৪-৭২৪

: প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আমার আবেদন। প্রয়াগে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন। প্রবাসী ১১ ৩৪০, পৃ. [illegible]

: ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রণালী। (মাণিকগঞ্জে বক্তৃতা)

প্রবাসী. ৯.৩৩৪, পৃ. ৩৮০-৩৮৪

: মেদিনীপুর সাহিত্য সভা (বক্তৃতা)

প্রবাসী, ৩.৩৩৪ পৃ. ৩৪৬-৩৪৮, মাধবী, ১১. ৩৩৩

: রামেন্দ্র স্থন্দর ত্রিবেদী ও আরব্য উপন্যাস।

প্রবাসী, ৩. ৩৪২, পৃ. ৪৪৩

: রেভারেণ্ড টমসন সাহেবের পণ্ডিতম্মন্যতা।

প্রবাসী, ৪. ৩৩৪, পৃ. ৫১৮-৫২১

: শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী—প্রবাসী সম্পাদকের মন্তব্য।

প্রবাসী, ৫. ৩৪৬, পৃ. ৭০১-৭০৩

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পা: অ্যারাবিয়ান নাইটস্—*আরব্য উপন্যাস। ৩য় সং। খ: ১-৩ কলিকাতা, ১৯১৭. ১৮ সেঃ সংক্ষিপ্ত সং। প্রথম প্রকাশ: ১৯১২

ন্যা লা: 182 Oc 917,44-46—912, 25

: কাশীরাম দাস—*মহাভারত। কলিকাতা, ১৯২৬. ২৫ সেঃ

ন্যা. লা. 182, Jb. 926, 6,

: কৃত্তিবাস—*রামায়ণ। ৪র্থ সং। কলিকাতা, ১৯১৩. ২৫ সেঃ

প্রথম প্রকাশ: ১৯০৯ ন্যা. লা. 182, Jb, 913, 6

: শ্রীশচন্দ্র বসু—*হিন্দুস্থানী উপকথা। কলিকাতা, প্রবাসী কার্যালয়, ১৯১২. ২৫ প্লেট, চিত্র, ২১ সেঃ শেখ চিল্লী বা শ্রীশচন্দ্র বসুর ইংরেজী 'ফোক টেলস্ অব হিন্দুস্থানে'র বাঙ্গালা অনুবাদ। অনুবাদিকা: শান্তা দেবী। চিত্র: উপেন্দ্রকিশোর রায়।

হেমলতা ঠাকুর: সত্যপন্থী (রামানন্দ স্মরণে)—কবিতা)। প্রবাসী. ৮. ৩৫০, পৃ. ১৫৭

৯—ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ ও জীবনী

অজিত কুমার চক্রবর্তী: *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সমালোচনা। প্রবাসী, ৬.৩২৩, পৃ. ৬৩১

অরূপানন্দ স্বামী: *মায়ের কথা। কলিকাতা, ১৯২৬। ১৮ সেঃ রামকৃষ্ণের সহধর্মিনীর জীবন সম্বন্ধে রামানন্দের রচনা সম্বলিত। ন্যাঃ লাঃ 182 Cc, 926, 29.

অবনীনাথ রায়: রামানন্দ স্মৃতি। প্রবাসী. ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭,

পৃ. ৬৭৭-৬৭৮

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রামানন্দ জীবনী। শান্তা দেবীর রচিত 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালা' পুস্তক সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের পত্র।

প্রবাসী, ৯. ৩৫৭, পৃ. ২৮১

উষা বিশ্বাস : রামানন্দ স্মরণে। প্রবাসী, ৭. ৩৫৮, পৃ. ১৫-১৬

করুণাকুমার নন্দী : ভারত পথিকৃৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৩. ৩৭১, পৃ. ২৫২

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত : স্মৃতির ঝাঁপি। প্রবাসী, ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ ৬৭৮-৬৮২

কালীপদ সিংহ : রামানন্দ স্মৃতি। প্রবাসী, ২. ৩৫৭, পৃ. ১৪৬

ক্ষিতিমোহন সেন : পুণ্য চরিত কথা। (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) প্রবাসী, ৯ ৩৫০, পৃ. ২৬২-২৬৯

: রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ বাবু। প্রবাসী, ১০. ৩৫০, পৃ. ৩৪৭-৩৫৬

গোপাল লাল দে : রামানন্দ স্মরণে। (কবিতা)। প্রবাসী, ১১. ৩৫০, পৃ ৪৬০

চট্টোপাধ্যায় বংশ : (পণ্ডিত রত্নী মেল) সংগ্রাহক : সুনীল শেখর চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৯.৩৫০, পৃ. ২৯৬

জীবনময় রায় : দাসাশ্রম দানী। প্রবাসী, ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ. ৬৬৫-৬৭০

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় : দেশ হিতব্রতী রামানন্দ। (জীবনালেখ্য) সংহতি, ১২. ৩৬৯, পৃ ৫৫৬-৫৬৩

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ১০. ৩৫৮, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫

: রামানন্দ স্মরণে। জয়শ্রী, ১. ৩৭২, পৃ ১৫-১৬

নেপাল চন্দ্র রায় : এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৭৭-২৮৩

পত্রাবলী : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৪ ২. ৩৩২

জগদীশ চন্দ্র বসুকে ৩০. ৫. ১৯২৫ (ইং)

বামনদাস বসু—রামানন্দের ৬০তম জন্ম দিবসে প্রবাসী, ৮. ৩৫০

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রামানন্দকে

৩, ১, ৩১৫	১৮, ৭, ৩১৮	২১, ৬, ৩১৯	৯, ৮, ৩২৬
৯, ৪, ৩১৭	২৬, ১০, ৩১৮	২০, ৬, ৩২২	৮, ৯, ৩২৬
৮, ১১, ৩১৭	৮, ১১, ৩১৮	১৫, ১২, ৩২২	১৩, ৮, ৩২৬
৯, ২, ৩১৭	১৩, ১১, ৩১৮	১২, ৭, ৩২৪	২, ৬, ৩২৮
১৩, ২, ৩১৮	২৪, ১১, ৩১৮	২৬, ৯, ৩২৪	৬, ৩২৮
১৮, ২, ৩১৮	৩০, ১, ৩১৯	২৮, ১, ৩২৬	
		৭, ৫, ৩২৬	

প্রবাসী, ১১, ৩৫৪. ১২.৩১৪

পুষ্প দেবী : অমর রামানন্দ ঠাকুর দা। প্রবাসী, ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ ৬৭৬-৬৭৭

প্রবাসী সম্পাদক ও রোমাঁ রোলাঁ : (সচিত্র) প্রবাসী, ৭. ৩৩৩, পৃ. ১৭০-১৭১

প্রবাসী সম্পাদকের ইউরোপ যাত্রা : (২৭. ৭. ১৯২৬ ইং) (সচিত্র) প্রবাসী, ৬.৩৩১

যামিনীকান্ত সোম : পূজ্যপাদ রামানন্দ। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭,
পৃ. ১৮-২১

যোগেশ চন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিকথা
প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৮৯-২৯৫

যোগেশচন্দ্র বাগল : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৫-১৯৪৩,
বিশ্বভারতী পত্রিকা, (১০-১২), ৩৭১

রজনীকান্ত গুহ : শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ৯. ৩৫০, পৃ. ২৮৩-২৮৭

রমেশচন্দ্র মজুমদার : জনগুরু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ১০. ৩৫০. পৃ ৩৪৭-৩৪৮

রামপদ মুখোপাধ্যায় : স্মৃতির আলোয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
জয়শ্রী, ১. ৩৭২, পৃ. ৯-১৩

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : অন্ধ্র দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ। (সচিত্র)।
প্রবাসী, ৩. ৩৪৩, পৃ ৪২৮-৪৩৬

: অভিনন্দন পত্র—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রজত জয়ন্তী উৎসব।
প্রবাসী, ২. ৩৪২, পৃ. ২৫০

: আন্তরিক চিত্র ও স্মৃতি চারণ। জয়শ্রী, ১. ৩৭২

: আফগান রাজের দেশ ভ্রমণ। প্রবাসী, ১১. ৩৩৪ পৃ. ৭০৪-৭০৮

: উইণ্টারনিৎস্। প্রবাসী, ১১. ৩৪৩, পৃ. ৬৭৯-৭৭১

: এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। চিঠিপত্র, ১ম খণ্ড, ১৩৪৯ থেকে

রবীন্দ্র নাথ সম্বন্ধে স্মৃতি চিত্রণ। প্রবাসী, ৩. ৩৪৯, পৃ. ২৯৬-২৯৮

: চিন্তামণি ঘোষ। (সচিত্র) প্রবাসী, ১১. ৩৩৪, পৃ. ৬৮৮-৬৯৬

: দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। ৫. ৪. ১৯৪০ (ইং) তারিখে বেতার বক্তৃতা।
প্রবাসী, ১. ৩৪৭, পৃ. ১০২-১০৩

: নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সচিত্র)। প্রবাসী, ১০, ৩৪৭, পৃ, ৫১৪-৫১৯

: বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, ১২, ৩৪৬, পৃ, ৮২৭-৮৩০

: বামন দাস বসু। (সচিত্র) প্রবাসী, ৯৩৩৭, পৃ, ৪০০-৪০৮

: মহত্তর ভারত। প্রবাসী, ১, ৩৩২, পৃ, ১১৯-১২৪

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, ৫, ৩৪৮

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫ তারিখে বেতার বক্তৃতা।
প্রবাসী, ২, ৩৪৫, পৃ, ২৮১-২৮৪

: রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'—দ্বিতীয় খণ্ড।
প্রবাসী, ৫, ৩৪৯ পৃ, ৫০০-৫০৯

: রামমোহন রায়। প্রবাসী. ২, ১২৮—২,৩৭১, পৃ, ২৩৬-২৩৭

: রামমোহন রায় ও রাজা রাম। প্রবাসী, ১২, ৩৩৬, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮

: রামমোহন রায় ও রাজা রাম। প্রবাসী, ১১, ৩৪৮, পৃ, ৭০৪-৭০৮
: সারদামণি। (সচিত্র)। প্রবাসী, ১, ৩৫১, পৃ, ৮১-৯০
: স্বর্গীয় রাজা রবি বর্মা। প্রবাসী, ৭; ৩১৩, পৃ, ৪১১-৪১২

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পা : মতিলাল রায়—যুগগুরু, কলিকাতা, ১৯৩৩,
ন্যা, লা, 182, Jc,933, 9

রামানন্দ প্রসঙ্গে : জয়শ্রী, ১, ৩৭২

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় : রামানন্দ পরিচয়। প্রবাসী, ৩, ৩৬৯ পৃ, ২৯৮-৩০০
: রামানন্দ স্মরণে। প্রবাসী, ১০, ৩৬০ পৃ, ৫৩৬-৩০৭
: রামানন্দ বাবুকে যেমনটি দেখিয়াছি। অবাসী, ৬, ৩৭১ পৃ, ৬৪১-৬৪৪
: স্বাধীনতার পূজারী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
জয়শ্রী, ১, ৩৭২, পৃ, ১৪-১৫

বিধুশেখর ভট্টাচার্য : মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
প্রবাসী, ৯, ৩৫০, পৃ, ২৮৭-২৮৯,

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ : জাতীয় জীবনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক কোং, ১৯৪৮। ৪ + ৭৫, পৃ ১৮ সেঃ ·৭৫
ন্যা, লা, 182, Cc 948. 34

শান্তা দেবী : পিতৃ তর্পন। (২৩, ৬, ১৯৫০) প্রবাসী, ৮. ৩৫০, পৃ, ১২১-১৩২
: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা। কলিকাতা, ১৯৫০ XIV, ৩০২, চার্ট, ২৪'৫ সেঃ চট্টোপাধ্যায় বংশের তালিকা, ক্ষিতিমোহন সেনের ভূমিকা।
ন্যা, লাঃ 182, Cc 950, 1

সত্যভূষণ দত্ত : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকর্মীর স্মৃতিকথা।
প্রবাসী, ২, ৩৫৯, পৃ, ১৯৭-১৯৯

সত্যব্রত মিত্র : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৩৬৭
পৃ, ১৪-১৫

সীতা দেবী : পিতৃস্মৃতি। প্রবাসী, ষষ্ঠি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ,১৩৬৭ পৃ, ৬৭০-৬৭৫

সুখময় সরকার : রামানন্দ—যোগেশ চন্দ্র সংবাদ। (একাঙ্ক নাটিকা—সচিত্র)
প্রবাসী, ৭, ৩৬৮, পৃ, ১২৫-১৩১

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় : রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী।
জয়শ্রী, ১, ৩৭২, পৃ, ১৭-২৯

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ : শ্রদ্ধাঞ্জলী (রামানন্দ)। প্রবাসী, ১০,৩৫০, পৃ, ৩২১-৩২২

সুরেশচন্দ্র দেব : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মসমাজ হলে ২৮, ৯, ১৯৫১ (ইং) সালে বক্তৃতা। প্রবাসী, ৯, ৩৫৮, ৫৩০-৫৩১

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি রক্ষা : প্রবাসী, ৭, ৩৫২, ১৫-১৬

(সম্পাদকীয়র অবশিষ্টাংশ)

১৯৫১ সালে ইউনেস্কো এবং ভারত সরকারের যুক্ত উদ্যোগে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে এবং এটি একটি আদর্শ পাবলিক লাইব্রেরী রূপে গড়ে উঠেছে। এখন ভারতের ১৬টি রাজ্যেই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। ভারতের ৩২৭টি জেলার মধ্যে ১৯৬৫র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২০৫টি জেলায় কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, ৫২২৩টি উন্নয়ণ ব্লকের ১৩৯৪টি ব্লকে এ পর্যন্ত ব্লক লাইব্রেরী, এবং ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৫,৬৬,৮৭৮টি গ্রামের মাত্র ৩,৯৪৯ গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ১টি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং প্রায় পাঁচশত অন্যান্য গ্রন্থাগার (ফিডার, রুরাল ইত্যাদি) স্থাপিত হয়েছে।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা হয়তো আমরা এখনও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেই লেখাপড়ার সঙ্গের সকল সম্পর্ক চুকে গেল এইরূপ একটি ধারণা আছে। বহু ডিগ্রিধারী ব্যক্তি আছেন যাঁরা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও পাশ করে বেরোবার পর আর লেখাপড়ার চর্চা করেন না। গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা এখনও আমাদের দেশের লোকের কাছে খুব সুস্পষ্ট নয়। গ্রন্থাগার হচ্ছে কতকগুলি বইয়ের সংগ্রহ—গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে বই দেওয়া-নেওয়া এবং গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ করা আর পাঠক সেখানে যায় শুধু অবসর বিনোদনের জন্য—এই পুরানো ধারণাই এখনো আমাদের দেশের লোকের মনে রয়ে গেছে। আধুনিক গ্রন্থাগারে শুধ বইই নয়—সংবাদপত্র পত্র পত্রিকা গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম, টেপ রেকর্ড, ডকুমেন্ট, ছবি, চলচ্চিত্র, মাইক্রোফিল্ম—এমন কি খেলনা, পোষ্টার ইত্যাদিও বইয়ের স্থান গ্রহন করেছে। আজকের গ্রন্থাগার শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান সম্পন্নের জন্যই নয় নিরক্ষরের জন্যও।

গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সামগ্রীর উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর আর গ্রন্থাগারিককে তার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। গ্রন্থাগারে কি কি জিনিস আছে তার তালিকা করা, পত্র-পত্রিকা এবং নতুন বইয়ের প্রদর্শনী এবং পাঠককে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করা ছাড়াও পাঠচক্র আলোচনা-চক্র, রচনা পাঠ, কবিতা পাঠ সঙ্গীতানুষ্ঠান, সভা-সমিতি ইত্যাদি কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিকগণই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারেন। তাছাড়া গ্রন্থাগারগুলির যে জীবিকা সহায়ক ভূমিকাও আছে সে কথাও যেন আমরা স্মরণে রাখি। আমাদের গ্রামগুলির শতকরা ৮০ ভাগ লোকের জীবিকা কৃষি এবং শতকরা ৫ ভাগ লোকের নিজস্ব কোন জমি নেই। ভারতের শতকরা ৮০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বাস করে। বাংলা দেশে ১৮৪টি শহর আছে, বসতিপূর্ণ গ্রামের সংখ্যা ৩৮৫৩০টি এবং বসতিহীন ৩১৯০টি; শহরাঞ্চলে যেখানে বাস করে ৮৫৪০,৮৪২ জন সেখানে গ্রামাঞ্চলে বাস করে ২৬, ৩৮৫, ৫৩৭ জন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও আজ গ্রামগুলি অবহেলিত

এবং এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে আমাদের গ্রামগুলিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকার এখনও সক্ষম হননি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ'—এর এক নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের ৩৫৪ কোটি গ্রামবাসীর বার্ষিক আয়ের গড় লোকপিছু ২৪৭ কোটি টাকা অর্থাৎ দিনে মাত্র ৬৮ পয়সা। দেশের প্রকৃত উন্নতি করতে হলে যে গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন একথা বহু দিন থেকেই আমরা শুনে আসছি; কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যে প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। অপরিসীম দারিদ্র, নিরানন্দ এবং হতাশায় ভরা গ্রামজীবনের মায়া কাটিয়ে আজ শিক্ষিত জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশই শহরের দিকে ধাবমান। চাকুরী ব্যবসায় প্রভৃতি নানা প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও আছে শহরের নানা সুখ সুবিধার আকর্ষণ একথা অস্বীকার করা যায় না।

দেশের অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির তুলনায় গ্রন্থাগারের স্থান একেবারেই গৌণ বলে মনে করলে আমরা মারাত্মক ভুল করবো। পাকা রাস্তাঘাট, নর্দমা এবং সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের জন্য কূপ বা টিউবওয়েল, পোষ্ট অফিস, স্কুল এবং হাসপাতালের মতই গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। আশার কথা এই যে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশের অর্থনৈতিক পুণর্গঠনে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগারের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন।

একজন প্রাথমিক শিক্ষক কিম্বা একজন গ্রামীন গ্রন্থাগারিক মানবিক সম্পদের বিকাশ সাধন করেন সুতরাং আমাদের যেমন উপযুক্ত শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন এঁদের উপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

জাতিগঠনে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁদের না আছে সামাজিক স্বীকৃতি না আছে ভদ্রভাবে বাঁচার মত বেতন—এটা কি আমাদের পরিকল্পনার গোড়াতেই গলদ নয়?

Editorial : Integrated public library service in West Bengal and the pay & status of librarians.

ভাদ্র সংখ্যায় সম্পাদকীয়র ১৪৮ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তিতে "হওয়ায় প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হয়" স্থলে "হওয়ায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হয়" পড়তে হবে।

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার ফল—১৯৬৫

পরিষদ পরিচালিত সার্ট-লিব শিক্ষণের ফল নীচে দেওয়া হল। সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন সেসনের মোট ১৪৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিলের তার মধ্যে ১০২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবারে ডিস্টিংশন পেয়েছেন ৬ জন। পাশের হার ৭০.৩৪%।

সম্মানসূচক (গুণানুসারে)

৪	অমল কুমার রায়চোধুরী	৪৬	জ্যোৎস্না নায়ক
৩১	দীপশ্রী রায়	২৩	চিত্রলেখা ঘোষ
১৪১	অশ্বিনী কুমার সেন	৯০	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তীর্ণ (রোল নম্বর অনুযায়ী)

২	অজিত কুমার সুর	৪৮	কালিপদ কর
৫	অমলেশ রায়	৪৯	কল্যাণী বসু
৭	অঞ্জলি দাশগুপ্ত	৫০	কমল কান্ত কুমার
৯	আরতি বিশ্বাস	৫১	কমলা দাস
১০	অরুণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫২	কণা সেন
১১	অরুণা চক্রবর্তী	৫৩	কণিকা চট্টোপাধ্যায়
১২	অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়	৫৪	করুণাকণা কাঁড়ার
১৭	ভারতী ঘোষ	৫৫	লক্ষ্মীনারায়ণ পাল
১৯	বিভাবসু ঘোষ	৫৬	লীলা চাকলাদার
২০	চন্দ্রকান্ত কুমার	৫৭	মমতা সেন
২২	ছবি সেন	৫৯	মনীষা বিশ্বাস
২৬	দিলীপ কুমার রাহা	৬০	মনীষা মজুমদার
২৮	দীপা চৌধুরী	৬১	মনোজ কুমার ধর চৌধুরী
২৯	দীপক চন্দ্র অধিকারী	৬৯	মোহিত মোহন দে
৩৫	গৌরী চৌধুরী	৭০	মৃদুলা ঘোষ
৪০	গীতা রায়	৭৬	নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী
৪১	ইলা বিশ্বাস	৮০	নির্মাল্য কুসুম ভট্টাচার্য
৪২	ইলা চক্রবর্তী	৮১	নিশা চক্রবর্তী
৪৩	ইলা পাল	৮২	নৃপেন্দ্রনাথ মাইতি
৪৪	ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৮	পুরশ্রী দাস

৯৩ রামরতন পাত্র
৯৪ রঞ্জিত কুমার প্রামাণিক
৯৭ রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৯ সবিতা প্রসাদ দুবে
১০০ সবিতা গুহ (দাশগুপ্ত)
১০২ সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়
১০৫ সোনালী গুপ্ত
১০৭ সুধা চট্টোপাধ্যায়
১০৮ সুধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১০৯ সুজিত কুমার দত্ত
১১০ সুজাতা ভৌমিক
১১২ সুনীল চন্দ্র দে
১১৩ সুনীলকান্তি কুমার
১১৭ তরুণকান্তি সিংহরায়
১১৮ তিমির কুমার পাল
১১৯ তীর্থরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
১২১ উমা চট্টোপাধ্যায়
১২২ রমা চৌধুরী
১২৩ অশ্বিনী কুমার আচার্য
১২৪ অঞ্জলী সাহা
১২৬ প্রীতি মজুমদার (চক্রবর্তী)
১২৮ উমা মজুমদার
১২৯ মনোরঞ্জন জানা
১৩১ সুচিত্রা ঘোষ
১৩৩ অলক কুমার রায়
১৩৪ শ্যামলী ভট্টাচার্য
১৩৫ কালিদাস ঘোষ
১৩৭ অমল কুমার বসু
১৩৯ ব্রজগোপাল দাস
১৪০ রাজকুমার প্রামাণিক
এন ২ আনন্দ গোপাল দাস
„ ৪ অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়
„ ৫ অনিমা সেনগুপ্ত
„ ৬ আরতি সেন
„ ৭ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য
„ ৮ অসীম কুমার চক্রবর্তী
„ ১১ বিমল কুমার
„ ১২ ছন্দা রায়চৌ
„ ১৫ জয়দেব দত্ত
„ ১৬ কবিতা নাগ
„ ১৭ কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়
„ ১৮ কৃষ্ণা রায়
„ ১৯ লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ২১ নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
„ ২২ রবীন্দ্রনাথ করাতী
„ ২৩ রমা গুহ
„ ২৫ সমরেন্দ্রনাথ রায়
„ ২৬ সমর কুমার দত্ত
„ ২৮ সিপ্রা গুপ্ত
„ ২৯ স্মৃতিকণা দে
„ ৩০ সোমেশ চন্দ্র বসু
„ ৩১ সুবিমল পাল
„ ৩২ সুকুমার কোলে
„ ৩৪ উষা পাত্র
„ ৩৬ সবিতা রক্ষিত
„ ৩৭ অর্চনা মজুমদার

Result of the Cert. Lib. Examination
Conducted by B.L.A.—1965

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারকে সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ করি। গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার বিবরণ সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে লিখে পাঠাতে হবে। যাতে প্রেরিত সংবাদে বেশী পরিবর্তন এবং সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না ঘটে সেজন্য সংবাদদাতাদের 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদগুলির দিকে নজর রাখতে বলি।

এই প্রসঙ্গে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী "গ্রন্থাগার"-এর পঞ্চদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে ২নং ও ৩নং প্রস্তাবে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের প্রতি সম্মেলন যে নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি আমি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

বাঁকুড়া

বাণী-মন্দির। হদল নারায়ণপুর।

বাণীমন্দির সাধারণ গ্রন্থাগার ও সেবায়তনের সম্পাদক শ্রীনীহার কুমার মণ্ডল জানাচ্ছেন যে (গ্রন্থাগারটি ১৯২৪, ইং) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এটি ভাড়াবাড়ীতে অবস্থিত। পুস্তক সংখ্যা ১১৫২টি, সভ্যসংখ্যা ৮৫ জন এবং মাসে গড়ে প্রায় ৪৫০টি পুস্তক আদান-প্রদান হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের বার্ষিক আয় ৪০০৲ টাকা; ব্যয়ও ৪০০৲ টাকা। কর্মীর সংখ্যা ২ জন; এঁদের কেউই গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। গ্রন্থাগারটি বছরে ৬০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পায়।

নদীয়া

আসাননগর তরুণ পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ১৫ই আগষ্ট পাঠাগার প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার অষ্টাদশ বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমণ করেন। অতঃপর এতদুপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি সভা হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। ঐদিন গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

হাওড়া

সবুজ পাঠাগার। নিজবালিয়া।

সবুজ গ্রন্থাগারের কর্মীপরিষদ 'হাওড়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহে পাঠকদের পুস্তক পাঠের আগ্রহ' সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করবেন বলে স্থির করেছেন।

পাঠকরা গ্রন্থাগার কিরূপ এবং কোন সময় সর্বাধিক ব্যবহার করেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে কোন শ্রেণীর পুস্তক অধিক পঠিত হয়, গড়ে কত জন পাঠক দৈনিক পাঠাগারে আসেন, পাঠকক্ষে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র কিংবা পুস্তক কোন্‌টি পাঠের আগ্রহ অধিক, গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহ আছে কিনা এবং তাতে তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা—এই সব জানাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

সবুজ গ্রন্থাগার হাওড়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের একটি তালিকাও প্রস্তুত করছেন। ডঃ অজিত কুমার মাইতি, শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, শ্রীবেচারাম ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন জানা ও শ্রীশিবেন্দু মান্নার ওপর এইসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

News from Libraries

বিজ্ঞপ্তি

১। ঊনবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জিলার অন্ততঃ তিনটি করিয়া গ্রন্থাগারের পুস্তক লেন-দেনের বিবরণ হইতে বাংলা দেশের পুস্তক পঠন সম্বন্ধে বিবরণ রচনা করিতে হইবে। যে সমস্ত গ্রন্থাগার উদ্যোগী হইয়া এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে পারিবেন, তাঁহারা পত্র লিখিলে প্রয়োজনীয় ফরম্‌ প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

২। যে সমস্ত গ্রন্থাগার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারা জানাইলে, এই বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট ফরম্‌ প্রেরিত হইবে।

৩। যাঁহারা নিরক্ষর লোকদিগের নিকট জ্ঞানপ্রচারের জন্য ছায়াচিত্রাদি প্রদর্শন বা পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইবার আয়োজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক বিবরণ পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্পাদক—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ কথা

পরিষদের বিভিন্ন সমিতির কর্মোদ্যম

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পরিষদের 'সভ্য সংগ্রহ সমিতি'র সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সমিতির সভা হয়। তিনি বলেন, নতুন সদস্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা পুরানো সদস্যগণ যাতে সদস্যপদ ত্যাগ না করেন সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। অতঃপর কি করে সদস্যদের ধরে রাখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় —(১) যাঁদের চাঁদা বাকী আছে ৺পূজার ছুটির পর তাঁদের চিঠি দেওয়া হবে (২) বার্ষিক সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের পরিষদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য অনুরোধ জানান হবে এবং (৩) সদস্য সংগ্রহ ও বাকী চাঁদা আদায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করা হবে। এছাড়া গত কয়েক বছরে পরিষদের সদস্য হ্রাস-বৃদ্ধির একটি সমীক্ষাও করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রাথমিক ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হয় শ্রীঅরুণ কুমার ঘোষের উপর।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর 'হিসাব ও অর্থ বিষয়ক সমিতি'র সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। সভায় বিগত জুলাই মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি'র সভা হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ সভায় ১৯৬৫ সালের সার্টলিব্ পরীক্ষার ফল অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন এবং ঐ ফল অনুমোদিত হয়। অতঃপর সিলেবাস সংশোধন সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব প্রস্তাব পাওয়া গেছে সেগুলি সভায় পেশ করা হয়। স্থির হয় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, শিক্ষণ সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মতামতের জন্য এ সকল প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রচার করা হবে।

আগামী সপ্তাহান্তিক সার্টলিব কোর্সের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তও এই সভায় গৃহীত হয়। স্থির হয় যে আপাততঃ এই কোর্সের জন্য নতুন কোন অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে না—বর্তমান শিক্ষক মণ্ডলীই আগামী সেসনের কাজ চালিয়ে যাবেন।

সর্বশেষে এই কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবণতা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হবে বলে স্থির হয় এবং সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু ও গনেশ ভট্টাচার্যের ওপরে এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

একই দিনে বিকেল ৬টায়, পরিষদের 'কার্যকরী সমিতির' এক জরুরী সভায় সার্টলিব্ কোর্স পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু।

রুশ-ভাষা শিক্ষান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

পরিষদের সদস্য ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীসুনীত বসু ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির আমন্ত্রণে এবং সোভিয়েত সরকারের বৃত্তি নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল মস্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ করে গত ৫ই আগষ্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। শ্রীবসু সেখানকার রুশ ভাষাও সাহিত্য, ইতিহাস এবং রুশ ভাষার শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বরেণ্য সন্তান আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গত কয়েক বছরে একে একে তাঁদের অনেকেরই জন্মশতবার্ষিকী হয়ে গেল—রবীন্দ্রনাথ. জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়—আরো কতজন। একজন নির্ভীক ও দক্ষ সাংবাদিক, এবং দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সে সময়ের এমনি এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

রামানন্দের জন্ম হয়েছিল বাঁকুড়া শহরে ১৮৬৫ সালের ৩১শে মে। রামানন্দ অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ১৮৮৯ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই তিনি সে যুগের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'র সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 'ধর্মবন্ধু' (১৮৯০) পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে ঐ পত্রিকা সম্পাদনের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ৺শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রের সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন এবং সে যুগের আরো দুটি বিখ্যাত পত্রিকা 'তত্ত্বকৌমুদি' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এও লিখতেন।

পরবর্তী কালে তিনি অনেকগুলি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন—'দাসী' (১৮৯২-১৮৯৬) 'মুকুল' (১৮৯৫) 'প্রদীপ' (১৮৯৬-১৮৯৯) 'প্রবাসী' (১৯০১-১৯৪৩) 'মডার্ণ রিভিয়ু' (১৯০৭-১৯৪৩)। তিনি শেষোক্ত পত্রিকা দুটি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদনা করে গেছেন।

রামানন্দ কর্মজীবন সুরু করেছিলেন এলাহাবাদে শিক্ষকরূপে, পরে কলকাতায় এসে সম্পূর্ণ ভাবে সাংবাদিক বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করেন।

পরিষদের তরফ থেকে আমরা মনীষী রামানন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এই সংখ্যায় রামানন্দের একটি গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশ করা হল।

Association Notes

চিঠিপত্র

[পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক অথবা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' দায়ী নন। 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য চিঠি যে-কেউ দিতে পারেন। ছাপাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে এবং পত্রিকায় জায়গা থাকলে পত্র ছাপানো হবে। পত্রিকায় লেখা পাঠাবার যে নিয়ম—চিঠির বেলাতেও ঐরূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পত্রলেখকের পুরা নাম-ঠিকানা দিতে হবে। পত্র সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পত্রের দৈর্ঘ্য যেন কোন ক্রমেই এক পৃষ্ঠা অতিক্রম না করে। প্রয়োজনানুযায়ী পত্রের সংশোধন ও সম্পাদন করার অধিকার সম্পাদকের অবশ্যই থাকবে।]

ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মহীশূর অধিবেশন প্রসঙ্গে

মহাশয়,

সম্প্রতি মহীশূরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (Indian Library Association) একটি সম্মেলন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু পরিতাপের এবং একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সভ্যকে এই সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত করা হয় নাই। ফলে তাঁহারা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যপদে বহাল থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠীর অব্যবস্থার জন্য সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। সভ্যবৃন্দের জন্য নাকি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একপিঠের ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দানে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিজ্ঞপ্তি পাইয়া রেলওয়ে কনসেসনের সুযোগ পাইবার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদকের নিকট সভ্য হিসাবে আবেদন জানাইয়াছিলেন তাঁহারাও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেও রেলওয়ে কনসেশনের সুযোগ না পাওয়ায় সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে যত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন সম্মেলনের উদ্দেশ্য তত বেশী সার্থক রূপ ধারণ করে বা সাফল্য মণ্ডিত হয়। কিন্তু যে সম্মেলনে সঙ্ঘের আপন সভ্য বা সদস্যদের যোগদান, ইচ্ছাপূর্বক, পরিচালকদের পক্ষে, সম্পাদক কর্তৃক নিবারিত হয় সে সম্মেলনের সার্থকতা কি? আপনার 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইলে ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মহীশূর অধিবেশনে যোগদানে অপারগ সদস্য-দিগের জানিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এই পত্র খানি আপনার "গ্রন্থাগার" মাসিক পত্রে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীরামনারায়ন তার্কিক

শ্রীকৃষ্ণপুর লাইব্রেরী, ব্যবত্তারহাট, মেদিনীপুর।

[মহীশূরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। পরিষদের সম্পাদক শ্রী ডি আর কালিয়া বলেন যে, খুব তাড়াহুড়ো করে সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়েছিল বলে সকল সদস্যকে সম্মেলনের সংবাদ জানানো সম্ভব হয়নি।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার]

Correspondence.

গ্রন্থ সমালোচনা

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যো-দয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৯। দাম ৩.৭৫।

যে অল্প কয়েকজন গ্রন্থাগারিক বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের বই লিখে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের মাতৃভাষায় নির্দেশ দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় সহায়তা করেছেন, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি এই বিষয়ের উপরে তাঁর সপ্তম গ্রন্থ। দীর্ঘকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বর্তমান গ্রন্থে তার প্রতিফলন দেখা যায়।

স্কুল কলেজের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূল্য আছে। ছাত্রজীবনে যদি পড়ার অভ্যাস গড়ে না ওঠে তাহলে পরবর্তী জীবনে সে অভ্যাস সৃষ্টি করা কঠিন। তাছাড়া শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করবার জন্যও গ্রন্থাগারের সহায়তা অপরিহার্য। সুপরিচালিত গ্রন্থাগার না হলে তরুণ শিক্ষার্থীর মন বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ নয়।

স্কুল-গ্রন্থাগার সুপরিচালনার পক্ষে রাজকুমার বাবুর বইটি বিশেষ উপযোগী। সাবলীল ভাষায় সহজ করে গ্রন্থাগার পরিচালনার সবগুলি প্রধান ধাপ লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থাগারের বাড়ী কেমন হওয়া উচিত, পুস্তক নির্বাচনের পদ্ধতি কী, বইয়ের যত্ন কেমন করে করতে হয়, পুস্তকের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ, পাঠকদের দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। আলোচনা প্রাঞ্জলতর হয়েছে কতকগুলি চার্টের সাহায্যে।

অধিকাংশ স্কুলেরই উপযুক্ত বেতন দিয়ে সর্বক্ষণের কাজের জন্য যোগ্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করবার সামর্থ্য এখনো হয়নি। সেই সব স্কুলে গ্রন্থাগার সংগঠন ও দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্য এ বইটি খুবই সহায়তা করবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৭ | ১৩৭২, কার্ত্তিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার দিবস

প্রতি বছর ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়ে থাকে। ঐ দিন থেকে সপ্তাহকালব্যাপী বাংলাদেশের সবত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগার সভা, সমাবেশ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং নানারূপ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। 'গ্রন্থাগার'-এর পরবর্তী সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে তখন নিশ্চয়ই ঐ দিবস পার হয়ে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার সপ্তাহের অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকবে।

পরিষদের উদ্যোগে এই গ্রন্থাগার দিবস পালনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের কথা নয়। ১৯৫১ সালের দিকে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচার ও প্রসারের জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রন্থাগার দিবস পালনের কথা চিন্তা করা হয়। তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট প্রথম 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। ১৯শে আগষ্ট পরিষদের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল বলে প্রথমে এই দিনটিতেই গ্রন্থাগার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০শে ডিসেম্বরই গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালন করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছর পরিষদের আহ্বানে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালিত হচ্ছে।

দেখা গেছে যে গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস না জেনেও এবং এই দিবসের তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি না করেও, এমন কি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী না পেয়েও অনেক গ্রন্থাগার এখন এই দিবস পালন করে থাকেন। সম্ভবতঃ এই দিবস এখন গ্রন্থাগারগুলির কাছে অন্যান্য অবশ্যপালনীয় জাতীয় দিবসরূপে পরিগণিত হয়েছে। এটা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যেরই সূচনা করে।

যদিও এই দিবস পালন করা ইতিমধ্যেই গতানুগতিক এবং একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু এইরূপ একটি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার দঁরদী সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে সমবেতভাবে গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সংকল্পবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবার চেষ্টা করেন তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের বিশেষ সহায়ক হয় একথা অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য গ্রন্থাগার দিবস পালনের পদ্ধতির মধ্যে কিছু অদলবদল করে বা নতুন নতুন কর্মপন্থা স্থির করে একে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় কিনা একথা বিবেচনা করতে হবে। এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভা কলকাতাতেই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভা যদি শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ না রেখে এক এক বছর কলকাতার কাছাকাছি জেলা গুলিতে করা যায় তাহলে সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে কিছু ফল পাওয়া যায়। রাতারাতি যাদুদণ্ডের সাহায্যে সকলকে গ্রন্থাগার-সচেতন করে তোলা যাবে এ কথা কেউ যদি ভেবে থাকেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে। কঠিন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো ছাড়া এ ব্যাপারে কোন সহজ পন্থা নেই। জনসাধারণের মধ্যে যতটুকু গ্রন্থাগার সচেতনতা হয়েছে তা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলেই হয়েছে, একদিনে হঠাৎ যে হয়নি একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার দীর্ঘদিনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। বাংলা দেশে এখন এই পরিষদ সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার এ গ্রন্থাগারকর্মীর সবাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি এমনই এক প্রতিষ্ঠান যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি এবং পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ব্যক্তিবৃন্দ এবং গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দই সাধারণতঃ এই প্রতিষ্টানের সদস্য হয়েছেন। এক সময় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করবার জন্য পরিষদের জন্য ব্যাপকভাবে সদস্য সংগ্রহ করা হয়েছিল; এই সকল সদস্যের অধিকাংশই গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া সে সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যাও ছিল কম। পরিষদের উদ্যোগে ১৯৪২ সালে যে লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হয় তাতে মোট ১৫১ জন কর্মরত শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা এর দশগুণ হয়েছে; যদিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের বেশ কিছু অংশ এখনো গ্রন্থাগারবৃত্তিতে আসেন. নি এবং প্রতি বছর যাঁরা পাশ করে বেরোচ্ছেন তাঁদেরও সকলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছেনা।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পরিষদকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে, তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করতে হবে। যে সময়ে গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষিত কর্মীর অভাব ছিল তখন পরিষদের সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করেই ভাল চাকুরী পাওয়া যেত এবং অনেকে

দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হতেন। কিন্তু আজ গ্রন্থাগারকর্মীরা ডিপ্লোমা পাশ করেও যথেষ্ট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। পরিষদ আজ একটি স্বীকৃত সংস্থারূপে পরিচিত হয়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিয়োজিত কর্মীদের ওপর। গ্রন্থাগার পরিষদ বৃত্তিকুশলীদের মুখপাত্র হবে এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৃত্তির পরিষদের কাজের ক্ষেত্র নানারূপ হয়ে থাকে। যত অল্প ক্ষেত্রেই তার কাজ সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন তবু সে বৃত্তির স্বার্থরক্ষা তার অবশ্য কর্তব্য। পরিষদের প্রতিনিধিত্ব কত অধিক কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে পরিষদের আপন সদস্যদের সমর্থনের ওপর। সেই সমর্থন সদস্যদের কাছ থেকে আসে সক্রিয় সহযোগিতা এবং নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। পরিষদের সদস্যদের ওপরই নির্ভর করে তার পরিষদ কি রূপ হবে; সদস্যরাই একে সক্রিয় করে তুলতে পারেন আবার সদস্যরাই একে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারেন। পরিষদের কাজকর্ম অবশ্য নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সচিবদের দ্বারা—এই সব কাজকর্মের কোনটা হয়তো কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় কোনটা হয়তো বিভিন্ন সমিতির পরিচালনায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। সদস্যরা বিভিন্ন কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ক'রে কিংবা সহযোগিতা দিয়ে এসব কাজে সাহায্য করতে পারেন। অনেক সময়েই দেখা যায় পরিষদের কাজের সমালোচনায় যাঁরা সবচেয়ে মুখর, পরিষদের কার্য পরিচালনায় তাঁদের কাছ থেকেই খুব কম সাহায্য পাওয়া যায়।

যদি বেশির ভাগ সদস্যই চাঁদা বাকী ফেলে রাখেন অথবা চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক হন এবং সপ্তাহে বা মাসে অন্ততঃ কিছু সময় পরিষদের কাজে ব্যয় না করেন তবে পরিষদের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য কেবলমাত্র সদস্য চাঁদার উপর নির্ভর করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত এতবড় প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কাজকর্মের ব্যয় নির্বাহ হয়না। কিন্তু নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার মধ্যে সদস্যদের সহযোগিতা ও সমর্থন থাকে একথা বুঝতে হবে। প্রথমাবস্থায় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, পরিষদের কাজের ক্ষেত্রও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে পরিষদের সদস্য সংখ্যা যেমন বেড়ে গেছে সেই পরিমাণে তার দায়ও বেড়ে গেছে। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে পরিষদের সদস্যরা এই বহুমুখী কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন এবং পরিষদের সমস্যাগুলিও তাঁদের অজানা থেকে যায়।

আমাদের দেশে সংঘবদ্ধ ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা খুবই সাম্প্রতিক কালে সুরু হয়েছে। ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বরোদা রাজ্যে ১৯২০ সালের দিকে। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও-এর মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক বিস্তারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। তাই এই সম্মেলন থেকে সুসংগঠিত পথে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার জন্য ভারতের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে

১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় এবং পরবর্তী কালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছে। বাংলা দেশের পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রথমাবধি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেই তিন প্রধান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সুশীল ঘোষ এবং তিনকড়ি দত্ত এখন পরলোকগত হয়েছেন। পরিষদের কয়েকজন প্রবীন সদস্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পরিষদের পুরানো কথা কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লেখা বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখায় অনেক ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে দেখা যায়। হয়তো সঠিক তথ্যের অনুপস্থিতিই এই ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণ। পরিষদের উদ্যোগেই এখন বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হওয়া উচিত। সে ইতিহাস লিখিত হলে দেখা যাবে অনেকের অনেক ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম ছিল বলেই পরিষদ আজ এই গৌরবের আসনে আসীন হয়েছেন।

অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র অতীত গৌরবের স্মৃতি রোমন্থন করেই তার প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল করে তুলতে পারেনা। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু বর্তমানকে কোনক্রমেই ভুললে চলবেনা— বর্তমানকে ভুলে থাকলে বা ফাঁকি দিলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবে না।

গত দশ বছরে পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্ম-প্রচেষ্টার হিসেব নিলে দেখা যাবে যে এর নিয়মিত স্বাভাবিক কাজকর্ম ছাড়াও নানারকম আন্দোলন যথা, পশ্চিমবঙ্গের জন্য গ্রন্থাগার বিল প্রবর্তনের চেষ্টা, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী, বই-এর ওপর থেকে বিক্রয়-কর রহিত করার আন্দোলন, মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদার দাবী—এককথায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ জড়িত সমস্যার প্রতি অতি সঙ্গতভাবেই গ্রন্থাগার পরিষদকে নজর দিতে হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত কাজকর্মের মধ্যে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স পরিচালনা, গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান; বক্তৃতা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন, গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য শিবির শিক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদি তো রয়েছেই। এই সকল কাজকর্ম নির্বাহের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জনবলের। পরিষদ সদস্যদের যদি আপন বৃত্তির পরিষদের প্রতি কোন অনুরাগ না থাকে তবে কেউই তাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা। এটা আশা করা অন্যায় নয় যে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের শতকরা ৯০ জন পরিষদের সদস্য হবেন।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নতুন-পুরাতন, ছোট-বড় বহু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে জনসাধারণের চেষ্টায়। অপরদিকে সরকারী উদ্যোগেও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হচ্ছে। তবে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারগুলির উৎসাহ-উদ্যম বরাবর সমানভাবে বজায় খুব কমক্ষেত্রেই থাকে। বিপুল উৎসাহ নিয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুকাল হয়তো কাজকর্ম ভালভাবেই চলে, কিন্তু তারপর উৎসাহে

(শেষাংশ ২৫৬ পাতায় দেখুন)

পুস্তক সূচীর ইতিহাস ঃ সপ্তদশ শতাব্দী

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

১৬দশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্নভাবে পুস্তক সূচী তৈরী করবার প্রচেষ্টা চলেছিল কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী এল ১৬দশ শতাব্দীর প্রচেষ্টাকে পুরা দমে সাহায্য করতে। এ যুগটা হ'চ্ছে ইতিহাসের ও পাণ্ডিত্যের যুগ। পুস্তক সূচীর উপর এ যুগের যে প্রভাব তা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে থাকবে।

ছাপাখানার আবিষ্কারের পর পুস্তক ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি হ'লো। ছাপাখানার আবিষ্কারের পূর্বে বই যারা ভালবাসত তারা কেবল পুঁথি সংগ্রহ করতো। সে সব পুঁথির মধ্যে বেশীর ভাগই থাকত বিরল বই। বই ছাপা সুরু হ'তে তাদের বিরল বইয়ের সংকলনের পাশে সুন্দর বইয়ের সংকলন গড়ে উঠতে থাকল। সুন্দর বইয়ের প্রেমে পড়েই Gabriel Naudet, ১৬৩৭ সালে লিখলেন: Advis pour dresser une bibliotheque এবং Louis Jacob, ১৬৬৪ সালে লিখলেন Traite des plus belles bibliotheques publiques et particulieres qui ont este et qui sont a present dans le monde।

বই ক্রমশঃ জনসাধারণের সম্পত্তি (vulgarise) হয়ে দাড়াতে থাকল। জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জনমত গড়ে উঠতে থাকল—গবেষণা, পরীক্ষা, এবং উন্নত ধরণের রুচি হ'লো জনসাধারণের চরিত্র। Galilec, Kepler, Fermat, Harvey, Cavendish. Newton ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করলেন।

মানব মনের এই যে নতুন গতি তা প্রথম দেখা দিল ঐতিহাসিকদের মধ্যে। তারা পাঠ্যকে বিচার করে দেখতে এবং সমালোচনা করতে সুরু করলো—কোন মতামত নির্বিচারে তারা আর মেনে নিতে পারলনা। রাজা রাজড়ারা এবং রাষ্ট্র ঐতিহাসিকদের পাশে এসে দাড়াল।

ঐতিহাসিকদের সঙ্গে যোগ দিল বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়। তারা নানাবিধ দলিল পত্রের (documents) সংগ্রহ করতে সুরু করল এবং তার সূচী তৈরী করতে থাকল। ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে Benedictin, ও Jesuite রা ছিলেন প্রধান। ফ্রান্সে Maurine, ও বেলজিয়ামে Bollandist ধর্ম-সম্প্রদায় এই কাজে বেশ তৎপর হ'য়ে ওঠে। এরা যে সব সূচী তৈরী করতে থাকল তা দেখে মনে হয় যেন এ কাজটা একটা বিশেষ পথ বেছে নিয়েছে। পুস্তক সূচীর কতকগুলি নিজস্ব চরিত্র দেখা দিল। Louis Jacob তার পুস্তক সূচীর নাম করণ করলেন: Bibliographia। পুস্তক সূচীর উদ্দেশ্য এবং প্রণালী এদুটি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। পুস্তক সূচীকে আড়াল করে দাড়াল সমালোচনা।

পারীতে Journal des Savants, লাইপসিকে Acta Eruditorum এবং লণ্ডনে Philosophical transactions, ছাপা সুরু হ'লো। এই পত্রিকাগুলি ছাপা সুরু হ'তে

দেখা গেল জনসাধারণ সকল বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করতে চায় (Encyclopœdic informations)। Holland-এ Peirre Bayle-এর সম্পাদনায় প্রকাশ হ'তে থাকল Nouvelles de la Republique des lettres (১৬৮৪), ও Jean Le Clerc প্রকাশ করতে থাকলেন—Bibliotheques universelle, chosie, ancienne el moderne (১৬৮৬-১৬৯৩, ১৭০৩-১৭১৩, ১৭১৪-১৭২৬)। এই সকল পত্রিকার মধ্যে থাকত বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ, বিশেষ সাহিত্য সম্বন্ধে সংবাদ এবং পুস্তক সমালোচনা। ৩১শে মে ১৬৩১ সালে সুরু হ'লো Gazette de France দৈনিক ছাপা। এই দৈনিকের পিছনে ছিলেন Richelieu।

এই যুগের প্রথমার্ধে সুরু হয় Thirty years' war – সে কারণে খুব বেশী পুস্তক সূচীর সৃষ্টি হয়নি। Germany তে Meszkatalog সম্পূর্ণভাবে জাতীয় চরিত্র নিল। এই সময়ে Leibniz এলেন পুস্তক তালিকার ক্ষেত্রে। তাঁর Semestria—ছয়মাস অন্তর পুস্তক সূচী হিসাবে প্রকাশিত হ'তে থাকল।

এই শতকের মাঝামাঝি পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নানা পুস্তক সূচী সাময়িকী হিসাবে প্রকাশিত হ'তে থাকল। এগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো: Bibliographica Gallica universalis, Paris ১৬৪৪-৫৪ ; Bibliographica Parisiana, Paris ১৬৪৫-৫১। এই দুটি বিবলিওগ্রাফীতে Leibniz-এর পদাঙ্ক অনুসরণে প্রত্যেক পুস্তকের সঙ্গে সমালোচনা দেওয়া হ'তো। ইংলণ্ডে ১৬৬৮ থেকে ১৭১১ সাল পর্যন্ত Term Catalogs ছাপা সুরু হ'লো। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালো পুস্তক সূচী হ'লো Spain-এ প্রকাশিত Nicolas Antonios-এর লেখা Bibliotheca Hispana ১ম ও ২য় খণ্ড ও Hispana Vetus, ১ম ও ২য় খণ্ড—ছাপা হয় Rome-এ ১৬৭১ ও ১৬৯৬ সালে।

বিশেষ বিষয়ের উপরও কয়েকখানি সূচী প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো Johann Hallervords-এর Bibliotheca Curiosa (১৬৭৫); Paul Boldanus-এর Bibliotheca philosophica ও Theologica ও Historica ; Vincenz Placcius-এর De scripti et scriptoribus anonymis atque pseudonymis (১৬৭৪)।

উপরে পুস্তক সূচীর ইতিহাসের যা বর্ণনা দেওয়া হ'লো তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ১৬শ ও ১৭দশ শতাব্দীতে, পুস্তক সূচীর ক্ষেত্রে নেমে ছিলেন বিদ্বান লোকেরা। পুস্তকের সঙ্গে সমালোচনা দেখা দিল বটে কিন্তু পুস্তক সূচী তৈরী করার পন্থা পূর্বের মতই ছিল। পুস্তক অপেক্ষা পুস্তকের লেখকের জীবনীর প্রাধান্য এখনও বর্ত্তমান রইল।

১৭দশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক সূচীর বর্ণনা:—

বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তকসূচী

Andre Chesne (১৫৮৪-১৬৪০)—ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক। এর লেখা পুস্তক সূচী: Bibliotheca Chiniacensis (১৫৭২-১৬৪৪); Historiae Francorum Scriptores Coaetanei—তার জীবীত অবস্থায় ২টি খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৬৩৮ ও ১৬৩৯)।

আর ৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর। এর আর একখানি সূচী হ'লো : Bibliotheque des autheurs qui out escript l' histoire et topographie de la France divisee en deux parties selon l'ordre de temps et de matiere—ছাপা হয় পারিতে ১৬১৮ সালে এবং ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬২৭ সালে। এই সূচীতে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'চ্ছে যে লেখকদের জীবনী পুস্তকের বর্ণনাকে ছাপিয়ে যায়নি।

Gabriel Naudet (গাবৃয়েল নোদে)—১৬০০-১৬৫৩। Louis XIII-'র চিকিৎসক ও Richelieu-'র গ্রন্থাগারিক। এর লেখা Advis pour dresser une bibliothique ····· ছাপা হয় ১৬২৭ সালে। বইখানি ইংরাজীতে এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এর Bibliographica politicas, ভেনিশে ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে এই প্রথম Bibliotheca-'র পরিবর্তে Bibliographia কথাটি ব্যবহৃত হয়। বইখানির Leyden, Amsterdam ও Cambridge-এ যথাক্রমে ১৬৩৭ ও ১৬৪২ সালে, ১৬৪৫ সালে এবং ১৬৮৪ সালে সংস্করণ হয়।

Audre Baillet (১৬৪৯-১৭০৬)। ইনি প্রথম ছিলেন College de Beauvais'র অধ্যাপক পরে President de Lamoignon'র গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। গ্রন্থাগারিকের পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার ধারণা হয় "লোকে যদি বুঝতে পারে কোন বই পড়া দরকার আর কোন বই পড়ার দরকার নেই তা হ'লে তারা সহজে বিজ্ঞান ও কলার ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পারে"। এই ধারণার বশবর্ত্তি হ'য়ে তিনি লিখলেন : Jugements des scavans sur les principaux ouvrages des auteurs। বইখানি ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৬৮৫-১৬৮৬)। নতুন সংস্করণ হয় ১৭২২-১৭২৫। বিশেষ বিষয়ের উপর এই কয়খানি পুস্তক সূচী ফরাসী দেশে প্রধান। এ ছাড়া আরও কয়েকখানি পুস্তক সূচী ছাপা হয়েছিল।

Paul Bolduanus—এর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ইনি ৩ খানি Bibliothecae প্রকাশ করেন—একখানি ধর্মের উপর (Iena, ১৬১৪. Lipzig, ১৬২২); ২য় খানি দর্শনের উপর (Iena, ১৬১৬) ও ৩য় খানি ইতিহাসের উপর (১৬২০)।

Jean-Pierre Lotich (১৫৯৮-১৬৬৯) ইনি জার্মান চিকিৎসক ও ল্যাটিণ কবি। এর লেখা সূচী : Bibliothecae poeticae pars una et secunda, tertia, quarta el ultima—Francfort ১৬২৫-১৬১৮, ৪ খণ্ড : গ্রীস, ইতালী, স্পেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, Hungary, ডেনমার্ক, বোহেমীয়া ইত্যাদি দেশের কবিদের নাম করা লেখার সূচী।

Martin Ziller (১৫৮৮-১৬৬১)। জন্ম Austria'য়। Martin Ziller তাঁর জ্ঞান ও লেখার জন্য জার্মাণীর বাহিরেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সকল প্রকার ভ্রমণ কাহিনী পড়েছিলেন এবং দেশ বিদেশের বর্ণনাকে তার কাজে লাগান। তিনি লেখেন Historici chronologici et geographi celebres ex variis qui de eorum aetate et operibus scripserunt ১৬৫২-৫৭।

Martin Lipen (১৬৩৫-১৬৯২)। প্রথম পুস্তক স্থচী Bibliotheca realis universalis। পরে Frankfort-এ প্রকাশ করেন Bibliotheca realis medica, ১৬৭৯, ৪৯২ পৃঃ; Bibliotheca realis juridica, ১৬৭৯, ৫৬০ পৃঃ; Bibliotheca realis philosophica, ১৬৮৫, ২ খণ্ড; Bibliotheca realis theologia, ১৬৮৫, ২ খণ্ড। এই সকল স্থচীতে প্রায় ২০,০০০ লেখকের লেখার উল্লেখ আছে। এই স্থচীগুলির সে সময়ে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। কেবল Bibliotheca Juridica খুব বেশী প্রচলিত হয়েছিল এবং ১৮ দশ শতাব্দীতে বহু সংস্করণ হয়েছিল।

Vincent Placcius (১৬৪২-১৬৯৯)। Hamburg-এর আইনজীবী পরে ঐ সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি প্রথম চেষ্টা করেন লেখকের নামহীন বা প্রকাশকের নামহীন পুস্তককে সনাক্ত করতে। তাঁর প্রথম বই De scriptio el scriptoribus anonymis el pseudsnymis syntagma—প্রথম বার হয় Hamburg-এ ১৬৭৪ সালে পরে ঐ স্থচীকে সম্পূর্ণ করে Joh. Deckherr, ১৬৭৮ সালে: De scriptis adespotis pseudoepigraphis et suppositiis conjecturae।

ইংলণ্ডে এ সময়ে প্রকাশিত হয় – Theatrum poetarum বা A complete collection of the poets especially the most eminent of all ages, London, 1675. এই স্থচীর লেখক হ'লেন Edward Philips (১৬৩০-১৬৯৬)—ইনি ছিলেন John Milton-এর ভাগ্নে।

পুস্তক বিক্রেতা Thomos Bassett আইন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি স্থচী প্রকাশ করে: ১৬৭১, ১২০ পৃঃ; ১৬৮২, ১৪৫ পৃঃ ও ১৬৯৪, ১৪১ পৃঃ।

আর ২ খানি নাম করা পুস্তক স্থচী হ'লো: Guillaume Crowe (১৬১৬-১৬৭৫)—প্রটেষ্টেণ্ট পুরহিত। এর প্রণীত পুস্তক স্থচী: Elenchus scriptorum in sacram scriptorum tam graecorum quam latinorum in que exhibentur corum gens, patria professio, religio librorum tituli, volumina, editiones variae quo tempore claruerint vel obierint, ১৬৭২, ৩৪৪ পৃঃ। যে সব লেখকেরা ধর্ম পুস্তক সম্বন্ধে লিখেছিলেন তাদের নাম এই পুস্তক স্থচীতে লেখকের নামে আক্ষরিক ভাবে সাজান আছে। লেখকদের জন্ম তারিখ, তারা কোন ধর্ম-মতালম্বী, তাদের ব্যবসায়, কবে মৃত্যু হয়েছে এই সব বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে। অন্য একখানি নাম করা পুস্তক স্থচী হ'লো:—

Guillanme Cave (১৬৩৭-১৭১৩) Scriptorum eccleciasticorum historia literaria, Londom ১৩৪৪, ২ খণ্ড। এ বইখানির সংস্করণ হয় Geneva'য় ১৬৯৩, ১৬৯৪. ১৭০৫ ও ১৭২০; Oxford-এ ১৭৪০-৪৩, Basle-এ ১৭৪১-৪৫, শেষোক্ত সংস্করণে প্রায় ১৩,০০০ পুস্তকের উল্লেখ আছে।

Netherlands-এ ১৭ দশ শতাব্দীতে যে সব পুস্তক স্থচী প্রকাশিত হয় তার মধ্যে প্রধান হ'লো:—

Jean Antoine Van der Linden : ইনি চিকিৎসক। Amsterdam-এ ব্যবসায় স্থরু করেন, পরে Leyden বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং ১৬৩৭ সালে De scriptis medicis libridus নামক পুস্তক সূচী প্রকাশ করেন। এই বইখানির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৫১ ও ১৬৬২ সালে। তার মৃত্যুর পর Nurunberg-এর চিকিৎসক George A. Mercklin এই বইখানির আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন : Lindenius renovatur, ১৬৮৬, ১,০৯৭ পৃঃ

Cornelius Beugham—ইনি ছিলেন Westphalia'র পুস্তক বিক্রেতা। Lipen-এর পদাঙ্ক অনুসরণে ইনি ১৬৫০ সাল থেকে প্রকাশিত সমুদয় পুস্তকের সূচী প্রকাশ করতে মনস্থ করেন : ১৬৮০-১৬৮৯ মধ্যে প্রকাশিত হয় Bibliograhia juridica et politica (১৬৮০)। ১৬৮১ সালে প্রকাশিত হয় Bibliographia medica et physica—এ বইখানি Van der Linden-এরই নতুন সংস্করণ—যদিও তা স্বীকার করা হয়নি। Bibliographia historica chronologica et geographica, ১৬৮৫, এবং শেষে Bibliographia matematica et artificiosa noviossima, ১৬৮৮। এই সকল পুস্তক সূচীতে বইগুলি সাজান আছে লেখকের নামে। মৃত ও জীবন্ত ভাষায় লেখা বইগুলিকে আলাদা করা হয়েছে। বইয়ের নামগুলি সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়েছে এবং কোথায় ও কবে ছাপা হয়েছে, বইয়ের আকার এসব সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু Beugham-এর নাম তার Incunabulum typographica'র সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত : এই বইখানির ভিতরে ৩০০০ incunabula'র উল্লেখ আছে। এই বইখানি প্রথম Incunabula'র সূচী।

১৭ দশ শতাব্দীতে ইতালীতে অনেকগুলি স্থানীয় পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিষয়ের উপর পুস্তক সূচীর জন্য দুটি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য :—

Leon Allacci (১৫৮৬-১৬৬০)—জন্ম Chio-তে। Rome-এ Greek ভাষার অধ্যাপক, পরে Cardinal Barberini'র ও Vatican-এর গ্রন্থাগারিক। বহু কিছু বিষয়ের উপর লিখেছেন। এর প্রথম সূচী নট ও নাটকের উপর : Dramaturgia, Rome-এ, ১৬৬৬ সালে প্রকাশিত হয়, ৮১৬ পৃঃ। F. Doni অনুসারে সাজান ইতালীয় নাটকের সূচী। এই সূচীর অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিশেষ পরিচিত সংস্করণ ১৭৫৫ সালে Venise-এ প্রকাশিত হয়। প্রায় ৬০০০ নাটকের উল্লেখ আছে।

Ovidio Montalbani—ইনি নিজের নাম গোপন করে J. A. Bulmadus (১৬০২-১৬৭১) নামে প্রথম সূচী প্রকাশ করেন। ইনি ছিলেন চিকিৎসক ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। ইনি ১৬৫৭ সালে Bibliotheca botanica seu harboristarum scriptorum promota synodia নামে একখানি পুস্তক সূচী প্রকাশ করেন।

এই যুগের আর দুইখানি নাম করা সূচী হ'লো :—

স্থইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী J. H. Hottinger-এর (১৬২০-১৬৭৭) Promptuarium sive Bibliotheca orientali। ছাপা হয় Heidelberg-এ ১৬৫৮ সালে।

Rome-এ প্রকাশিত Giulio Bartolocci'র ১৬৭৫-১৬৯৩ সাল প্রকাশিত হিব্রু ভাষায় লেখা বই Bibliotheca magna robbinica de scriptoribus latinis qui ex diversis nanionibus contra Judacos vel de re hebraica utcumque scripsere, ৫৪৯ পৃষ্ঠা।

সাধারণ বা বিশ্ব পুস্তকসূচী

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে জার্মানীতে ২ খানি বিশ্ব পুস্তক সূচী প্রকাশিত হয়। Frankfurt ও Leipzig-এ পুস্তক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত পুস্তকের যে সব সূচী (Meazkatalog) প্রকাশিত হ'তো সেই সব পুস্তক সূচী থেকে এই দুইখানি সূচী সংকলিত হ'য়েছিল। প্রথম সূচীর সংকলক, Johann Cless। লেখক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সূচীর নাম: Unius seculi ejusque virorum literatorum monumentis ab anno 1500 ad 1602. Elenchus consumatissimus librorumque hebraci, graeci, latini, germani, alisrumque Europae idiomatum, typorum aeternitae consecratorum, এক খণ্ডে ২টী ভাগ, in-4° ৫৬৯ ও ২৯১ পৃঃ। এই সূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হ'য়েছে সকল ভাষায় লেখা সকল বিষয়ের উপর বই।

George Draud (১৫৭৩-১৬৩৫)। ইনি তিনখানি পুস্তক সূচী লেখেন। ১ম ও ২য়: Bibliotheca exostica। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় ও অন্যান্য ভাষায় লেখা ১৫০০ সাল থেকে প্রকাশিত সমুদয় বই এই সূচীর অন্তর্গত করা হ'য়েছে। ছাপা হয় Frankfurt-এ ১৬১০ সালে, ২১৯ পৃঃ ও ১৬২৫ সালে ৩০২ পৃঃ। তৃতীয়খানি সত্যই বিশ্ব-পুস্তক সূচী: Bibliotheca classica sive catalogus officinalis in que singuli singolarum facultatum ac profesionum qui in quavis fere lingua extant—১৬১১, ১,২৫৩ পৃঃ, ২য় সংস্করণ ১৬২৫, ১,৬৫৪ পৃঃ।

Jean Hallervord: Gesner-এর Bibliotheca Universalis-এর একটি পরিপূরক সূচী প্রকাশ করে: Bibliotheca curiosa in qua plurimi raressimi atque pancis cognitii scriptores indicantur, ১৬৭৬। বিরল বইয়ের একখানি ভাল সূচী। সূচীখানি লেখকের নাম অনুসারে সাজান। প্রত্যেক বইয়ের ছাপার তারিখ ও স্থান, লেখকের জন্ম তারিখ তাদের গুণাগুণ এসব কিছুই উল্লেখ করা আছে।

আর কয়েকখানি সূচীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায় কিন্তু এ সূচীগুলি উপরের সূচী গুলির মত নয়:

Guillaum Sancroft: Bibliotheque choisie, ১৬৮২, ১৭০০, ১৭০৯, ১৬১ সালে যথাক্রমে Amsterdam, Hamburg ও Sario-এ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।

Jesuit, Cl. Tr. Menestrur (১৬৩১-১৭০৫): Bibliotheque curieuse et instructive: ১৭০৪ সালে Trevonn-তে ২ খণ্ডে-in-12-এ ছাপা হয়।

Kiel-এর অধ্যাপক Danial-Georges Morhof (১৬৩৯-১৬৯১)—Lubeck শহরে

১৬৮৮-৯২, ও ১৬৯৫ সালে Polylistor প্রকাশ করেন। ১৭৪৭ সালের মধ্যে বইখানির ৩টি সংস্করণ হয়।

Fabians Giustiniani : Rome-এ ১৬১২ সালে Index universalis olphabeticus প্রকাশ করে।

জাতীয় পুস্তকসূচী

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ইতালীতে এবং বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডস-এ সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এবং স্পেনে ১৭দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্থানীয় লেখকদের সম্বন্ধে কতগুলি প্রয়োজনীয় জীবনীমূলক পুস্তক স্ফুচী প্রকাশিত হয়। ফ্রান্স এ সময়ে কোন জাতীয় পুস্তক স্ফুচী প্রকাশ করেনি। তবে ১৬৪৩ সালে Carme Louis Jacob নতুন বইয়ের একখানি পত্রিকা সাময়িকী হিসাবে প্রকাশ করতে থাকে। এ ধরণের সাময়িক পত্রিকা England-এ Maunsell আগেই প্রকাশ করেছিল। জার্মানীতে এ ধরণের পুস্তক স্ফুচী হ'লো Draud-এর Bibliotheca librorum Germanicarum classica। ১৬১১ সাল থেকে ছাপা হ'তে থাকে।

Valere Andre´ (১৬৪৪-১৬৫৬) Louvain শহরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। ইনি ১৬২৩ সালে Bibliotheca Belgica প্রকাশ করেন। এ বইখানি নেদারল্যাণ্ডস-এর ১৭টি দেশের লেখার সবচেয়ে ভালো স্ফুচী।

আর কয়েকখানি স্ফুচী :—

Antoine Sanders বা Sanderus (১৬৮৬-১৬৬৪) : De criptoribus Flandriae, de Gandavensibus eruditionis fama claris ও De Brugeusibus cruditionis fama claris, ১৬০, ১২৭ ও ৭৮ পৃঃ, ছাপা হয় Anvers ১৬২৪ সালে

Jean de Meurs বা Meursius (১৬৭৯-১৬৩৯) গ্রীসের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৬২৫ সালে প্রকাশিত হয় Athenae Batavac.

স্পেনে ১৬০৭ সালে Mainz-এ প্রকাশ করল Catalogus clarorum Hispaniae scriptorum। পরে Andre Schott (১৫৫২-১৬২৯) Frankfurt-এ ৪ খণ্ডে একখানি স্পেনীয় পুস্তক স্ফুচী প্রকাশ করে : Hispaniae illustrate seu rerum urbium que Hispaniae, Lusitaniae. Aethodpiae et Indiae scriptorio varii (১৬০৩-১৬০৪) এবং পরে Hispanae Bibliotheca…১৬০৮, ৬৪৯ পৃঃ।

Nicolas Antonio (১৬১৭-১৬৮৪) : এর বই Bibliotheca hispana nova, ১৬৭২। এই স্ফুচীতে ১৫০০ সাল পর্য্যন্ত জীবিত লেখকদের লেখার স্ফুচী আছে। প্রথম দুই খণ্ডে ছাপা হয় Rome-এ, ২য় সংস্করণ ছাপা হয় Madrid-এ ১৭৮৩-৮৮, এর পরে বইখানি, Antonio'র মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে Rome-এ Bibliotheca Hispana Vetus নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হয় Biliotheca arabico-hispana।

ফ্রান্সে Lou's-Jacob de St.-Charles (১৬০৮-১৬৬০) নতুন প্রকাশিত বইয়ের সূচী সুরু করে : Bibliographia parisiano hoc est Catalogus omnium Parisiis amis 1643 ও et 1644 excusorum. বইখানি প্রতি বছরে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত নতুন করে ছাপা হয়েছিল।

Charles Sorel (১৫৯৭-১৬৭৪) Bibliotheque francaise ou le cloix et l'examen des livres francais qui traite l'eloquence, de la de philosphie de la devotion et de la conduite des moeurs। এই সূচী ছাপা হয় পারীতে ১৬৬৪ সালে, ৪০০ পৃ, in-12°। সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৬৭ সালে। এই সূচীতে ফ্রান্সে প্রকাশিত নির্বাচিত পুস্তক সম্বলিত হয়েছে।

ইংলণ্ডে Manusll-এর নির্দ্ধারিত পথে জাতীয় পুস্তক সূচী প্রকাশিত হতে থাকে : –

William London ১৬৫৭ সালে Catalogue of the readable books in England প্রকাশ করেন! William London ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা। পরের বৎসরে বইখানির একটি সংস্করণ হয় এবং একটি পরিপূরক (supplement) সংযোজিত হয়। এই বইখানির মুদ্রন বহুবার হ'য়েছে এবং বহুবার ছাপা বন্ধ করা হ'য়েছে। J. Besterman-এর World bibliography of bibliographies এই পুস্তকের মধ্যে William London এর সম্পূর্ণ পুস্তকেরই উল্লেখ আছে (১৯৪৭, পৃ: ৯০৫-৯১২)

Robert Clavell—আর একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ১৬৭০ সালে প্রকাশ করেন: Catalogue of books printed published at London. এই বইখানি ১৭০৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। clavell ১৬৭৩, ১৬৭৫ ১৬৮০ ও ১৬৯৬ সালে England এ প্রকাশিত পুস্তকের Retrospetive catalogue প্রকাশ করেন।

উপরিক্ত পুস্তকসূচীগুলি এবং তাদের প্রনেতাদের বিচার করে দেখলে দেখা যাবে প্রনেতারা সকলেই ছিলেন পাঠক - তারা নিজের প্রয়োজনে বই পড়তেন এবং যে বইগুলি তাদের ভাললাগত এবং যেগুলি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তাঁরা কেবল সেই বইগুলিরই উল্লেখ করতেন তাদের পুস্তকের সূচীতে।

১৬শ শতাব্দীতে জার্মানীতে ও ইংলণ্ডে পুস্তক সূচীর সূত্রপাত হয় এবং এই দুটী দেশে ১৭দশ শতাব্দীতে পুস্তক-সূচী শিকড় গেড়ে বসে এবং তার ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত হ'তে থাকে।

History of the 17th Century Bibliographies-
Rajkumar Mukhopadhyay

পুস্তক প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক

দিলা মুখোপাধ্যায়

পুস্তক প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে—পুস্তক নির্বাচন করা, পুস্তক উৎপাদন করা ও পুস্তক বিলি করা। প্রকাশকের এই তিনটি কাজ একটির উপর একটি নির্ভর করে। এই তিনটি কাজ একটির পর একটি সম্পূর্ণ হ'লে তবেই পুস্তক প্রকাশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই তিনটি কাজকে ঠিক মত বুঝতে হ'লে পুস্তক প্রকাশনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারনা থাকা প্রয়োজন।

পুস্তক প্রকাশকের বয়স বেশী নয়। পুরাকালে পুস্তক প্রকাশক বলতে কেউ ছিল না। যে মুদ্রক সেই ছিল প্রকাশক। নিজের লেখা লেখক নিজেই মুষ্টিমেয় জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করত। জাপানী দৈনিক পত্রের পূর্ব পুরুষ Yomiuri, যিনি লিখতেন, তিনিই ছাপতেন এবং তিনিই নিজে বিক্রি করতেন। পুঁথির যুগে ধনী ব্যক্তিরা মাইনে দিয়ে লোক রেখে পুঁথি নকল করাত এবং পরে সেগুলি পুস্তক ব্যবসায়ের কেন্দ্রে বিক্রিত হ'তো। ছাপাখানার আবিষ্কারের পরও মুদ্রক এবং প্রকাশক দুজনেই ছিল এক ব্যক্তি। ক্রমশঃ পুস্তকের সংখ্যা যত বেশী বাড়তে লাগল এবং পাঠক সংখ্যা যত বাড়তে থাকল পুস্তক প্রকাশের কাজ তত জটিল হ'য়ে উঠতে থাকল। ফলে এক জনের পক্ষে মুদ্রক এবং প্রকাশকের কাজ করা সম্ভব হ'লো না। প্রকাশকের এবং মুদ্রকের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে গেল। কেবল তাই নয় পুস্তক প্রকাশকের পক্ষে খুচরা বই বিক্রি করাও ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে পড়লো। এ অবস্থার সৃষ্টি হ'লো ১৬শ শতাব্দীতে এবং এই সময়েই ফ্রান্সে, জার্মানিতে এবং ইংলণ্ডে, Librairie, buchhandler ও book-seller কথার সৃষ্টি হ'লো। এই সময়েই বই হ'লো জনসাধারণের সম্পত্তি এবং ঠিক এই কারণেই প্রয়োজন হ'লো বিচক্ষণ প্রকাশকের। এখন দেখা যাক প্রকাশকের সংজ্ঞা কি।

প্রকাশক

লেখক বই লেখে কিন্তু তার সৃষ্ট বস্তু প্রকাশিত না হ'লে লেখকেরও কোন মানে থাকে না বা তার সৃষ্টিরও কোন সার্থকতা থাকেনা কারণ উভয়েরই সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব থাকেনা। লেখক থেকে তার সৃষ্টি যতক্ষন না বিচ্ছিন্ন হ'চ্ছে ততক্ষণ তার সত্যিকারের অস্তিত্ব সুরু হ'চ্ছে না। প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে স্রষ্টা থেকে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে প্রকাশ করা—অর্থাৎ তাকে জনসাধারণের সম্পত্তি করা। সত্যি কথা বলতে কি বই একবার প্রকাশিত হ'লে তা আর লেখকের সম্পত্তি হ'য়ে থাকে না। ঠিক এই কারণেই Robert Escarpit বলছেন "On peut assimiler le role de l'editeur a celui d'un accoucheur" অর্থাৎ

প্রকাশকের কাজ ধাত্রীর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ce n'est pas lui la source de la vie, ce n'est pas lui qui feconde ni qui donne une part de sa choeir, mais sans lui l'oeuvre concue et menee jusqu'aux limites de la creation n' accederait pas a l'existence—অর্থাৎ প্রকাশক পুস্তকের জীবনের উৎস নয়, পুস্তক প্রকাশকের চিন্তা প্রসূত নয়। পুস্তক প্রকাশকের অঙ্গের অংশ নয় কিন্তু পুস্তক সৃষ্টির শেষ সীমায় আসা সত্বেও তার অস্তিত্ব সম্ভব হয় না যদি প্রকাশক না থাকে। Robert Escarpit'এর এই মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে পুস্তকের জীবন্ত অস্তিত্ব দেওয়া।

প্রকাশ করা কথাটির ইংরাজী হ'চ্ছে "Publish"। কথাটি ল্যাটিন "publicare" কথা থেকে এসেছে। Publicare কথাটির মানে হ'চ্ছে জনসাধারণের গোচরে আনা। অর্থাৎ আমরা এ কথা বলতে পারি যে প্রকাশকের কাজ হ'চ্ছে একটি ব্যক্তিগত বিষয়কে সমষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করা।

প্রকাশকের কাজ

প্রকাশকের কাজ যদি হয় একটি "ব্যক্তিগত বিষয়কে সমষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করা" তা হ'লে আমরা বলতে পারি প্রকাশককে প্রথম একখানি বই নির্বাচন করতে হ'বে, তার পর বইখানিকে প্রস্তুত করতে হ'বে এবং শেষে বইখানিকে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে হ'বে এভাবে প্রকাশকের কাজকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্গে প্রকাশকের কাজের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কারণ গ্রন্থাগারের প্রধান কাজগুলি হ'চ্ছে পুস্তক নির্বাচন, পুস্তক প্রস্তুতি এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা।

পুস্তক নির্বাচনের সময় প্রকাশক জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে বিচার করে এবং জনসাধারণের উপযুক্ত বই নির্বাচন করবার চেষ্টা করে। গ্রন্থাগারিকের কাজও হচ্ছে তাই অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক যদি নিজেকে জনসাধারণের মধ্যে গণ্য না করে পুস্তক নির্বাচন করে তাহ'লে তার পুস্তক নির্বাচন বৃথা হয় কারণ পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকলে পুস্তক নির্বাচন অকেজো হ'য়ে যায়। গ্রন্থাগারিকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে "Every reader his book" বা "To fit the book to his reader" সুতরাং গ্রন্থাগারিকের এবং প্রকাশকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রভাব পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব নয়। জনসাধারণ কি পড়বে তা ঠিক করবার পর উভয়কেই চিন্তা করে দেখতে হ'বে বইখানি "ভালো" বই কি না অর্থাৎ বইখানি পড়বার মত কিনা। প্রকাশক প্রথম দেখবে বইখানি 'বিক্রি" হ'বে কিনা এবং পরে বিচার করে দেখবে বইখানি "ভালো" বই কি না। অর্থাৎ বইখানির 'Esthetic moral" বা রুচি এবং নীতিগত মূল্য আছে কি না।

লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে থাকে প্রকাশক এবং গ্রন্থাগার। প্রকাশক কিন্তু উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা না করে চেষ্টা করে লেখকের দোহাই দিয়ে পাঠকের উপর এবং পাঠকের দোহাই দিয়ে লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে। গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে পাঠককে বিচার করে কোন কোন লেখকের বই কিনতে হবে তা ঠিক করা এবং লেখককে বিচার করে পাঠক ঠিক করা। ধরুন আনবিক শক্তির উপর একখানি বই কিনতে হ'বে। এক্ষেত্রে পাঠক যদি হয় জনসাধারণ তাহ'লে গ্রন্থাগারিককে এমন একজন লেখকের লেখা বই কিনতে হ'বে যে জনসাধারণের জন্য লিখতে পারে।

সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ফলে এক এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এক এক ধরণের বই পড়বার নেশা জাগে—এক এক জন লেখক জনসাধারণের প্রিয় হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিককে এই সব অবস্থার সুযোগ নিতে হয় এবং সে জন্যে সচেতন থাকতে হয়। Byron-এর Child Harold ছপো হ'লো—John Murray, "Haroldian" জনসাধারণের সুযোগ নিয়ে "Byronism" এর ভিত্তিতে বই ছাপা সুরু করলে। Germanyতে যখন Goethe-এর Leiden des Junger Werthers ছাপা হ'লো—তখন জার্মানীর পাঠকের মধ্যে "Wertherism" একটা নেশার মত দেখা দিল।

প্রকাশকের পুস্তক নির্বাচণের ক্ষেত্রে এত কথা বলার প্রয়োজন হ'লো—তার কারণ এই কথাগুলি থেকে বুঝাতে হ'বে যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে সব সময়ে অনুমানমূলক জনসাধারণ ভিত্তি হিসাবে বর্তমান থাকে। এই আনুমাণিক জনসাধারণের উপর নির্ভর করেই প্রকাশক কোন বই প্রকাশ করবে ঠিক করে এবং কোন লেখকের বই প্রকাশ করবে তা ও ঠিক করে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কাজও প্রকাশকের কাজের মত অন্ততঃ পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

এতদূর যা বলা হ'লো তা বইয়ের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে। পুস্তক প্রকাশকের ক্ষেত্রে "আনুমানিক জনসাধারণকে" বিচার করেই পুস্তকের Physical make up সম্বন্ধে বিচার করতে হ'বে। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের সময় "পাঠকের মুখ চেয়ে" বইয়ের অবয়ব ঠিক করতে হ'বে। প্রকাশকের "আনুমানিক জনসাধারণ"-এর সমষ্টি যদি হয় মাত্র কয়েক শত পুস্তক প্রেমিক, তা হ'লে যে বইখানি সে ছাপছে তা ভালো কাগজে ছেপে ভালো ভাবে বাঁধাই করে অতিরিক্ত মূল্যে বাজারে ছাড়তে পারে। তবে কোন একখানি Popular বই ছাপার সময়, কাগজ, বাঁধাই, ছাপার হরফ ফর্মা সবই অন্য ধরণের করবার প্রয়োজন হয়—কারণ বইখানিকে কম দামী করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বইখানির ব্যবহার কিরূপ হ'বে তা বিচার করে পুস্তকের অবয়ব ঠিক করতে হয়। একথা বললে হয়তো ভুল হ'বে না যে বইয়ের রূপ এবং অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে "আনুমানিক জন সাধারণের" উপর।

বই বিক্রি না হ'লে তা আর কাজে লাগেনা। গ্রন্থাগারেও বই ব্যবহার না হ'লে তাকে বাতিল করতে হয়। প্রকাশক যদি কম সংখ্যক বই ছাপে তা হ'লে তার খরচে পোষাবে না

আবার অতিরিক্ত বেশী সংখ্যক বই ছাপলে তা বিক্রি না হওয়ার ফলে প্রকাশকের লোকসান হ'বে। অর্থাৎ "আনুমানিক জনসাধারণের" প্রয়োজন অনুযায়ী বই ছাপতে হ'বে। গ্রন্থাগারে বই কেনবার সময় একখানি বইয়ের কয় কপি কিনতে হ'বে তা "আনুমানিক জনসাধারণের" ভিত্তিতে কেনা প্রয়োজন। পাঠকের সংখ্যা বেশী হ'লে, সকলে যাতে বই পায় তার ব্যবস্থা করতে হ'বে তা না হ'লে গ্রন্থাগারে "বই পাওয়া যায়না" এই বদনাম রটবে; আবার প্রয়োজনের অধিক কপি বই কিনলে Library economy ব্যাহত হ'বে।

পুস্তক বিলি (Distribution)

এতক্ষণ আমরা পুস্তক প্রকাশের (production) কথা বললাম এইবার দেখা যাক পুস্তক বিলি করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও প্রকাশকের মধ্যে সম্বন্ধটা কিরূপ।

একখানি বই ছাপা হ'লো কিন্তু তা বিক্রি করতে হ'বে তা না হ'লে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'বে না। পুস্তকের প্রচারের জন্য কিছু বই বিনামূল্যে বিলি করতে হয়।

পুস্তক বিক্রি করবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে পুস্তক প্রচার। পুস্তক প্রচারের খরচ আজকালকার যুগে, বিশেষ করে Capitalist দেশে খুব বেশী। প্রকাশকের প্রচারের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে তার প্রকাশিত বইখানি তার "আনুমানিক জনসাধারণের" গোচরে আনা। এক্ষেত্রে প্রকাশককে একটি সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। কারণ তার পক্ষে "আনুমানিক জনসাধারণের" গোচরে আনবার মত করে প্রচার করা সম্ভব নয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তা "জনসাধারণের" গোচরে আসবে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে যদি ৫০০ জনের চোখে পড়ে তার সংখ্যার হয়তো দশ জন হ'বে "আনুমানিক" জনসাধারণ। "আনুমানিক জনসাধারণের" গোচরে আনবার নানারূপ পন্থা আছে—কিন্তু সে সব বিষয় এ প্রবন্ধে বলার কোন প্রয়োজন দেখিনা। গ্রন্থাগারেও কেবল পুস্তক কিনলে কাজের হয়না, প্রত্যেক বইখানি পাঠকের গোচরে আনা প্রয়োজন। সেইজন্য গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রচারের প্রথম কাজ হ'চ্ছে তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তা জনসাধারণ যে তালিকা ব্যবহার করছে বইখানিকে সেই তালিকার অন্তভূ'ক্ত করা। প্রকাশকেরও প্রথম কাজ হ'চ্ছে বইখানিকে তালিকাভুক্ত করা—অর্থাৎ নানা Bibliography'র অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রকাশকের হাত থেকে একখানি বই বার হ'বার পর বইখানির ভবিষ্যতের উপর প্রকাশকের আর কোন হাত থাকেনা। বইখানি "আনুমানিক জনসাধারণের" সীমারেখা পর্যন্ত পৌছাতেও পারে আবার তার অকাল মৃত্যুও হ'তে পারে আবার তা সীমা অতিক্রম করে Best Seller হ'তে পারে। নানা কারণে একখানি বই Best Seller হ'তে পারে। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সব কারণগুলি বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। পরে অন্য প্রবন্ধে Best Seller সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা করবো।

পুস্তক বিলির একটা সীমারেখা নির্দেশ করা খুবই সমস্যাজনক। এ বিষয়ে কিছু জানতে হ'লে R. E. Barker-এর Books for all নামে বইখানি পড়া দরকার।

পুস্তক বিলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে মধ্যস্থতা করা কারণ ব্যক্তিগতভাবে বই কেনে খুব কম লোকেই। শতকরা নব্বুই ভাগ পুস্তক সম্ভবতঃ গ্রন্থাগারের দ্বারা বিলি হয়। আমরা প্রবন্ধের সুরুতেই বলেছি প্রকাশক পুস্তক প্রকাশ করে কিন্তু তা বিলি করে পুস্তক বিক্রেতা। আমাদের দেশে ঠিক এ ধরণের পুস্তক প্রকাশক খুবই অল্প। বেশীর ভাগ প্রকাশকই পুস্তক বিক্রেতা।

উপসংহার

উপসংহারে এটুকু বলা দরকার যে বই যেদিন থেকে জনসাধারণের সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়াল সেইদিন প্রকাশকের সৃষ্টি হ'লো এবং সেইদিন থেকেই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ও সৃষ্টি হ'লো। ইউরোপে এই সময়টা হ'লো Feudalism-এর সমাপ্তি এবং Democracy'র সূত্রপাত। Feudalism-এর যুগে জনসাধারণের বলতে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিছু ছিলনা। Feudalism-এর যুগে বই ও গ্রন্থাগার ছিল কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেইজন্যে সত্যি-কারের পুস্তক প্রকাশের এবং পুস্তক প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিলনা!

The Book sellers and the Librarian
by Dila Mukhopadhyay.

ঃ প্রকাশনায় নতুন আদল ঃ

গোলোকেন্দু ঘোষ

(৩)

আন্তর্জাতিক বাধা

নিরক্ষরতা এবং ভাষার বিভিন্নতা, এই দুটি হল বই প্রচারের সর্বপ্রধান স্বাভাবিক বাধা। এই দুটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা অবাস্তব, দুটিকে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বই, কাজেই একটা ভাষার মূল্য নির্ভর করে সেই ভাষার বই কত ব্যাপকভাবে পঠিত হয় তার উপর। সেই ভাষায় যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বই পঠনে সক্ষম ভাষার মূল্যও তত বৃদ্ধি পায়।

একথাটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে সমগ্র মনুষ্যকুলের চারভাগের তিনভাগ অংশ প্রধান বারটি ভাষায় কথা বলে। বিশ্বজনসংখ্যার হার অনুসারে সেগুলি সাজানো হল: চীনা—২৫% ; ইংরেজী—১১% ; রুশ – ৮·৩০% ; হিন্দী—৬·২৫% ; স্পেনীয়—৬·২৫% ; জার্মান – ৩·৭৫% ; জাপানী—৩·৭৫% ; বাঙলা—৩% ; আরবী—২·৭০ ; ফরাসী—২·৭০% ; পর্তুগীজ – ২·৫০% এবং ইতালীয়—২·১০%।

অবশ্য যদি আমরা প্রত্যেক ভাষার প্রকৃত পাঠক-সংখ্যা নিরূপণ করার চেষ্টা করি তাহলে হিসাবটা অন্য রকম হয়ে যাবে। বিশ্বজনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগের সঙ্গে যোগাযোগ কবার জন্যে আটটি ভাষাই যথেষ্ট—শতকরা হিসাব অনুসারে ভাষাগুলির ক্রম হল: ইংরেজী—১৮·১০% ; চীন – ১৬·৯% ; রুশ—১৫·৯% ; স্পেনীয় ৬·২% ; জার্মান—৫% ; জাপানী—৫% ; ফরাসী—৩·৮% এবং ইতালীয় - ২·৪%।

পৃথিবীর পাঠক-সংখ্যা বলতে যে-সব ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পড়তে সক্ষম তাঁদের বোঝানো হচ্ছে। এঁদের হিসাব ধরা হয়েছে ১২০ কোটি,—বিশ্বজনসংখ্যার এঁরা হলেন শতকরা ৪০% ভাগ এবং পড়তে পারার-মত-উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অর্ধেকের নিশ্চয়ই বেশি।

ভাষাগত বিভাগ

বিষয়টির প্রতি আরো গভীরভাবে অভিনিবেশ করলে তা খুব আশাপ্রদ মনে হবে না। প্রথমতঃ কতকগুলি প্রধান ভাষার যেমন চীনা; রুশ, জার্মান, জাপানী এবং ইতালীয় ভাষার প্রচার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ। অন্য ভাষাগুলি যেমন ইংরেজী, স্পেনীয় বা ফরাসী কয়েকটি মহাদেশে প্রচলিত থাকলেও এবং বিশ্বভাষা হিসাবে এদের ব্যবহার করা গেলেও,

সব সময়ে এইগুলি সর্বপ্রধান ভাষা নয়; বিশেষ করে পর্তুগীজ, ডাচ এবং আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য। (আরবী-র ক্ষেত্রে ততটা নয়)।

এক এক মহাদেশের পরিস্থিতি এক এক রকমের, বিস্তর প্রভেদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় আমেরিকায় কোন সমস্যা নেই। জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ২০ কোটি লোক চারটি ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষাগুলির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কারণ আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি লেখ্য-ভাষা ছিল না। শুধু ইংরেজী ও স্পেনীয় ভাষার প্রতিযোগিতায় বর্তমান ভারসাম্যের যে তারতম্য ঘটবে তা আঁচ করা যেতে পারে। আমেরিকার প্রায় সমগ্র পাঠক-সাধারণ ইংরেজীভাষার অধীন; কিন্তু স্পেনীয়ভাষার যথোচিত ব্যবহারের ফলে, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ফলে বিংশ শতকের শেষের দিকে স্পেনীয় ভাষার প্রচার পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে।

ওশিয়ানিয়া মহাদেশেও কোন সমস্যা নেই, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে প্রচলিত ইংরেজী ভাষার সম্ভবত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেবে না। আফ্রিকা মহাদেশের বিষয়টা বড় জটিল। একথাটা খুব পরিষ্কার যে বড় উপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাবের খুব বড়াই করছে। এই শক্তিগুলির ভাষা আফ্রিকার যে পাঠক-সাধারণ ব্যবহার করে, তারা সমগ্র আফ্রিকার শতকরা ১০% ভাগও নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতবর্ণধারীর সংখ্যাও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। কখনো কখনো কিছুটা যুক্তি সহকারে ফরাসীভাষাকে আফ্রিকার যোগাযোগকারী ভাষা হিসাবে দাঁড় করান হয়। জাতীয় ভাষা বা দ্বিতীয়ভাষা হিসাবে ৫০ লক্ষ বা ৬০ লক্ষ সম্ভাব্য-পাঠক এই ভাষা ব্যবহার করে। ইংরেজী ভাষার ·১ কোটিরও বেশি সম্ভাব্য-পাঠক আছে, কিন্তু এই ভাষা ব্যবহারকারীদের বসবাস সীমিত অঞ্চলের মধ্যে এবং তারা অধিকাংশই অ-আফ্রিকীয় বংশ-উদ্ভূত। আরবীভাষার ৭০ লক্ষ পাঠক আছে এবং ইসলাম সংস্কৃতির সমর্থন থাকা সত্ত্বেও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে এই ভাষা সীমাবদ্ধ। কাজেই, এইটাই বাস্তব যে ফরাসীভাষাই হল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত সর্বাধিক আফ্রিকীয় দ্বারা পঠিত সাহিত্যিক ভাষা। দেশীয় আফ্রিকীয় ভাষায় সাহিত্যের উদ্ভব একদিন হলেও, এইটাই ঘটা সম্ভব যে ফরাসীভাষায় পঠন-লেখন পারদর্শিতার উপর নির্ভর করবে সে-সাহিত্যের প্রকাশন ও প্রসার।

সাংস্কৃতিক অসমতা

এবার এশিয়া এবং ইউরোপ দুটি সর্ববৃহৎ জোটের কথা। পৃথিবীর প্রত্যেক আটজন পাঠকের মধ্যে তিনজন এশীয় এবং তিনজন ইউরোপীয়। এই সমসংখ্যাই হল অসাম্যের উপাদান কারণ ইউরোপীয়ের চেয়ে এশীয়র জন সংখ্যা তিনগুণ বেশী। আবার, সারা পৃথিবীর প্রকাশনার তিনভাগের দুভাগ হয় ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে এবং এশীয় ভাষাগুলিতে প্রকাশন হয় চারভাগের একভাগের চেয়েও কম। ইউরোপে তিরিশটির বেশী লেখ্য-ভাষা আছে, এশিয়ার আছে তার অনেক বেশী এবং তিরিশটির বেশী ভাষা ব্যবহার করে অন্তত ৫০ লক্ষ

লোক। সুতরাং, একদিকে, দেখা যাচ্ছে, বিশাল প্রকাশনা কিছু-সংখ্যক ভাষা জুড়ে আর একদিকে বিরাট সম্ভাব্য পাঠক-সাধারন যাদের সংখ্যা আগামী কয়েক দশকে তিনগুণ বাড়তে পারে এবং যারা ভাষার বহুলতায় ক্ষুদ্রখণ্ডে বিভক্ত থাকবে।

প্রশাসনিক এবং রাজনৈতক গণ্ডিই ভাষাগত বিভেদকে অনেক বেশি কার্যকর করেছে। কোন একটি ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হলেই সূচিত হয় না যে বইটা সেই ভাষায় পাঠক্ষম সকল লোকের কাছে প্রাপ্তব্য হবে। যদি বইটিতে নামমাত্রও আদর্শগত ভাবধারা থাকে তা হলে সেই ভাষাজোটের সকল দেশগুলিতে বইটি একযোগে প্রচারিত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। যুদ্ধের সময় ছাড়া বইয়ের ওপর থেকে রাজনৈতিক বিধিনিষেধ (সেন্সরশিপ) প্রায় সবদেশই তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই স্বাধীনতাকে নাকচ করার নানান পথ আছে। খোলাখুলি নিষিদ্ধ না করে বইয়ের প্রচারকে যে-সব ব্যবস্থা, ব্যাহত করে সেই সব ব্যবস্থা প্রবর্তনের যুক্তিগুলি যে সর্বদাই রাজনৈতিক যুক্তি হয় তা অবশ্য নয়।

কর্তৃপক্ষই যে সর্বদা এইসব প্রচ্ছন্ন বাধানিষেধ (সেন্সরশিপ) আরোপ করেন তা নয়, সেই দেশের প্রকাশনা—জগতে আধিপত্য বিস্তার করে যে সব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চক্র তাদের দ্বারাও তা হতে পারে।

অর্থনৈতিক বাধা চার প্রকার: মুদ্রা বিনিময় (কারেন্সি) বিধি নিষেধ; ডাকের হার; শুল্ক বিধি, (আমদানী লাইসেন্স এবং মূল্যানুসার শুল্ক 'শুল্ক বিধি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এবং বিবিধ ট্যাক্স।

ইউনেস্কো প্রকাশিত Trade Barriers to Knowledge (প্যারিস., ১৯৫৬) বইটিতে ৯২টি দেশের বিভিন্ন আইনগত ধারাগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৫২ সন থেকে উল্লেখ্য উন্নতি হয়েছে এবং কমবেশি ৫০টি রাষ্ট্র ইউনিভার্সাল পোষ্টাল ইউনিয়নের (U.P.U.) সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেছে।

ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশনও ঐ সুপারিশ অনুযায়ী সাময়িক পত্রাদি এবং পুস্তক-তালিকার পরিবহণ হার তার বিমান সংস্থাগুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়েছে। শিক্ষাগত বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশনা রপ্তানি বিষয়ক ১৯৫০ সনে গৃহীত ইউনেস্কো চুক্তিপত্রে বহু দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং তারা মুদ্রিত বইয়ের উপর কোন আমদানি রপ্তানি শুল্ক ধার্য করছে না।

ঝোঁকটা কেন্দ্রীভবনের দিকে

এই অবধি বিনিময়ের জন্যেই হয়ত পূর্ববর্ণিত সাংস্কৃতিক অসম এবং ভাষাগত বিভক্ত দুনিয়ায় অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় পাঠক সাধারণের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। সম্ভবতঃ এই চাহিদা মেটাতে পারে কয়েকটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি যাদের বিশ্বজোড়া যোগাযোগের ভাষা আছে এবং

যাদের হাতে প্রভূত উৎপাদনের জন্যে বৃহদায়তন প্রকাশন-ব্যবস্থা আছে। প্রয়োগবিদ্যার বই বা স্কুলের বইয়ের ক্ষেত্রে এতে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই, হয়ত কিছু কল্যাণকরও হবে, কিন্তু অবিলম্বে হোক বা দেরীতেই হোক সাহিত্য কর্মও বিবেচিত হতে বাধ্য। যদি এই ক্রমবিকাশমান পাঠক-সাধারণের হাতে 'বাইরের' বই তুলে দিতে হয়, (বিশেষ করে যে ইউরোপীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর ভাষার কোন অবদান নেই) তাহলে ভবিতব্য লেখা আছে বিমর্ষ অনোৎসাহ। প্রকৃত সাহিত্যের জন্যে জীবনের সঙ্গে যে অনুষঙ্গতা প্রয়োজন হয় এ ক্ষেত্রে তা উহ্য থাকবে। যাদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি তাদের বাণী, অনুভূতি, ও চিন্তার প্রতি বধির ও বিমুখ সাহিত্যকর্ম যদি উচ্চশ্রেণীরও হয় তবু তার চেয়েও নিজ জনসমষ্টির জীবনের অনুষঙ্গ সাহিত্যকর্ম যদি মধ্যশ্রেণীর হয় সেও ভাল।

ঠিক এই রকম কেন্দ্রীভবনের দিকে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-জগতে সস্তা বইয়ের আবির্ভাব এই ঝোঁকটাকে প্রবল করে তুলেছে এবং বৃহৎ শক্তিগুলির উৎপাদন নতুন-পাঠকঅঞ্চলগুলিতে অভিযান চালাচ্ছে। বৃহদায়তন প্রকাশন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সকলের আয়ত্তাধীন নয়।

From : "The New Look in Book Publishing
by Robert Escarpit.

'গ্রন্থাগার'-এর পুরানো সংখ্যা চাই

ত্রৈমাসিক পর্যায়ের (১৩৫৮—১৩৬২) 'গ্রন্থাগার'-এর প্রতিটি সংখ্যা ও মাসিক পর্যায়ের ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৭ ও ১৩৬৮, সালের সবগুলি সংখ্যা পরিষদের কার্যালয়ের জন্য ক্রয় করা হবে অথবা দান হিসাবে সাদরে গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরানো গ্রন্থাগারগুলির দায় ও সমস্যা

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

পাঠকদের মনের মত বই পড়ানো বড় দায়। তাঁরা যা চান তা পান না। এ অভিযোগ আবার পুরানো গ্রন্থাগারগুলোকেই বেশী শুনতে হয়। যেহেতু পুরানো তাই পাঠক যে বই খুঁজবে সে বই-ই দিতে হবে। পাঠক সন্তুষ্টির কাজে এদের ভীষন সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অনেকে এটা বুঝতে চান না, মনে করেন পুরানো লাইব্রেরী, অনেক বই আছে, ওদের আবার সমস্যা কি? সাহায্যকারী ও দাতার মনে এই প্রশ্নটাই বড় করে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে নিষ্করুণ অবহেলায় এরা ঘোর দুর্দিনের মধ্যে পড়ে আছে। পুরানো বই এদের অনেকের আছে বটে, কিন্তু বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য কোথায়? নতুন বই উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াবার মত যথেষ্ট অর্থ এরা পায় না। নিজস্ব বাড়ী হয়ত অনেকের আছে, কিন্তু বাড়ী মেরামতের পয়সা নেই। ভাঙ্গা কাঠের র‍্যাকে কোন রকমে বই গাদা করে রেখেছে, নতুন আসবাব পত্র কিনতে পারে না। শতচ্ছিন্ন ধূলায় মলিন বই, বাঁধাবার বা সংরক্ষণের ভীষন অসুবিধা। অতিজীর্ণ খাতায় লেখা গ্রন্থালেখ্য পাঠকদের কোন কাজে লাগে না। এই চরম দৈন্যের ছবি শতাধিক ও অর্ধশতাধিক বছরের পুরানো গ্রন্থাগারের অনেকগুলিতে দেখা যাবে।

নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কর্মীর অভাব হয় না, গড়ার আনন্দই তাদের উদ্যম ও উৎসাহ জোগায়। কিন্তু পুরানো গ্রন্থাগার চালাবার কর্মী পাওয়া খুব শক্ত। বিধিবদ্ধ রীতি-নীতি আর সমস্যার চাপ তাদের উৎসাহকে অল্পদিনেই নিভিয়ে দেয়। গ্রন্থাগারের গতানুগতিক কার্যে তারা সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তাই পুরানো গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে কর্মী সংগ্রহ করাই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। কর্মী সমস্যা মিটলে অন্যান্য সমস্যা কিছু কিছু মিটবার সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক প্রথায় বর্গীকৃত গ্রন্থসূচী খুব কম পুরানো গ্রন্থাগারেই আছে। আভিধানিক প্রথায় খাতায় লেখা জরাজীর্ণ গ্রন্থসূচী পাঠকদের বিশেষ কোন কাজে আসে না। অর্থাৎ আধুনিক প্রথায় বর্গীকরণ করে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করার লোকবল বা অর্থবল কিছুই এদের অধিকাংশের নেই। পাঠকদের অভিযোগের ঠেলায় কর্মীরা অতিষ্ঠ। নতুন বই কেনার যেমন সামর্থ্য নেই, তেমনি সামর্থ্য নেই পুরানো বই বাঁধাবার বা আধুনিক যুগোপযোগী র‍্যাকে তাদের সুসজ্জিত করে রাখার, বা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের সংরক্ষণ করার।

যখন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাজই সামলে উঠতে পারেনা, তখন এরা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে সাহসী হয়না, যদিও জানে গতানুগতিকতা গ্রন্থাগারের আকর্ষণ অনেক কমিয়ে দেয়। এসব পুরানো লাইব্রেরীতে প্রাচীন বই, পুঁথি, পত্রিকা প্রভৃতি যা

সংগৃহীত আছে তা গবেষকদের অনেক কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাঁদের সুযোগ সুবিধে করে দেওয়া অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করা, পৃথক কক্ষের আয়োজন করা, প্রভৃতি এদের সামর্থ্যের বাইরে। বহু প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থসম্পদ এই সব লাইব্রেরীতে অসংরক্ষিত হয়ে নষ্ট হয়েছে এবং হতে চলেছে। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির এই প্রধান ধারক ও বাহকগুলি যারা গত শতাব্দী ও অর্ধশতাব্দী কাল ধরে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে সমাজ সেবা করে এসেছে, তারা আজ নিষ্করুণ অবহেলায় অবহেলিত, চরম উপেক্ষায় উপেক্ষিত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে এই লাইব্রেরীগুলির বর্তমান অবস্থার যে চিত্র পাওয়া গেছে তার কয়েকটি এখানে তুলে দিলুম :—

তালিকা নং ১

গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল (খৃঃ)	পুস্তক সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা	বার্ষিক আয় টাঃ	বার্ষিক ব্যয় টাঃ	পুস্তকের জন্য ব্যয়, আয়ের শতকরা অংশ	পরিচালনার জন্য ব্যয় আয়ের শতকরা অংশ
কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী, (হুগলী)	১৮৫৮	১১০১০	৩৭১	৪১১৭	৩১৫৩	৩৪%	৩২%
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী, (হুগলী)	১৮৭১	৮০০০	২৬৩	২৮৩৫	২৫০৮	২৫%	৩৮%
অম্বিকা সাধারণ পাঠাগার, কালনা (বর্ধমান)	১৮৭২	২৫০০	১০০	৭০৬	২৫৫	৮০%	৫%
বালী সাধারণ গ্রন্থাগার, (হাওড়া)	১৮৮৫	১০৩৭৩	৭০৭	৪৫১১	৩৩২৬	২৭%	৪%
বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী, (হুগলী)	১৮৯১	১২৫৩৪	৮৪৫	১৫২৪৮	৭২০৪	৪৪%	১%
জুবিলী লাইব্রেরী সিউড়ী, (বীরভূম)	১৯০০	৮৬০০	৩০৭	৫০৯৮	৪৯৫৫	৩৮%	১৮%
বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি শেওড়াফুলী, (হুগলী)	১৯০৮	১৬৭০০	৩২৬	২৭১২	১৮৫১	৩৮%	২৫%

তালিকা নং ২

	শতাধিক বৎসরের পুরানো গ্রন্থাগার সংখ্যা	৭৫ বৎসরের অধিক পুরানো গ্রং সং	৬০ বৎসরের অধিক পুরানো গ্রং সং	৫০ বৎসরের অধিক পুরানো গ্রং সং	মোট
কলিকাতা	×	৯	১০	১১	৩০
হুগলী জেলা	২	২	৬	১১	২১
২৪ পরগণা জেলা	×	৪	৫	১২	২১
হাওড়া জেলা	×	৬	৪	৪	১৪
মোট	২	২১	২৫	৩৮	৮৬

যে সমস্ত পুরানো গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যাণ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে আছে এখানে তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করেছি। অপর সকলের অবস্থা মোটামুটী প্রায় একই ধরণের। কলিকাতা অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা সেই তুলনায় অনেক খারাপ। দ্বিতীয় তালিকায় যে সব জেলায় মোটামুটি সংখ্যক পুরানো গ্রন্থাগার আজও কোনরকমে বেঁচে আছে তাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য জেলায় কিছু কিছু পুরানো গ্রন্থাগার এখনও টিঁকে আছে। এই পরিসংখ্যানের চিত্রটি পাচ ছ'বছর আগের, তবে মনে হয় এই কয় বছরে এদের বিস্ময়কর কোন পরিবর্তন হয়নি। এই চিত্র হতে যদিও এদের উত্থান পতনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে সামগ্রিক ভাবে বলা যায় এদের উন্নয়ন সময়ের আনুপাতিক হারে মোটেই হয়নি এবং দেশের বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও এরা উপেক্ষিত। বহু গ্রন্থাগার কালের কঠোর আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে গেছে; তাদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তবে সংখ্যাটি যে খুব নগন্য হবেনা তা অনায়াসেই ধারণা করা যায়।

অবহেলায় আমরা অনেক সম্পদ হারিয়েছি ও হারাতে বসেছি। এই সব প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহে আজও বহু সম্পদ অবশিষ্ট আছে, এদের সঞ্জীবিত করলে গ্রন্থাগার আন্দোলন নবভারত গঠনে আবার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জাতির মহত্তর জীবন গঠনে গ্রন্থাগার অপরিহার্য, তেমনি গ্রন্থাগার আন্দালনের সার্থক ও সফল রূপায়নে প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার একান্ত প্রয়োজন।

The problem of old libraries of West Bengal and their management—by Sunil Kumar Chattopadhyay.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফল ১৯৬৫ (আগষ্ট)

প্রথম শ্রেণী

(ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে)

- ২ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
- ৫ অতুলচন্দ্র দে
- ২৩ রমা দাস
- ২৪ সুধাহাসিনী বসু
- ২৮ দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী
- ৩৬ শৈলেন্দ্রনাথ পাল
- ৩৭ হিমাদ্রী কুমার চক্রবর্তী
- ৪৮ তুষারকান্তি সান্যাল
- ৬৫ প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় শ্রেণী

- ৪ শচীন্দ্রকুমার রায়
- ৭ বিজয়া দত্তরায়
- ১০ জয়তী রায়
- ১৪ তপতী বিশ্বাস
- ১৫ ছন্দা আচার্য
- ১৬ নমিতা সিংহ
- ২১ কল্পনা মুখোপাধ্যায়
- ২৬ মণিকা সেন
- ২৯ সত্যরঞ্জন রায়
- ৩১ বিদ্যুৎ কুমার হাজরা
- ৩২ কামাখ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- ৩৮ প্রতাপ চন্দ্র বেরা
- ৩৯ অজিত কুমার ভাওয়াল
- ৪৩ নিতাইচরণ মান্না
- ৪৪ বিধুভূষণ দাস
- ৪৬ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৪৭ চিত্তরঞ্জন দত্ত
- ৪৯ কিরণ চন্দ্র দে
- ৫১ গোপালচন্দ্র সা
- ৫৩ অনুরাধা চন্দ্র হালদার
- ৫৫ মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল
- ৫৬ অজিত কুমার পাল
- ৫৭ বিশ্বনাথ ঘোষ
- ৫৯ প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস
- ৬০ বিমলেন্দু বিকাশ সিংহ
- ৬১ সনৎ কুমার রায়
- ৬৭ প্রদীপ কুমার চৌধুরী
- ৬৯ অনাথ নাথ পাত্র
- ৭০ মাধব আচার্য

Results of the Dip-Lib Examination (Calcutta University)

গ্রন্থাগারের গত 'আশ্বিন' সংখ্যায় 'সার্ট-লিব্ পরীক্ষার ফলাফল' শীর্ষক সংবাদে রোল নং ১০৮ সুধাকৃষ্ণ গুপ্তের নাম সুধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রূপে ছাপা হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বি, টি, রোড, কলিকাতা-৫০

শিশুদের জন্য উন্নততর গ্রন্থাগারব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নিজ কার্যালয়ে একটি শিশু বিভাগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এটি স্থাপিত হলে এতে অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে তথ্যচিত্রাবলী প্রদর্শিত হবে। পরে অবশ্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রবণ-দর্শন-প্রচার শাখাটি (Audio-Visul unit) অন্যান্য স্থানেও এই কাজের জন্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার শাখা খোলার এখনও কিছু বিলম্ব আছে কিন্তু শ্রবণ-দর্শন-প্রচার শাখার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২৮শে আগষ্ট থেকে শিশুদের জন্য চিত্র প্রদর্শনের কথা। এর পর থেকে প্রতি শনিবারে বিকেল ৪টে থেকে ৫টা অবধি নিয়মিত চিত্র প্রদর্শিত হবে। যে কোন শিশু এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী। ৪৭এ, বি, টি, রোড কলিকাতা-৫০

সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারের অষ্টম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্পাদকের কার্য-বিবরণী থেকে জানা গেল এই গ্রন্থাগারের (১) বড়দের বিভাগ (২) শিশু-বিভাগ এবং (৩) অবৈতনিক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ মোট তিন বিভাগের সভ্য সংখ্যা ৩৫০ জন এবং পুস্তক সংখ্যা ৩০০০।

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত বৎসর নেতাজী জন্মোৎসব, গণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। সভ্যরা ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাণ্ডবাদ্য ও আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলার নিয়মিত অনুশীলন করে থাকেন এছাড়া এঁরা গত বৎসর বিষ্ণুপুরে ২ দিন এবং মুর্শিদাবাদে ৪ দিন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন। গ্রন্থাগারকে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। বর্তমান বৎসরে শ্রীসুশীল কুমার পাল সভাপতি, শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সাধুখাঁ সম্পাদক ও শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক হয়েছেন।

২৪ পরগণা

সাধুজন পাঠাগার। বনগ্রাম

পাঠাগারের ৩১তম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব গত ২৮শে আশ্বিন অপরাহ্নে "সাধু-পাঠ-মন্দিরে" উৎযাপিত হয়েছে। শ্রীদেবকীদুলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

"জন গুঞ্জন স্বাগতম" সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার শুভ সূচনা ঘটে। অছি সভাপতি শ্রীইন্দ্র গোপাল চট্টোপাধ্যায় সাধুজন পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগতম জানান। কবি নির্মল আচার্য সাধুজন পাঠাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পাঠাগার অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু উৎসবের সাফল্যসূচক 'বাণী'গুলি পাঠ করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জোৎস্নারাণী সাধু পাঠাগারের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। কার্য বিবরণীতে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে পাঠাগারের আয় ৬১৪৫, ২৪ পয়সা, সদস্য সংখ্যা ২৫৩ পুস্তক বিলি ১০৩১২ ; পুস্তক সংখ্যা ৮১১৫।

গুণীজন সম্বর্ধনায় শিল্পী শ্রীসুনীলকুমার সরকারকে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হয়। বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কৃতী ব্যক্তিদের রৌপ্যপদক, অভিজ্ঞান পত্র ও পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় কবিতিলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীদেবকীদুলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ নাথ, কুমারী মনীষা সাধু, শ্রীঅশোক দাস কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন।

সাহিত্যিক শ্রীগৌরীশংকর মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাধু-সংস্কৃতি-সংঘের সভাসভ্যাবৃন্দ শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" নাটকটি মাইক্রোফোনে পরিবেশন করেন।

বর্ধমান

জোতরাম বাণীমন্দির। গ্রামীন গ্রন্থাগার

গত ১০ই অক্টোবর গ্রন্থাগারের ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা জোতরাম বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান অঞ্চল পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ। প্রথমে ভারতীয় শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দু মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বিগত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ করা হয় এবং উপস্থিত সভ্যগণ তা অনুমোদন করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হলে বর্তমান বৎসরে গ্রন্থাগারের আয়ের উন্নতিতে সভ্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বর্তমান বছরে ডাঃ গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ সভাপতি, শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীসনাতন মণ্ডল গ্রন্থাগারিক ও সহঃ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সর্বসমেত ১১ জনকে নিয়ে পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এই গ্রন্থাগারটিকে একটি গ্রামীন গ্রন্থাগার রূপে গণ্য করার জন্য অনেকদিন থেকেই সরকারের নিকট আবেদন জানান হচ্ছে কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ১১০৬ এবং সদস্য সংখ্যা ১০০।

বাঁকুড়া

হাড়মাসড়া বাণীমন্দির। গ্রামীন গ্রন্থাগার

গত ৫ই অক্টোবর বাণীমন্দির সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে "বিজয়া সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকল্যাণী সেনগুপ্ত ও ডাঃ সরসীভূষণ রায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় "পুস্তক দান যজ্ঞের" অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন ৯,৩৪·৩৩ পয়সা মূল্যের মোট ২৬২ খানি পুস্তক দান হিসেবে পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে গত বৎসরও দান হিসেবে ১১১৯·৪৬ পয়সা মূল্যের ৩৬৮টি পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

১৯৬৩-৬৪ সালে পাঠাগারের মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৯৮৬টি। ১৯৬৪-৬৫ সালে সংযোজিত হয় ৪৯৭টি পুস্তক এবং ৩৮৪টি পুস্তক বাতিল করা হয় সুতরাং ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৯৭টি। পাঠাগারের সভ্য সংখ্যা: ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল পুরুষ ৯৪ এবং মহিলা ১০। ১৯৬৪-৬৫ সালে সভাবৃদ্ধি হয় পুরুষ ২৬ ও মহিলা ৩; ঐ সালে ১২ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলার সদস্যপদ বাতিল হয় সুতরাং পাঠাগারের বর্তমানে সভাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পুরুষ ১০৮ এবং মহিলা ১২ মোট ১২০। অবৈতনিক পাঠকক্ষে দৈনিক উপস্থিতির হার:—শিক্ষক ৪ জন; ছাত্র ২০ জন এবং সাধারণ ১২ জন, মোট ৩৬ জন। মোট পঠিত পুস্তকের সংখ্যা: ১৯৬২-৬৩ সালে ৮৪৬৩, ১৯৬৩-৬৪ সালে ৯০৬২ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে, ১৪, ২২৫। আয়: ১৯৬২-৬৩ সালে ২৮৫৫·১৫ টাঃ। বর্তমান বৎসরে শ্রীশশিশেখর ভট্টাচার্য পাঠাগারের সভাপতি, শ্রীহরিকিঙ্কর রায় সম্পাদক এবং শ্রীঅখিল চন্দ্র পাল গ্রন্থাগারিক ও সহঃ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এবং মোট ১২ জনকে নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

হাওড়া

মিলন পাঠাগার। রামনবমীতলা লেন। বালী

গত ৮ই আগষ্ট রবিবার সকাল ৯টায় বালী মিলন পাঠাগারের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন কার্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীফনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সম্পাদক শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিবরণীতে পাঠাগারের উন্নতির একটি সুন্দর বর্ণনা দেন। তিনি সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে বিশেষতঃ যাঁরা কার্যকরী সমিতির সদস্য না হয়েও পাঠাগারের উন্নতিকল্পে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হবেন না এই আশা প্রকাশ করেন। সভায় পাঠাগারের ১৯৬৫ সালের জন্য শ্রীসরল কুমার চট্টোপাধ্যায় F. C. A মহাশয় সর্বসম্মতভাবে হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৪ সালের হিসাব পরীক্ষার জন্য তাঁকে পাঠাগারের পক্ষ থেকে সম্পাদক মহাশয় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

News from Libraries

আগামী ২০শে ডিসেম্বরে প্রতিপাল্য গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আমাদের আবেদন—

প্রিয় সহকর্মী,

দেশ-গঠনের সর্বাত্মক প্রয়োজন আজ সারা দেশে যেমন উপলব্ধ হ'য়েছে এর আগে কখনও তা'হয়নি'। সীমান্তের প্রহরায় আমাদের জওয়ানেরা, শিল্পক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদল, ক্ষেতে-খামারে আমাদের কৃষকেরা আজ এই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য আগুয়ান হ'য়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের অংশটুকু পালন না ক'রে কি আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি।

উন্নতিকামী প্রত্যেক দেশের নাগরিককে আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করা, দেশের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের নিজেদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করা গ্রন্থাগারের কাজ। অক্ষর-জ্ঞান-বর্জিত-জনবহুল দেশে এই কাজ বিশেষ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের অপেক্ষা রাখে। আমাদের এই বছরের গ্রন্থাগার-দিবসে তাই আমরা গ্রন্থাগারগুলোকে আপন আপন এলাকার সমাজ-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ-স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান পরীক্ষায় জাতি যাতে আপন যোগ্যতা প্রমাণ ক'রে উন্নতির নিশ্চিত পথে এগোতে পারে সেইজন্য সমস্ত পুরুষ ও নারীকে যথাযথ সংবাদ পরিবেষণের ও শিক্ষাদানের জন্য গ্রন্থাগারকে গ'ড়ে তোলার গুরুত্ব আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠুক এই অনুরোধ।

১১ই নভেম্বর, ১৯৬৫

ইতি—
শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী—

১। প্রভাত ফেরী
২। কৃষি, দেশরক্ষা ও শিল্প বিষয়ে প্রদর্শনী
৩। জনসভা
৪। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ
৫। অন্যান্য উপযুক্ত অনুষ্ঠান

পরিষদ কথা

বঃ গ্রঃ পরিষদের বিভিন্ন সমিতির কর্মোদ্যম

গত ২৮শে অক্টোবর শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে 'হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি'র সভা হয়। সভায় পরিষদের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উক্ত হিসাব অনুমোদিত হয়।

সভায় পরিষদের টেলিফোন কলের হিসাবে গড়মিল থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বিলে দেখা যায় তিন মাসে মোট ৩০২টি কল হয়েছে, কিন্তু পরিষদ অফিসে টেলিফোন কল লিখে রাখার যে দৈনিক রেজিষ্টার রয়েছে তাতে উক্ত তিন মাসে মোট ৯৩টি কল লেখা হয়েছে। ফলে যতসংখ্যক কল হয়েছে তার সঠিক বিল হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

কার্যকরী সমিতি যাতে ব্যাঙ্কে একটি স্থায়ী আমানতের (Fixed deposit) অ্যাকাউণ্ট খোলেন সেজন্য সমিতি অনুরোধ জানান।

গত ৫ই নভেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'কার্যকরী সমিতি'র একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি' ও 'গৃহ নির্মাণ সমিতি'র কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গত সভার সিদ্ধান্তগুলি কতদূর কার্যকরী হয়েছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, জেলা গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সমাজ-শিক্ষা-অধিকারিকের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছে। অতঃপর পত্রটি সভায় পঠিত হয় ও অনুমোদিত হয়। সম্পাদক পরিষদের গৃহ-নির্মাণ সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন, বারবার পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিষদ ভবনের প্ল্যান মঞ্জুর করছেন না। এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে বলে সভায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উত্তরবঙ্গে একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য পত্রালাপ করা হয়েছিল কিন্তু এ সম্পর্কে কোন মহল থেকেই সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরিকল্পনাটি আপাততঃ মুলতুবি রাখতে হয়েছে বলে সম্পাদক জানান।

সভার পরবর্তী আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলি নীচে দেওয়া হল।

১। বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার দাঁড়হাট্টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

২। পরিষদের গৃহ-নির্মাণের ব্যাপারে কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলরের সঙ্গে আলোচনা করতে সম্পাদককে অনুরোধ জানান হয়। গৃহ-নির্মাণের পথে বাধা অপসারণের জন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাতে এবং প্রয়োজন হলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের ভার সম্পাদকের ওপর দেওয়া হয়।

৩। পরিষদের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন সভায় বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ টাকা করে ভাতাবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা অতঃপর শিথিল করে স্কুল ফাইনাল পাশ করা হবে কিনা এ সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, প্রার্থী যদি গ্রন্থাগারে কর্মরত হন এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন তাহলে শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে। গ্রন্থাগারবৃত্তি যাঁদের জীবিকা নয় অর্থাৎ অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকদের এই সুযোগ দেওয়া হবে না।

৫। আগামী 'গ্রন্থাগার দিবস'-এর আয়োজন করা সম্পর্কে সভায় আলোচন হয়। কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন, পোষ্টার ইত্যাদি ছাপানোর জন্য এ বৎসর অর্থব্যয় করা সঙ্গত হবে কিনা এবং যেভাবে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় তার সার্থকতা আছে কিনা তাই নিয়ে কিছু সময় মতামত বিনিময়ের পর বরাবরের মতই 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

৬। কুচবিহার ইভিনিং কলেজে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ' কোস খোলা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সম্পাদকের সঙ্গে এঁদের প্রতিনিধিদের যে মৌখিক আলোচনা হয়েছে তার জবাব পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলে স্থির হয়।

সহযোগী গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কর্মোদ্যম প্রসঙ্গে

শিক্ষা কমিশনের নিকট 'ইয়াসলিক' (IASLIC)-এর স্মারক পত্র

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (ইয়াসলিক) পক্ষ থেকে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সফররত শিক্ষা কমিশনের নিকট ভারতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশন যাতে জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেন সেইজন্য এই স্মারকপত্রে অনুরোধ জানান হয় :—

১। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুস্তক সরবরাহ, গ্রন্থাগার বেশী সময় খোলা রাখা, উপযুক্ত এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের দ্বারা দেশের গ্রন্থাগারগুলির সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হোক।

২। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রমের রূপ হওয়া উচিত :—

(ক) বড় পাবলিক লাইব্রেরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, গবেষণাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে স্থাপিত শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির আধা-বৃত্তিকুশলী কর্মীর (Semi professional) শিক্ষার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ছয় মাসের মোট ৬০০ ঘণ্টার সার্টিফিকেট কোর্স।

(খ) জাতীয় গ্রন্থাগার, বড় পাবলিক লাইব্রেরী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, গবেষণা-কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও টেকনিক্যাল লাইব্রেরী এবং উপরোক্ত সকল

শ্রেণীর মাঝারী ও ছোট গ্রন্থাগারের নিম্ন পর্যায়ের বৃত্তিকুশলী কর্মীর (Junior-professional staff) শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় এক বছরের মোট ১০০০ ঘণ্টার বি, লিব, এস, সি কোর্স।

(গ) উপরোক্ত সকল গ্রন্থাগারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের বৃত্তিকুশলী বা তত্ত্বাবধায়ক কর্মীদের Senior professional or managerial staff এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা বি, লিব, এস, সি পাশ করার পরই এক বছরের মোট ১০০০ ঘণ্টার মাষ্টার্স ডিগ্রী কোর্স।

(ঘ) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের মৌলিক রচনা বা গবেষণার জন্য ডি, ফিল ; পি, এইচ, ডি এবং ডি, এস, সি ডিগ্রি কোর্সের প্রবতন।

(ঙ) বিশেষ ধরণের সংস্থাগুলির জন্য ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট ও ডকুমেণ্ট বিদদের শিক্ষার জন্য কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্তদের জন্য এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

৩। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগ (Department of Library Sc.) বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্কুল (School of Library Science) গুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে (ক) প্রফেসর, রিডার, লেকচারার (খ) রিসার্চ ফেলোশিপ (গ) লাইব্রেরী ও লাবরেটরীর উপযুক্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

৪। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথন পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থা বাঙ্গালোরের ডকুমেণ্টেশন রিচার্স এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারকে (DRTC) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হোক এবং একে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা বিতরণের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক।

৫। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্যায়ণের জন্য এবং সর্বত্র একরকম শিক্ষার মান প্রবর্তনের জন্য ইউ জি সি, ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এবং গ্রন্থাগারবৃত্তির জাতীয় পরিষদগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা যায় কিনা কমিশনকে বা ভেবে দেখতে অনুরোধ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের স্মারকলিপি

সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি'র পক্ষ থেকে এই সব গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য নবপ্রবর্তিত বেতনক্রম সংশোধনের দাবীতে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

এই স্মারকলিপিতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কথা উল্লেখ করে জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগারিক এবং জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের বেতন ও মর্যাদার ব্যাপারে গুরুতর অবিচার করা হয়েছে বলে ও এই

সকল গ্রন্থাগারের পিয়ন, দারোয়ান, নাইটগার্ড প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে বেতনবৃদ্ধির হার (বাৎসরিক ৫০ পয়সা মাত্র) নৈরাশ্যজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক এবং সকলশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা, চিকিৎসাভাতা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, বাড়ীভাড়া ভাতা প্রভৃতি যে সকল সুযোগ পান গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সে সকল সুবিধা দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর 'আশু দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সহৃদয় হস্তক্ষেপের জন্য' নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করেছেন :—

১। জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যমূলক নীতি যেন অনুসরণ না করা হয় এবং গ্রন্থাগারিক পদের মর্যাদা রক্ষার জন্য উচ্চতর বেতনক্রমটি সকলের ক্ষেত্রেই কার্যকরী করা হয়।

২। বর্তমানে কর্মরত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সব স্তরের গ্রন্থাগারিক এবং লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যাণ্টগণকে গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হোক এবং এই সকল গ্রন্থাগারকর্মী যেন বেতনক্রমের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হন।

৩। মহার্ঘভাতা, চিকিৎসাভাতা, বাড়ীভাড়াভাতা এবং সন্তানসন্ততিদের বিনাবেতনে শিক্ষার সুবিধা প্রভৃতি উল্লিখিত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং এই সব গ্রন্থাগারকর্মী যেন বেতনক্রমের সূচনাকাল থেকে এই সব সুযোগ-সুবিধা পান।

৪। সকল স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যেন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় সবেতন ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

৫। সংশোধিত বেতনক্রম প্রবর্তন না পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মীকে ন্যূনপক্ষে ৩৫৲ টাকা অন্তবর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুর করা হোক।

কর্মপ্রার্থীদের নাম রেজেস্টি

বঃ গ্রঃ পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয় ৩৩ নং হুজুরীমল লেনে এখন থেকে কর্মপ্রার্থীদের নাম রেজেষ্ট্রি করা হবে। নিয়োগ কর্তারা অনেক সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে লোক চেয়ে পত্র দেন। কিন্তু পরিষদ অফিসে কর্মপ্রার্থীদের কোন তালিকা না থাকায় এ ব্যাপারে খুব অসুবিধা হয়। অতএব কর্মপ্রার্থীদের পরিষদ অফিসে এসে সন্ধ্যা ৫-৩০টা থেকে ৭-৩০টার মধ্যে নাম লেখাতে অনুরোধ জানান হচ্ছে। সমস্ত ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ইত্যাদি সঙ্গে আনতে হবে।

বার্তা বিচিত্রা

পরলোকে ডাঃ আলবার্ট সোয়াইৎজার (১৮৭৫—১৯৬৫)

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ফরাসী বিষুব আফ্রিকার গাবোঁর অন্তর্গত লাম্বেরেনে বিখ্যাত দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরবর্তী জীবনে চিকিৎসাব্রতী ডাঃ আলবার্ট সোয়াইৎজার পরলোক গমন করেছেন। গত ৫০ বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জলবায়ুতে আফ্রিকার 'জঙ্গল হাসপাতালে' তিনি স্বইচ্ছায় বাস করছিলেন। সামান্য রোগভোগের পর ৯০ বছর বয়সে তাঁর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়।

১৮৯৯ সালে ২৪ বছর বয়সে জার্মান ভাষায় কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তিনি দর্শনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি "Bach the musician poet" নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিরিশ বছর বয়সে তিনি যখন ডাক্তারী পড়বেন এবং আফ্রিকায় গিয়ে মানবতার সেবায় লাগবেন বলে সংকল্প করেন তার বহু পূর্বেই সুপণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি রটেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ সেণ্ট টমাস কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন এবং ১৯১২ সালে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কন্যা শ্রীমতী হেলেন ব্রেসলাউকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁর স্ত্রীও নার্সের ট্রেনিং নিয়েছিলেন।

সোয়াইৎজার ১৯১৩ সালে ২০০ প্যাকেট ডাক্তারী যন্ত্রপাতি এবং একটি পিয়ানো সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। যন্ত্রপাতিগুলি তিনি তাঁর গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ এবং বক্তৃতা দ্বারা উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিনেছিলেন; আর পিয়ানোটি প্যারীর বাক সোসাইটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফরাসী মিশনারী সমিতিতে যোগ দেন এবং লাম্বেরেনে হাসপাতাল স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান নাগরিক বলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ফরাসীদের হাতে বন্দী হন ও তাঁদের ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Philosophy of Civilization রচনা করেন। পরে তিনি আবার আফ্রিকায় ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর Indian thought and its development গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস; স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হল :—

The Quest of the Historical Jesus (১৯১০), Paul and his Interpreters (১৯১২) On the Edges of the Primeaval Forest (১৯২২) Memoirs of childhood and Youth (১৯২৪), The Forest Hospital at Lambarane (১৯৩১), My Life and Thought (১৯৩৩)

সূত্র : বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণাল, ১১ই সেপ্টেম্বর

শতবর্ষ আগে : স্যর জন উড্রফ স্মরণে

এ বছর বিখ্যাত ভারতবিদ্ স্যর জন জর্জ উড্রফের (১৮৬৫-১৯৩৬) জন্মশতবার্ষিকী। স্যর উড্রফ কলকাতা হাই কোর্টের এডভোকেট হয়ে এদেশে আসেন ১৮৯০ সালে। তিনি ১৮৮৯ সালে অক্সফোর্ড থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভারতীয় আইন বিষয়ের 'রিডার' পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে, বিশেষতঃ তন্ত্র সম্পর্কে স্যর উড্রফের রচনাগুলি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

Shakti and Shakta, Garlands of Letters, The World as Power, (৬খণ্ড) Is India Civilized? Hymns to the Goddess, Principles of Tranta ইত্যাদি।

সূত্র : সায়েন্স এণ্ড কালচার, প্রথম বর্ষ, ১৯৩৫

দিল্লীতে রুশ ভাষা শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

আগামী ১৪ই নভেম্বর পরলোকগত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে মোট ১০০ জন ছাত্র নিয়ে নয়াদিল্লীতে প্রথম রুশ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা এবং রুশ রাষ্ট্রদূত শ্রীবেনেডিক্টভ এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উভয় দেশের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সরকার শিক্ষক, বইপত্র এবং কারিগরী সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ভারতীয় শিক্ষকদের একটি দলকে পাঁচ বছরের জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করা হবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, (২৮শে অক্টোবর)

কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর সমাবর্তন

কানপুরের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৩১শে অক্টোবর এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সমাবর্তন ভাষণ দেবেন। ১৯৬০ সালে এটি স্থাপিত হয়। এখানে ১০০ জন অধ্যাপক ৯টি কারিগরী বিষয়ে ১০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০ জন অধ্যাপক এবং ২০০০ ছাত্র ছাত্রী করা হবে বলে জানা গেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানটিকে ৮ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছে এবং আমেরিকার ৭টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে একে সাহায্য করবে।

হিন্দুস্তান টাইমস্, দিল্লী (৩০শে অক্টোবর)

আবু পাহাড়ে পর্ব্বতারোহণ-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন

গুজরাট সরকার বর্তমান বৎসরে আবু পাহাড়ে একটি পর্বতারোহণ-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করবেন বলে সরকারী ভাবে ঘোষণা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে এখানে ৭টি ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে।

দি হিন্দু, মাদ্রাজ, (১৬ই অক্টোবর)

দিল্লীর বৃটিশ ইনফরমেশন লাইব্রেরীর দরোজা বন্ধ

নয়াদিল্লীর কনট সার্কাসের নিকটে অবস্থিত বৃটিশ ইনফরমেশন লাইব্রেরীটি বর্তমানে যে বাড়ীতে অবস্থিত তার লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় লাইব্রেরীটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ লোক লাইব্রেরীটি ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য লাইব্রেরীটির সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের বিভাগটি রফি মার্গে অবস্থিত বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে এবং রেফারেন্স বিভাগটি চাণক্যপুরীতে অবস্থিত বৃটিশ হাই কমিশন অফিসে স্থানান্তরিত হচ্ছে। হিন্দুস্থান টাইম্স্, দিল্লী; (৩০শে অক্টোবর)

যোগ-বিয়োগ

প্রখ্যাত 'ডন' সিরিজের লেখক রুশ ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোকফ এ বৎসর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

সুইস রসায়নবিদ ডঃ পল মূলার গত ১৩ই অক্টোবর ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি কীটধ্বংসী 'ডি ডি টি'র প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দি হিন্দু, (১৫ই অক্টোবর)

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যখানি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় ভারতীয় জ্ঞানপীঠ কবিকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য পুরস্কারগুলির মধ্যে সর্বাধিক।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার কবিকে যে ৩৫০৲ টাকা পেন্সন দিতেন গত আগস্ট মাস থেকে তা দেওয়া বন্ধ করেছেন।[১] ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য কবিকে নিয়মিত পেন্সন দিয়ে যাচ্ছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য বহুদিন থেকেই এই সব সম্মান-অসম্মানের উর্দ্ধে চলে গেছেন। কবি এখন জীবন্মৃত, দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে তাঁর স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত। কিছুকাল আগে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী প্রমীলা পরলোকগমন করেছেন। কবি বর্তমানে কলকাতায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সব্যসাচীর নিকট অবস্থান করছেন। যুগান্তর, কলকাতা।

'চীনা রিভিয়্যু' পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আদেশবলে ৬৭ গণেশ অ্যাভেন্যু হতে প্রকাশিত এবং শ্রী সি. কে হুয়াং কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'চীনা রিভিয়্যু' দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬২ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত এই পত্রিকাটিতে অনেক আপত্তিকর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত পত্রিকাটির ঐ সংখ্যাগুলির কোনটি যদি কারো কাছে থাকে তবে তা স্থানীয় পুলিশের নিকট সমর্পণ করতে হবে।

১। পরে জানা গেছে এই সংবাদ সঠিক নয়। সঃ গ্রঃ

ঐ সংখ্যাগুলির মুদ্রণ, বিক্রয় এবং বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ঐ সংখ্যাগুলি থেকে কোনরূপ অনুবাদ, তার পুর্নমুদ্রণ বিক্রয় বা বিতরণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এইরূপ অনুবাদ বা ঐ সংখ্যাগুলির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ক্যালকাটা গেজেট (অতিরিক্ত) ১৪ই সেপ্টেম্বর

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড পুনর্গঠিত

সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই বোর্ডের কার্য-কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে আবার নতুন করে তিন বৎসরের জন্য এই বোর্ড গঠিত হয়েছে:—জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং, বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস, এন, এম, ত্রিপাঠী, দ্বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস, ভি, সোহোনী, জয়পুরের সংস্কৃত শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ কে, মাধবকৃষ্ণ শর্মা, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ ভি, রাঘবন, বরোদার ডঃ পি, এম, মোদী, শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কিউরেটর পণ্ডিত শ্রীমান ডি, টি, তথাচার্য এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী।

দি হিন্দু, মাদ্রাজ (৪ অক্টোবর)

ভাটনগর-স্মৃতি পুরস্কার

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালের ভাটনগর-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর স্যর শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের (১৮৯৫-১৯৫৫) স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯৬৪ সালের জন্য ডঃ এ, আর, বর্মা (পদার্থবিদ্যা) ডঃ সুখদেব (রসায়ন) ডঃ ভি, এস, আখোয়াল (জীববিদ্যা), ডঃ বি, আর নিবাওয়ান (যন্ত্রবিদ্যা); ১৯৬৩ সালের জন্য ডঃ আর রামণ (পদার্থবিদ্যা) ডঃ বি, ডি, তিলক (রসায়ন) ডঃ জে, জে, গাঙ্গুলী (জীববিদ্যা), ডঃ বি, প্রকাশ (যন্ত্রবিদ্যা) এবং চিকিৎসা বিদ্যায় ডাঃ এস, এইচ জাইদি ও ডাঃ বি, কে, আনন্দ যুক্তভাবে পুরস্কার পেয়েছেন।

দি হিন্দু, মাদ্রাজ (৯ই অক্টোবর)

(সম্পাদকীয়র শেষাংশ)

ভাটা পড়ে। তখন কোনমতে একে টিঁকিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চলে—অনেক গ্রন্থাগারের দরজা হয়তো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কেন এমন হয় গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী কি তা কখনো ভেবে দেখেছেন? পরিষদের এইসব প্রতিষ্ঠান সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্যমের অভাবই আবার তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির এখন সুবিধাজনক অবস্থা। অর্থাভাব এবং কর্মীর সমস্যা নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে না। যদিও অনেক রকমের অসুবিধা তাঁদেরও আছে। মনে হয় টিঁকে থাকার সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিই সর্বত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আর পুরানো গ্রন্থাগারগুলি কি বাতি জ্বালাবার লোকের অভাবে একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? আশ্চর্যের বিষয়, বেসরকারী উদ্যোগে কোথাও না কোথাও আজও নিত্য নতুন গ্রন্থাগার গজিয়ে ওঠার নজিরের অভাব নেই। অথচ অনেক লোকের অনেক ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে গড়ে ওঠা পুরাতন গ্রন্থাগারগুলির অমূল্য সম্পদ কি আমাদের অবহেলার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে? এই অপচয় রোধের জন্য এ সম্পর্কে সরকার ও জনসাধারণের কি কিছু করবার নেই? সরকার তো অনায়াসেই এইসব পুরাতন এবং বৃহৎ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারেন! আগামী গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বাংলা দেশের সর্বত্র পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য ও প্রতিষ্ঠান সদস্যদের এই কথাগুলি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

Editorial : The Library Day Campaign and
Library Movement in West Bengal

আগামী ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র
গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৮ } ১৩৭২, অগ্রহায়ণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

পাঠস্পৃহা ও পাঠরুচি : প্রস্তাবিত নমুনা সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক-পঠন সম্পর্কে একটি বিবরণ রচনার উদ্দেশ্যে অল্প দিনের মধ্যেই 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'-এর তরফ থেকে একটি নমুনা সমীক্ষার কাজ আরম্ভ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার অন্ততঃ তিনটি গ্রন্থাগারের কাছ থেকে ছাপানো ফরমে বই লেন-দেন সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর উত্তর চেয়ে পাঠানো হবে। এছাড়া এই সব গ্রন্থাগারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ এবং নিরক্ষরদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের তাদের কি ব্যবস্থা আছে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম সম্পর্কে যে মূল প্রবন্ধ আলোচনা করা হয়েছিল তাতে এইসব গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী জনসাধারণের পাঠরুচি ও পাঠস্পৃহার প্রসঙ্গও উঠেছিল। 'দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারব্যবস্থার কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু সে তুলনায় জনসাধারণের মধ্যে পুস্তক-পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে গ্রন্থাগারগুলি কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছে এবং পুস্তক-পঠনের প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে সামান্য তথ্যই আমাদের হাতে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুযায়ী এই রাজ্যের সরকার পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা হল দু'লক্ষ। গ্রন্থাগারগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুস্তক-পঠন সম্পর্কে নিয়মিত বিবরণ রাখা হয় না। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর বই পড়ার প্রতি পাঠকদের ঝোঁক সে সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয় না। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অবশ্য কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক-পঠন সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া অনেক গ্রন্থাগার বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে পুস্তক আদান-প্রদানের বিবরণও পাঠান। এরূপ কিছু কিছু তথ্যও 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়েছে।

জনসাধারণের পাঠরুচি অত্যন্ত নিম্নগামী হয়েছে বলে প্রায়ই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়। সস্তা ও চটকদার বই পড়ার ব্যাপক ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং অশ্লীল

সাহিত্য পাঠের ফলে দেশের নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু এ সকল কথাই বলা হয় সাধারণতঃ অনুমানের ওপর নির্ভর করে; তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যে বলা হচ্ছে না একথা বলাই বাহুল্য। এই সব কারণেই বর্তমান সমীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন নিম্নগামী পাঠরুচির পরিবর্তন এবং জনসাধারণকে নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' কিছু ভাবছেন কিনা।

জাতি হিসেবে আমরা যদি অধঃপতিত হয়ে থাকি তবে তার প্রতিকার শুধু গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে হবে এ আশা দুরাশা। বহুপ্রচলিত ছড়ার সেই 'নটে শাকটি মুড়োন'র অভিযোগে অভিযুক্তের ভূমিকায় পাঠক, লেখক, প্রকাশক, সরকার, গ্রন্থাগারিক তথা সমাজ সকলকেই টেনে আনা যায়। তাহলে দেখা যাবে শুধু পাঠকের রুচির ওপর দোষ চাপিয়ে আমরা পরিত্রাণ পাবো না লেখককে জিজ্ঞেস করুন, লেখক কেন ঐসব বই লিখছেন, আর প্রকাশকরাই বা কেন ঐসব সস্তা বই প্রকাশ না করে ভাল বই প্রকাশ করছেন না? সরকারের ও উচিত হবে ভাল বই প্রকাশের জন্য অকৃপণ ভাবে অর্থ সাহায্য করা। পাঠরুচির মানোন্নয়নের জন্য অথবা জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করবার জন্য গ্রন্থাগারিকের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে। কিন্তু পাঠকও নিশ্চয় তার পছন্দমাফিক বই-ই পড়তে চাইবেন। জোর করে তাঁকে অন্যকিছু পড়ানো যায়না। সে চেষ্টা করতে গেলে পাঠকের তার ওপর বিরক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া আমরা যে শুধু প্রয়োজনের জন্যই বই পড়ি তা নয় আনন্দলাভের জন্যও আমরা বই পড়ি। বৃত্তিগত কলাকৌশল আয়ত্ত করবার জন্য এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রের অগ্রগতির সংবাদ রাখবার জন্য সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির লোকের যথা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক এদের প্রত্যেকেরই বই এবং পত্র-পত্রিকা পড়তে হয়।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির আদিতেই শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন কিনা তা পুরাণ বা বাইবেলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তবে সংস্কৃত আলংকারিকদের কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ যদি না থাকত এবং মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করবার কোন উপায়ই না থাকত তাহলে মানব সমাজের আর কি থাকত? কোথায় থাকত আজকের বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা বইয়ের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে বলেই আজ তার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের এই ভাবনা ধরে রাখার বহু নিদর্শন আমরা পাই। অ্যাসিরিয়ার কিউনিফর্ম ট্যাবলেট, মিশরীয় প্যাপিরাস, অ্যাজটেক প্রস্তর, মধ্যযুগীয় পার্চমেন্ট এবং ভূর্জপত্রের মধ্যে কত না জ্ঞান বিধৃত হয়ে আছে। বিভিন্ন যুগের এবং পৃথিবীর দূরতম প্রদেশের রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে বই। বলতে গেলে আজকের দুনিয়ায় সর্ববিষয়ে শিক্ষার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে ছাপার অক্ষরের বই এবং পত্র-পত্রিকা।

একটি বিশেষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা যখন একটি জাতি হিসেবে পরিগণিত হই তখন সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন হিসেবে, একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি হিসেবে সেই

জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষ লাভের ব্যাপারে আমাদেরও একটি বিশেষ কর্তব্য থাকে। সমাজের একজন হিসেবে দেশকে আমাদের অনেক কিছু দেবার থাকে; আবার বৃত্তির প্রতিনিধি হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য রয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি। সেই কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হলে আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য—আমাদের চিন্তা-ভাবনা, লেখা, বক্তৃতা বা কর্মোদ্যমকে উন্নত ধরণের করবার জন্যও আমাদের বই পড়ার প্রয়োজন হয়। হয়তো কেবলমাত্র বই পড়েই মহৎ ব্যক্তি হওয়া যায়না, কিন্তু খনির অভ্যন্তরে যেমন সোনা লুকানো থকে তেমনি মানুষের মনের গহন তলে যে সুপ্ত মহৎ প্রবৃত্তি থাকে তাকে হয়তো জাগিয়ে তুলতে পারে একটি বই!

নিছক আনন্দলাভের জন্যই যদি বই পড়া হয় তাকেও নিরুৎসাহ করা উচিত হবেনা। যে কোন বৃত্তির লোকেরই এবং অত্যন্ত কর্মব্যস্ত লোকেরও আনন্দলাভের জন্য বই পড়া প্রয়োজন। বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে বই পড়ার সময় কখনই হবেনা যদি সময় না করে নেওয়া যায়। একজন বৃত্তিকুশলীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে কেবলমাত্র তার নিজের বৃত্তির ওপরে লিখিত বই ছাড়া অন্য কোন বই স্থান পাবেনা একথা ভাবা যায়না। মহাকবি শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যদি ডাক্তারী বই পাওয়া যায় আর বিখ্যাত চিকিৎসকের লাইব্রেরীতে যদি আধুনিক কবিতার সংগ্রহ দেখা যায় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বই পড়ে আনন্দলাভের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠকের নিজের ওপর। কেউ গল্প-উপন্যাস পড়ে আনন্দলাভ করেন আর আইনস্টাইনের মত কেউ কেউ জটিল তত্ত্বের বই পড়ে আনন্দলাভ করেন। প্রতি সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কেউ যদি তার প্রিয় কবির কয়েক লাইন মনে মনে আবৃত্তি করে আনন্দ পান আর সারাদিন সহস্র কাজের মাঝে তার রেশ মনে গুঞ্জন করতে থাকে—তবে সেই পাঠের কোন মূল্য নেই কি করে বলি। ঈশ্বরানুরাগীদের মন্ত্র বা স্তোত্র পাঠের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই। গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতিকে লঘু সাহিত্য বলা হয় এবং আমরা এগুলি প্রধানতঃ আনন্দলাভের জন্যই পড়ে থাকি। কবিতাকে ঠিক লঘু সাহিত্য বলা চলে কিনা আমার জানা নেই। গল্প-উপন্যাস পাঠ করে আমরা মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আস্বাদন করতে পারি আর কবিতা পড়ে আমরা পাই মহৎ প্রেরণা! তবে আনন্দের জন্য পড়া ও বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্য পড়া ঠিক এক কথা নয়। সাংসারিক যন্ত্রনা বা সমস্যা ভুলে থাকতেও আমরা সময় সময় বই পড়ি। বইকে তখন শুধু সময় কাটাবার উপকরণ হিসেবেই দেখা হয় অথবা বই পড়া মানুষকে নেশার মত পেয়ে বসে। যখন ভালমন্দ বাছাবাছি থাকেনা তখন বই হয়তো আমাদের কিছু ক্ষতিও করে। কিন্তু বই পড়ে খুব কম লোকেই অধঃপতিত হয়।

আসলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশিত হয় কম। আবার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে গল্প-উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য শ্রেণীর এবং সিরিয়াস বিষয়ে বই তেমন প্রকাশিত হচ্ছেনা। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে প্রকাশিত মোট বইয়ের সংখ্যা হল ২১,২৬৫। এর ভেতর ১০,৪৩৮টিই ইংরেজী বই। ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রকাশিত মোট বইয়ের সংখ্যা হল ১০,৮২৭। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত

বইগুলির মধ্যে সর্বাধিক (২৬৩৩টি) বই প্রকাশিত হয়েছে হিন্দী ভাষায় ; দ্বিতীয় স্থান মারাঠীর (১৫১৪টি) এবং বাংলাভাষায় প্রকাশিত বইয়ের স্থান হচ্ছে তৃতীয় (১৩০২টি)।

আবার প্রদেশ হিসেবে দেখতে গেলে এই বছরে সর্বাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে দিল্লী থেকে (৫০৪৮টি), দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্রের (৩৫৬৩), তৃতীয় মাদ্রাজ (২৫৬৮) এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ (২৪৫০)।

গত ১৫ বছরে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা ৬% থেকে বেড়ে ২৩·৭% হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষিতের হার অনুযায়ী প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের সপ্তম স্থান। একশ বছর আগে প্রকাশিত লঙ সাহেব প্রণীত বাংলা পুস্তকের তালিকায় দেখা যায় ১৮৫৭ সালে ৩২২টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছিল। আর এক শতাব্দী পরে আজ এই সংখ্যা মাত্র চারগুণের একটু বেশী হয়েছে।

সুতরাং তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে আমরা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারি এবং তখন তার প্রতিকারেও ব্যবস্থা করতে পারি। এখন প্রশ্ন হতে পারে পরিষদের প্রস্তাবিত নমুনা সমীক্ষায় পাঠরুচি ও পাঠস্পৃহা সম্পর্কে সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিনা এবং তা নির্ভরযোগ্য হবে কিনা ! এই সমীক্ষা করা হবে মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। তবু যদি এই প্রশ্নাবলীতে পাঠকের বাসস্থান, জাতি, বয়স, বৃত্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ তিনি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত কোন শ্রেণীর লোক, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, দিনে কয় ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করেন, মাসে গড়ে কখানা করে বই পড়েন, প্রতি দশখানা বইয়ের মধ্যে কখানা কেনেন আর কখানা লাইব্রেরী থেকে নেন, মাসে কত টাকা বইয়ের জন্য খরচ করেন, গত তিন বছরে কি কি বই পড়েছেন, কোন বই সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে, কোন বই ভবিষ্যতে পড়বার ইচ্ছা আছে, কোন শ্রেণীর পুস্তক পাঠে আগ্রহ বেশী, ভাল অথবা মন্দ বই কোনগুলি বলে তার নিজের ধারণা · এই ধরণের প্রশ্নের অন্ততঃ কিছু প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায় তবে কিছু কাজ হবে মনে হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় লাইব্রেরীগুলি বারবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও ফর্ম ফেরৎ পাঠান না। দীর্ঘ সময় পরে যে ফর্মগুলি ফেরৎ এল তাও হয়তো দায়সারা গোছের করে পূরণ করা হল—হয়তো সঠিক তথ্যও অনেক সময়ে দেওয়া হয়না। এইসব গ্রন্থাগারের অধিকাংশই পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্য ; তাদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যে অভাব আছে তা নয়। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে যেরূপ ঢিলেঢালাভাবে কাজকর্ম হয়ে থাকে খানিকটা তার জন্য এবং সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা না থাকায় এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়না। ফলে প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করে যে ফললাভ করা গেল দেখা যায় তা মোটেই নির্ভরযোগ্য হচ্ছেনা। নমুনা সমীক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করি।

Editorial : Trends in reading habits : The proposed sample survey.

পাঠস্পৃহা ও পাঠরুচি ঃ দিগ্‌দর্শন

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে সব কিছুরই ফ্যাসান দেখা যায়। মানুষ নিজের নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ চাহিদা প্রকাশ করে। সব দেশেই প্রায় জামাকাপড়ের একটি ফ্যাসান চালু আছে। এই ফ্যাসান আবার প্রায় কিছুদিন পর পর বদল হয়। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় মেয়েদের গহনারও ফ্যাসান প্রচলিত আছে সর্বদেশে ও সর্বকালে। জনসমাজেও তার ব্যবহারের কিছু না কিছু ফ্যাসান পরিলক্ষিত হয়। প্রতি দেশেই প্রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ফ্যাসানের প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশেই যদি যথাযথ হিসাব রাখা যায় দেখা যাবে যে তাতে ৫০ বছরের ভিতরই লোকমুখে কত বিভিন্ন রকমের গানের প্রচলন ছিল। এক কালে যে গান লোকমুখে অনবরত শোনা যেত কিছু কাল পর আর সে গানের তত প্রচলন দেখা যায় না, অন্য নূতন গান তার স্থান অধিকার করে। ২।১টি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। অতুলপ্রসাদের "বাঁধনা তরীখানি আমার এ নদীকূলে"—এই গান এক সময়ে প্রায় সকলের মুখে মুখে ফিরত। পরবর্তী যুগে আবার ও গান কোথায় মিলিয়ে গেল—কত নূতন গান লোকমুখে ফিরতে লাগলো। "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে" অথবা "শেফালী তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে"—অথবা "হে নটরাজ—প্রলয় নাচন নাচলে যখন"—ইত্যাদি গান বিভিন্ন সময়ে অদ্ভুতভাবে জনমনকে আকৃষ্ট করে আবার লোককর্ণের বাইরে চলে গিয়েছে। আধুনিক কালেও সিনেমার কল্যাণে এই ভাবে কত গান লোকমুখে আসা-যাওয়া করে—তার ইতিহাস সন্ধান করলে বেশ বোঝা যায় সমাজের জনমন কি ভাবে কখন উদ্বেলিত হয়।

এবার সমাজের গ্রন্থাগারের কথায় আসা যাক—প্রতি গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন রকমের পাঠক আসেন তাঁদের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা নিয়ে। গ্রন্থাগারিক যদি এই সব বিভিন্ন প্রকারের চাহিদার প্রতি একটু নজর রাখেন এবং তার পরিসংখ্যান যথাযথ ভাবে রাখা যায় তাহলে প্রতি বৎসরান্তেই বেশ মনোজ্ঞ ছবি পাওয়া যায় জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বা পাঠ রুচির। সামাজিক চিন্তার এটা এক সুন্দর উদাহরণ। প্রতি গ্রন্থাগারকর্মীর প্রতি আমার এই অনুরোধ যেন এই পাঠরুচির একটি পরিসংখ্যান তাঁরা যথাযথ ভাবে রক্ষা করে চলেন; এ থেকে জনসাধারণের পাঠস্পৃহা কোন দিকে যাচ্ছে তার হদিস পাওয়া সহজ হয়। কে কি বই পড়ছেন তারই একটু বিষয়ানুগত বিবরণ রাখা। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পূর্বে এই রূপ পরিসংখ্যান রাখা হত, এখন হয় কিনা জানা নাই, হলেও তার প্রচার দেখা যায় না। বিদেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারের এই সব তথ্যাদির

বিবরণ যথাযথ ভাবে রাখা হয় এবং বাৎসরিক রিপোর্টে তার ব্যবহার করা হয়। এতে স্থানীয় জনসাধারণের মন কী ভাবে কোন বিষয়ে বেশী আকৃষ্ট হয় তা বেশ ভাল ভাবে বোঝা যায়। কয়েকমাস পূর্বে ইংলণ্ডে পুস্তক ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংস্থা Foyles & Foyles এর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরছলে নিম্নলিখিত ছবিটি প্রকাশ পায়। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে পুস্তক বিক্রয় ব্যাপারেও ফ্যাসানের প্রকাশ বেশ পরিলক্ষিত হয়। গত ১০ বছরে জনসাধারণের পুস্তক পাঠস্পৃহা কি ভাবে বা কি খাতে প্রবাহিত হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী Christina Foyles বলেন যে; ঠিক যেমন পোষাক পরিচ্ছদে অথবা স্থাপত্য শিল্পে ফ্যাসানের প্রচলন দেখা যায় অনুরূপ ভাবে পুস্তকের ক্ষেত্রেও ফ্যাসনের চলন পরিলক্ষিত হয়। এই ফ্যাসন প্রায় প্রতি দু'বৎসর অন্তর বদলায়। ইংলণ্ডের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে একযুগে জনসাধারণ রাজারাজড়ার বিষয়ে লিখিত বই পড়তে আগ্রহান্বিত ছিল পরে আবার ঐ আগ্রহ জীবজন্তুদের বিষয়ে পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হয়; আবার কিছুকাল পরে দেখা যায় যে যুদ্ধ নায়ক ও সেনাপতিদের জীবন ও বিবরণ পাঠের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে চলে। উত্তর কালে আবার দেখা যায় যে জনমন অশ্লীল [Pornography] সাহিত্যের পুস্তক পাঠ করতে অতি ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতা চরমে ওঠে লরেন্স সাহেবের 'লেডি চ্যাটারলিজ লাভার' নামক পুস্তকের অশ্লীলতার বিচারে। এই চাহিদা প্রায় ২।৩ বৎসর ধরে চালু থাকে। বর্তমানে দেখা যায় যে জনমন অন্য পথে ধাবমান। ধর্মবিষয়ক পুস্তক, বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ আঙ্গিকে লিখিত পুস্তকের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। শ্রীমতী Foyles তাঁর পুস্তক প্রকাশনের গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বলেন যে আগামীকালে জনসাধারণ বিভিন্ন ভাষাভাষীর জীবন, তথা বিভিন্ন ভাষাভাষীর দৈনন্দিন জীবন চর্যা—যথা ফরাসী, জার্মান ও ডেনিসরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাদের আহার-বিহার ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য আরো উৎসুক হবে এবং ঐ সব বিষয়ে বইয়ের চাহিদা অত্যন্ত বাড়বে। যদিও বহু ইংরাজ ইউরোপ ভ্রমণে যেয়ে স্বচক্ষে ঐ সব দেশের জীবন-প্রণালী দেখে আসেন তথাপি অধিকাংশ ইংরাজই ঘরকুণো এবং পুস্তক পাঠ করে ঐ সব জ্ঞান আহরণে তৎপর হবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

Paperback পুস্তকাদি পড়ে অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীদের নৈতিক অধঃপতন দ্রুততর হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীমতী ফয়েল একমত নন। তিনি বলেন, অল্প বয়স্করা সাধারণতঃ নোংরা বই (dirty books) পড়ে না। ঐ জাতীয় পুস্তকাদি সচরাচর প্রাপ্ত বয়স্করাই বেশী পড়েন এবং তাঁদের নৈতিক অবনতির কথা উত্থাপনের প্রশ্নই উঠতে পারে না কারণ তাঁরা উন্নতি-অবনতির বাইরে। বহু পূর্বেই তাঁদের নৈতিক অবনতি হয়েছে। ওদেশে পুস্তক ব্যবসায়ীরা পুস্তক বিক্রয়ের উপর কোনো censorship আরোপ করেন না। যার যা ইচ্ছা কিনতে পারেন। তবে একথা সত্য যে অনেকে আদিরসাশ্রিত বা অনুরূপ পুস্তকাদি সকলের সমক্ষে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন এবং তাদের জন্য বহু সাদা মলাট মজুত রাখতে হয়, যাতে ঐ জাতীয় পুস্তকাদি ঢেকে রাখার আবরণ রূপে ব্যবহার করা চলে। স্বাধীন দেশে যার যা ইচ্ছা পড়বেন এতে দ্বিরুক্তির কিছু নাই।

আমাদের দেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরা অনুরূপ ভাবে কোনো হিসাব রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না। জাতি হিসাবে আমরা এখনো বহু পশ্চাতে। আমাদের লিখনপঠনক্ষম জনসংখ্যাই অতি সামান্য, পুস্তক প্রকাশনও অনুরূপ ভাবে নগণ্য। তবে আশা করা যায় যথাযথভাবে এগিয়ে চললে একদিন আমাদেরও উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরাও সামগ্রিক ভাবে দেশের ও দশের উন্নতিমূলক পুস্তক প্রকাশনে তৎপর হবেন।

Reading habits : A Survey
by—Subodh Kumar Mukhopadhyay

লেখকের আয়

দিলা মুখোপাধ্যায়

লেখক, তিনি যেমনই হোন, তাঁকে প্রতিদিন খেতে হয় ও ঘুমাতে হয়। সুতরাং লেখককে মানুষ হিসাবে বিচার করলে, তাঁর ব্যবসায় থেকে আয়ের প্রয়োজন—কেবল বই লিখলেই তার পেট ভরে না। কিন্তু বই ছাপার খরচটা লেখকের আয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হ'বে কারণ লেখকের খেয়ে-পরে বাঁচবার মত আয় আর বই ছাপার খরচ এ দুটো এক বস্তু নয়।

লেখকের আয় হ'লো একটা সমস্যা—চিরকেলে সমস্যা। সমাজের প্রয়োজনে লেখকের ও লেখার সৃষ্টি হ'লো সত্যি কথা—বই ছাপার সমস্যারও সমাজ সমাধান করলো সত্যি, কিন্তু লেখক হ'য়ে রইল মন্দিরের আরশুলা—ঝড়তি-পড়তি কুড়িয়েই তাকে বহুদিন বেঁচে থাকতে হ'য়েছে। লেখক সৃষ্টি করে সত্যি কিন্তু তার বস্তু বিক্রি করে অন্যে হয় ধনবান। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করবেন না, বাস্তব অবস্থাটা একটু ভালো না হ'লে সাহিত্যসৃষ্টি কঠিন হ'য়ে পড়ে। "সাহিত্যেরও উদর আছে"—এটা বড় বাজে কথা নয়।

পয়সার জন্যে স্যারভান্তেস (Cervantes) নভেল লেখা সুরু করলেন। Walter Scott তার ব্যবসায় যাতে লালবাতি না জলে সেই জন্যে নভেল লেখা সুরু করেন। কেবল যাঁরা কবিতা লেখেন বা নাটক লিখে জীবন যাত্রা সহজ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের দুরবস্থার বর্ণনা দেবার ভাষা হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবুও সে যুগের (অর্থাৎ Copyright আইন হ'বার আগের যুগের) লেখকেরা বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কি ভাবে?

লেখকেরা দুভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে: ১। লেখকের প্রাপ্য Royalty ২। অপরের সাহায্য।

Royalty-র কথাটা আমরা পরে বলবো। আগেকার যুগে কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান লেখক যাতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করতো কিন্তু পরিবর্তে লেখককে সাহিত্যসৃষ্টি করতে হত। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব কোন দেশেই নেই সুতরাং উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আগেকার যুগে জনসাধারণের বইয়ের প্রয়োজন ছিলনা—সমাজের মধ্যে ধন সঞ্চিত হ'তো কয়েক জনের হাতে, কৃষ্টি ছিল কয়েক জনের সম্পত্তি সুতরাং লেখকের খুসীমত বই লেখা হ'লে তা থেকে লেখকের আয়ও হ'তো না, সে বইয়ের জন্মও হ'তো না। সুতরাং লেখককে লিখতে হ'তো সমাজের অন্তর্গত কয়েক ব্যক্তির মুখ চেয়ে তাদের রুচি অনুযায়ী করে। সুতরাং সে যুগে রাজারাজড়াদের পরগাছা হ'য়ে লেখকগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকতে হ'তো। বেশীদিন আগের কথা নয়; সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য প্রায়

এভাবেই গড়ে উঠেছিল। চতুর্দশ লুই না থাকলে সে সময়কার ফরাসী সাহিত্য যে গড়ে উঠত না একথা সত্যি। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা ভারসাম্য এল, বই ছাপার পন্থা আবিস্কৃত হ'লো ; ফলে বই তখন জনসাধারণের সম্পত্তি হ'লো। কৃষ্টি যখন আর কয়েকজনের সম্পত্তি হ'য়ে রইল না, তখনই কেবল লেখকের অবস্থার পরিবর্তন হলো, তবে লেখকের এ অবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলো না। রাষ্ট্র এদিক থেকে এখন রাজারাজড়াদের স্থান গ্রহণ করেছে। লেখকের এ অবস্থাকে ইংরাজী ভাষায় বলে Mecenas। এ কথাটির উৎপত্তি হ'চ্ছে গ্রীক ধনিক Mecenus-এর নাম থেকে। Mecenus ছিলেন Augustus-এর বন্ধু এবং Horace-এর রক্ষক (protector)। Mecenas এবং লেখকের মধ্যে অনেক সময় থাকতেন দালালেরা। লেখকের পক্ষে যখন সরাসরি ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হতো না তখন দালালের মধ্যস্থতায় লেখককে কার্যোদ্ধার করতে হ'তো।

মিশরীয় লেখক Taha Hussain বলেন, "তোষামোদি থেকে Mecenas এর উৎপত্তি একথা সত্য, কিন্তু সমাজের মধ্যে একটি স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে রেশারেশির ফলেও যে Mecenas-এর উৎপত্তি হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায়না"।

আধুনিক সভ্যতার চোখে কিন্তু Mecenas-কে একটি নীতিমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না কারণ এ প্রতিষ্ঠান হ'লো অত্যাচারী প্রতিষ্ঠান। অসাধু ব্যবসাদারী হ'লো এ প্রতিষ্ঠানের কাজ। লেখক এই ব্যবসাদারদের কাছ থেকে অর্থ পায় এবং সে তা খরচ করে এবং অর্থের পরিবর্তে ব্যবসাদারেরা লেখকের কাছ থেকে যে বস্তু পায় তা তারা খরচ করেনা।

এমন লেখক বড় একটা দেখা যায় না যার লেখা ছাড়া আর কোন ব্যবসা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে লেখকেরা নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে থাকেন এবং লেখকের এ অবস্থাকে Auto-Mecenas বলা যেতে পারে। Aristotle ছিলেন Alexander-এর গুরু, Bacon ছিলেন ইংলণ্ডের রাজকর্মচারী, Chateaubriand ছিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত, Byron ছিলেন "A gentleman who writes", Voltaire ছিলেন ব্যবসাদার, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার, নীহার গুপ্ত ডাক্তার।

লেখকের মূল কাজ হওয়া প্রয়োজন সাহিত্য সৃষ্টি ; তার ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং তার কল্পনা ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যমুখী হওয়া দরকার। তা না হলে তার সৃষ্টি Socio-professional হ'য়ে যেতে পারে অর্থাৎ তার সাহিত্যসৃষ্টির ধারা একদিকেই বইতে থাকে, লেখারও বিশেষ গভীরতা থাকে না। তার মূল ব্যবসার বাইরের যা অভিজ্ঞতা লেখকের তা অর্জন করা সম্ভব হয়না। ব্যবসায়গত জীবন ব্যতীত লেখকের যে ব্যক্তিগত একটা জীবন আছে লেখক তা উপলব্ধি করতে পারেনা।

সত্যিকারের লেখকের জন্ম হয় সম্ভবতঃ ১৭৫৫ সালে। এই সময়ে Samuel Johnson Lord Chesterfield-কে, তার অভিধান সমাপ্ত করবার জন্যে সাহায্য চেয়ে বিফলমনোরথ হওয়ায় "পত্র লেখেন। তিনি লেখেন, "মহাশয়, সাত বছর ধরে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থী

হ'য়ে বার বার বিমুখ হ'তে হ'য়েছে। বার বার বিমুখ হ'য়েও আমি আমার কাজ করে গেছি কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন উৎসাহ পাইনি, কেউ আমাকে সাহায্য করেনি"। এই পত্র থেকে বোঝা যায় Johnson-ই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় লেখাকে ব্যবসা করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন।

১৭০৯ সালে লেখকের স্বত্ব রক্ষা করবার জন্যে Statute of Queen Anne নামে একটি আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই আইন নামেই আইন, আসলে প্রকাশকদের হাত থেকে লেখকদের রক্ষা করবার কোন উপায় ছিলনা। পুস্তকের ব্যবসা যখন সত্যিকারের ব্যবসা হ'য়ে দাঁড়াল অর্থাৎ লেখকের স্বত্বই যখন পুস্তক ব্যবসায়ের ভিত্তি হ'য়ে দাঁড়াল তখনই কেবল লেখকের স্বত্ব রক্ষা করা সম্ভব হ'লো। এটা হ'লো ১৮দশ শতাব্দীর কথা।

লেখকের স্বত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্য হ'লো লেখকের নিজস্ব সৃষ্টির উপর যে অধিকার সেই অধিকারকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রক্ষা করা। এরূপ একটি আইনের প্রয়োজন তার কারণ লেখকের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলে তা লেখকের হাত ছাড়া হ'য়ে যায়, তা হ'য়ে যায় সাধারণের সম্পত্তি। আমেরিকায় লেখকের স্বত্ব বজায় থাকে ২৮ বছর এবং তা আর একবার নতুন করে নেওয়া যায়। পর্তুগালে এই সত্ব লেখকের চিরকাল বর্তমান থাকে এবং বহুদেশে লেখকের মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর এই সত্ব বজায় থাকে! এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখক তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে।

এই আইন আন্তর্জাতিক হয় প্রথম Berne-এ ১৮৮৬ সালে। ১৯৫৬ সালে এই আইন পরিমার্জিত হয়। ৪৩টি দেশ এই আইন মেনে নিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক আইন ব্যতীত বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আইন আছে। আমেরিকায় ১৮৮৯ সালে Montevideo Convention প্রবর্তিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে UNESCO লেখকের স্বত্ব রক্ষা করবার ভার নেয়। ১৯৫৫ সালে একটি আইন প্রবর্তিত হয় এবং ৪০টি দেশ এই আইন মেনে নেয়। এই আইন কিন্তু Berne Convention-এর স্থলাভিষিক্ত হয়নি।

সাহিত্যসৃষ্টির উপর Copyright আইনের প্রভাব কিরূপ তা বেশ বোঝা যায় ১৯শ শতাব্দীর আমেরিকার সাহিত্য বিচার করে দেখলে। সে সময়ে আমেরিকার প্রকাশকদের ইংলণ্ডে প্রকাশিত ইংরাজী বই ছাপতে কোন বাধা ছিল না ফলে তারা যত কিছু ভালো ইংরাজী বই আমেরিকায় প্রকাশ করত এবং আমেরিকার লেখকেরা অবহেলিত হ'তো। আমেরিকায় পুস্তকের পরিবর্তে নানা ধরণের পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকল এবং লেখকেরা পত্রিকার উপযুক্ত করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকল। ঠিক এই কারণে আমেরিকায় পত্রিকার প্রচলন বেশী এবং সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম দিকে সৃষ্টি হয়েছিল ছোটগল্প।

লেখকের সত্ব বজায় রাখবার জন্য আইন করা হ'লো বটে কিন্তু সেই সত্ব ভোগ করবার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। চুরি করে (Pirated) বই ছাপার জন্যে বহু মোকদ্দমা হ'তে থাকল।

লেখক সাধারণতঃ তার সত্ব উপভোগ করে দুটি উপায়ে। নির্ধারিত অর্থ নিয়ে লেখক হয় প্রকাশককে তার সত্ব বিক্রি করে দেয়; না হয় যত কপি পুস্তক বিক্রি হয় তার মূল্যের উপর শতকরা কিছু টাকা লেখক পেয়ে থাকে। এই অর্থ সাধারণতঃ ধার্য হয় শতকরা ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১২½ টাকা এবং খুব বেশী চলবে এমন বইয়ের জন্যে শত করা ১৫ টাকা। সময়ে সময়ে প্রকাশক লেখককে কিছু টাকা আগাম দিয়ে থাকে।

বেতার ও Television-এর উন্নতির ফলে এবং নানা ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে অনুবাদ ও adaptation-এর খুব বেশী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে পুস্তকের উপর যে সত্ব তা লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে। কিন্তু লেখকের এই সত্ব রক্ষা করবার আইন যতই হ'ক বহু ক্ষেত্রে লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে লেখকই ফাঁকে পড়ে। সুতরাং লেখার ব্যবসা যে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসা তা মনে করা ভুল। প্রকাশক লেখককে যদি ফাঁকি নাও দেয় তা হ'লেও মাসে ২ খানি উপন্যাস লিখে ও লেখক এমন কিছু একটা আয় করতে পারে না যার দ্বারা সে মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে।

লেখকের সত্ব রক্ষা করবার জন্যে এখন নানা ধরণের সংঘের সৃষ্টি হ'য়েছে। ফ্রান্সে: Societe des Gens de Lettres ও Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ইংলণ্ডে: Incorporated Society of Authors, Playwrights and Composers (১৮৮৪) আমেরিকায়: The Authors' League of America (১৯১২)।

উপস্থিত লেখকরা যে অবস্থার মধ্যে রয়েছে সে অবস্থায় লেখকদের সাহিত্য রচনাকে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। অবশ্য এমন কয়েকজন লেখক আছে যাদের বই খুব বেশী চলে এবং যাদের বই সিনেমায় ওঠে তাদের পক্ষে লেখাকে ব্যবসা হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব নয়। বেশীর ভাগ লেখককেই অন্য কোন কাজ করতে হয়। অনেক সময়ে মাইনে করা লেখক হিসাবে তারা সাংবাদিকতার কাজ করতে পারে, না হয় কোন প্রকাশকের দপ্তরে proof-reader বা উপদেষ্টা কিংবা অনুবাদক হিসাবে কাজ করতে পারে, আর না হয় তাদের খুব নিচে নেমে America-র pot-boilers-দের মত বই লিখতে হয় অর্থাৎ কদর্য রুচিপূর্ণ উপন্যাস, রহস্য-উপন্যাস, বা ডিটেকটিভ-উপন্যাস লিখতে হয়। আমেরিকায় এ ধরণের লেখার প্রাচুর্য দেখে অবাক হ'তে হয়। এই ধরণের বইয়ের লেখকেরা সমাজে কোন কালেই স্থান পায়না, যদিও আমেরিকার পাঠক সমাজের দশ-ভাগের-নয়-ভাগ এই ধরণের বই পাঠ করেই তাদের পাঠলিপ্সা চরিতার্থ করে।

The Income of Writers
by Dila Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

["সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে, কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোট হয়—দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই-চারিজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।"]

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিরক্ষরতা দূরীকরণ দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষা এক নয়। ভারতবর্ষের জনগণ নিরক্ষর হলেও তারা অশিক্ষিত নয়। এ দেশের শিক্ষাধারা মূলতঃ শ্রুতি-স্মৃতি বাহিত। সাধারণভাবে আমরা জানি, এদেশে ইংরেজ আগমন এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন শিক্ষাধারাকে সেই পূর্বপথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

বর্তমান যুগের পটভূমিকায় একথা অনুভূত হচ্ছে যে শ্রোত্রকেন্দ্রীক শিক্ষাধারা আর পর্যাপ্ত নয়। কারণ, আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন। শিক্ষা এখন ব্যক্তির সখ বা সাধনার বস্তু নয়। বর্তমান গতিশীল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হলে শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এবং শিক্ষা অন্নরাশ্রয়ী না হলে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির চিন্তাভাবনার আদান প্রদানও সম্ভবপর নয়। জনজীবনের স্বাভাবিক জটিলতা, গতি ও সময়ের মূল্যবৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে আজ বোঝা যাচ্ছে অক্ষরই প্রধান মাধ্যম যার দ্বারা শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয়। রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা ইত্যাদি, শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হলেও অক্ষর-জ্ঞানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

অক্ষরজ্ঞানের অভাবই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা—সে কথা ধরে নিয়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের যে কোন ভূমিকা আছে, একথা স্বীকারেও অনেকেই নারাজ। তাঁদের যুক্তি—গ্রন্থাগারের আদর্শ শিক্ষাবিস্তার নয়। শিক্ষিত যাঁরা হয়েছেন বা হওয়ার পথে, তাঁদের সব রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়াই গ্রন্থাগারের কাজ। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আছেন সরকার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অক্ষর পরিচয়ের দায়িত্ব চিরকালই শিক্ষকদের। গ্রন্থাগার তো স্কুলের কাজ করতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের আদর্শ ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগারের কার্যসীমানাকে ব্যপ্ত করলেই এ-কাজ তার আওতায় আসবে। মনীষী রঙ্গনাথনও

বলেছেন, গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। এর কর্মপদ্ধতির ক্রমপরিণতি থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্যও বিবর্তিত হবে। গ্রন্থাগারকে যদি একটি গতিশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়, তাহলে সমাজোন্নতি সাধনে তার দায়িত্ব অস্বীকৃত হতে পারে না।

গ্রন্থাগার তার নিজের অস্তিত্বকে জনমানসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই একাজে অগ্রসর হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সব মানুষেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় এ বোধ জাগানোর জন্যও গ্রন্থাগারগুলির নিরক্ষরতা দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেখানে আজও শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক অক্ষরজ্ঞানহীন, সেখানে গ্রন্থাগারকে তার নিজেরই উন্নতির জন্য এধরণের-সমাজ সেবামূলক কাজে অগ্রসর হতে হবে।

অনেকে বলবেন, আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া গেলেও রূপায়ণের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা চলে না। এমনিতেই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মী নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, পুস্তক সংগ্রহ বাড়ানো যাচ্ছে না, নিয়মিত কোন প্রদর্শনী বা পাঠচক্রের আয়োজনও সম্ভব হচ্ছে না, তার উপর আবার নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ যে একেবারে বোঝার উপর শাকের আঁটি।

অর্থসমস্যা শুধু এক্ষেত্রেই নয়, আমাদের মত দারিদ্র্যজর্জরিত, জনসংখ্যা-প্রপীড়িত দেশে যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রেই তা বাধাস্বরূপ। তাবলে সব কাজই অকৃত থাকবে—এ কোন যুক্তি নয়। সীমিত সাধ্যের দ্বারা প্রয়োজনকে কীভাবে মেটানো যায়, সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

গ্রন্থাগারের এ দায়িত্ব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করেছেন সরকার। কিন্তু সরকারী শ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল খুব আশাপ্রদ হয়নি যে, তার প্রমাণ সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পশ্চিম বাংলার শতকরা ২৪ জন সাক্ষর ছিল। '৬১ সালের সেন্সাসে সেটা বেড়ে ২৯.৪ হয়েছে বটে, কিন্তু এই দশবছরে জনসংখ্যা এরাজ্যে শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। এমন কি সাম্প্রতিক কালের যোজনা কমিশনের Programme Evaluation Organisation গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে যে তথ্য দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে, গ্রামের শিশুদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ এখনও বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি; এবং যে সব গ্রামের লোক সংখ্যা ৫০০ কিংবা তারও নীচে সেখানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নি। ১৬টি নির্বাচিত জেলায় এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। সুতরাং সরকারের ভরসায় বসে না থেকে জনসাধারণকে একাজে নামতে হবে। সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাধ্যমত এতে অংশ গ্রহণ করা দরকার। গ্রন্থাগার প্রত্যক্ষভাবে তার মূল কর্তব্য—যারা গ্রন্থাগার ব্যবহারে সমর্থ তাদের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা দান করবে। তার কর্মক্ষেত্রের পশ্চাৎপট হিসেবে পরোক্ষভাবে, যাতে আরও বেশী সংখ্যক লোক গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে পারে, তার জন্য একটু সময় ও শক্তি ব্যয় করবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভাব্য কয়েকটি রূপ ও রীতি ঃ—

(ক) যেহেতু গ্রামাঞ্চলে সমস্যার আকার তীব্র, সেখানে গ্রাম্য-গ্রন্থাগারকে এগিয়ে আসতে হবে। সেখানকার নিরক্ষরতা শুধু শিশুদের সমস্যা নয়, বয়স্ক যারা খেটে খাওয়া মানুষ তারাও নিরক্ষর। সুতরাং তাদের সাক্ষর করাতে হলে, গ্রন্থাগারকে চণ্ডীমণ্ডপের জায়গা নিতে হবে। লোকে যেখানে স্বেচ্ছায় অবসর বিনোদনের তাগিদে আসবে। বাঁধা স্কুলের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে এদের লেখাপড়া শেখানো যাবে না। কিছু গল্প, কিছু আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মনকে আকৃষ্ট করতে হবে।

গ্রাম-গ্রন্থাগারের কর্মী নিজ এলাকার স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এ কাজ করাতে সচেষ্ট হবেন। তবে সব কিছুই যেন তাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। গ্রাম জীবনের বারব্রত মেলা, চাষ-আবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুহলী করে ধীরে ধীরে পঠন-পাঠনে এগোতে হবে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে সচেতন করাতে না পারলে তারা অক্ষর পরিচয়ের কষ্ট স্বীকারে রাজী হবে না।

(খ) পূর্বেই বলেছি গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি হবে পরোক্ষ। অর্থাৎ সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে অ, আ, ক, খ, শেখানো নয়, যাতে তারা শিখতে চায় এমন আগ্রহ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে প্রদর্শনী, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সহায়তা করতে পারে। শুধু শ্রবণ নয়, কারণ শ্রবণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরবর্তী শিক্ষণের আকাঙ্খা নষ্ট হয়ে যায়। দর্শন দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে। ছবি দেখে তারা যদি বোঝে যে ছবি অংশমাত্র, মূল বক্তব্য লিখিত আছে, তাহলে তারা অক্ষর চেনায় আগ্রহী হবে।

(গ) বলা বাহুল্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সদ্য স্বাক্ষরদের জন্য রচিত পুস্তক রাখবে। অর্থাৎ ছবি দেখিয়ে শুধু মনের ক্ষুধা জাগানোতেই কর্তব্য শেষ নয়, তার আহার্যের যোগাড় রাখতে হবে। বয়স্ক সদ্যস্বাক্ষরদের ক্ষেত্রে, বইগুলি বিশেষভাবে যেন তাদের জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কিত বই হয়। অর্থাৎ চাষী জানতে চাইবে কিভাবে জমির আরও উৎকর্ষ সাধন করা যায়, তাকে হয়ত অন্য কোন গল্পের বই আকৃষ্ট করতে নাও পারে।

(ঘ) অর্থ এবং কর্মীসংখ্যা সীমিত বলে কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটি গ্রন্থাগার যদি নিজ এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এ কাজে অগ্রসর হন তবে ক্রমে তা সম্ভব হবে। প্রথমে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ কাজকে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'ই বলবেন। তাঁদের এ কাজে প্ররোচিত করতে পারেন গ্রন্থাগার কর্মীরা। যাঁরা প্রতিদিন বই লেন-দেনের জন্য আসেন, তাঁদের মধ্যে থেকে উৎসাহী একদল কর্মী গড়ে নেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া প্রায় প্রতি এলাকায় একদল উৎসাহী যুবক দেখা যায় যাঁদের উৎসাহ এবং কর্মক্ষমতা কোন সৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত হবার অভাবে বছরে কয়েকটি জন্মজয়ন্তী পালন, ধর্মঘটের মিছিল বার করা ইত্যাদিতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁদের যদি এ ধরণের

সমাজ-সেবামূলক কাজে নিযুক্ত করা যায়, তাহলে কর্মী সমস্যার সমাধান হতে পারে। যাঁরা এ ধরণের কাজে অগ্রণী হবেন, গ্রন্থাগারগুলি তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে—এটুকু পরোক্ষ কাজও গ্রন্থাগার করতে পারে।

(ঙ) স্থান সমস্যার সমাধানের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি রয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, রাত্রিবেলায় স্বচ্ছন্দে সেখানে নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন।

(চ) যেহেতু নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলাই দায়িত্ব—সেহেতু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরও ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয় ছুটি থাকাকালীন উচ্চতর বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা এ কাজ করাতে পারেন।

(ছ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নেমেছেন। খুবই আনন্দের কথা। গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক দ্বারা তাঁদের সক্রিয় সাহায্য করতে পারে। যে সব গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা নেই তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেন।

(জ) গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা এ কাজে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শুধু গ্রন্থ পরিগ্রহণ, তার বর্গীকরণ বা গ্রন্থাগার পরিচালনাতেই সবটুকু জোর দেওয়া হয়ে থাকে। দক্ষ কর্মী হতে হলে এগুলোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর চিনিয়ে হতে ধরে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যাওয়াও সামাজিক কর্তব্য। গ্রন্থাগারের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যাঁরা পরিচালনা করবেন, এটুকু সমাজসেবা তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিই করবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলির যে সুস্পষ্ট ভূমিকা আছে—এ কথা Library Advisory Cmmittee-ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। শিশুদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাবিধি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে যে বিপুল অংশ বয়স্ক নিরক্ষর, তাদের সাক্ষর করার জন্য যদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় না হয়, তাহলে দেশের বর্তমান বৈষয়িক উন্নতি ও সামাজিক সমতায় যে সমস্যা তার কোন সুষ্ঠু সমাধান হবে না।

Eradication of illiteracy and the libraries
by Krishna Bandopadhyay

যন্ত্র-প্রযুক্তি-বিদ্যার (Mechanical Engineering) পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

1.	Air resistance	বায়ু প্রতিরোধ
2.	Angle ring	কোণ বলয়
3.	Annulus	বলয়িকা, মণ্ডলাকার, অঙ্গুরীয়াকার
4.	Anti-clock wise	বামাবর্ত
5.	Aperture	ছিদ্র
6.	Hole	গহ্বর, বিবর, গর্ত,
7.	Orifice	রন্ধ্র
8.	Auxiliary valve	সহায়ক ভালভ্
9.	Baffle plate	বিফল প্লেট, বাধাপ্রদ প্লেট
10.	Balancing	সন্তোলন
11.	Balance cylinder	সন্তোলন বেলন
12.	Blow off valve or Blow off cock	ফুৎকার ভালভ্
13.	Brake thermal efficiency	গতি রোধক তাপ দক্ষতা
14.	Brake whell	গতি রোধক চক্র
15.	Brine	লবণাক্ত জল, নোনা জল
16.	Buoyancy	প্লবতা, ভাসনশীলতা, প্লাবিতা
17.	Burnish	বার্ণিশ, চমকানো
18.	Bush	আস্তিন
19.	Butt strap	ঠোক্কর ফেটা
20.	By-pass	উপমার্গ, উপপথ, এড়ানো
21.	Carrying wheels	বহন চক্র
22.	Caulking	ঠেসে বোজানো, ককিং
23.	Caulking ring	ককিং বলয়
24.	Centrifugal pump	কেন্দ্রাতিগ পাম্প ও অপকেন্দ্রিক পাম্প
25.	Charge	ভরণ
26.	Cistern	চৌবাচ্ছা বা কুণ্ড
27.	Circumferential joint	পরিধীয় জোড়

28.	Circumferential seam	পরিধীয় সীবন
29.	Clearance space collar	অন্তর স্থান চুড়ি
30.	Compounding	সংযোজন
31.	Condensing engine	ঘনীভবন ইঞ্জিন, সঙ্কোচনী ইঞ্জিন
32.	Conical seat	শঙ্কুতল
33.	Constant	স্থিরাঙ্ক, ধ্রুবাঙ্ক
34.	Constant pressure	স্থির চাপ
35,	Constant volume	স্থির আয়তন
36.	Contour	সমোচ্চ রেখা
37.	Cooling water	শীতক বারি
38.	Corrosion	ক্ষারণ, মরিচা
39.	Corrugations	পাল তোলা, লহর তোলা, ঢেউ তোলা
40.	Corrugated	ঢেউ তোলা
41.	Cotter	কটার
42.	Coupled wheels	যুগ্ম চক্র, সংযুক্ত চক্র, সংযুক্ত
43.	Cover	আবরণ, ঢাকা
44.	Cross compound engine	সমকোণ-যৌগিক ইঞ্জিন
45.	Cross-section	প্রতিচ্ছেদ
46	Cubic feet	ঘন ফুট
47.	Damper	বাতাস নিয়ন্ত্রক, প্রবাত নিয়মন
48.	Delayed exposion	বিলম্বিত বিস্ফোরণ
49.	Delivery pipe	প্রেরক নল, বহন নল, বিতরণ নল
50.	Design	পরিকল্পনা, অভিপ্রায়
51.	Dimension	পরিমাপ, পরিমাণ
52.	Discharge	স্রাব, ক্ষরণ, নিস্তারণ, ভারমোচন
53.	Disc valve	চাকৃতি ভালভ্
54.	Double acting	দ্বিক্রিয়, যুগ্ম-ক্রিয়াশীল, দ্বৈতক্রিয়াশীল
55.	Downtake	অধোগামী, অধোবাহী
56.	Drain header	নিকাসী হেডার
57.	Drain pipe	নিকাসী নালা
58.	Driving wheel	চালন চক্র
59.	Dry pipe	শুষ্ক নালী
60.	Duration of trial	পরীক্ষাকাল, অন্বেষিতকাল, সমীক্ষাসময়
61.	Earthenware	মৃৎ বস্তু, মৃণ্ময়, মৃত্তিকাজাত বস্তু

62.	Effective diameter	কার্যকরী ব্যাস
63.	End plate	প্রান্ত প্লেট
64.	Front end plate	সম্মুখ প্লেট, অগ্রস্থিত প্লেট
65.	Back end plate	পশ্চাৎ প্লেট
66.	Erosion	অবক্ষয়, ক্ষয়, উপক্ষয়
67.	Excessive air	অতি বায়ু
68.	Exhaustive test	পূর্ণ পরীক্ষা, নিঃশেষিত পরীক্ষা
59.	Expansion, apparent	আপাত প্রসারণ, প্রতীয়মান প্রসারণ
70.	Expansion co-efficient	প্রসারণ গুণাঙ্ক
71.	Expansion, cubical	আয়তন প্রসারণ, ঘন প্রসারণ
72.	Expansion linear	রৈখিক প্রসারণ
73.	Expansion real	বাস্তবিক প্রসারণ, প্রকৃত প্রসারণ
74.	Expansion superficial	তল প্রসারণ; বাহ্যিক প্রসারণ
75.	Explosions	বিস্ফোরণ
76.	Explosive mixture	বিস্ফোরক মিশ্রণ
77.	Eye bolt	নেত্র বোল্ট
78.	Ferrule	ফেরুল
79.	Fire box	বহ্নি কক্ষ, অগ্নি প্রকোষ্ঠ, অগ্নিবাক্স
80.	Inner box	ভিতরের বাক্স, অন্তস্থিত বাক্স
81.	Outer box	বাহিরের বাক্স, বহিঃ বাক্স
82.	Flange	ফ্ল্যাঞ্জ, ফ্ল্যান্জ
83.	Flat seat	সমতল আসন
84.	Float	প্লব
85.	Float gauge	প্লবমান
86.	Foundation ring	ভিত্তি বলয়
87.	Four wheeled bogie	চতুশ্চক্র গাড়ী
88.	Frame	কাঠামো
89.	Fullering	ফুলারিং
90.	Fulcrum	অবলম্বন
91.	Furnace crown	চুল্লী-শির, চুল্লী-মূর্ধা
92.	Gib	জিব্
93.	Gib headed	জিব্‌শীর্ষ
94.	Glass tube	কাচের নল, কাঁচনলিকা
95.	Grid	গ্রিড

96.	Grit	কাঁকর
97.	Gritty	কাঁকুরে
98.	Guards	রক্ষক, রক্ষী, প্রহরী চৌকিদার
99.	Gudgeon pin	গজন পীন
100.	Gun metal	তোপধাতু, পিতলজাতীয় ধাতু
101.	Gutter	নালী, নর্দমা, গা-নল
102.	Hand wheel	হাত চাকা, হস্তচক্র
103.	Header	হেডার
104.	Heat converted	পরিবর্তিত তাপ
105.	Heat equivalent	তুল্য তাপ
106.	Heat rejected	ত্যক্ত তাপ
107.	Heat supplied	প্রদত্ত তাপ
108.	Heat unaccounted for	গণনাবহির্ভূত তাপ, আলেখ্য তাপ. অজ্ঞেয় তাপ
109.	Hemispherical valve	অর্ধগোল ভালভ্
110.	Hermetically sealed	সংমুদ্রিত, নির্বাত বদ্ধ
111.	High speed engine	দ্রুত গতি ইঞ্জিন
112.	High pressure cylinder	উচ্চচাপ সিলিণ্ডার
113.	Hollow column	শূণ্যগর্ভ স্তম্ভ, ফাঁপা থাম
114.	Horizontal engine	অনুভূমিক ইঞ্জিন
115.	Hydraulic press	উদক চাপ যন্ত্র
116.	Ideal diagram	আদর্শ রেখাঙ্কণ, আদর্শ রেখাচিত্র
117.	Idle cycle	নিষ্কর্ম চক্র
118.	Independent feed pump	স্বতন্ত্র ভরণ পাম্প
119.	Inspectors standard guage	নিরীক্ষকের নির্দিষ্ট মাপদণ্ড
120.	Inter-change	বিনিময়, আদান-প্রদান
121.	Intermediate cylinder	মধ্যস্থিত সিলিণ্ডার, অন্তস্থ সিলিণ্ডার

Terminology of Mechanical Engineering (in Bengali)
by Sudhananda Chattopadhyay

গ্রন্থ সমালোচনা

উত্তরসূরী ও বারো বছরের বাংলা কবিতা*

সুধীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' এর পর বাংলা দেশে লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে 'উত্তরসূরী' একটি বিশিষ্ট নাম। সম্পাদনকর্মে অরুণ ভট্টাচার্যের মতো কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথের পর এদেশে আর দেখা যায়নি। কবিতা, সংগীত, শিল্পকলা ও সমালোচনার মুখপত্র হিসেবে গত বারো বছর ধরে 'উত্তরসূরী' বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে অপরিসীম অভিনন্দন লাভ করেছে। কেননা প্রথম সংখ্যা থেকেই 'উত্তরসূরী' আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে উন্নততর রুচি, বিচারবুদ্ধি ও চরিত্রের এক অপূর্ব অখণ্ডতা নিয়ে। অর্থাৎ, তার মানে এই নয় যে 'উত্তরসূরী'র প্রতিটি সংখ্যাই 'লা তাব্‌ল্‌ রঁন্দ্‌' বা 'লা লিকরন্‌' - এর মতো; তবে এর প্রতিটি সংখ্যাতেই প্রাজ্ঞ প্রসাধনের পরিচ্ছন্নতা বর্তমান। এবং যা নিঃসন্দেহেই লিটল ম্যাগাজিনের অপরিহার্য অংগ।

এই জোলো দেশের আবহাওয়ায় নিছক কবিতার পত্রিকা প্রকাশের পথিকৃৎ, এক বিদগ্ধ কবি ও সমালোচক আজ থেকে ঠিক বারো বছর আগে লিটল ম্যাগাজিনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন :

'লিটল ম্যাগাজিন : বললেই বোঝা গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনও ছোঁবে না, নগদ মূল্যে বড়বাজারে বিকোবে না, কিন্তু—হয়তো—কোন একদিন এর একটি পুরোনো সংখ্যার জন্য গুণীসমাজে ঔৎসুক্য জেগে উঠবে। সেটা সম্ভব হবে এই জন্যেই যে এটি কখনো মন যোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিলো। চেয়েছিলো নতুন সুরে নতুন কথা বলতে; কোন এক সন্ধিক্ষণে যখন গতানুগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিলো— নিন্দা, নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত হয় নি। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা—এইটেই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম।'

'উত্তরসূরী' লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম কতটুকু পালন করেছে ও করবে তার যথার্থ মূল্যায়ন আপাতত ভাবীকালের গবেষকদের হাতে ন্যস্ত করছি। তবে, এই বারো বছরে 'উত্তরসূরী' যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ সৌষম্য ও এক অখণ্ড আদর্শ স্থাপনে সমর্থ হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবেই বলা যায়, এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিকে শুধুমাত্র সাম্প্রতিক বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়; পাশ্চাত্যের যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর

---

*উত্তরসূরী ॥ সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য। ১২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা; বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। ১বি/৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য—২৲।

সাহিত্যপত্রেরই এটি সমতুল্য। এবং এই সত্য ভাষণে এদেশের কিছুসংখ্যক উৎকট উঁচকপালবাদীও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। বস্তুতঃ কবিতাপ্রিয় পাঠকদের কাছে 'উত্তরসূরী'র আকর্ষণটি অনিবার্য; কারণ কবিতা নির্বাচনের এমন সুনিপুণ সংহতি এদেশের অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বিরল।

ফলতঃ 'উত্তরসূরী'র এবারের সংখ্যাটি মহার্ঘ, কাব্যচিন্তায় আস্থাশীল, সহৃদয় পাঠকদের কাছে এক পরম আকর্ষণীয় বস্তু। দীর্ঘ বারো বছর 'উত্তরসূরী'-তে যে-সব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি থেকে বাছাই করে এটিকে একটি কাব্য-সংকলনের আকারে সম্পাদক মহাশয় আমাদের উপহার দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে তরুণতম কবি গণেশ বসু পর্যন্ত উননব্বুই জন কবি ও প্রায় দুশো কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। অনেক দিন আগে পড়া কবিতাগুলি আবার যেন এক নতুন রূপ নিয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু নতুন লাগা নয়, কাব্যপ্রিয় পাঠকদের কাছে গত বারো বছরে বাংলা কবিতার ধারাটিও এ সংকলনে স্পষ্টতর হবে। প্রসঙ্গতঃ সম্পাদক মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত, মূল্যবান ভূমিকাটিতে জানিয়েছেন :

'এ কথা মনে করিয়ে দিই, এই সংকলন কোন কবির প্রতিনিধিত্ব বিচারের মাপকাঠি নয়, বাংলা কবিতার নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে কিছুটা বোঝবার জন্যই এই প্রয়াস।'

পরিশেষে পুনরায় 'উত্তরসূরী'-র সম্পাদককে তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা, দুর্মর অনুরাগ ও সর্বোপরি নির্ভেজাল রুচির জন্য কবিতাপ্রিয় পাঠকদের তরফ থেকে তারিফ জানিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র ভাষ্য শেষ করছি। —**সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়**

অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস॥ জীবনতারা হালদার প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ। ১৯৬৫। প্রকাশক : যতীন্দ্রনাথ শেঠ, ২২।১।১এ, সুধীর চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪০ পয়সা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনুশীলন সমিতির অবদান কম নয়। বাংলা দেশের যে সব সংগঠন ও গুপ্ত সমিতি মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সহিংস বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতি তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি একদিকে যেমন দেশের ভাবলোকে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিলেন, তেমনি সেই অগ্নিযুগে বিপ্লববাদেই বাংলার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। গ্রন্থকার অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে এই বিপ্লব প্রচেষ্টার শরিক হয়েছিলেন। তাঁর রচনা এদিক থেকে মূল্যবান। তাছাড়া বইটি সুলিখিতও বটে। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। (নি. মু.)

রহড়া জিলা গ্রন্থাগার পরিচালিত লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্সের ফলাফল—১৯৬৫

ডিস্টিংশনে উত্তীর্ণ

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
১	রাজেন্দ্রনাথ মাইতি	৪	অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫	ভদ্রেশ্বর মণ্ডল	৭	হরিপদ মজুমদার
৮	সুশীলকুমার মণ্ডল	১০	বরেন্দ্রনাথ কুলভী
১৭	কান্তি চট্টোপাধ্যায়	২২	আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
২	অরবিন্দ ঘোষ	৩	রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়	৯	রমেশচন্দ্র দেবনাথ
১১	গৌরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	১২	সরোজকুমার লাহা
১৩	গুরুপদ মণ্ডল	১৪	মন্মথ নাথ দাস
১৫	নিশাকর চৌধুরী	১৮	সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯	মধুসূদন ঘোষ	২০	জীবনকৃষ্ণ সরকার
২১	সুকুমার সরকার	২৩	বেণীমাধব প্রামাণিক

'গ্রন্থাগার'-এর পুরানো সংখ্যা চাই

ত্রৈমাসিক পর্যায়ের (১৩৫৮-১৩৬২) 'গ্রন্থাগার'-এর প্রতিটি সংখ্যা ও মাসিক পর্যায়ের ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৭ ও ১৩৬৮ সালের 'গ্রন্থাগার' 'পাঠাগার', এবং 'Bengal Library Association Bulletin' নামে পরিষদের ইংরেজী বুলেটিনের সবগুলি সংখ্যা ক্রয় করা হবে অথবা দান হিসেবে গৃহীত হবে।

গ্রন্থাগারের পুরানো সংখ্যা চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের সদস্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৮ সালের 'গ্রন্থাগার'-এর অধিকাংশ সংখ্যা পরিষদকে দান করবেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাহলেও পরিষদ অফিসে ৫।৬ কপি অতিরিক্ত খণ্ড সংগ্রহ করে রাখার জন্য আমরা আবার পরিষদের—মুখপত্রগুলির পুরানো সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

পরিষদ গ্রন্থাগারে সম্প্রতি দান হিসাবে গৃহীত কয়েকটি পুস্তক

Author	Title	Donated by
Bengal Library Association	Report of the working of the association 1933-34 & 1935	T. C. Datta
Dewan Ram Prakash	Directory of Booksellers & Publishers 1963	Author
Library of Congress	Filing rules of the Library of Congress	L. C. (Exchange)
	Annual report of the Library of Congress for the Fiscal year ending June 30, 1963.	do
	Rules for the descriptive Cataloging in the Library of Congress	do
	Catalging rules of the ALA and the Library of Congress : additions and changes 1949-58	do
	The Catalging in source experiment	do
India. National Library	Index translationum indicarum	National Library
Maulana Salahuddin Ahmed	Reading habits of men in West Pakistan	UNESCO
	Reading habits of women in West Pakistan	do
	Vocabularium bibliothecarii (Supplement)	do
American Library Association	Studying the Community	USIS
	Student use of libraries	do
	Standards for school libraries programme	do
	Standards for library factions at state levels	do
	Public library Service ; a guide to evaluation with minimum standard	do
	Costs of public library services 1963	do

Author		Title	Donated by
		Access to public libraries	USIS
		Civil service and libraries	do
		Library furniture and equipment	do
Public Lib. Asson.		Interim standards for small public libraries	do
ALA Commissions of Enquiry	:	Libraries in Canada : a study of library conditions and needs	do
Oliver Garceau		The Public library in the political process ; 2nd ed.	do
		Educational motion pictures and libraries	do
		Joint conference proceedings, American Library—Canadian Library Associations, June 1960	do
Marie A Toser	:	Library manual, 5th ed. 1955	do
Ella V. Aldrich	:	Using books and libraries 4th ed. (5 copies)	do
Jean Key Gates	:	Guide to the use of books and libraries	do
S L Wallace,	:	Promotion cf ideas for public libraries	do
P. B. Cory, and V. F. Myer,	:	Co-operative film services in Public libraries	do
H. T. Geer,	:	Changing Systems	do
Grosvenor Dawe	:	Melvil Dewey : Seer, Inspirer ; Doer.	Dr. S. Vann
Viswanath Dinkar Narwane	:	Bharatiya Byabaharkosh	Author
Swami Vivekananda	;	Swami Vivekanander Bani-O-Rachana Vol I—X	D.P.I. West Bengal

Books recently presented and placed in the Association's Library

বার্তা বিচিত্রা

সিমলায় 'ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডি'র উদ্বোধন

গত ২০শে অক্টোবর সিমলায় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষণ আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি'র উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হিউম্যানিটিজ-এর বিভিন্ন শাখা - দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের উচ্চতর পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ চালাবে বলে জানা গেছে।

বৃটিশ কাউন্সিল গত তিন বছরে ৩০০০ পাউণ্ড মূল্যের (৪০,০০০ টাকা) ৪৭৬ খানা বই ইনস্টিটিউটকে দান করেছেন এবং এই উপলক্ষে বইগুলির একটি প্রদর্শনী হয়। এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএম, সি, চাগলা এবং বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি মিঃ ডব্লউ, এইচ আর্লে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র : দিস্ ইজ বৃটেন (১লা নভেম্বর)

ভারতের প্রথম চলমান বিজ্ঞান সংগ্রহশালার উদ্বোধন

গত ১৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভারতের প্রথম চলমান বিজ্ঞান সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার উদ্যোগে এই নতুন সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। যাতে সাধারণ অক্ষর-পরিচয়-জ্ঞান-সম্পন্ন লোকও এই প্রদর্শনী দেখে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারে সেজন্য প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি সরল বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রদর্শনী ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত নরেন্দ্রপুরে চালু থাকবার কথা। এর পরে প্রদর্শনীটিকে বেলুড়, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও হুগলীতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সূত্র : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো : গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া (১৭।১১।৬৫)

লণ্ডনে কমনওয়েলথ-এর পুস্তকের প্রদর্শনী

সম্প্রতি লণ্ডনে "কমনওয়েলথ ইন বুকস্" প্রদর্শনীতে ১০০০ বই প্রদর্শিত হয়। এতে ভারত থেকে ৫০টি বই স্থান লাভ করেছিল। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তিনটি প্রদর্শনীর মধ্যে এটি বৃহত্তম। প্রদর্শিত বইগুলিকে ৭টি বিভাগে ভাগ করা হয়—সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সাহায্য, কমনওয়েলথের গাছ-পালা, কমনওয়েলথ-এর শিল্পকলা, কমনওয়েলথের রেফারেন্স বই এবং গ্রন্থপঞ্জী।

সূত্র : দিস ইজ বৃটেন, ১লা নভেম্বর

সদ্য সাক্ষরদের জন্য পুস্তক পুরস্কৃত

চতুর্থ ইউনেস্কো প্রতিযোগিতায় সদ্য সাক্ষরদের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ১৭টি পুস্তক নির্বাচিত হয়েছে। পুস্তকগুলির লেখকগণ প্রত্যেকে ১০০০৲ টাকা করে পুরস্কার

পাবেন। ২টি আসামী, গুজরাটি ২টি, হিন্দী ৫টি, কানাড়া ১টি, মালয়ালম ১টি, মারাঠী ১টি, পাঞ্জাবী ১টি, তামিল ১টি, তেলেগু ১টি, উর্দু ১টি এবং ১টি বাংলা বই এই পুরস্কার পেয়েছে।

বাংলা বইটি হচ্ছে 'ভারত আমার' এবং এর লেখক হচ্ছেন শ্রীঅমর নাথ রায়।

সূত্র : টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ৭ই নভেম্বর

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কয়েকটি সর্বভারতীয় সম্মেলন

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদ্বৎ পরিষদ ইত্যাদির সম্মেলন, আলোচনা-চক্র ও সভা সমিতির বেশির ভাগই এদেশে শীতের মরসুমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বৎসরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আমরা ইতিপূর্বেই এই ধরণের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম। ডিসেম্বরের ১৩ই থেকে ১৮ই ভারতীয় মানক সংস্থার (ISI) নবম সম্মেলন এবং ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারের (DRTC) তৃতীয় বার্ষিক সেমিনার বাঙ্গালোরে প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের ষষ্ঠ সম্মেলন আগামী ২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিবান্দ্রমে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। কেরালার রাজ্যপাল শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সামুয়েল মাথাই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন পরিকল্পনা কমিশনের (শিক্ষা) সদস্য ডঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের সচিব শ্রীপি, এন, কৃপাল সম্মেলনের উদ্বোধক বিশেষ অতিথি হবেন। নয়াদিল্লীর ইনসডক-এর অধিকর্তা শ্রীবি, এস, কেশবন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন।

তত্ত্ববিদ্যা সমিতির সম্মেলন

২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের অন্তর্গত আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির ৯০তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর ৬০টি দেশে এই সোসাইটির সদস্য আছেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর এলাহাবাদের ইয়্যুং খ্রীস্ট্রীয়ান কলেজ প্রাঙ্গনে ৪০তম নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদ

আগামী জানুয়ারী (১৯৬৬) মাসের ৩রা থেকে ৯ই পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিষদের ৫৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন

২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর বরোদায় ৪১তম নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন ভারতীয় চিকিৎসকদের জাতীয় পরিষদ 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিষদ ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয়।

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর)

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রেস-সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টা (Chief Press Adviser) নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি ইতিপূর্বে সংবাদপত্রসমূহের রেজিস্ট্রারের পদে কাজ করছিলেন। বর্তমানে তিনি উক্ত দুই পদেই বহাল থাকবেন। 'যাযাবর' এই ছদ্মনামে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করে তিনি সাহিত্যজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া (২৭শে অক্টোবর)

স্বল্প মূল্যের পাঠ্য পুস্তকের প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতা ওয়াই, এম, সি, এ, (YMCA)-তে 'ইন্দো-আমেরিকান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্কস প্রোগ্রাম'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রায় ৩০০ স্বল্প মূল্যের পাঠ্য-পুস্তকের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী শ্রীভবতোষ দত্ত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন, এই ধরণের পুস্তক প্রকাশের ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের খুব উপকার হবে।

সূত্র : অমৃতবাজার পত্রিকা (৪ঠা ডিসেম্বর)

কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে

'গ্রন্থাগার'-এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল যে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যখানির জন্য কবিকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু পরে জানা গেল এই পুরস্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি। আসলে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ ১৯২০ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মের জন্য একলক্ষ টাকার যে পুরস্কারটি দেবেন তার জন্য যে কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রতি-যোগিতা চলেছে তার মধ্যে কবি নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যখানি আছে।

গত ১০ই ডিসেম্বর রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন জানান, কবির চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার কবিকে সরকারীভাবে কোন টাকাকড়ি দেন না। তবে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাধীন তহবিল থেকে কবিকে একশত টাকা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিকে প্রতিমাসে দুইশ টাকা দেন। কবিকে পাকিস্তান সরকার প্রতিমাসে তিনশ পঞ্চাশ টাকা ভাতা দেন। সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯৬৫

॥ দ্বারহাট্টা—হুগলী ॥

হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমূহের আহ্বানে আগামী ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনি ও রবিবার হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথের হরিপাল ষ্টেশন থেকে এই স্থানটি পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের গ্রন্থাগারিক নয়াদিল্লীর শ্রীনারায়ন চন্দ্র চক্রবর্তী। News notes

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

জাতীয় গ্রন্থাগার। বেলভেডিয়ার। কলিকাতা-২৭

গত ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঁশিয়ে জ্যাঁ দারিদ জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই, এম, মূলের হাতে ৫৪ খানি নির্বাচিত ফরাসী পুস্তক উপহার দেন। অনুষ্ঠানে ফরাসী রাষ্ট্রদূত বাংলা ও ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভেরসাইয়ে একশতটি সনেট রচনা করেন। উভয় দেশের সম্পর্কের এটাই সূত্রপাত। তাঁর একটি সনেট ভিক্টর ইউগোর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ভেরসাইকে তিনি অমরাবতী বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর কবিতায় লা ফঁত্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে এক ভারতীয় প্রতিভা কিভাবে আত্মস্থ করেছিলেন তার এক আশ্চর্য নিদর্শন বর্তমান শতাব্দীতে ৺প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনায় পাওয়া গেছে।

এই অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ, শ্রীগোপাল হালদার, লেডী রাণু মুখার্জী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে ফরাসী ও ফরাসী থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত পুস্তকের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়েছিল।

২৪ পরগণা

ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির। ভাটপাড়া

গত ২০শে জুন ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দিরের (সাধারণ গ্রন্থাগার) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বশ্রী শ্রীজীব ন্যায়রত্ন সভাপতি, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য কার্যকরী সভাপতি, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সহঃ-সভাপতি, সুধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদক, অশেষ কুমার ভট্টাচার্য ও মদনমোহন রায় সহঃ সম্পাদক, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারিক, প্রণব কুমার ভট্টাচার্য কোষাধ্যক্ষ এবং অপর ১০ ব্যক্তিকে নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

বর্ধমান

এম, এ, এম, সি, ষ্টাফ ক্লাব। দুর্গাপুর।

বিশ্বকর্মানগর ·দুর্গাপুরে মাত্র কয়েকখানা বই নিয়ে এই ক্লাবের গ্রন্থাগার বিভাগটির কাজ সুরু হয় গত বছরের গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগারে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী পুস্তকের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী হয়েছে। গ্রন্থাগারের অবৈতনিক পাঠককে বিভিন্ন

ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা সাতশতেরও অধিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত গ্রন্থাগারের কাজ চলে এবং প্রতিদিন ৪।৫ জন কর্মী বিনা পারিশ্রমিকে গ্রন্থাগারের কাজ করে থাকেন। কর্তৃপক্ষের এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা গ্রন্থাগারটিকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে ১৪ই নভেম্বর তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্ব-শিশু-দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন বিকেল ৪টেয় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বিদ্যালয়, হ্যামিণ্টন হাই স্কুল, সান্তনাময়ী গার্লস হাই স্কুল, টাউন স্কুল, শিশু-মেলা এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় প্রায় পাঁচশত শিশুকে নিয়ে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, শিশু সমাবেশ, সভা, আবৃত্তি, গল্প, নেহেরুর জীবনাদর্শ আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশুরা ছাড়াও ঐ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দুজন শিশু ছাত্র সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে এবং তারা সুচারু-রূপে সভার কার্য সম্পন্ন করে। গত বৎসরে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের অধিকারীদের ৪৭টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেলা-গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত সকল শিশুকে নেহেরুজীর আদর্শে নিজেদের চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করেন। রাজকুমারী সান্তনাময়ী বিদ্যালয়ের নার্সারী বিভাগের শিশু ছাত্র শ্রীমান পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্যের "আমাদের বাংলা দেশ" (সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত) ও "লিটল ষ্টার" ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি এবং স্থানীয় রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী বিথীকা দেবীর জওহরলালের জীবনী-আলোচনা বিশেষ আকর্ষনীয় হয়। সভার সভাপতি শ্রীমান অমিতাভ জানাও তার সুন্দর ভাষণে সকলকে মোহিত করে। এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরুর জীবন আলেখ্য ও শিশুদের উপযোগী পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনী ১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু ছিল।

হাওড়া

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। হাওড়া

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে পরলোকগত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পাঠাগার ভবনে গত ১৪ই থেকে ১৬ই নভেম্বর তিনদিনব্যাপী শিশু ও কিশোরদের উপযোগী এক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রত্যহ বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ৭-৩০টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকত। প্রতিদিন প্রদর্শনীতে আগত শিশুদের মধ্যে

দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হত। ১৫ই নভম্বর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের সহযোগিতায় শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই তিন দিনে বহুসংখ্যক শিশু, কিশোর ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী দেখে গেছেন।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। ত্রিবেণী।

পাঠাগারের গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় গত ৭ই নভেম্বর পাঠাগারের এক বিশেষ সাধারণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গঠনতন্ত্রের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন করা হয়। শিশুশ্রেণীর সভ্যদের জন্য অতঃপর বিনাচাঁদায় পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পূর্বে এদের মাসিক ১৫ পয়সা করে চাঁদা দিতে হত। অবশ্য সভ্যপদের জন্য এদের এক টাকা জমা রাখতে হবে। এছাড়া ২য় শ্রেণীর সভ্যগণকে অধিকতর সুবিধা দানের উদ্দেশ্য ১০৲ টাকা অবধি মূল্যের বই দেওয়া এবং ১০৲ টাকা-উর্ধ্ব মূল্যের বইয়ের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ টাকা জমা রাখার এক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেবলমাত্র ১২ মাসের স্থায়ী সদস্যরাই ভোটদানের অধিকারী হবেন এবং ১৮ মাসের স্থায়ী সদস্যগণ নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন বলে অপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল যে, ভোটাধিকারী হবার জন্য নির্বাচনের দিন থেকে একাদিক্রমে তিনমাস পর্যন্ত সভ্য থাকতে হবে এবং নির্বাচন প্রার্থী হবার জন্য একাদিক্রমে ১২ মাসের সভ্য হতে হবে।

গত ১লা ডিসেম্বর সমিতির পাঠাগারে সর্বভারতীয় সামাজিক শিক্ষাদিবস পালন করা হয়। শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি ছাড়াও পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বশ্রী নীলমণি মোদক, নিমাইচাঁদ নাথ, অসীম কুমার বিশ্বাস, সুনীল চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁদের ভাষণে সামাজিক শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

'গ্রন্থাগার দিবস'-এর সংবাদ

'গ্রন্থাগার'-এর পরবর্তী সংখ্যার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সংবাদ বিশেষ সংবাদ হিসেবে ছাপা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবিলম্বে এই সংবাদ পাঠাতে অনুরোধ করি। —সঃ গ্রঃ

পরিষদ কথা

পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে শ্রীবি, আই, পামার (B, I. Palmer)

গত ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪টায় ৩৩নং হুজুরীমল লেনে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে ব্রিটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষা-প্রাধিকারিক শ্রীআই, বি, পামারকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু নবীন ও প্রবীণ গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে শ্রীযুত পামার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পরিষদ কার্যালয়ে কাটান। বাংলা দেশের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা তথা এই রাজ্যের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পক্ষান্তরে ব্রিটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বহু তথ্য জানান। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই, এম, মুলে, 'ইউ, এস, আই, এস'-এর শ্রীমতী গ্রেস বান্‌কার, বৃটিশ কাউন্সিলের শ্রীম্যাকেঞ্জী স্মিথ, ও গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রমলা মজুমদার, সর্বশ্রী প্রমীল চন্দ্র বসু নিখিলরঞ্জন রায়, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত পামার পরিষদ প্রকাশিত লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের সংখ্যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন, স্বাধীনতার পূর্বে তিনি যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি এখানকার একটি মাত্র গ্রন্থাগারই পরিদর্শন করেছিলেন এবং তা হচ্ছে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী।

কি করে সভ্য বৃদ্ধি করা যায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিষদের সম্ভাব্য সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। তিনি বলেন, এতে বেশ সুফল পাওয়া যায়। ২৮ বৎসর পূর্বে লণ্ডন লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৫০ জন; বর্তমানে এই সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার প্রসঙ্গে তিনি বলেন লণ্ডন লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন তার সদস্যদের কম মাইনে হলে চাকুরী গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেন এবং সভ্যরা এই নির্দেশ দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাছাড়া ওদেশে গ্রন্থাগারিক বা কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেকার থাকতে হয়না। কিন্তু ভারতে তীব্র বেকার সমস্যা বর্তমান; এখানকার পরিষদ সদস্যদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব হবেনা। শ্রীযুত পামার জানান বৃটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন সরাসরি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করেন না; কিন্তু কাউন্টি লাইব্রেরীয়ানদের আর একটি অ্যাসোসিয়শন তা করে থাকেন।

বৃত্তির মান সম্পর্কে এখানে কোন সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা তিনি জানতে চান। ওদেশে গ্রন্থাগারিক-বিনিময় এবং ইন্টার্ণশিপের ব্যবস্থা আছে। লিভারপুল পাবলিক লাইব্রেরী প্রতি বছর একজন 'ইন্টার্ণ গ্রহণ করেন।

ভালো বই প্রকাশের জন্য বৃটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিশেন পুস্তক প্রকাশকদের মেডেলও দিয়ে থাকেন। বৃটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কেবলমাত্র পরীক্ষাই গ্রহণ করে থাকেন, শিক্ষা দান করেন না।

'কমনওয়েলথের দেশগুলি থেকে আগত ব্রিটেনে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের কোন পার্থক্য করা হয় কিনা'—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত পামার জানান কোনরূপ পার্থক্য নেই।

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য

পরিষদের কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য এবং পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের (সার্ট-লিব-কোর্স) শিক্ষক শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য বাঙ্গালোরের ডকুমেণ্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারের (DRTC) সিনিয়র লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীভট্টাচার্য দীর্ঘকালব্যাপী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, স্কটিশ চার্চ কলেজ, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন।

পরিষদের অন্যতম উৎসাহী কর্মী ও শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের সহধর্মিনী শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্যও একই সঙ্গে 'ডি, আর, টি, সি'র গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্য 'সাহা ইনস্টীটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর গ্রন্থাগারে কাজ করছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীমতী ভট্টাচার্যের কর্মজীবনে সাফল্যের সংবাদে আমরা যেমন আনন্দলাভ করেছি তেমনি পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী এই দম্পতিকে হারিয়ে পরিষদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে দুঃখিত হচ্ছি। প্রায় এক বৎসরকাল আগে আর এক গ্রন্থাগারিক দম্পতি শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী অশোকা দাশগুপ্ত (ধর) যখন দিল্লী চলে গেলেন তখনও আমরা অনুরূপভাবেই দুঃখিত হয়েছিলাম! কিন্তু বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বানে আমাদের সহকর্মীদের প্রায়ই এইরূপ একস্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হবে।

সান্ত্বনার কথা এই যে, নতুন কর্মস্থলেও এঁরা নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত থাকবেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে বরাবর যুক্ত থেকে আমাদের সহকর্মী, সহধর্মী ও সহগামীরূপেই কাজ করে যাবেন।

শ্রীগোবিন্দলাল রায় ও শ্রীজগদীশ সাহা

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্দলাল রায় ও শ্রীজগদীশ সাহা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন। এঁরা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ পদে নিযুক্ত হলেন। শ্রীগোবিন্দলাল রায় পরিষদের একজন কাউন্সিল সদস্য ও পরিষদ পরিচালিত

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ বিভাগের (সার্ট-লিব্-কোর্স) শিক্ষক। তিনি ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পাশ করেন এবং ১৯৫৫ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে ঢোকেন। ১৯৬০ সালে তিনি এম, এ পাশ করেন। এছাড়া হিন্দী ও ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। শ্রীরায়ের জন্ম ১৯২৩ সালে। শ্রীজগদীশ সাহা পূর্বে বেথুন কলেজ ও মহাকরণ গ্রন্থাগারে ছিলেন। কলকাতায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রীসাহা এর অন্যতম সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

॥ বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—দ্বারহাট্টা, হুগলী ॥

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে হুগলীর অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীঅজিত কুমার ঘোড়ই-এর সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। চন্দননগরের মহকুমা শাসক, হুগলীর জেলা সমাজশিক্ষা অধিকর্তা, জেলা পরিদর্শক, জেলা গ্রন্থাগারিক (চুঁচুড়া); হরিপাল, সিঙ্গুর ও তারকেশ্বরের ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারগণ এই সমিতির সহঃ-সভাপতি এবং দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিশনের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন কর্ম স্বচারুরূপে সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে প্রচার ও কর্মসূচী নির্ধারক, আবাস ও স্বাচ্ছন্দবিধান, রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার, হিসাব ও অর্থ, মণ্ডপসজ্জা, যানবাহন ও পরিভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, দপ্তর, অর্থ সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি বারটি উপসমিতি গঠিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৯ | ১৩৭২, পৌষ

॥ সম্পাদকীয় ॥

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রতিনিধিবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় সমবেত হবেন। স্বভাবতঃই এই সম্মেলনে পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যগণ এবং পরিষদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গই অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়ে থাকেন। তবে বেশ কিছু সংখ্যক এমন প্রতিনিধিও থাকেন যাঁরা পরিষদের সদস্য নন বা পরিষদের সঙ্গে কোনরূপেই যুক্ত নন। এঁরা আসেন হয়তো কেউ পরিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কেউ হয়তো গ্রন্থাগার বা গ্রন্থদরদী বলে, আর বেশীরভাগই পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য 'জনপরিচালিত' গ্রন্থাগারের সঙ্গে হয়তো কোন না কোন ভাবে যুক্ত বলে। অবশ্য পরিষদের সদস্য নন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ গ্রন্থাগার প্রভৃতির কিছু কিছু কর্মীও সম্মেলনে যোগদান করে থাকেন দেখা গেছে।

কয়েক মাস পূর্বেও দেশে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাতে এ বৎসর এ ভাবে আমরা আমাদের বার্ষিক সম্মেলনে আবার মিলিত হতে পারব এ আশা ছিল না। যদিও আমরা সংকট উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি কিন্তু তার অশুভ ছায়া একেবারে অপসারিত হয়েছে একথা জোর করে বলা যায় না। তবু যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এতে সকলেই আনন্দিত হবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেমন এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তেমনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেরও এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখন যেমন প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের এক একটি জেলায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরাবরই কিন্তু তেমনটি হয়নি। ১৯৫৩ সালে আচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শান্তিপুরে যে সপ্তম গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল তারপর থেকে শ্যামপুরের উনবিংশ সম্মেলন পর্যন্ত প্রতিবছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগের সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে

অনিয়মিতভাবে। ১৯২৫ সালে প্রথম নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকেই নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহঃ-সভাপতিগণ হলেন মিঃ ভ্যান ম্যানেন, তুলসীচরণ গোস্বামী, সরলা দেবী চৌধুরাণী ও কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং সুশীল কুমার ঘোষ সম্পাদক হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির গণনায় পূর্বের তিনটি সম্মেলনকে বাদ দিয়ে গণনা করা হয়। নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ ৬ বৎসরকাল সক্রিয় ছিল। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হবার পর বঙ্গীয় পরিষদকে পুনর্জীবিত করা হয় এবং নাম রাখা হয় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'। ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগষ্ট পরিষদের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে কয়েকবার এই গঠনতন্ত্র সংশোধনও করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সালে কলকাতার আশুতোষ হলে অবিভক্ত বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী (মরহুম) জনাব ফজলুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলনকেই এখন প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বলে ধরা হয়। ঐ সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং সম্পাদক তিনকড়ি দত্ত। ১৯৩৭ সালের পরে এই সম্মেলনগুলি যথাক্রমে ১৯৩৮, ১৯৪১, ১৯৪৪, ১৯৪৬, এবং ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মদাতা হুগলী জেলা -এই জেলা বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকগণের তীর্থ ক্ষেত্র। দ্বারহট্টের আগামী বিংশ সম্মেলন হবে হুগলী জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১৯৪১ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় শ্রীযুক্ত বি, আর, সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ খুব কম সংখ্যক লোকের স্মৃতিতেই পঁচিশ বছর আগেকার সেই সম্মেলনের কথা জাগরুকরয়েছে। ঐ সম্মেলনের বছরে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল সেও আজ ২৫ বছরের যুবকে পরিণত হয়েছে। যে সব যুবক ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাঁরা এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত হয়েছেন; আর এঁদের ভেতর যাঁরা ছিলেন অধিকতর পরিণত বয়স্ক তারা বৃদ্ধদশায় উপনীত হয়েছেন; আর অনেকে ইহধামই ত্যাগ করেছেন। তবু যদি কেউ দুই সম্মেলনেরই প্রত্যক্ষদর্শী হন তাঁর পক্ষে একাল ও সেকালের হুগলী জেলার দুই সম্মেলনের তুলনা করে দেখা হয়তো সম্ভব হবে।

বর্তমানে অনেকের ধারণা, এইরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের খুব বেশী সার্থকতা নেই। বৃত্তি-কুশলীদের সম্মেলন যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত বর্তমানের সম্মেলনগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না। সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ নতুন স্থানে গিয়ে স্থানীয় দৃশ্য দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, বৃত্তিমূলক সমস্যাগুলি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে আলোচনার উপযুক্ত আবহাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। তাই অনেকের মতে জেলায় জেলায় না হয়ে এ ধরণের সম্মেলন যদি কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয় তবে তা উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক সম্মেলনগুলির দুটি দিক থাকে : (১) এর সামাজিক দিক অর্থাৎ পরস্পর মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরিষদের জনসংযোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা (২) এর বৈজ্ঞানিক দিক অর্থাৎ বৃত্তিগত প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে সমস্যাবলীর আলোচনা করা। সম্মেলনের সার্থকতার বিচারের সময় মনে রাখতে হবে যে এই দুটি দিকেরই সমান প্রয়োজনীয়তা আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় আহ্বান করার রীতি যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন এবং সে সময়ে যে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন একথা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। তাছাড়া গোড়ার দিকের সম্মেলনগুলি কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাহলে পরবর্তীকালে এগুলি বিভিন্ন জেলায় করার প্রয়োজন কেন হল? কলকাতায় সম্মেলন হলেই সেই সম্মেলন উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে বলে যাঁদের ধারণা তাঁদের কাছে শুধু একটি জিজ্ঞাসা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভাতো কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু কতজন প্রতি বৎসর এতে উপস্থিত হয়ে থাকেন? যুক্তি হিসেবে অনেকে বলতে পারেন কমসংখ্যক লোক হলেও এই লোকগুলি যথার্থ গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার থেকে প্রতি বৎসরই সম্মেলনে যে জনসমাগম হয় তার চেহারা আলাদা। আমরা কি নতুন নতুন লোকের ভেতর গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণী ছড়িয়ে দিতে চাই না? সম্মেলন প্রতি বছর যদি কলকাতাতেই হয় তবে তার চেয়ে নীরস এবং একঘেয়ে জিনিস বোধ হয় আর কিছু হতে পারেনা। তাছাড়া জনসংযোগের কথা বিচার করলেও বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

অনেকের মতে আবার বর্তমানের সম্মেলনগুলির অধিকাংশই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হচ্ছে বলে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছেনা। যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন প্রতি বছর এক এক জেলায় অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এই সম্মেলন থেকে স্থানীয় জনসাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন—সম্মেলনের সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কিনা এ সম্বন্ধে এঁরা সংশয় প্রকাশ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে এখন যেমন সম্মেলনগুলি প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরাবরই এটি তেমন হয়নি এবং একথাও সত্যি যে এখন সরকারী সহযোগিতায় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা সহজসাধ্য হয়েছে বরাবর এটি তেমন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলনা। গ্রন্থাগার ব্যাপারে আগ্রহী লোকের সংখ্যা এক একটি সম্মেলনের পরে হু হু করে বেড়ে যাবে এরূপ আশা করা বাতুলতা। প্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগও নয়। আমাদের দেশে তো শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই শতকরা তিরিশেরও কম। সুতরাং আমাদের এরূপ একটি মোহ থাকা উচিত হবেনা যে এই সব সম্মেলনে স্থানীয় জনসাধারণের বিরাট অংশ এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেবে। প্রতি জেলায় সম্মেলন কালে যদি কিছু সংখ্যক লোককেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমর্থকরূপে পাওয়া যায় তবে সেটাই পরিষদের লাভ।

আমাদের দেশের বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যোৎসাহী হলেও সাধারণভাবে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। স্বাধীনতার পরেও যে দেশের সকল স্থান হতে পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অপসৃত হয়েছে একথা জোর করে বলা যায় না। দেশে একদিকে সামগ্রিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত না হলে এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা কল্পনা করা যায়না। এদিক থেকে স্বাধীনতার পরে দেশে গ্রন্থাগার বিস্তারের সরকারী পরিকল্পনা নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কিভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়ে অবশ্য পরিষদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করে পরিষদ ইতিপূর্বে প্রস্তাবাদিও পাশ করেছেন। তাছাড়া গ্রন্থাগারিকগণের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নে, সমাজ শিক্ষা অধিকারের শাখা হিসেবে জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে, জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নিঃশুল্ক করার প্রশ্নে, জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালন কমিটিতে গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করার প্রশ্নে, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য, বিশেষ করে জন-পরিচালিত গ্রন্থাগার ও সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এবং আরো অনেক বিষয়ে সরকার ও গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও আছে। কিন্তু তাই বলে সরকারের সঙ্গে পরিষদের সহযোগিতার ক্ষেত্র কোথাও একেবারেই নেই একথা মনে করলে ভুল করা হবে। সম্মেলনে শুধু সরকারের সমালোচনা করেই পরিষদের কর্তব্য শেষ হয় না। পরিষদ আশা করেন যে, বাংলা দেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। অনেকের ধারণা, পরিষদের গৃহনির্মাণের জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করেছেন বলে পরিষদ তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা হারিয়েছেন। সরকার যে শুধু গৃহনির্মাণের ব্যাপারেই অর্থসাহায্য করেছেন তাই নয়, পরিষদের অনেক কর্মপ্রচেষ্টাকেই যেমন, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রভৃতির জন্য পরিষদকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এতে বরং সরকার তাঁর কর্তব্যই পালন করেছেন যদি তা না করতেন বা এ ব্যাপারে সরকার উদাসীন হতেন তাহলেই বরং ক্ষোভের কারণ ঘটত।

বর্তমানে প্রতীচ্যের অগ্রসর দেশগুলিতে একক এবং বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারের পরিবর্তে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। আমাদের দেশেও যে একটি কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ—'পশ্চিম বঙ্গের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' আশা করি উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গেই আলোচিত হবে। এরই সঙ্গে অন্য আলোচ্য বিষয় রয়েছে 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার'—তাও কম গুরুত্ব পূর্ণ নয়। প্রতি বৎসর সম্মেলনে আমরা এরূপ গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যারই আলোচনা করি এবং আমাদের বাৎসরিক কাজকর্মেরও হিসেব-নিকেশ করে থাকি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময়

করেন। এর কোনই মূল্য নেই এ কথা বলা চলেনা। তবে আমাদের সম্মেলন যেমন ঢিলেঢালা এবং অগোছাল ভাবে হয়ে থাকে তাকে চেষ্টা করলে সুশৃঙ্খল এবং আরও কার্যোপযোগী করে তোলা যায় কিনা একথা ভাবতে হবে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এক একটা সম্মেলন করে কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করেই যদি আমরা নিশ্চিন্ত থাকি তবে সম্মেলনের সার্থকতা খুবই কম একথা স্বীকার করতেই হয়।

প্রতিটি সম্মেলনে পূর্ববর্তী সম্মেলনের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। পূর্ববর্তী সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংখ্যা কিরূপ ছিল, কত প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের ভেতর কতজন পরিষদের সদস্য এবং কতজন নন, কতজন দর্শক ছিলেন, কতজন অতিথি এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছিলেন, কতজন সহযোগী পরিষদগুলির (associate members) সদস্য ছিলেন, কতজন বক্তা বক্তৃতা করেছিলেন, সম্মেলনের কয়টি অধিবেশন হয়েছিল এবং এই অধিবেশনগুলিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কত, কতজন প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, কতগুলি প্রদর্শনী হয়েছিল এবং অন্যান্য তথ্য আমরা যদি তুলনা মূলক ভাবে বিচার করে দেখি তবে বোধ হয় ভাল হয়—এটা সম্ভব না হলে সম্মেলনের পরে এই সব তথ্যও যদি সঠিকভাবে পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশ করা হয় তবে অনেক কাজ হয়।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত অধ্যাপক নির্মল বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়েছিলাম। এ বৎসর আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একজন সর্বভারতীয় নেতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে সভাপতিরূপে পাব। তিনি যে তাঁর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারশক্তি দিয়ে এই সম্মেলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ফ্যাসান ও পাঠরুচি

দিলা মুখোপাধ্যায়

জন্তুর অন্তর নেই, তার আছে বাহির—সে চিরকালই "অন্য"। তার নিজের ঘর নেই, তার ভিতর বলতে কিছু নেই। ধরা যাক, জন্তু তার চারপাশকে ভুলল—ধরা যাক, সে তার বাহিরকে অগ্রাহ্য করল। তা হ'লে তার আর কোথাও যাবার স্থান থাকে না, তার নিজের কোন ঘর নেই, যা পৃথিবী থেকে ভিন্ন। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিলে প্রাণী বলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ তার অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ তাকে "অপর" হ'য়ে থাকতে হয়—সব সময়ে সে অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অপরের ভয়ে ভীত।

মানুষের ভিতর এবং বাহির দুই-ই আছে; সে ইচ্ছা করলে বাহিরের সকল প্রভাব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। বাহিরে সে সামাজিক মানুষ, অপরের প্রভাবে সে প্রভাবান্বিত, অপরের ভয়ে সেও ভীত, তা হ'লেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আছে। তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এবং সেই কারণেই মানুষ জন্তু থেকে ভিন্ন। মানুষের এই স্বাধীন সত্বার উপলব্ধিই মানুষকে মানুষ করেছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সে দিক থেকে মানুষের নানা ধরণের চাহিদা থাকে। কিন্তু মানুষের সকল চাহিদা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী চাহিদা নয়। সে চাহিদা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থাৎ সে চাহিদা তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পায় সেই চাহিদা-কেই তার ব্যক্তিগত চাহিদা বলা যেতে পারে। যেমন ধরুন ফ্যাসান! আজকালকার যুবকেরা প্যাণ্ট পরে, মেয়েরা দেহের কিছুটা বার করে রাখা যায় এমন ব্লাউজ পরে। ছেলেরা সম্মুখ দিকে কাজ করা Sweater পরে। কিন্তু তারা কেন পরে? এ প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় লোকে পরে তাই পরে। অর্থাৎ তারাই বলবে, "I do because it is done" তা হলে মানুষের ফ্যাসানের দরুন যা চাহিদা তা তার ব্যক্তিগত চাহিদা নয়। এ চাহিদাটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে জনসাধারণের একজন—সুতরাং জনসাধারণের দ্বারাই সে পরিচালিত—জনসাধারণের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। তার নিজস্ব choice বলতে কিছু নেই। সে নিজেই জনসাধারণ।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব নেই কিন্তু জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব আছে। সুতরাং জনসাধারণ মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চিন্তা, তার প্রবণতা, সব কিছুকেই পরিচালিত করছে। জনসাধারণ থেকে ব্যক্তি যদি নিজেকে আলাদা করে নিতে যায়, তা হ'লে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু ও মানুষ তার এই শক্তির ব্যবহার করতে পারে। তার

এই শক্তির ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় পাঠের ক্ষেত্রে। কেউ যখন বই পড়ে তখন তাকে জনসাধারণ এমন কি পৃথিবীকে পর্যন্ত ভুলতে হয়। বই-ই হয় তখন তার পৃথিবী। সম্পূর্ণ ভাবে একা তাকে বইয়ের বিষয়বস্তুকে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে হয়। তখন সে নিজেই হয় বইখানির সৃষ্টিকর্তা। এবং এ সৃষ্টি হয় তার ব্যক্তিগত সৃষ্টি।

"প্রতি গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন ধরণের পাঠক আসেন তাদের বিভিন্ন প্রকারের চাহিদা নিয়ে" একথা যদি সত্য হয় তা হ'লে আমরা একথা বলতে পারি যে পাঠের ক্ষেত্রে চাহিদা প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা এবং রুচিও প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা। তা হ'লে একথাও আমরা বলতে পারি পাঠের চাহিদা আর ফ্যাসানের চাহিদা এক নয়। ফলে পাঠ ও ফ্যাসান এক হ'তে পারেনা। সুতরাং Christiana Foyles যদি বলে থাকেন "ঠিক যেমন পোষাক পরিচ্ছদে...... পুস্তকের ক্ষেত্রেও ফ্যাসনের চলন পরিলক্ষিত হয়", তা হ'লে তা ভুল বলা হয়েছে না হয় তিনি ফ্যাসান ও পাঠের রুচির ক্রম-বিবর্তনের কারণ গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন নি।[১]

তবে একথা সত্যি যে, এক একটা যুগ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে এক এক ধরণের পাঠের চাহিদা দেখা দেয় এবং যুগের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে পাঠের চরিত্র কিরূপ হ'বে তা বলা যায়। এ বিষয়ের উপর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

ফ্যাসান ও পাঠের রুচির মধ্যে তো কোন মিল নেই-ই উপরন্তু এ-দুটি পরস্পর-বিরোধী। ফ্যাসান মানুষকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করে—অর্থাৎ বেশ-ভূষা, খাওয়া-পরা, শেষে এমন কি, প্রেমের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ফ্যাসান ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির যাতে কোন তফাৎ না থাকে তার চেষ্টা করে। অর্থাৎ ফ্যাসান চেষ্টা করে মানুষের ভিতরটাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে তাকে বাহিরের বস্তু করতে। কিন্তু পাঠের কাজ সম্পূর্ণভাবে ফ্যাসানের বিরোধী কারণ পাঠ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তার ভিতরকে গড়ে তুলে তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে —ফলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে। এই দূরত্ব বা ভিন্নতাই মানুষের সমাজে ক্রমবিবর্তন ও উন্নতি নিয়ে আসে।

ফ্যাসানের সৃষ্টি অনুকরণে। পাঠের স্পৃহার সৃষ্টি শক্তিগত প্রয়োজনে। সেই কারণে কোন ফ্যাসানই বহুকাল স্থায়ী হয় না। জামা-কাপড়ের ফ্যাসান ইউরোপে প্রায় প্রতি বছরেই পরিবর্তন হয় তার কারণ ব্যবসাদারেরা নতুন Style-এর চলন করবার চেষ্টা করে তাদের ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু পাঠের স্পৃহা পাঠের রুচি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সামাজিক ও কৃষ্টির ক্রমবিকাশের উপরে এবং এই ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ঠিক এই কারণে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রন্থাগারকে Economic Institution আখ্যা দিয়ে থাকেন। পাঠের রুচি সাধারণতঃ ফ্যাসানের মত বছরে বছরে

১। গ্রন্থাগারের 'অগ্রহায়ণ' সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পাঠরুচি ও পাঠস্পৃহা : দিগদর্শন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তিত হয় না। কারণ মানবসমাজে গ্রন্থাগারের স্থরু থেকে আজ পর্যন্ত পাঠের রুচিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় পাঠ হ'লো প্রাচীন যুগের পাঠ, এর পরের যুগে মানুষের সমাজে এল কৃষ্টি সম্বন্ধীয় পাঠ এবং সমাজের মধ্যে স্থান করে নেবার জন্যে পাঠ—এ যুগটা হ'লো Technology'র যুগ এবং এই যুগেই আসে compensatory reading-এর যুগ। আমাদের দেশে চলেছে এখন এই শেষের যুগ। Compensatory reading-কে orgiastic reading বলা যেতে পারে অর্থাৎ এই ধরণের পাঠ মানুষের জীবনের কাঠিন্যকে (tension) কতকটা প্রশমিত করে। আধুনিক সমাজের মানুষের মধ্যে এ ধরণের পাঠ একান্ত প্রয়োজন। যৌন আবেদনমূলক বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস, রহস্য উপন্যাস ইত্যাদি হ'লো orgiastic reading-এর জন্য বই। এ ধরণের বইগুলি হ'লো নেশার মত অর্থাৎ এ বইগুলি আধুনিক সমাজের conventional necessity.

পাঠের পরিসংখ্যান রাখলে পাঠের রুচির গতি কোন দিকে যাচ্ছে তা জানা যেতে পারে। কিন্তু পাঠের রুচি কোন দিকে যাচ্ছে তা জানবার জন্য পরিসংখ্যানের বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না কারণ সমাজের গঠন দেখে অনায়াসেই বোঝা যায় সমাজের চাহিদা। এই চাহিদা থেকেই পাঠের উৎপত্তি এবং পাঠের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সমাজের গঠন বিচার করলেই বোঝা যায় পাঠের রূপকে। আর পাঠের রুচি যে দিকেই যাক গ্রন্থাগারকে সে রুচির খোরাক যোগান দিতে হ'বে—তাছাড়া গ্রন্থাগারের বেঁচে থাকবার উপায় নেই। কারণ পাঠের প্রয়োজন থেকেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি এবং সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের এক মাত্র কাজ হচ্ছে চাহিদার যোগান দেওয়া। চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমান সমান হ'লে বুঝতে হ'বে সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ভাবে কাজ করছে।

যারা গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী তাঁদের উদ্দেশ্য প্রশংশনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁরা যেন এই কথাগুলি মনে রাখেন :—

"The need for reading does not result from the fact that book etc. are available but goes much deeper. On the whole. urban populations read more than the rural ones, and this fact is not explainable solely by the fact that more books are available If the demend were there, it would be met but the demand itself is less probably because the rate of tension is lower and the need-pattern is simpler. Similarly, the reading habit cannot be created in less developed countries simply by teaching reading and by creating libraries. It is a matter of motivation and the motive seems to emerge mostly in more complex societies"

(B Landheer : Social functions of Librarie, p. 96)

উপরের বক্তব্য থেকে আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগার তার কাজ সফল করবার জন্যে কিভাবে এবং কতদূর এগুতে পারে তা বেশ বোঝা যায়।

Fashion and reading habits
by Dila Mukhopadhyay.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগার

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেস্‌লী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ স্থাপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর বিখ্যাত Minutes-এ বলেন—"A college is hereby founded at Fort William in Bengal for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company" (18th Aug. 1800). রাজকর্মচারিগণের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান ভাষা ছাড়াও হিন্দু আইন, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি ছিল। কলেজের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তখনই উপলব্ধ হয়। "A copious library, it was thought, would be of material help to the professors and students alike in promoting the study of the languages".

টমাস রোবাক তাঁর "The Annals of the College of Fort William" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "নেটিভ লাইব্রেরীয়ান" হিসেবে তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন—

"Moonshee Ghoolam Hue. Sept. 1801 Mohunprusad Thakoor. Oct. 1807 Muoluvee Ikram Ulee. Oct. 1816"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারে কী ধরণের পুস্তক রাখা হত সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সহজসাধ্য নয়। মনে রাখতে হবে তখনও মুদ্রিত পুস্তকের এমন প্রাচুর্য দেখা যায়নি। পুস্তক মুদ্রণ রীতিমত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। সরকারী আনুকূল্যে পুস্তক মুদ্রিত হত। কলেজ কাউন্সিল মুদ্রণের সাহায্যার্থে অনেকগুলি কপি কলেজের ছাত্রদের জন্য ক্রয় করতেন। বলা বাহুল্য, সেগুলি কলেজ গ্রন্থাগার-সংগ্রহে স্থান লাভ করত। ১৮৫৯ খৃঃ রেভারেণ্ড জেঃ লঙের "Selections from the records of the Government, Published by Authority No. XXXII" প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজে ব্যবহার্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা আছে। ঐ তালিকানুযায়ী, ক্রীত পুস্তকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২,৬০০।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ যে সকল গ্রন্থ রচনা করতেন, সেগুলিও কলেজ গ্রন্থাগারে রাখা হত। রাজীবলোচনের "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" এবং চণ্ডীচরণ মুন্‌শী-কৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ সম্পর্কে উইলিয়ম কেরী কলেজ কাউন্সিলকে জানালে কলেজ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও ছিল। "......a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the library of the college."

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালার খ্যাতি দুষ্প্রাপ্য আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত পুঁথিসমূহ রক্ষণে। এতদিন সাহিত্য ছিল রাজসভাশ্রিত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে প্রাচ্য জ্ঞানভাণ্ডার রাজছত্রতল থেকে সমগ্র ভারতের নানাস্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে অযত্নে, অবহেলায় নিশ্চিত অবলুপ্তির সম্মুখীন হচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারে সেই সকল পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হয়। টিপু সুলতানের পুঁথি-সংগ্রহও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গ্রন্থাগারে প্রথমে নীত হয়। কিন্তু পরিশেষে একটিমাত্র পুঁথি ছাড়া বাকিগুলি লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী' এবং কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী'তে স্থানান্তরিত হয়। বিভিন্ন প্রাচ্যভাষাবিদগণ কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথিগুলির অনেক পুঁথি সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন।

১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়—"In 1835, the number of European printed books was about 5,224 ; Oriental printed books about 11,718 ; and Oriental manuscripts – some of which were richly illuminated and of great rarity—4,225." ১৮৩৬ খৃঃ প্রাচ্যদেশীয় পুঁথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়। সোসাইটি কর্তৃপক্ষ পুঁথিগুলির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং জনসাধারণকে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করেন।

গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ। প্রথম প্রথম গ্রন্থাগারের বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হত। অনেক বই হারিয়ে যাওয়ায় বা অন্যরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৮০৭ সালের ১লা আগষ্ট কলেজ কাউন্সিল নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। নূতন নিয়মে বলা হয়, নেটিভরা কোন কারণেই বই গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না। প্রয়োজনানুযায়ী তাঁরা অবশ্য কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবেন। আরও বলা হল, একমাত্র সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন কাজে যেমন, কোন গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য বই বাইরে দেওয়া হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত বিশেষ অনুমতিপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব তৎকালীন রাজকর্মচারিগণের পঠন-পাঠনে সাহায্য প্রদান বা পুরাতন পুঁথির সংগ্রহতেই শেষ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ মৌলিক গ্রন্থ-রচনা এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা গদ্যের যে কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীরা সেই কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। কলেজ-গ্রন্থাগারিক মোহন প্রসাদ ঠাকুর শিক্ষার্থিগণের জন্য একটি বাংলা-ইংরাজী শব্দসংগ্রহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যায়ে শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। প্রকাশকাল ১৮১০। গ্রন্থটি শিক্ষার্থিগণের প্রয়োজন মেটাতে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ আরও দুটি সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২-তে প্রকাশিত হয়। মোহন প্রসাদ ঠাকুরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ওড়িয়া-ইংরেজী' শব্দসংগ্রহ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮১১। এ ছাড়াও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি পার্সী

গল্পের অনুবাদ করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অপর একজন গ্রন্থাগারকর্মী লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত নীতিগ্রন্থ 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন চার্লস উইলকিন্স।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগার শুধু বই দেওয়া-নেওয়া বা বই সংরক্ষণ কাজেই নিজের শক্তিকে ব্যয় করেনি। সাহিত্যকে গড়ে তোলার জন্য যে প্রয়াস কলেজের পণ্ডিতবর্গ করেছিলেন, গ্রন্থাগারও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা আজ সঠিকভাবে জানতে পারিনা এখানে কোন পদ্ধতিতে পুস্তক রাখা হত বা বই দেওয়া-নেওয়ার কোন পদ্ধতি অনুসৃত হত। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ মোহন প্রসাদ ঠাকুর বা লক্ষ্মীনারায়ণের পরিচয়-লিপিতে 'গ্রন্থাগারিক' কথাটির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থাগারিক হয়েও সাহিত্যকর্মীরূপে পুস্তক রচনা-দ্বারা তাঁরা গ্রন্থাগারিকতার মান উন্নীতস করে গেছেন!

সহায়িকা গ্রন্থ :—

১) Brojendranath Banerjee—Dawn of New India.

২) S. K. De—Bengali Literature in the Nineteenth Century.

৩) সজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গদ্যের প্রথম যুগ।

The Library of the College of Fort William
by Krishna Bandyopadhyay.

কি করে সম্মেলন ভণ্ডুল করতে হয়

শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মা

উপরের নাম পড়েই হয়তো আপনারা মারমুখী হয়েছেন, হয়তো আমাকে হাতের কাছে পাচ্ছেন না তাই রক্ষা! কিন্তু ধৈর্য ধরে যদি আমার বক্তব্য শোনেন তবে দেখবেন আমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই ভণ্ডুলানন্দ শর্মা অনেক বড় বড় সম্মেলন ঘুরে এসেছেন অর্থাৎ ভণ্ডুল করে এসেছেন। সম্মেলন ভণ্ডুল করার সহজ উপায় সম্পর্কে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই কাজে লাগবে। সম্মেলন ভণ্ডুল করেই আমার আনন্দ, সুতরাং এই বিষয়ের নানা দিক নিয়েই আমাকে বিশেষ চিন্তা করতে হয়েছে। আশা করি, এই অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না।

প্রথমেই ধরুন, সম্মেলন অনুষ্ঠানের বহু পূর্বে সম্মেলনের জন্য একজন সংগঠক ঠিক করতে হয়। তিনি আবার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ কোষাধ্যক্ষের এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থ। এই ভণ্ডুল বাবুর পরামর্শে এই সমিতির সদস্যরা যদি মনে করেন সম্মেলনের তো দেরী আছে— এবং নিজের নিজের কাজে মন দেন আর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় মনে করেন, 'আচ্ছা, আগে চাঁদা তো উঠুক তারপর দেখা যাবে!'—তাহলেই ভণ্ডুলের মনস্কামনা অর্ধেক সিদ্ধ হয়। আর যাঁদের কাছ থেকে আপনি চাঁদা পাবেন বলে মনে করেছেন তাঁরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। আধুনিক সভ্য নাগরিকের একটি লক্ষণ হচ্ছে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা কখনোই পালন করেন না। আপনিও মুখে চাঁদা দেব, কেন দেবনা, নিশ্চয়ই দেব—একথা বলবেন কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে এক পয়সাও আপনি চাঁদা দেবেন না। সংগঠন-সম্পাদক ভদ্রলোক হয়তো মান বাঁচানো দায় দেখে মুখে রক্ত উঠিয়ে ছোটাছুটি করে সম্মেলনের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। সমিতির সদস্য হিসেবে আপনিও তখন তার গৌরবের ভাগী হবেন।

সম্মেলনে যাঁরা ভি, আই, পি, আসছেন তাঁরা যে সম্মেলন ভণ্ডুল করার ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করতে পারেন একথা বলাই বাহুল্য। ভি, আই, পি, বলেই তিনি যে কখন কোথায় থাকবেন তা তাঁর নিজেরও সব সময় জানা থাকে না। আর উদ্যোক্তাদেরও সে কথা সময় মতো জানিয়ে দিতে পারেন না। তারপর প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ যখন ভি, আই, পি-র জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধীর হয়ে ওঠেন এবং ঘড়ির কাঁটা ঘুরে আসে তখন ভণ্ডুলের বড় আনন্দ হয়।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় যাঁরা থাকেন তাঁরাও এ ব্যাপারে খুবই সাহায্য করতে পারেন। ধরুন তাঁরা হয়তো এমন ছোট জায়গায় অধিবেশনের জায়গা করলেন যে অর্ধেক লোকেরই

তাতে জায়গা হয় না। তারপর অধিবেশন যখন আরম্ভ হল তখন মাইকটি হয়তো বিকল হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক কসরত করেও ঐ মাইককে আর চালু করা যাবেনা। এমন ব্যবস্থা রাখবেন যেন ধারে কাছে আর দ্বিতীয় মাইক না থাকে। অথবা রাত্রিবেলা অনুষ্ঠান চলাকালে হঠাৎ যেন আলো নিভে যায়—ঘণ্টাখানেকের আগে ঐ আলো জ্বালাবার চেষ্টা করবেন না। তারপর এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখবেন যাদের সেবার চোটে সম্মেলনের প্রথম দিনেই প্রতিনিধিরা পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না।

সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। তাঁরা পূর্বাহ্ণে উদ্যোক্তাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না তাঁরা আসছেন কি আসছেন না; তারপর সম্মেলন আরম্ভ হবার যথেষ্ট পূর্বেও আসার চেষ্টা করবেন না। একটা দৃশ্য দেখে ভণ্ডুল অত্যন্ত প্রীত হন; একদিকে সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে আর অন্যদিকে প্রতিনিধিবৃন্দ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর যে বেচারাদের ওপর এই রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির ভার পড়েছে তারা লাইনে দাঁড়ানো প্রতিনিধিদের তাড়া খেয়ে প্রায়ই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে এবং টাকা পয়সার গোলমাল করে ফেলে মাথা খারাপ করে ফেলে। তাছাড়া যে কোন সম্মেলনেই আপনি ভণ্ডুল বাবুর একদল চেলাকে দেখতে পাবেন—যাঁরা সর্বদা ব্যস্ত থাকেন কি করে আগে ভাল জায়গাটি গিয়ে দখল করবেন, রান্নাঘরের মেনুতে কি আছে তার খোঁজ-খবর আগেভাগেই রাখবেন এবং একদল ভি, আই, পি-র পোজ নিয়ে খুব ছোটাছুটি করতে থাকবেন—আসলে কিন্তু তাঁদের কিছুই করতে হবেনা এবং যথাসময়ে রান্নাঘরের কোন কোন লোভনীয় পদ তাঁদের কৃপায় কম পড়ে যাবে। এই সব অবশ্য পালনীয় কর্মে তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন যে অনেক সময় সম্মেলনের অধিবেশনেই তাঁদের যোগ দেওয়া হয় না।

সম্মেলনে যারা প্রবন্ধাদি পাঠ করেন তারাও যে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে না পারেন এমন নয়। ধরুন এমন প্রবন্ধই তাঁরা পাঠ করবেন যা কস্মিনকালেও ছাপার যোগ্য নয়। যুক্তি হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে প্রবন্ধ নির্বাচনের ভার যাঁদের ওপর দেওয়া হয় তাঁরা তবে কী করেন? তার উত্তরে বলতে হয় সেই নির্বাচন কমিটি এতো ব্যস্ততার মধ্যে সবগুলি প্রবন্ধ পাঠ করে দেখবার অবসর না পেরে ভণ্ডুলবাবুর পরামর্শমতো চোখ বুজে পাশ মার্ক দিয়ে দেন। তারপর ধরুন সম্মেলনে আপনার প্রবন্ধ পাঠের সময় দেওয়া হয়েছে দশ মিনিট—তার পাঁচ মিনিট আপনার ভূমিকা করতেই কেটে গেল; আর পাঁচ মিনিটে আপনার বক্তব্য বিষয়টির মধ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছেন এমন সময় সময়জ্ঞাপক লাল আলো জ্বলে নিশানা দিল যে আপনার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আরো পাঁচ মিনিট সময় নেবেন—কিন্তু অতিরিক্ত ঐ পাঁচ মিনিটেও আপনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবেন না। সুতরাং সভাপতির সংকেত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাত থেকে মাইক কেড়ে নেবার আগে পর্যন্ত আপনি পূর্ণোদ্যমে আপনার প্রবন্ধ-পাঠ চালিয়ে যাবেন।

সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি প্রবন্ধ-পাঠ করবেন না কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সময় নানা প্রশ্ন করে

থাকেন তাঁরাও একটু সচেষ্ট হলে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন। ধরুন, তিনি হয়তো এমন প্রশ্ন করবেন যা আদৌ করার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। তারপর প্রশ্নের উত্তরে এমন সব কথা বলবেন যে সম্পর্কে তাঁর আদৌ জ্ঞান নেই। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। ভণ্ডুলের ধারণা, যে সম্পর্কে আপনি জানেন সে সম্পর্কে বলাই কঠিন, যে সম্পর্কে আপনি জানেন না সেই সম্পর্কেই তো আপনি গড়গড় করে বলে যেতে পারেন।

সম্মেলনটা একটা 'মেলা' বা 'তামাসা' গোছের হলে ভণ্ডুলের বড় আনন্দ হয়। এটা যে হয়না তা নয়, মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। এখন পরিষদের কিছু কিছু সেয়ানা লোক নাকি প্রশ্ন তুলেছেন এই সব সম্মেলন করে আদৌ লাভ হয় কিনা। এই সম্মেলনে নাকি পরিষদ সদস্য এবং প্রতিষ্ঠান সদস্যদের বেশির ভাগই প্রতিনিধি পাঠান না। প্রতি বছরই কিছু কিছু নতুন লোক মজা দেখতে আসে, পরের বছর নাকি তাঁদের আর টিকি দেখা যায় না। তাহলে এত লোক সম্মেলনে আসে কোথেকে ভণ্ডুল ভেবে পায় না। আর ভণ্ডুলের আশা চূর্ণ করে সম্মেলনগুলিই বা কি করে ঠিক ঠিক হয়ে যায়? আসলে জানেন কি, হাতের আঙ্গুলে গোনা যায় এমনি কয়েকটা পরিষদের চাঁই বরাবর ভণ্ডুলের সাধে বাদ সাধে। এদের ওপর ভণ্ডুলের রাগ। এরা ভাবে এরা কতই যেন স্বার্থত্যাগ করছে। ভণ্ডুল ভালভাবেই জানে এই সব করে আখেরে এরা পস্তাবে।

যাই হোক, আপনাদের সম্পাদক কিন্তু কিছুতেই আমার এই জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছাপতে চাচ্ছেন না। তাঁর সিরিয়াস পত্রিকায় এই সব রঙ্গরসের কথা ছাপা হলে নাকি তাঁর মান যাবে। কি বুদ্ধি! আমার এই প্রবন্ধকে উনি রঙ্গরস বলে ভাবতে পারলেন! ভণ্ডুলের চুরি বিদ্যা স্বীকারের ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু এই নাছোড়বান্দা সম্পাদকের পাল্লায় পড়ে ওঁকে দেখাতে হল যে ওঁর চেয়ে ঢের ঢের গুণে বেশী সিরিয়াস জর্ণালে দিল্লীর Dr. B. N. S. Walia 'The Art of Making a Conference Unsuccessful' বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন (ভণ্ডুলের ভাবটি এই প্রবন্ধ থেকেই চুরি করা)। এরপরে অবশ্য তিনি আমার প্রবন্ধটি ছাপতে রাজী হয়েছেন। দ্বারহট্টে আসুন! আমিও আমার চেলাদের নিয়ে সদলবলে সেখানে যাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই দেখা হবে। নমস্কার!

The Art of Making a Conference Unsuccessful
by Bhandulananda Sharma.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন : কেন্দ্রীয় জনসভা

গত ২০শে ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্টস হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাধিকর্তা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সভায় পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন সভাপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : - আজ থেকে ৪০ বৎসর আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় এবং বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। তাই আমরা প্রতিবছর এই দিনটিকে গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালন করি।

আজ দেশের সত্যিই দুর্দিন এবং জরুরী অবস্থার জন্য আমাদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা সত্বেও দেশের শিক্ষা প্রসারের দিকে যদি আমরা ভাল করে দৃষ্টি দিতে না পারি, মানুষ গড়ার কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না করতে পারি, তাহলে কোন মহৎ কাজই আমাদের দ্বারা সম্ভব হবেনা। গ্রন্থাগার শিক্ষার প্রধান বাহন সুতরাং এর যাতে সব দিক দিয়ে উন্নতি বিধান করা সম্ভব হয় সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আর চিন্তা করতে হবে, কর্মিদের আর্থিক অবস্থার যদি উন্নতি না হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা বেতনক্রম চালু করেছেন। এটা খুবই আনন্দের কথা; কারন এতদিন এইসব গ্রন্থাগারের কর্মিরা বছরের পর বছর একটা বাঁধা বেতন পেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বেতনক্রম মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এঁদের বিষয়ে একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু বলেন :—আজ এখানে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই দিনটিতে বাংলা দেশে প্রথম গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয়। আজ এখানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হোল। যাঁরা এই অভিজ্ঞান পত্র পেলেন তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য তাঁরা যেন সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে যাত্রা সুরু করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় বলেন : – জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য সম্প্রতি একটা বেতনক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভাল বেতনক্রম তৈরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি দেখা দিলে এই বেতনক্রমকে আরো উন্নত করার চেষ্টা সরকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরায় আরো বলেন, আমাদের বাংলা দেশে সৃজনমূলক সাহিত্যের অভাব আজ বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। মিখায়েল শলোকভের মত সাহিত্যিক আজ বাংলাদেশে কোথায়? সৃজনমূলক সাহিত্যের এই অভাব দূর করতে না পারলে দেশের সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি সচেষ্ট হন তাহলে সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাধিকর্তা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন:—স্কুল ও কলেজ একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেয়। গ্রন্থাগার সকলকেই শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও জনসংযোগ বৃদ্ধি করে চলেছেন। ২০শে ডিসেম্বর সারা বাংলা দেশে গ্রন্থাগার দিবস রূপে পালিত হচ্ছে, বাংলা দেশের সামাজিক উন্নয়নে এই দিনটির তাৎপর্য কম নয়।

পরিশেষে পরিষদের সহঃ-সভাপতি শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

কলিকাতার অন্যান্য সভা

প্রতাপচন্দ্র মজু...ার টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী। কলিকাতা-৯

২০শে ডিসেম্বর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার টেকষ্ট বুক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটির সদস্য সংখ্যা প্রায় তিনশ'। গ্রন্থাগারটিতে সাত হাজারের মত টেকষ্ট বই আছে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারে একটি পুস্তকের প্রদর্শনীও হয়।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার। কলিকাতা-৯

২০শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারে সন্ধ্যা ৭টায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাময়িক পত্র পত্রিকা, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। প্রদর্শনীটি অসংখ্য দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে এবং দর্শকদের অনুরোধে অতিরিক্ত কয়েকদিন এটিকে চালু রাখা হয়।

নারী শিল্প নিকেতন। ১১৬এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

২০শে ডিসেম্বর বৈকাল ৪টায় নারী-শিল্প-নিকেতনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার। ৮২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করা হয়। সকালবেলায় একদল কর্মী শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐ গ্রামে এবং বাদুড়িয়া অঞ্চলে পুস্তক সংগ্রহের জন্য অভিযান করেন। এর ফলে ১৮০টি পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থ কলকাতা থেকেও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সংগৃহীত গ্রন্থের মূল্য প্রায় পাঁচশত টাকা।

বিকাল বেলায় একটি জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাদুড়িয়ার ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্তী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সভার কাজ শুরু হয়। গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে শ্রীক্ষিতিনাথ সুর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপ্রমথনাথ নাগচৌধুরী (বাদুড়িয়া এল, এম, এস স্কুলের প্রধান শিক্ষক), শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং শ্রীদীননাথ বসুও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন।

সর্বশ্রী জয়ন্ত নাগচৌধুরী, মঞ্জু নাগচৌধুরী, শিবানী ভট্টাচার্য প্রভৃতি আবৃত্তিতে এবং মঞ্জুশ্রী মজুমদার, সরস্বতী ভট্টাচার্য, শিবানী ভট্টাচার্য, গায়ত্রী সুর, শিপ্রা বিশ্বাস, ও মঞ্জু বসু, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে অংশ গ্রহন করেন।

বাদুড়িয়া, ঈশ্বরগাছা, রাজনগর, খোরগাছি প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামবাসী সহ প্রায় ২০০ লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নদীয়া

আসাননগর তরুণ পাঠাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে তরুণ পাঠাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপিত হয়। সকালে প্রভাত ফেরী গ্রামের প্রধান প্রধান পথ পরিভ্রমণ করে। বিকেলে এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয় কিন্তু এই বেতনক্রম যথোপযুক্ত হয়নি বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি 'চ্যারিটি শো' করা হবে বলে স্থির হয়।

'অধিক ফসল ফলাও'—এই সরকারী প্রকল্পে সাড়া দিয়ে গ্রন্থাগার সংলগ্ন জমিতে সবজি লাগানো হয়েছে।

পুরুলিয়া

বুড়দা তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সকালে ৬টায় প্রভাত ফেরী বার করে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়।

বৈকাল ৪টায় শ্রীনন্দলাল কুমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। সর্ব্বশ্রী সৃষ্টিধর দাশ, ঘনশ্যাম মাহাতো, মদন মোহন গরাঞী প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং মুচিরাম দাস ও কিরণ চাঁদ কাপুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। পোঃ জাড়গ্রাম। বর্ধমান।

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত সরকার অনুমোদিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ভবনে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীনিরাপদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত দিবসে গ্রন্থাগার ভবন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা হয়, দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী, শিশু-সমাবেশ ও ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং তা যথাযথভাবে পালিত হয়। গ্রন্থাগারিক ও সহঃ-সম্পাদক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বীরভুম

দেবগ্রাম যুব সংঘ। পোঃ কয়থা। থানা নলহাটি।

২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় দেবগ্রাম যুবসংঘ সাধারণ পাঠাগারের সদস্যগণ গ্রাম বাসীদের সহযোগিতায় দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভা করেন। সভাপতিত্ব করেন নলহাটী ১নং সমাজ উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন নলহাটী থানা নিম্নভূমি রাজস্ব আধিকারিক শ্রীগণপতি চক্রবর্তী মহাশয়। শ্রীসুখেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় তাঁদের বক্তৃতায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বলেন। যুব সংঘের পাঠাগারটি কয়থা, বুরলা ও ভদ্রপুর অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পাঠাগারটিকে কয়থা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানানোর এক প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে গ্রামবাসী জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলে স্থির হয়।

মেদিনীপুর

তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন। শ্রীকৃষ্ণপুর। ব্যবত্তারহাট।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতনের পরিচালনায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। সকালে গ্রন্থ নিকেতনের সদস্য, পাঠক-পাঠিকা এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় গ্রন্থাগারের পার্শ্ববর্তী জায়গা এবং রাস্তাঘাট পরিস্কার

করা হয়। ঐ সঙ্গে এক পুস্তক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টার সময় গ্রন্থাগার অনুরাগীদের উপস্থিতিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। গ্রন্থ নিকেতনের সম্পাদক শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'দেশ গঠনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, সমাজের সর্বস্তরের নারী ও পুরুষকে যথেষ্ট শিক্ষিত করে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সমধিক। পুস্তক প্রদর্শনীটি সকাল থেকে রাত ৯টা অবধি খোলা ছিল।

শহীদ পাঠাগার। চৈতন্যপুর। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

গত ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সুতাহাটা থানার বিভিন্ন স্থানে শহীদ পাঠাগারের কর্মিগণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও সংগ্রহ-অভিযান সানন্দে পরিচালনা করেছেন। ২০শে ডিসেম্বর স্থানীয় কৃষ্ণনগর বাণীমন্দির বহুমুখী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সভা হয়। পূর্বদিন শহীদ পাঠাগারের কর্মিগণ গ্রামে গ্রামে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালান। ঐদিন বিকেল ৪টায় শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার বসুর সভাপতিত্বে "সমাজে গ্রন্থাগারের স্থান" শীর্ষক এক আলোচনা সভা হয়। ২০শে ডিসেম্বর সারাদিনে ১০৫.০০ টাকা সংগৃহীত হয়। ২১শে ডিসেম্বর কুকুড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামবাসীদের নিকট হতে ২০.০০ টাকা সংগৃহীত হয়। বিকেলে এখানে একটি জনসভা হয়। এই সভায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ক্ষুধা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সংকল্প গ্রহণ করা হয়। ২২শে ডিসেম্বর দুর্গাপুর গ্রামে ৫.০০ টাকা এবং ২৪শে শোলাট গ্রামে ৬৬ টাকা সংগৃহীত হয়। বিকেল ৪টায় এইদিন এখানে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়।

২৫শে ডিসেম্বর দেভোগ কাণীর বাজার ও আন্দুলিয়া গান্ধী স্মারক নিধির গ্রাম সেবা কেন্দ্র এবং গ্রামবাসীদের নিকট হতে ১৮.০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর হলদিয়া পোর্ট এবং ইন্দ্রমাণিকে সংগ্রহ অভিযান চলে। ২.০০ টাকা সংগৃহীত হয়। বিকেলে একটি জনসভাও হয়।

২৯শে ডিসেম্বর 'নিরক্ষরতার নিবাসন এই হোক মোদের পণ' এই ধ্বনি দিয়ে ৮ মাইল দূরবর্তী বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমে যাওয়া হয়। এই স্থানে ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধী পদার্পন করেছিলেন। প্রতি বছর এই দিনে এখানে সেই স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন এখানে সংগৃহীত হয় ১০ টাকা।

হাওড়া

সমাজ সেবী মণিমেলা। একসরা। চামরাইল। হাওড়া

২০শে ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় একসরা মণি মিলন প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য একটি সভা হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীপরেশ চন্দ্র কোলে এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল। এই শুভ গ্রন্থাগার-দিবসে মণি রক্ষক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ জানা

শিশুদের জন্য একটি শিশু গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন এবং এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার দিবস ও শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাঠাগারটি বঙ্গীয় সমাজ সেবী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত। এঁদের তিনটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে আরও তিনটি মহিলাদের গ্রন্থাগার আছে। বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ শতাধিক পুস্তক মণি-মেলাকে দান করেন।

দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমদন মোহন ঘোষ। প্রথমেই ভারতীয় শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় পাঠাগারের উন্নতির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হুগলী

হুগলী জেলা পরিষদ। জন ও সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি। হুগলী

গ্রন্থাগার দিবস পালনের জন্য হুগলী জেলা পরিষদ গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহের সম্পাদকগণের নিকট এক সার্কুলার প্রেরণ করেন। এই সার্কুলারটি সমিতির সভাপতি শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় ও আহ্বায়ক শ্রীনীতীশ বাগচি মহাশয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত। সার্কুলারটির বয়ান নিম্নরূপ ঃ

"প্রতি বছর ২০শে ডিসেম্বর তারিখটা "গ্রন্থাগার দিবস" হিসাবে পালিত হয়। ঐ দিবসটিতে গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবার দিন। গ্রন্থাগার কক্ষটী ও তাহার চতুপার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, প্রতিটি পুস্তকের প্রতি নজর দেওয়া, সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার দিন।

এই দিনটিতে আলোচনা সভার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা রচনা করা—বাকী চাঁদা সংগ্রহ করা, কিছু সংখ্যক দেশাত্মমূলক নূতন পুস্তক পাঠকদের মধ্যে পরিবেশন করা এবং পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহের অভিযানে বাহির হওয়া প্রভৃতি কাজ করা যাইতে পারে। ছোটখাটো হইলেও দেশরক্ষা ও কৃষি বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সময়োচিত হইবে।

আশা করি আপনাদের গ্রন্থাগারেও গ্রন্থাগার দিবস যথাযথভাবে পালিত হইবে। "গ্রন্থাগার দিবস" পালন করা হইলে তাহার একটি বিবরণ জেলা পরিষদের সভাপতির নামে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নয়নের প্রতি জিলা পরিষদের লক্ষ্য আছে।"

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী। শ্রীরামপুর।

গত ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারের নানা অসুবিধার কথা বলেন। অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক শ্রীশুভ্রাংশু কুমার মিত্র 'সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার চাই'—এই বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি জানান যে, তাঁদের গ্রন্থাগারে পুস্তক-সূচী শীঘ্রই কার্ডে করা হবে এবং এই গ্রন্থাগারটির জন্য কার্ড ইনডেক্স ক্যাটালগ (Card Index Catalogue) একান্তই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারটি ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় শ্রীমিহির সাহা, শ্রীঅশোক হালদার প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

দুলাল স্মৃতি সংসদ। খাজুরদহ।

দুলাল স্মৃতি সংসদের কার্যালয়ে সংসদের সদস্য ও পাঠকবর্গকে নিয়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে একটি সভা করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বেরা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনন্দদুলাল সুর। প্রধান অতিথি মহাশয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে পল্লীজীবনে গ্রন্থাগার যে অশেষ উপকার সাধন করে এ সম্পর্কে সুন্দর একটি ভাষণ দেন। স্থানীয় অঞ্চল প্রধান শ্রীতারকচন্দ্র মাইতি মহাশয় এই পাঠাগারটিকে সরকার অনুমোদিত একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। শ্রীঅজিত কুমার ও শ্রীদেশবন্ধু ঘোষও সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় ৬৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে সদস্যগণের বাকী চাঁদা সংগ্রহের অভিযান চালানো হয়। দল বেঁধে যেয়ে প্রত্যেকের কাছে চাঁদা চাওয়ায় অনেকেই বাকী চাঁদা পরিশোধ করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বিকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন ফেষ্টুন সহকারে অঞ্চল পরিক্রমা ও প্রচার এবং রাত ৮টায় জনসভা হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বাগাটি উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীনীলমণি মোদক।

জনসভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন :— আমাদের এই ত্রিবেণী পাঠাগার উক্ত পরিষদের কাউন্সিল সদস্য। সুতরাং গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ ও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজে সহায়তা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সভাপতি শ্রীনীলমণি মোদক তার ভাষনে বলেন :—বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, শিক্ষার এই নিম্নমানের প্রতি তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন এবং গ্রন্থাগারের সাহায্যে জনশিক্ষা প্রসারের প্রতি প্রত্যেককে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেন।

সর্বশ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, নিমাই নাথ, অসীম বিশ্বাস, দীনবন্ধু হাজরা প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরা

কৈলাসহর পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিতবন্ধু চক্রবর্তী জানাচ্ছেন: 'গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আপনাদের আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছি। দূরত্বের ব্যবধানহেতু ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানে অক্ষম বলে আমরা দুঃখিত। আমরাও ত্রিপুরাতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছি– এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।'

গত ২৪শে ডিসেম্বর কৈলাসহর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। এতদুপলক্ষে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত একটি পুস্তক-প্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যা ৬টায় আলোচনা-চক্র এবং রাত্রি ৭টায় বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

News from Libraries.

গ্রন্থ সমালোচনা

চিকিৎসা-জগৎ। সম্পাদক ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক শ্রীজগদীশ গুপ্ত। ৩৭ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; কার্তিক, ১৩৭২। মূল্যঃ ভারতে ৬·০০ টাকা; ভারতের বাইরে ৮·০০ টাকা।

'চিকিৎসা-জগৎ' বাংলাভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যাদি, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালী সম্পর্কে মতামত 'মৌলিক প্রবন্ধ', 'রোগীর বিবরণ' (case notes), 'চয়ন' (current excerpts 'সংবাদ সংগ্রহ' প্রভৃতির মাধ্যমে এই পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত হলেও 'চিকিৎসা-জগৎ' যে কেবল মাত্র একটি লোকরঞ্জন (popular) স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা তা মোটেই নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিল তথ্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীই এতে বেশী থাকে; অবশ্য কিছু কিছু লোকরঞ্জন প্রবন্ধও এতে স্থান পায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং সাধারণ ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু পত্রিকাই কলকাতা থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এ সকল পত্রিকাই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৮২৫ সালে ভারতে প্রথম মেডিক্যাল জর্নাল প্রকাশিত হয়েছিল। যে সকল ইংরেজ ভারতীয় 'মেডিক্যাল সার্ভিসে' নিযুক্ত হয়ে এদেশে এসেছিলেন প্রধানতঃ তাঁদের উৎসাহেই সে যুগে এদেশে 'মেডিক্যাল সোসাইটি' বা চিকিৎসকগণের সমিতি গড়ে ওঠে এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার ধারার প্রবর্তনও এঁরাই করেছিলেন।

বর্তমানে এদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষণ হয়ে থাকে ইংরেজী ভাষায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা এবং উচ্চতর শিক্ষায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজী ভাষাতেই নিজেদের কাজকর্ম নিষ্পন্ন করেন। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে মাতৃভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জটিল তথ্যাদি পরিবেশনের যেমন অসুবিধা তেমনি বাংলাভাষা চর্চায় অনভ্যাসের দরুণ এইসব চিকিৎসক মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহী হন না।

বাংলাদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষণের গোড়ার যুগে বাংলাভাষাতেই শিক্ষাদান করা হত এবং অনেক পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় ছাপাও হয়েছিল। বাংলাভাষায় এইসব ডাক্তারী বই কোন অংশে হীন ছিলনা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ইংরাজী ভাষার চর্চা একান্তই প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। সেকথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, মাতৃভাষাকেও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া যে ভাষা সর্বসাধারণের সহজবোধ্য সেই ভাষাতে বিজ্ঞানের প্রচার হওয়াও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে ছড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় চিকিৎসকগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' কিংবা এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা বাংলাভাষায় কোন পত্রিকা প্রকাশ করেন না। অথচ এই সংস্থারই উত্তরপ্রদেশ শাখা এবং আসাম শাখা যথাক্রমে হিন্দী এবং অসমীয়াতে তাঁদের মুখপত্র প্রকাশ করে থাকেন। 'চিকিৎসা-জগৎ' পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়ে সেই অভাব পূরণ করেছে। এই পত্রিকাটি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এর জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্য কোন অংশেই কম নয়।

'চিকিৎসা-জগৎ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট ইংরেজীনবীশ নন বলেই বাংলাভাষায় কলম ধরেছিলেন একথা মনে করবার কোন হেতু নেই। মেডিক্যাল জর্ণালিজমের ক্ষেত্রে এঁর নাম সুপরিচিত। ইনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে 'জার্ণাল অব দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন', 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্ণাল' প্রভৃতি ইংরাজী পত্রিকারও সম্পাদনা করেছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন, মাতৃভাষায় এই ধরণের পত্রিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রচুর শ্রম এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়েছে।

আলোচ্য সংখ্যায় বরাবরের মতই উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি স্থান পেয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য এই যে, মহামান্য হিপোক্রেটশ-এর শপথবাণীটি বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

(নি. মু.)

নবরঙ। সম্পাদক নির্মল ভট্টাচার্য। কপালীটোলা রাজকৃষ্ণ সংঘ ও কপালী-বান্ধব লাইব্রেরীর মুখপত্র। কপালীটোলা লেন, কলিকাতা-১২। ১৯৬৫। পৃঃ ৮৮। মূল্য ২ টাকা।

কপালীটোলা রাজকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও কপালীবান্ধব লাইব্রেরীর মুখপত্র নবরঙ প্রথম প্রকাশিত হল। এটি বিভিন্ন রচনার সংকলন। লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, স্বপনবুড়ো, ইন্দিরা দেবী, বাণী বসু, কৃশানু বন্দোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতি। অধিকাংশ রচনাই শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করে লেখা। খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি যে সব অখ্যাতনামা লেখকের রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে সেগুলি পড়ে শিশু ও কিশোররা তো বটেই বড়রাও যথেষ্ট আনন্দ পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। পত্রিকাটির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী এবং ভেতরের ছবিগুলি শ্রীমানব ভট্টাচার্যের। ছবিগুলি নিঃসন্দেহে সংকলনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। একটি সংঘ ও তার পাঠাগারের তরফ থেকে এ ধরণের একখানি সুরুচিপূর্ণ সংকলন প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। (চ. কু. সে.)

বাণীরেখা। সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত। বাণীরেখা শিক্ষায়তন, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ৯৬+১৬ পৃঃ। মূল্য ৬.০০ টাকা।

বাণীরেখা বাংলা সংকেতলিপি বা সর্টহ্যাণ্ডের বই। দ্রুত-লিখনের প্রয়োজনীয়তা শুধু যে এই বিংশ শতকেই দেখা দিয়েছে তা নয়; যুগে যুগে কি করে সংক্ষেপে লেখা যায় তার

উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন যুগে রোমে Tiro এক সংক্ষেপ লিপির উদ্ভাবন করেছিলেন। এই লিপির সাহায্যে Cicero, Seneca প্রভৃতি সিনেটরদের বক্তৃতা টুকে নেওয়া হত। মধ্যযুগেও যে সর্টহ্যাণ্ডের ব্যবহার ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ৯৭২ সালের একটি পুঁথির মার্জিনে সর্টহ্যাণ্ডের লেখায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্যকার Samuel Pepys-এর বিখ্যাত ডায়েরী সর্টহ্যাণ্ডে লেখা হয়েছিল। বর্তমানে সবদেশেই আইনসভা, পার্লামেণ্ট, কোর্ট প্রভৃতির বিবরণী; সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও বক্তৃতা এবং ব্যবসায়িক চিঠি-পত্রাদির অনুলেখনে সর্টহ্যাণ্ডের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

বাংলাভাষায় সংক্ষেপলিপি প্রবর্তনের চেষ্টা অনেক হয়েছে কিন্তু বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল পদ্ধতি আজও উদ্ভাবিত হয়নি। ইংরেজী সংক্ষেপলিপির অন্ধ অনুকরণে বাংলা সংক্ষেপলিপি প্রবর্তন করতে গেলে তা যে কোনক্রমেই কার্যোপযোগী হতে পারেনা একথা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতির মধ্যে Sound writing system বা ধ্বনিভিত্তিক পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত। Pitman, Gregg প্রভৃতির পদ্ধতি ধ্বনিভিত্তিক। 'বাণীরেখা'র উদ্ভাবক দাবী করেছেন যে তাঁর পদ্ধতিটি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। এমন কি একে অতি সহজেই সর্বভারতীয় ধ্বনিলিপির রূপ দেওয়া যায়। আজকাল বাংলাভাষার ব্যবহার অধিকতর হয়েছে এবং মাতৃভাষার ক্ষিপ্রতর অনুলেখনেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। জীবিকা হিসেবে যাঁরা বাংলা সর্টহ্যাণ্ড শিখবেন এই বইটি যদি তাঁদের সহায়ক হয় তবেই এর সার্থকতা।

গ্রন্থকার বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আলোচ্য গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। ৫০টি সূত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর পদ্ধতিটি বিন্যস্ত করেছেন। এছাড়া 'মিলনী' বা শব্দাবলী (Phrases) এবং সংক্ষেপিত শব্দ অনুলিখনের সংকেতও ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে। আঁচড়গুলিও নিঃসন্দেহে ভালই হয়েছে। তবে উচ্চতর শিক্ষার্থীদের জন্য একখানি সংক্ষেপলিপির অভিধান সংকলন করলেই বোধ হয় ভালো হত।

(নি. মু.)

বার্তা বিচিত্রা

পরলোকে উইলিয়ম সমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫)

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্পলেখক এবং এ যুগের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক সমারসেট মম ৯১ বছর বয়সে ফ্রান্সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ৬০ খানারও বেশি উপন্যাস, নাটক গল্পসংগ্রহ এবং প্রবন্ধের বই লিখেছেন। 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ', 'দি মুন এণ্ড সিক্স পেন্স', 'দি পেণ্টেড ভেইল', 'কেকস্ অ্যাণ্ড এল', দি রেজরস এজ', 'রেইন' প্রভৃতি তার বিখ্যাত বই।

মম ১৮৭৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা দুজনেই ইংরেজ। শিক্ষালাভ হয়েছে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে। ১৮৯২ সালে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। ডাক্তারী ডিগ্রিলাভ করলেও চিকিৎসাবিদ্যা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, লেখকের পেশাই তিনি গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অব ল্যাম্বেথ' ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখকজীবনে তিনি কোনরূপ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। মম সাহিত্যরচনা ছেড়ে দিয়ে জাহাজে ডাক্তারের চাকুরী নেবেন স্থির করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তার 'লেডী ফ্রেডরিক' নাটকটি লণ্ডনের এক থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এতে তাঁর কিছুটা নাম হয়। অতঃপর এক ধনী মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। ১৯০৫ সালেই তাঁর 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সময় এই উপন্যাসটি লোকের মনে কোন সাড়াই জাগায়নি। বিশ বছর পরে আমেরিকার এক পুস্তক সংকলক ও সমালোচক এই বইকে একটি মহৎ গ্রন্থ বলে ঘোষনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই উপন্যাসটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মম বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরী নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচটি বিদেশী ভাষা ভালভাবে জানতেন। এই চাকুরী নিয়ে তিনি কিছুকাল সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় ছিলেন। যুদ্ধের পর যক্ষারোগাক্রান্ত হয়ে তিনি কয়েক বছর স্যানিটোরিয়ামে কাটান। মম স্যর উইন্সটন চার্চিলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি তার বাসস্থল ফ্রান্সের রিভিয়েরা ছেড়ে ইংলণ্ডে আসেন এবং বৃটিশ প্রচার বিভাগে যোগ দেন। এই কাজে তিনি ছয় বছর আমেরিকায় ছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে যান এবং ফ্রান্সেই গত ১৬ই ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইংরেজী সাহিত্যের 'মোপাসাঁ' মম ভিক্টোরিয়ান, এডওয়ার্ডিয়ান ও জর্জিয়ান এই তিন যুগকে তাঁর চোখের ওপর বিকশিত হতে দেখেছেন। জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, আর্ণল্ড বেনেট এবং জন গলর্সওয়ার্দি প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ তাঁর সমসাময়িক। মম

আধুনিক যুগের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক হলেও সমালোচকদের কাছে এক বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। হয়তো এজন্যই একাধিকবার তাঁর নাম প্রস্তাবিত হলেও কার্যত তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তবে মম অনেক দেশ ঘুরেছেন এবং অনেক সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান প্রধান ভাষাতেই তাঁর বইয়ের অনুবাদ হয়েছে এবং তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' বইটি প্রায় আত্মজীবনীমূলক। এছাড়া 'সামিং আপ' ও 'রাইটার্স নোটবুকে'ও তাঁর লেখক জীবনের কথা আছে। তিনি প্রথম জীবনে যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেকথা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ভোলেন নি। ১৯৬০ সালে তিনি নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ অভাবগ্রস্থ লেখকদের সাহায্যার্থে ব্রিটিশ লেখক সংঘকে সমর্পন করার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর কন্যা এর বিরোধিতা করায় তাঁকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেও মম দ্বিধাবোধ করেননি।

সূত্র : নয়া সাহিত্য (দিল্লী) জানুয়ারী ১৯৬৬

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব

গত ৬ই ডিসেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পৌরোহিত্য করেন। এই সমাবর্তনে মোট ৯৭৬ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা পান, ৩৭ জন কৃতিত্বের অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করেন এবং ২৫৮ জন কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এস, এন, দাসগুপ্ত বলেন, ভারতের আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কল্যাণী অন্যতম। বর্তমান বছরে মোট ১০৮০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬২০ জন কৃষি বিষয়ে পড়ছেন। এছাড়া গবেষণা ও স্নাতোকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন চলেছে। কৃষি গবেষণার জন্য সাজ-সরঞ্জাম সহ এখানে আঞ্চলিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ চলেছে। আগামী বছর থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে কৃষি শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। এখানে কলা, বিজ্ঞান ও কৃষি সংক্রান্ত ফ্যাকাল্টি ছাড়া সম্প্রতি পশু-বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে।

গত ১৩ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্রকুঞ্জে আঞ্চলিক কৃষি বিদ্যা উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক সুরু হয়। এতে বিহার, ওড়িশা, আসাম, নাগাভূমি ও মণিপুর রাজ্যের প্রতিনিধিগণ এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমেনন উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার মান সংক্রান্ত ইউ, জি, সি, কমিটির রিপোর্ট

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার মান সম্পর্কে ইউ, জি, সি'র রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৬১ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ অক্ষুন্ন রাখা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আজ প্রধান সমস্যা। ভারতে গত ১০ থেকে ১৫ বছরে শিক্ষার মানের

অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। শিক্ষা পরিকল্পনাকে আমাদের আরও অনেক বেশী বাস্তবানুগ এবং সম্ভাবনাময় করে তুলতে হবে। অযোগ্য ছাত্রদের পেছনে যাতে প্রভূত অপচয় না হয় এবং অনুপযুক্ত ছাত্ররা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেন, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার ঢং-এ ক্লাসে বক্তৃতাদান, তৈরী নোটের ওপর নির্ভরতা, সহায়ক পুস্তক এবং প্রশ্নসর্বস্ব পরীক্ষা-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতিরও সংস্কার করতে হবে। কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যতদিন না স্থাপিত হচ্ছে এবং শিক্ষকদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নের আশা নেই।

কমিটি বলেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভারতীয় দৃষ্টিতে আধুনিকতার বিকাশ ঘটানো এবং মননশীলতার ঐতিহ্যসৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত। এজন্য ছাত্রদের ভারতীয় ভাষাসমূহ, ইতিহাস এবং দর্শন ভালভাবে অধ্যয়ন করা উচিত হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ পরিকল্পনা

রাজ্যের ১৫টি জেলার একটি আঞ্চলিক পরিষদ এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ পাইলট প্রজেক্ট অনুযায়ী আগামী ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান সুরু হবে। প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদ এলাকায় ৩৫০টি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে এবং এজন্য বৎসরে ৪২,০০০ টাকা খরচ করা হবে। কুড়িজন ছাত্র নিয়ে এক একটি শিক্ষার্থীর দল হবে এবং একজন শিক্ষক থাকবেন। শিক্ষকগণ মাথাপিছু ৩০৲ টাকা পাবেন এবং অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০৲ টাকা। সরকারের লক্ষ্য হল ১৯৬৬-৬৭ সালে এইরূপ ১ হাজার ও ভবিষ্যতে ৫ হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং যাঁরা বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান না অনুন্নত সেইসব শিক্ষার্থীর পড়ার সুযোগ করে দেওয়া।

হুগলী জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টা

হুগলী জেলা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ পাইলট প্রজেক্টে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী অনুসারে হুগলী জেলার আদিবাসী ও হরিজন অধ্যুষিত এবং অনগ্রসর পোলবা ব্লকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি চুচুড়ায় অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা পরিষদের জন ও সমাজ কল্যাণ স্থায়ী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয়েছে যে পোলবা ব্লকের প্রায় ৭৫টি গ্রামসভায় আগামী ২৬শে জানুয়ারী নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হবে।

ডাকবাংলোর সদ্ব্যবহার

বনগাঁ মহাকুমার মোল্লাহাটি গ্রামে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে যে ডাকবাংলোটি আছে তিন বছরে তার আর্থিক আয় তেরো টাকা এবং ব্যয় এক হাজার চারশ টাকায় দাঁড়ালে চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদ ডাকবাংলোটিকে পরিষদের পাবলিক ওয়েলফেয়ার স্ট্যানডিং কমিটির হাতে সমর্পন করেছেন। বাংলোটিতে ১৪ বছরের অধিক বয়স্ক নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য জেলা পরিষদের আর্থিক সাহায্যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

চতুর্থ যোজনায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব

ইনডিয়ান ফেডারেশন অব ইউনির্ভাসিটি উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মেয়েদের শিক্ষাসংক্রান্ত এক ইউনেস্কো সেমিনারের উদ্বোধন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডঃ ডি. এস. কোঠারী বলেন, দেশে মেয়েদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষালাভের আরও সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত প্রতি পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজন মেয়ে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মেয়েই (৭%) বর্তমানে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে থাকে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা উচিত নয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব শ্রীপি. এন. কৃপাল বলেন, আগামী চতুর্থ যোজনায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস (২৮শে ডিসেম্বর) ও আনন্দবাজার (২রা জানুয়ারী)

বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন

হুগলীর মহিলা মঙ্গল সমবায় সমিতির উদ্যোগে জানুয়ারী মাস থেকে বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলটি অনুমোদন করেছেন। অবস্থা অনুকূল ছিল না বলে পূর্বে পড়াশুনা করতে পারেননি এরূপ ১৪ বৎসর এবং তদূর্ধ বয়স্কা মহিলাদের এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হবে।

সূত্র : টাইমস অব ইণ্ডিয়া (২৮শে ডিসেম্বর) ও আনন্দবাজার (৯ই জানুয়ারী)

হুগলীতে ফরাসী ভাষানুরাগীদের সভা

হুগলীর অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা ও চন্দননগরের প্রশাসক শ্রীঅজিত কুমার ঘোড়াইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফরাসী অনুরাগীদের এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের কাছে চন্দননগরের ফরাসী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব সরাসরি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভারতীয়দের উপযোগী করে 'ব্রেভে' ক্লাসের পুনর্প্রবর্তন এবং ফরাসী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য একটি পর্ষৎ গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।

সূত্র : আনন্দবাজার, ৫ই পৌষ

'কে রোখে মুক্ত স্বাধীন সত্যকে'?

বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যকে মুক্ত করার জন্য সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা সংশোধন করার বিষয় চিন্তা করছেন। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান রেডিও তার ঢাকা কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত মুখ বুজে সহ্য করবেন না। সংবাদে দেখা গেল, ঢাকার প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'ঢাকা টাইমস' সরকারী নীতির সমালোচনা করেছেন।

এদিকে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানগুলি অধিক প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে নজরুলের কবিতা ও গানগুলি অদলবদল করে প্রচার করায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাসখন্দে শাস্ত্রী-আয়ুব আলোচনা কালে প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে বলে জানা গেছে।

সূত্র : আনন্দবাজার ও যুগান্তর

হরপ্পায় প্রাপ্ত সমাধির মৃৎপাত্রের প্রদর্শনী

দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় এখন থেকে প্রতি মাসে এর মূর্তি-শিল্প, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং শিল্প সৌন্দর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সমূহের বিরাট সংগ্রহ থেকে একটি বিষয়কে বেছে নিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে বলে স্থির হয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসের বিষয়বস্তু ছিল হরপ্পায় প্রাপ্ত ৩৫০০ বছরের পুরানো সমাধির মৃৎপাত্র। এর গায়ে 'মৃত্যুর পরে জীবন' বিষয়ে চিত্রাবলী উৎকীর্ণ রয়েছে। ১৯২৭ সালে পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলার হরপ্পায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) এই মৃৎপাত্রগুলি শ্রীকে, এন শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। বিশেষজ্ঞগণ মৃৎপাত্রের গায়ের চিত্রাবলীর সঙ্গে বৈদিক যুগের সাহিত্য এবং রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। দি হিন্দু (৯ই ডিসেম্বর)

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরস্থাপত্য সম্পর্কে চিত্র প্রদর্শনী

মাদ্রাজ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় রাজাজী হলে প্রায় চারশ মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কিত চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতে পহ্লব যুগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যুগে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শিল্পের বিবরণ তুলে ধরা হয়। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম গত ১৩ই ডিসেম্বর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শনীটি চালু থাকবার কথা। দি হিন্দু (১৪ই ডিসেম্বর)

আমেরিকায় নেহেরু স্মারক প্রদর্শনী

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিষ্টরী অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে গত ২৭শে অক্টোবর নেহেরু স্মারক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এই প্রদর্শনী প্রথমে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে নিউ-ইয়র্কে চলেছিল এবং জুন মাসে প্রদর্শনীটি লণ্ডনেও দেখানো হয়েছিল। এখানে প্রদর্শনীটি ২রা জানুয়ারী (১৯৬৬) পর্যন্ত চালু থাকবে। তারপর ওয়াশিংটন থেকে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রদর্শনীটি লস এঞ্জেলস ও হাওয়াই যাবার কথা আছে।

দি হিন্দু (৮ই ডিসেম্বর)

ললিতকলা আকাদমীর সভাপতিপদে ডঃ মুলুক রাজ আনন্দ্

ডঃ মুলুক রাজ আনন্দ্ ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পাঁচ বছরের জন্য ভারতীয় ললিত কলা আকাদমীর সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া (২৮শে ডিসেম্বর)

বিশ্বভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্য

ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের স্থলে বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৬৫) ষ্টুডেণ্টস হলে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনাড়ম্বর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীওয়াই, এম, মুলে।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র বলেন—যাঁরা একবার এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁদের আর এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শিক্ষা লাভ করবার পর আমি বিভিন্ন বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনটাতেই তৃপ্তি খুঁজে পাইনি। শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে। যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন তাঁরা জানেন জ্ঞানার্জনের বিষয়ে পাঠককে সাহায্য করতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। যাঁরা এই বৃত্তিকে অন্তরের সাথে গ্রহণ করতে পেরেছেন এই আনন্দই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী ওয়াই, এম, মুলে বলেন - আজকের এই মিলনোৎসবে আমাকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে এজন্য আমি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করছি। যাঁরা এই সুন্দর সভার আয়োজন করেছেন ও পরিচালনা করছেন এবং যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

কাউন্সিলের সভা

গত ১১ই ডিসেম্বর সান্ধ্য কার্যালয়ে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল: ১। গত সভার বিবরণী অনুমোদন ২। বাজেট ৩। পরিষদের কাজকর্মের বিবরণ ৪। গ্রন্থাগার দিবস ৫। বিবিধ। সভায় মোট ২১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত হয়:—

১। সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গত সভার কার্য বিবরণী পাঠ করেন এবং পঠিত বিবরণী অনুমোদিত হয়।

২। কোষাধ্যক্ষ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬ সালের বাজেট পেশ করেন; বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতির সম্পাদক শ্রীপার্থসুধীর গুহ জানান যে, তাঁর সমিতি বাংলাভাষায় সূচীকরণের নিয়মাবলী (Cataloguing Rules) প্রণয়নের কাজে

হাত দিয়েছেন—শীঘ্রই একাজ সমাপ্ত হবে। শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ায় শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষকে এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

৪। গৃহ নির্মাণ সমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত জানান যে পরিষদ ভবনের প্ল্যান যাতে মঞ্জুর হয় সে চেষ্টা চলেছে। ১৩ই ডিসেম্বর এ সম্পর্কে একটি সভাও ডাকা হয়েছে। এই সভাতে এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৫। 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতির সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান যে, তাঁর সমিতির একটি সভা হয়েছে। তিনি সভায় প্রকাশন সমিতির কাজের বিবরণ পেশ করেন।

৬। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে।

৭। সভ্য বৃদ্ধি সমিতির সম্পাদক শ্রীসুনীলভূষণ গুহ বলেন, এখনো কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি; তবে যাতে এ ব্যাপারে শীঘ্রই কিছু করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।

৮। সহকারী সম্পাদক শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় জানান, বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় অনুষ্ঠিত হবে এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করবেন। মূল আলোচ্য বিষয় 'সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'। সেইসঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কেও আলোচনা হবে বলে স্থির হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসে সভাপতিত্ব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষাধিকর্তাকে এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীর বসু মল্লিককে অনুরোধ করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

কাউন্সিলের এই সভায় নিম্নলিখিত জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন:—

কান্দোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার (নদীয়া), তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার (২৪ পরগণা), ডুইল্যা মিলন মন্দির (হাওড়া), ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি (হুগলী), জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক (মেদিনীপুর)।

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্যদের মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কার্যকরী সমিতির সভা

গত ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির সভা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল: ১। পূর্ববর্তী সভার বিবরণী অনুমোদন ২। গ্রন্থাগার দিবস ৩। বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৪। বিবিধ। সভায় ১১ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়:—

১। ৬।১১।৬৫ তারিখের বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। গ্রন্থাগার দিবসে 'জনগণের নিত্য প্রয়োজনে গ্রন্থাগার'—এই সম্পর্কে আলোচনা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশ এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়।

৩। বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করার জন্য শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ জানান হবে বলে স্থির হয়। সম্মেলনের আলোচ্য মূল বিষয় 'পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' অনুমোদন করা হয়। সম্মেলন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থার ভার সম্পাদকের ওপর দেওয়া হয়। সভায় সভ্যবৃদ্ধি সমিতির (১৪ই ডিসেম্বরের সভা) এবং গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতির (৬ই ডিসেম্বরের সভা) কয়েকটি সুপারিশও অনুমোদিত হয়।

অন্যান্য সমিতির সভা

গত ২৫শে নভেম্বর 'হিসাব ও অর্থবিষয়ক সমিতি'র অক্টোবর মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়। হুগলী জেলার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে প্রশ্নবলী প্রেরণের (বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) ব্যয় অনুমোদিত হয়।

২রা ডিসেম্বর শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সভা হয়। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সমিতির কয়েকজন সদস্যের ওপর ভার দেওয়া হয়। তাঁরা বিশেষভাবে বিবেচনা করে সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া করবেন। খসড়াটি সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য প্রচার করা হবে বলে স্থির হয়। এই পাঠ্যক্রম বর্তমান সেসন থেকেই চালু হবে। এই সভায় বর্তমান সেসনের শিক্ষকগণ কে কি বিষয় পড়াবেন তা স্থির হয়। দুর্গাপুর এবং বেলুড় থেকে যে শিবির-শিক্ষণ পরিচালনার জন্য অনুরোধ এসেছে সে সম্পর্কে স্থির হয় যে, প্রথমে দুর্গাপুরে ক্যাম্প ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ করা হলে সরকার তা অনুমোদন করবেন কিনা এ বিষয়ে জানবার জন্য পত্র দেওয়া হবে বলে স্থির হয়।

৬ই ডিসেম্বর শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এবং তাঁর সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার ও প্রকাশন সমিতি'র সভা হয়। সমিতির সম্পাদক ষান্মাসিক বিবরণী (জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৬৫) উপস্থিত করেন। পরিষদ প্রকাশিত মোট ৮টি বইয়ের যত কপি এ পর্যন্ত বিক্রয় হয়েছে এবং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার গত ছয় মাসের বিবরণ পেশ করা হয়। প্রকাশন সমিতির সম্ভাব্য বার্ষিক বাজেট বাড়িয়ে ১১,০০০ টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সভায় কার্যকরী সমিতির বিবেচনার জন্য মোট ১১টি প্রস্তাব করা হয়েছিল তার ভেতর নিম্নলিখিত ৮টি প্রস্তাব কার্যকরী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় :—

১। পরিষদ প্রকাশিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। প্রতি বৎসর বিক্রীত পুস্তকের একটি বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। এই বিবরণী গ্রন্থকারদের কাছে পাঠাতে হবে এবং এটি পরিষদের বার্ষিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩। গ্রন্থকারদের প্রাপ্য রয়ালটি নিয়মিত মিটিয়ে দিতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা (Handbook) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। 'গ্রন্থাগার'-এর পঞ্চদশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগামী বৈশাখ, ১৩৭৩ সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশ করা হবে।

৬। 'গ্রন্থাগার'-এর গ্রাহকদের জন্য বার্ষিক ৬.০০ টাকা চাঁদা ধার্য করা হবে এবং 'গ্রন্থাগার'-এর গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এজেন্টদের ২০% কমিশন দেওয়া হবে!

৭। প্রেসের আবেদন অনুযায়ী পত্রিকা ছাপার ফর্মার রেট বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়।

৮। 'গ্রন্থাগার'-এর 'পরিষদ কথা'য় কাউন্সিল, কার্যকরী সমিতি ও পরিষদের অন্যান্য সমিতির কোন সিদ্ধান্ত ছাপার অসুবিধা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সমিতির সম্পাদক পূর্বেই 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে জানিয়ে দেবেন।

সভ্যবৃদ্ধি সমিতি

গত ১৪ই ডিসেম্বর সভ্যবৃদ্ধি সমিতির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ সভাপতিত্ব করেন। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তগুলি কতদূর কার্যকরী হয়েছে তার পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়:—

১। পরিষদের সদস্য হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে সমীক্ষার ছক প্রস্তুত করা হবে।

২। বাকী চাঁদার বিষয় জানিয়ে সদস্যদের পত্র দেবার ব্যাপারে সাহায্য করবেন সর্বশ্রী অশোক বসু, গীতা মিত্র, অমিতা মিত্র, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শীলা গুপ্ত প্রভৃতি। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই পত্র পাঠাতে হবে।

৩। গ্রন্থাগার দিবসেও বার্ষিক সম্মেলনে নতুন সদস্য হওয়ার জন্য এবং বকেয়া চাঁদা পরিশোধের জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকা মারফৎ আবেদন জানান হবে।

৪। দুই বা তিন বৎসরের চাঁদা যাঁদের বাকী আছে তাঁরা যাতে পর পর দুই বা তিনটি মাসিক কিস্তিতে চাঁদা পরিশোধ করার সুযোগ পান তার জন্য কার্যকরী সমিতির নিকট সুপারিশ করা হয়।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রবিবার রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। চব্বিশ পরগণার টাকির বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সন্তান, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও আইন সভার প্রাক্তন সদস্য হরেন্দ্রনাথ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর সমালোচনা গ্রন্থ, গীতার ভাষ্য এবং তাঁর New Menance to High School Education in Bengal—প্রভৃতি রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

চিঠিপত্রে মতামত

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)—'গ্রন্থাগারের অষ্টম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি 'গ্রন্থাগার'-এর উপযুক্ত হয়েছে'।

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ (জাতীয় গ্রন্থাগার)—...'পাঠকদের পাঠস্পৃহা ও রুচির ওপর যে দীপ্ত, মননশীল, বিশ্লেষণাত্মক ও বুদ্ধিপ্রণোদিত প্রবন্ধ রেখেছেন তার প্রশংসা না করে থাকতে পারছিনা। গতানুগতিক সম্পাদকীয়তার ক্ষেত্রে এ যেন নতুন আলোর বন্যা। খুবই ভালো লেগেছে—এ কথা জানাবার জন্যে আমার এই চিঠি। আপনার পটু হস্তে চিন্তার নবীনতায় 'গ্রন্থাগার' সার্থক হয়ে উঠুক।'

শ্রীমদন মল্লিক (তরুণ পাঠাগার, আসাননগর, নদীয়া)—'জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সকল গ্রন্থাগার কর্মীকে ৩৫৲ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা দেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য (হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)—'সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোন ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং মেডিক্যাল রিলিফ প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'।

শ্রীমোহিত মোহন দে (রাজীবপুর, হাওড়া)—'গ্রামের এক বৃহৎ অংশ লাইব্রেরীর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সর্ব প্রধান অন্তরায় হল চাঁদা, দ্বিতীয়তঃ অনভ্যাস বশতঃ বই পাঠে অনিচ্ছা তৃতীয়তঃ তাঁদের প্রতি গ্রন্থাগার কর্মীদের অসহযোগিতা। অনেকদিন চিঠি না লিখলে যেমন চিঠি লেখার অনিচ্ছা জন্মে তেমনি পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার পর বই পড়ার আগ্রহ সহজে আসে না। তাই মাঝে মাঝে সভাসমিতি করে জনসাধারণকে লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত ভাবে বই নেওয়ার অনুরোধ জানাতে হবে। গ্রন্থাগারকর্মী ও পরিচালক মণ্ডলীর এরূপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যে সফল হবে তাতে সন্দেহ নেই'।

শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার)—'এই দুর্দিনে মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা তিন মাসের বেতন বাকী হলে ২ মাসের বেতন পাচ্ছেন বলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। নতুন বেতনের গ্রেড উপযুক্ত হয় নাই। বর্তমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দিনে দুর্মূল্য ভাতার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করি'।

শ্রীনটবর রায় (ফ্রেজারগঞ্জ বিজলী ক্লাব এণ্ড রুরাল লাইব্রেরী, ফ্রেজারগঞ্জ, ২৪ পরগণা) —'গত জুলাই মাস হইতে নভেম্বর (১৯৬৫) মাস পর্যন্ত বেতন না পাইয়া অর্দ্ধাশনে ও অনশনে কালাতিপাত করিতে হইতেছে। ১৯৫৮ সাল হইতে লাইব্রেরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া প্রায়ই ৫।৭ মাস এইরূপ বেতন না পাইয়া চরম দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে'।

শেখ রওশন আলী (বজবজ, ২৪ পরগণা)—'গ্রন্থাগার'-এর ১৩৬৯ ও ১৩৭০ সালের বার্ষিক সূচীপত্র আজ পর্যন্ত আমরা পেলাম না ; যাতে তাড়াতাড়ি পাই তার ব্যবস্থা করলে বিশেষ বাধিত হব। নতুন প্রকাশিত বইগুলির নাম প্রতিমাসে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এবং বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করলে পাঠাগার গুলির উপকার হয়'।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

'গ্রন্থাগার' যাঁদের ভালো লেগেছে এবং তা আমাদের চিঠি লিখে বা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন আর যাঁরা 'গ্রন্থাগার'-এর কঠোর সমালোচনা করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই সম্পাদক কৃতজ্ঞ।

জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের নতুন বেতনক্রম সম্পর্কে আমরা যে সব চিঠি পেয়েছি তার প্রায় সবগুলির বক্তব্য একই রকম। এ সম্পর্কে পূর্বে চিঠি ছাপাও হয়েছে ; তা ছাড়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লেখা হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা যে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না এ সম্পর্কে আমরা প্রায়ই চিঠি পাচ্ছি। একমাত্র ২৪ পরগণা জেলা থেকেই আমরা এ পর্যন্ত বহু অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খুবই গুরুতর। একে সামান্য বেতন তাও যদি নিয়মিত না মেলে তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। আমরা জানিনা এই বিলম্বের উৎস কোথায়, দপ্তরের জটিল পদ্ধতি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুসীই এজন্য দায়ী কিনা! কারণ যাই হোক, গ্রন্থাগার কর্মীরা যাতে নিয়মিত বেতন পান সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'গ্রন্থাগার'-এর যে দুই বছরের সূচীপত্র এখনও সদস্যরা পাননি তা এবং বর্তমান বৎসরের সূচীপত্র চৈত্র, ১৩৭২ সংখ্যার সঙ্গে পাঠানো হবে। 'গ্রন্থাগার' সম্পর্কে যে কোন পরামর্শ পত্রিকা প্রকাশন সমিতি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন।

সূচীপত্রে এবং ভেতরে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' রূপে ছাপা হয়েছে। এটি যথার্থই মুদ্রণ প্রমাদ। এছাড়া 'ভ্রাম্যমাণ' বানান বিভ্রাট ও সূচীপত্রের চিঠিপত্র ৩২৬ এর স্থলে ৩২৫ হবে।

কভার ও ক্রোড়পত্রের ব্লক ডিজাইন করেছেন শ্রীনীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের (১৯২৫—৬৫) ও পরিষদের (১৯৩৭—১৯৬৫) সভাপতি ও সম্পাদকগণের ধারাবাহিক তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীসুকুমার কোলে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্মেলন প্রস্তুতি সংখ্যা
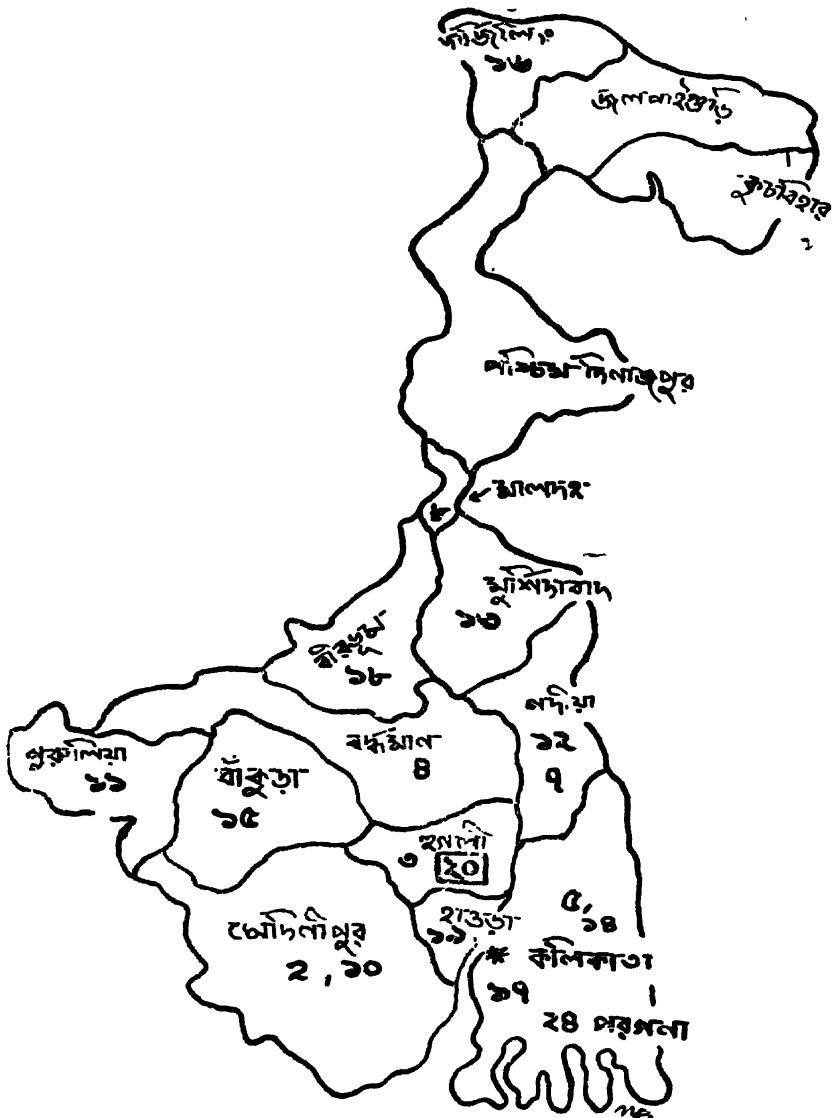
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯২৫-১৯৬৫

*ক, খ, গ, ১ম, ৬ষ্ঠ এবং ৯ম—কলিকাতা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—১৯২৫-১৯৬৫

অধিবেশন	বৎসর	স্থান	সভাপতি
ক	১৯২৫	কলিকাতা	জে, এ, চ্যাপম্যান (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী)
খ	১৯২৮	ঐ	প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)
গ	১৯৩১	ঐ	নিউটন মোহন দত্ত (বরোদা)
১	১৯৩৭	ঐ	এ, কে, ফজলুল হক,
২	১৯৩৮	মেদিনীপুর	ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৩	১৯৪১	বাঁশবেড়িয়া, হুগলী	বি, আর, সেন
৪	১৯৪৪	বর্ধমান	কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়
৫	১৯৪৬	আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা	?
৬	১৯৫০	কলিকাতা	অপূর্ব কুমার চন্দ
৭	১৯৫৩	শান্তিপুর	ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮	১৯৫৪	মালদহ	অনাথ নাথ বসু
৯	১৯৫৫	খিদিরপুর, কলকাতা	প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
১০	১৯৫৬	কাঁথি, মেদিনীপুর	প্রমীল চন্দ্র বসু
১১	১৯৫৭	পুরুলিয়া	বি, এস, কেশবন
১২	১৯৫৮	নবদ্বীপ	ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন
১৩	১৯৫৯	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ	কাজী আব্দুল ওদুদ
১৪	১৯৬০	ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা	ডঃ শচীদুলাল দাশগুপ্ত (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
১৫	১৯৬১	বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া	রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
১৬	১৯৬২	শিলিগুড়ি	সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
১৭	১৯৬৩	কাকদ্বীপ	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
১৮	১৯৬৪	সিউড়ি, বীরভূম	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯	১৯৬৫	শ্যামপুর, হাওড়া	অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু

বিংশ সম্মেলনের সভাপতির পরিচয়

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী,

বি এ.; ডিব. লিব. এস সি, সার্ট-ইন-ফ্রেঞ্চ, গ্রন্থাগারিক
অর্থমন্ত্রক গ্রন্থাগার, ভারত সরকার, নয়াদিল্লী (১৯৪৫-)
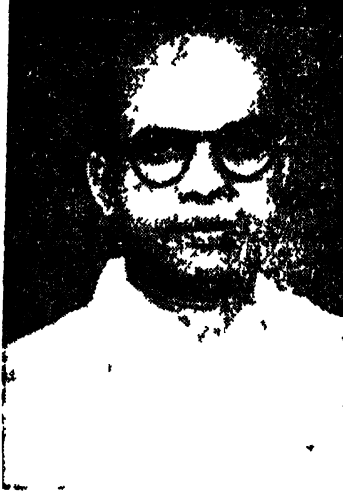
জন্ম—১৯১৫, ১লা জানুয়ারী। শিক্ষা - ঢাকা, কলিকাতা ও নয়াদিল্লী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুরজাসুন্দরী স্মৃতি বৃত্তি লাভ।

পনের বৎসর বয়সে ঢাকায় স্বীয় গ্রামে হরিজনদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ১৯২৯ সালে 'নবীন ব্রতী সংঘ' এবং এর লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। এটি একটি বিপ্লবী সংগঠন এবং পরে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। অনেক জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নয়াদিল্লীর সোসাল সার্ভিস লীগ (১৯৪৩-) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং সহঃ-সভাপতি।

অনারারী রেজিস্ট্রার,—গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ইন-সার্ভিস-পোষ্ট-গ্রাজুয়েট লাইব্রেরী সায়েন্স কোর্স (১৯৫০-৬০),

সহঃ-সভাপতি - গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯৫৬-) ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (১৯৬০-৬৪), ইয়াসলিক (১৯৬১-)

চেয়ারম্যান—ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন—এডিটোরিয়াল বোর্ড (১৯৬৪-)

ভিজিটিং প্রফেসর অব লাইব্রেরী সায়েন্স এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষক।

গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরীর বিকাশ সম্পর্কে এবং শিক্ষা প্রসঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

হুগলী জেলায় পরিষদের বর্তমান অবস্থা ঃ প্রতিষ্ঠান সদস্য সংখ্যা

হুগলী জেলার জনসংখ্যা ২০, ৩৮, ৪৭৭ (১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী) ; অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নের সংখ্যা ৭, ৭৩, ২৯২ ; আয়তন ১, ২১৬ বর্গ মাইল ; পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা ৩০৩ ; কলেজ গ্রন্থাগার ১৪টি অনুমোদিত ও ২টি অননুমোদিত ; বিশেষ গ্রন্থাগার ৪টি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০-র মত।

এই জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান সদস্যের সংখ্যা বর্তমানে ১৮০। এর ভেতর ১৭৩টি পাবলিক লাইব্রেরী ও ৭টি স্কুল বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। এই সব প্রতিষ্ঠান কোন সময়ে পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ নীচে দেওয়া হল (১৯২৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছরের একটি বিভাগ করা হয়েছে।

১৯২৫—১৯৩০	×
১৯৩১—১৯৩৫	২
১৯৩৬—১৯৪০	৮
১৯৪১—১৯৪৫	২
১৯৪৬—১৯৫০	১০
১৯৫১—১৯৫৫	৯১
১৯৫৬—১৯৬০	২৮
১৯৬১—১৯৬৫	৩৯
মোট ৪০ বৎসরে	১৮০

হুগলী জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গ্রন্থাগার

হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী, চুচুড়া	(১৮৫৪)
কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী	(১৮৫৮)
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী	(১৮৫৯)
শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী	(১৮৭১)
চন্দননগর পুস্তকাগার	(১৮৭৩)
বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী	(১৮৯১)
শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি	(১৮৯১)
জামগ্রাম নন্দী লাইব্রেরী	(১৮৯৪)

Present position of the Association in the District of Hooghly.

একটি অবিস্মরণীয় সভা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত উনবিংশ শতাব্দীতেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির একান্ত নির্ভরশীল বাহক গ্রন্থাগারের নবরূপায়ণ সুরু হয় আমাদের দেশে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষায়তনে, বিদ্বৎসমাজে এবং ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগার স্থাপন হতে থাকে এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের একক আত্মপ্রকাশ বোধ হয় সর্বপ্রথম হয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায়। এরপর বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় জনচেতনা জাগতে জাগতে অনেকগুলি বছর পার হয়ে যায়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়। (ভাঃ গ্রঃ পঃ-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ সাল)

এই পরিষদ সংগঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিতে শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকরূপে শ্রীদেব রায়ের নাম সর্বজনবিদিত। তাঁর সাংগঠনিক কাজ সুরু হয় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এরই উদ্বোধনী সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আলোচিত হয়। গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাসে এই সভাটি তাই অবিস্মরণীয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ও ২৯শে মার্চ বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর আহ্বানে এই সম্মেলন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অধিবাসী স্বনামধন্য শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ জে, এ, চ্যাপম্যান এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধক এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় এবং কুমার মুনীন্দ্র দেবরায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী দেশ ও জাতির পক্ষে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার কত মহামূল্যবান তা বোঝাবার জন্য বলেন, 'as well kill a man as kill a good book.' সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে জার্মানীর প্রতি সহরে দু তিনটি করে people's library আছে এবং সে সমস্ত লাইব্রেরী হতে বহু ছেলেমেয়ে শিক্ষা লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করেন দেশ গঠনের অনেকখানি দায়িত্ব গ্রন্থাগার বহন করতে পারে। শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায় যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীর গ্রন্থাগার প্রিয়তার চিত্রটি তুলে ধরেন এবং বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বলেন. "What is wanted is proper organisation co-ordination and co-operation among all the librarians in the Country. There ought to be a central organisation with a net work of branches thorughout the country."

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহঃ-সম্পাদক শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমূহের সুসংযোগ স্থাপনের জন্য বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন এবং আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টার ফল সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলী জেলার বলিষ্ঠ অধিনায়কত্বের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন "During the last twenty four years I have been to various places within the province and can make bold to say that there are few libraries in the district of Hooghly which have hardly any peers in Bengal. The libraries at Uttarpara, Baidyabati and Chandernagar deserve special mention in this connection."

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ চ্যাপম্যান বোদেলিয়ান বা ব্রিটীশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর মত বড় লাইব্রেরী এদেশে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। চিন্তাশীল সাহিত্য সাধক শ্রীহরিহর শেঠ বলেন. 'সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সংগঠনের অন্যতম প্রধান কাজ হবে জেলার গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা এবং গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে দেওয়া, কারণ তার অভাবে বহু গ্রন্থাগারকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায়।' অধ্যক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র রায় এবং আরও অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন সম্পর্কীয় প্রস্তাব। প্রস্তাবে শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), শ্রীগুরুদাস রায় (বলাগড়) শ্রীহরিহর শেঠ (চন্দননগর), শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় (বাঁশবেড়িয়া) শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (বৈদ্যবাটী), শ্রীদুর্গাদাস ব্যানার্জী (হুগলী), শ্রীসতীশ চন্দ্র মোদক (হুগলী), শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখার্জী (রাধানগর) এবং বাঁশবেড়িয়ার পাবলিক লাইব্রেরীর যুগ্ম-সম্পাদককে নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করা হয় এবং এর ওপর পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বলা হয় যে নব গঠিত হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ পরিষদের একটি শাখা হবে।

অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে (১) সমাজ সেবা ও শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা করা (২) আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণে সাহায্য করা, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা, (৪) পুস্তক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সুসংযোগ স্থাপন করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপরূপে সুচিহ্নিত থাকবে এই সভা। এর প্রত্যক্ষফলস্বরূপ ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতার এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হলেন পরিষদের প্রথম সভাপতি। শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায় অন্যতম সহ-সভাপতি এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক অন্যতম সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হলেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে দীপটি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যা আজও অনির্বাণ, তার দীপ্তছটায় সমগ্র বাংলা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

An unforgettable meeting

পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

মুখবন্ধ

শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ অংশে প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছিল। বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় অনেকে সেটির স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। সেজন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সেটিকে এই সম্মেলনের মূল-আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। বিষয়টি হোল সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Integrated Library System)।

প্রথমে আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য বিষয়টির সংজ্ঞা বিশ্লেষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অর্থ হোল: It is a co-operative and organic structure in which every unit, however small, is as rich as the whole system. A system allows for a balanced and even development of library services over large areas, irrespective of local differences in wealth. A system is more effective because it permits indroduction of library services based on modern concepts of service and approved standards. A system is comparatively more economical to develop.

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ও একটি পরিকল্পনা রচনা করেন।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ১টি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও ৫০৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাণীপুর ও কালিম্পঙে প্রতিষ্ঠিত দুটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলকভাবে দুটি আঞ্চলিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Pilot Project for Integrated Library System) প্রবর্তিত হয়েছে। এছাড়া সরকারী উদ্যোগে সম্প্রতি কয়েকটি মহকুমা গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বেসরকারী প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে অনেক গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়।

বর্তমান অবস্থার ত্রুটি

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সরকারী প্রচেষ্টাকে বহুবার অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার পিছনে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা পরিদৃষ্ট হয় না।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। সেগুলির অস্তিত্ব ও কার্যক্রম পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। জনশিক্ষার বিস্তার পরিকল্পে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে যদি সামাজিক নরী

(Social Investment) হিসাবে দেখা যায় তাহলে বিচার করা দরকার যে সমাজ সেগুলি থেকে লগ্নীর অনুপাতে কি পরিমাণে ফল লাভ করছে। কর্মপরিসরের সম্ভাব্য ও যথোচিত সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে লগ্নীকৃত সম্পদ ও সামর্থ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার ও উপকারিতা অর্জনই লক্ষ্য হওয়া দরকার। কার্যতঃ দেখা যায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমবায়িক সম্পর্ক তথা সুসংবদ্ধতা না থাকায় সেগুলির কর্মপ্রচেষ্টা সীমিত ও তাদের অস্তিত্ব ক্ষীণকায় এবং রাজ্যের সমগ্র সম্পদ ও শক্তির যথোচিত সদ্ব্যবহার হচ্ছে না।

সংগঠন ও পরিকল্পনায় ত্রুটি থাকার দরুণ দেখতে পাওয়া যায়ঃ

১। রাজ্যের সর্বস্থানের সকল অধিবাসীর পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না; ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জনপদের বাসিন্দাদের নিকট গ্রন্থ-বিতরণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

২। বহু বিষয় বা ধরণের বই কেনা সকল গ্রন্থাগারের পক্ষে সাধ্যের অতীত। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকার ফলে গ্রন্থ-বিনিময়ের মাধ্যমে সে-সমস্যার সমাধান বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে এখন যে গ্রন্থ-ঋণের ব্যবস্থা আছে তা খুবই সীমাবদ্ধ।

৩। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক কোনও সম্পর্ক না থাকার ফলে গ্রন্থ, শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের দ্বিত্ব ঘটে।

৪। উপযুক্ত ও কুশল কর্মীর অভাবে বহু গ্রন্থাগারেরই পরিচালন ব্যবস্থায় নানাবিধ ত্রুটি লক্ষিত হয়। শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সঞ্চালন ব্যবস্থার সাহায্যে ঐসব অসুবিধা অনায়াসেই কাটিয়ে ওঠা যায়।

ত্রুটির সমাধান

ত্রুটিবিচ্যুতির সামগ্রিক পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য ধনী-নির্ধন, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (Library Service) সুযোগ-সুবিধা পৌঁছিয়ে দেওয়া। আলোচনার দ্বিতীয় দিক হোল ঐ লক্ষ্যের অনুকূলে একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, (Choice of technique) যেটি এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

গ্রন্থাগাব সম্পর্কিত সর্ববিধ প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান সুরচিত একটি গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমেই যে সম্ভব সেকথা সর্বস্বীকৃত। আইনের বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীনে রয়েছে। কিন্তু যতদিন না আইন বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালেও রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে একটি system-এ অন্তর্ভুক্ত করার কোনও বাধা নেই যাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের পথে সাধ্যমত অগ্রসর হওয়া যায়।

উপরিউক্ত system-কে একটি বৃহৎ সেচকর্মের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেখানে বিশাল বাঁধের সাহায্যে সৃষ্ট একটি জলাশয় থেকে কৃষিক্ষেত্রের যে কোনও জমিতেই জলসিঞ্চন করা যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি অনেকটা সাবেকি আমলের পুকুর বা ইঁদারার মত, যেখান থেকে বৃহৎ কৃষিভূমির প্রতিটি খণ্ডে সেচের জল

পৌঁছয় না। গ্রন্থাগারগুলিকেও আধুনিক সেচ পদ্ধতির মত গড়ে তুলতে হবে, যাতে রাজ্যের প্রতি অঞ্চলের অধিবাসীই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান। সেজন্যে কেন্দ্রানুগ একটি কাঠামোর মধ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে সংবদ্ধ করা দরকার।

সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার মোটামুটি রূপ

রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিচালনা করবেন। তদধীনে পর্যায়ক্রমে থাকবে জেলা, মহকুমা গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নীতিনির্ধারণ, গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংরক্ষণ, টেকনিক্যাল বিষয়ে পরামর্শদান প্রভৃতি ছাড়াও সমগ্র ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক হতে হবে। জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে।

জেলা গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব ও কার্যপরিসর আরও ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ হবে। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্রন্থ-বিনিময়ের সুবিধার্থ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে একটি জেলা ইউনিয়ন ক্যাটলগ রাখতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কর্তৃক নির্বাচিত গ্রন্থ ক্রয়, বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি কাজ জেলা গ্রন্থাগার থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐসব বাঁধা ধরা কাজ থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে পাঠকদের প্রতি অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত ভাবে দৃষ্টি দিতে পারবেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজ শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদিতেও তাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ব্যয় করতে পারবেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় শেষোক্ত কাজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

যেসব সুদূর অঞ্চলে গ্রন্থাগার নেই সে সব স্থানের নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় সপ্তাহে নির্দিষ্ট কোনও দিনে গ্রন্থবিতরণের ব্যবস্থা জেলা অথবা গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী থাকা দরকার। গ্রন্থ বিতরণের জন্যে প্রেরিত কর্মীরা শ্রবদৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জ্ঞাতব্য নানাবিষয় পরিবেশন করতে পারবেন।

গ্রন্থাগার মানচিত্রের পরিবর্তন

একই জেলায় এখন কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক জেলা গ্রন্থাগার দেখতে পাওয়া যায়। প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে একই জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একাধিক থাকা সমীচীন নয়। জেলার আয়তন বৃহৎ অনুভূত হলে কর্মপরিসর অনুযায়ী স্বতন্ত্র Library-District সৃষ্ট হতে পারে। থানা এলাকা অনুযায়ী গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা যায় অনেক থানা এলাকায় কোনও গ্রামীণ গ্রন্থাগার নেই, অথচ একই থানা অঞ্চলে একাধিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সীমানা পুনর্নির্ধারণে কোনও বাধা নেই।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুফল

১। জনসাধারণ এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত উপকৃত হবে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীই বঞ্চিত হবেন না। সকল স্থানের অধিবাসীদের নিকট গ্রন্থ বিতরণের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারের; জেলা গ্রন্থাগার অথবা গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে সুবিধানুযায়ী সুদূর অঞ্চলের অধিবাসীদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

২। যে-কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যে-কোনও গ্রন্থ পেতে সমর্থ হবেন; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত রাজ্যের সমুদয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ভাণ্ডার তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ব্যবহৃত হবে।

৩। গ্রন্থ, শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জাম ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী সংগ্রহে ব্যয়ের দ্বিত্বই শুধু নয়, অর্থাভাব জনিত ঐসব বস্তু সংগ্রহের সমস্যারও সুরাহা হবে।

৪। কুশল কর্মীর অভাবে এখন অধিকাংশ গ্রন্থাগারের কার্য প্রণালী উন্নত নয়। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে বহু জরুরী বিষয়ই উপেক্ষিত থাকে। নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, পুস্তক-সমালোচনা সভা, প্রমোদানুষ্ঠান প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন সহজ ও সম্ভব হবে যদি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে কর্মী সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এক স্থানের কর্মী অপর স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানকার কার্যসূচীকে উন্নত করে তুলতে পারেন। কর্মীদের দিক থেকেও পদোন্নতি, কর্মকুশলতা প্রদর্শনের সুযোগ এবং বেতন সম্পর্কিত সমতা ও অন্যান্য সুবিধা অর্জন সম্ভব হবে।

উপসংহার

রাজ্যব্যাপী এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণের উপকার লাভ ছাড়াও অর্থনৈতিক দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। কর্মী, উপকরণ ও সম্পদের যথোচিত ব্যবহার ও সঞ্চালন (Economy and mobility of men, materials and resources) ব্যবস্থা পূর্ব কথিত সামাজিক লগ্নীকে লাভজনক করে তুলবে।

বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি আংশিকভাবে এই ব্যবস্থার সুফল পেতে পারেন। গ্রন্থ ও সরঞ্জামের সুবিধা পাওয়া গেলেও তাঁদের পক্ষে শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের নিয়মিত সাহায্য পাওয়া system-এর সহিত অঙ্গীভূত না হলে সম্ভব হবে না।

প্রস্তাবিত রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব যেমন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের উপর ন্যস্ত থাকবে, তেমনি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্তৃত্ব জেলা গ্রন্থাগারিকের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে ন্যস্ত না হলে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্য ব্যাহত হবে। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে একটি করে প্রতিনিধিত্বমূলক উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হওয়া সমীচীন।

Key note to the Twentieth Bengal Library Conference

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিকা

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(মর্ম)

স্কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি এবং স্কুল গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি? গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া নয়, গ্রন্থাগারের কাজ হল যারা পড়তে চায় তাদের পাঠের সুযোগ করে দেওয়া। স্কুল-কলেজ সৃষ্টি হবার বহু পূর্বে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠের পার্থক্য আছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমরা পাই বিগত যুগের উত্তরাধিকার-সূত্রে, তা কখনোই আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা নয়। একমাত্র সেই শিক্ষাই যদি আমাদের সম্বল হয় তা হলে সারাজীবনই আমাদের পরের ধনে পোদ্দারী করে নিজেকে প্রতারণা করতে হয়। তাহলে আমাদের পুরানো পৃথিবীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়—মানব সভ্যতার আর অগ্রগতি হয় না। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে সমাজের প্রয়োজনে মানুষ গড়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বিশেষ কোন এক ধরণের শিক্ষা না পেলে ব্যক্তির পক্ষে সমাজে স্থান করে নেওয়া সম্ভব নয়।

স্কুলের শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা থাকে। সে পাঠে স্বাধীনতা থাকেনা। পাঠ্যপুস্তকের লেখককেও সত্যিকারের লেখক বলা চলেনা। স্কুলের গ্রন্থাগারের কাজ হবে ছাত্রদের সঙ্গে পুস্তকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়ে ছাত্রদের মধ্যে অবাধ পাঠাভ্যাসকে জাগানো। সেজন্য স্কুল থেকেই ছাত্রদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে। স্কুল ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সংগে এক করে দেখা কখনই উচিত হবে না। ভারতের মত অনুন্নত দেশে স্কুলের গ্রন্থাগারের চেয়েও আগে নজর দিতে হবে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

চঞ্চল কুমার সেন

(মর্ম)

মানব জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বালকত্বের গণ্ডী পেরিয়ে ছাত্র যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয় তখন তার মধ্যে একটা অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। গ্রন্থাগার এই অনুসন্ধিৎসা মিটাতে সক্ষম। মুদালিয়ার কমিশন ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারের প্রযোজনীয়তার উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অর্থ সাহায্যের দ্বারা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়।

ছাত্রদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য পড়বার মত অধিক সংখ্যক বই এর প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং একটা বেতনক্রম স্থির করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২০%. বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা ১০০০-এরও কম। গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(মর্ম)

দৃষ্টিহীনদের কাছে এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অক্ষরের সাহায্যে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। ব্রেইল পদ্ধতি তাদের এই অন্ধকার ঘুচাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত অধিক। একার পক্ষে এই ব্যয় বহন করা অসম্ভব। এই জন্য প্রয়োজন ব্রেইল গ্রন্থাগারের। তাই অন্যান্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মত অন্ধ-বিদ্যালয়েও ব্রেইল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যালয়ের সবচেয়ে সহজগম্য ঘরটিকে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। Closed access system-ই এই বিষয়ে উপযুক্ত। Sheaf Catalouge দৃষ্টিহীনদের পক্ষে সহায়ক। যেখানে বিদ্যালয়ের ভবনটি দুই বা তিন তলায়, সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা শ্রেণী গ্রন্থাগার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকায় ডাকযোগে বিনামাশুলে ব্রেইল গ্রন্থ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বৃটেনে পাঁচ পাউণ্ড পর্যন্ত ব্রেইল গ্রন্থ প্রেরণ করতে কোন ডাক মাশুল লাগে না। ভারতবর্ষে শুধু সাত কিলোগ্রাম পর্যন্ত ব্রেইল গ্রন্থ বিনা ডাক মাশুলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা যায়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থগার ঃ মানবজীবনের আলোকবর্তিকা

মনোরঞ্জন. জানা

(মর্ম)

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ঃ

গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগারের আঙ্গিক রূপ সুন্দর ও পরিপাটি করে তোলা যেমন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তেমনি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত মানুষ করে তোলাও গ্রন্থাগারের একমাত্র পরোক্ষ লক্ষ্য।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ঃ

গ্রন্থাগারের লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য সকলের সমবেত ও সহযোগিতা পূর্ণ প্রচেষ্টা চাই। এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে গ্রন্থাগারিককে, শিক্ষককে, কর্তৃপক্ষকে ও অভিভাবককে।

পুস্তক নির্বাচন, পত্র ও পত্রিকা সংগ্রহ এবং ক্রয়, গ্রন্থাগারের বিচিত্র সম্ভার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সভা ও আলোচনা, পুস্তকপাঠে আগ্রহী করার জন্য গল্পবলা, Display board-এ নানারূপ সংবাদ পরিবেশন করা, সংগৃহীত মালমশলা হতে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী সারাংশ আত্মস্থ করার শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি হবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধান কার্য ক্রম।

সমাজ ও গ্রন্থাগার

নির্মলেন্দু মান্না

[নিজবালিয়া (হাওড়া) সবুজ গ্রন্থাগার বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে ছারহাটায় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু নিয়ে প্রদর্শনী সচিব এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি দীর্ঘ বলে এখানে শুধু প্রবন্ধের মর্ম প্রকাশ করা হল।

প্রদর্শনীর চিত্র সংগ্রাহক ও পরিচালক শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, ব্যবস্থাপনায় আছেন শ্রীশিবেন্দু মান্না ও ডঃ অজিত কুমার মাইতি এবং সহযোগিতায় নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দ।]

সমাজের জন্য কি দিয়েছি আমরা? জীবনের যোগ সূত্র দেশ থেকে দেশান্তরে যুগ থেকে যুগান্তরে বিস্তৃত। পারস্পরিক নির্ভরতা, অজ্ঞাত সহানুভূতি ও অদৃশ্য সহযোগিতার ওপর ভর দিয়ে মানবসমাজ চলেছে। মানুষের মন চায় প্রকাশ। মানুষের মানস সম্পদ রক্ষিত হয়েছে গ্রন্থাগারে।

হাজার বছর ধরে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সমাজ বাইরের জিনিষ বিশাল, অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত। গ্রন্থাগার মনের জিনিষ। মানুষ একদিকে স্বতন্ত্র আর একদিকে সামাজিক। গ্রন্থাগারে চলে তার একদিকে সামাজিক হবার ও অন্যদিকে স্বতন্ত্র হবার সাধনা।

সভ্যতার দুরন্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে নিঃস্ব, রিক্ত এবং অসহায় মনে করে। এই রিক্ততা ও অসহায়তা থেকে মুক্তি দিতে পারে এ যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মিলন কেন্দ্র গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের কর্মধারা বহু দিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। গণতন্ত্রের মৌল শিক্ষা মানুষ লাভ করবে গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগার থেকে সমস্যার সম্মুখীন হবার মত সাহস ও জ্ঞান সঞ্চার করে মানুষ যেন তার নিজস্ব জ্ঞান ও বিচার ক্ষমতার জোরে আপন আপন পথে চলতে পারে। গ্রন্থাগার অপেক্ষা করে আছে কবে সেই কর্মী আসবেন ও সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাধনা করবেন, গ্রন্থাগার হবে তাঁর জীবন সংগ্রামের সাথী, প্রিয়তম বন্ধু।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকগণ ১৯২৫-১৯৬৫

সভাপতি		সম্পাদক	
*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯২৫	সুশীল কুমার ঘোষ	১৯২৫—৩১
কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়	১৯৩৩—৪০	তিনকড়ি দত্ত	১৯৩৫—৩৮
রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৯৪১—৪৩	ডঃ নীহার রঞ্জন রায়	১৯৩৯—৪৩
কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়	১৯৪৩—৪৫	বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৪—৫০
অপূর্ব কুমার চন্দ	১৯৪৬—৪৭		
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়	১৯৪৮—৫১	অনাথ বন্ধু দত্ত	১৯৫১
অপূর্ব কুমার চন্দ	১৯৫২	প্রমীলচন্দ্র বসু	১৯৫২—৫৩
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়	১৯৫৩	প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৪
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৫৪		
প্রমীলচন্দ্র বসু	১৯৫৫—৫৮	ফণিভূষণ রায়	১৯৫৫—৫৬
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৫৯	রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী-বিশ্বাস	১৯৫৭—৫৮
তিনকড়ি দত্ত	১৯৬০—৬১	ফণিভূষণ রায়	১৯৫৯
শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৬২	বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৬০

* প্রথম সভাপতি ও সম্পাদকের নাম এই তালিকাভুক্ত করা হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তখন পরিষদের নাম ছিল নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ। এখন জানা গেছে, ১৯৪৬ সালে আড়িয়াদহে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকগণের এই তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এখন দুরূহ ব্যাপার। পরিষদের মুখপত্রে সন-তারিখ সহ নাম প্রায়ই উল্লেখ করা হয়নি; পরিষদের বার্ষিক বিবরণী, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক-পত্র থেকেও সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র ৪০ বছরের এবং তারো কম সময়ের ইতিহাস এখন রীতিমতো গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই তালিকাটি যথাসাধ্য সঠিকভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং শ্রদ্ধেয় প্রমীল চন্দ্র বসু মহাশয় দেখেও দিয়েছেন তবু মনে হয় এই তালিকায় অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে কারো যদি কোন সূত্র জানা থাকে সে সম্পর্কে জানালে বাধিত হব।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

: সম্মেলন ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিনিধিদের ১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টার মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

সম্মেলনের উদ্বোধন সকাল ৯ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

: পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠান) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের জন্য দুই টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

: প্রতিনিধি ও দর্শকদের নিজস্ব বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে।

: থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

: প্রতিনিধি ও দর্শকদের কেবলমাত্র থাকাখাওয়ার জন্য জনপ্রতি মোট ৪ টাকা করিয়া লাগিবে।

: যাতায়াতের পথনির্দেশ—হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথের হরিপাল স্টেশনে নামিতে হইবে। হাওড়া হইতে হরিপালের দূরত্ব ৪২ কিঃ মিঃ।

গাড়ীর ভাড়া—
প্রথম শ্রেণী : ৩ টাকা ৬২ পয়সা
তৃতীয় শ্রেণী : ৮৭ পয়সা

(পূর্ব রাত্রে পৌছিতে না পারিলে সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৬-১৬ মিনিটে হাওড়ায় গাড়ী ধরা সুবিধাজনক)

হরিপাল হইতে পৃথক বাসে দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনষ্টিটিউশনে যাইতে হইবে। বাসের ভাড়া ৩২ পয়সা।

: সম্মেলনের প্রতিনিধি ফি ও থাকাখাওয়ার জন্য দেয় টাকা ১২ই ফেব্রুয়ারী নাম তালিকাভুক্ত করিবার সময় দিতে হইবে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের নাম ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্মসচিবের (C/o রাজেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন, ডাকঘর দ্বারহাট্টা, জেলা হুগলী) নিকট জানাইতে হইবে।

: যাঁহারা ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা পৌছাইবেন তাঁহাদিগকে পূর্বে জানাইতে হইবে।

: যাঁহারা ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা পৌছাইবেন তাঁহাদিগকে পূর্বে জানাইতে হইবে। এবং উক্ত বেলার জন্য পৃথক ১·০০ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

: অন্যান্য সংবাদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ (ফোন : ৩৪-৭৩৫৫) সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

ক্রোড়পত্র

পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট

একটি প্রস্তাব

বিগত বর্ষে শ্যামপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য-প্রবন্ধের অন্যতম একটি বিষয় ছিল এই রাজ্যের অধিবাসীদের পঠনপাঠনের মান ও গতি সম্পর্কে পর্যালোচনা। সম্মেলনে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এই মর্মে যে প্রতি জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পাঠক ও সদস্যদের নিকট হতে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা হবে । প্রস্তাবটিকে রূপায়ণের কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিমধ্যে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন ।

কিন্তু তথ্য সংগ্রহ কেবলমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও বিস্তৃততর একটি নমুনা সমীক্ষার আয়োজন বাঞ্ছনীয়। কাজটি কিছুটা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ বলে পরিসংখ্যান প্রস্তুতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে এটিকে গ্রহণের জন্যে অনেকে অনুরোধ করেছেন। পঠনপাঠন সম্পর্কিত এধরণের নমুনা সমীক্ষা এরাজ্যে সম্প্রতিকালে হয়নি ।

প্রস্তাবিত সমীক্ষার প্রয়োজন ও উপকারিতা সুদূরপ্রসারী। এর সাহায্যে শিক্ষাসংস্কৃতির মান ও গতি পরিমাপ করা এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ হবে। বলা বাহুল্য সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার দিক থেকে এটি এখন খুবই জরুরী। তাছাড়া গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসারের প্রয়োজনেও তা' গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণকে গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই সঠিক তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা। তাই নমুনা-সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন ।

কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব কে নেবে? লোক চাই, টাকা চাই, পরিচালক চাই। গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে এককভাবে এ-দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সকল গ্রন্থাগারের কাছে তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা পঠনপাঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত এই নমুনা সমীক্ষার কাজে এগিয়ে আসুন। তাঁদের কাছ থেকে এবিষয়ে কিছুটা সাড়া পাওয়া গেলে পরিষদ অনতিবিলম্বে এই প্রকল্পে অগ্রসর হবেন। যে-ছকের সাহায্যে কাজটি করতে হবে তার একটি খসড়া মুদ্রিত হোল ।

কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে খসড়া নির্দেশ ঃ

১ নির্দিষ্ট একটি এলাকা বেছে নিতে হবে। রাস্তা অনুযায়ী আরও কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ঐ এলাকার শুধু স্থায়ী পরিবারগুলিকে গণনা করে ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি দশটি পরিবারের সংখ্যাগুলি থেকে একটিকে লটারী পদ্ধতিতে নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। লটারীতে যে-সংখ্যাটি উঠবে সেই সংখ্যা-সংশ্লিষ্ট পরিবারকে নমুনারূপে বিবেচনা করে সেই পরিবার থেকেই কেবল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সারা গ্রামে পাঁচশত পরিবার থাকলে পঞ্চাশটি হবে সমীক্ষার নমুনা পরিবার। মনে রাখা দরকার যে একই বাড়ী অথবা ফ্ল্যাটে একাধিক পরিবার থাকতে পারে। পৃথক হেঁসেল দ্বারা তা নিরূপিত হবে।

২ সেই এলাকার নমুনা পরিবারের কেবল কুড়ির উর্ধ্ব বয়স্ক সাক্ষর সকল ব্যক্তির তথ্য পরিবারের গৃহকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে হবে।

৩ ছকটি পূরণ করবেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রেরিত কর্মী। প্রশ্নদাতা নন।

৪ ছকের উপরের অংশটি লিখতে হবে; নীচর অংশে সংশ্লিষ্ট '☐' ঘরগুলির মধ্যে কেবল একটি '×' চিহ্ন দিতে হবে। 'না' হলে না-এর ঘরে; 'হাঁ' হলে হাঁ-এর ঘরে '×' চিহ্ন বসবে। অনুরূপ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘরগুলি পূরণ করতে হবে। কালি দিয়ে সুস্পষ্টরূপে লেখা আবশ্যক।

৫ একাজে পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য নিষ্ঠাবান কুশল কর্মীদের নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কর্মীদের ধৈর্য সহকারে, মিষ্ট বাক্যালাপের মধ্যে দিয়ে তথ্যগুলি জানা দরকার। তাঁদের পরিচালনা করবেন গ্রন্থাগারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। তাঁকে প্রথমে সমস্ত কাজটা কর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কাজের খতিয়ান নেওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে একত্র বসে আলোচনা করতে হবে। কিছু কিছু তথ্য তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে গিয়ে মিলিয়ে দেখবেন।

৬ যথাসম্ভব সঠিক তথ্য পাওয়া দরকার।

৭ রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কিংবা সকাল ও সন্ধ্যায় লোকের অবসর ও সুবিধা অনুযায়ী তাঁদের বাড়ী যাওয়া ভাল।

৮ মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নদাতা হয়ত

(ক) সহজে ও সোজাসুজিভাবে উত্তর দেবেন না ; অথবা

(খ) বিরক্তির ভাব দেখাবেন কিংবা লজ্জায় উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করবেন ; বা

(গ) আজ নয় কাল বলে সময়ক্ষেপ করবেন ; কিংবা

(ঘ) সমাদর জানাবেন না।

৯ যে গ্রন্থাগার এই সমীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রথমত এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মনে রাখতে হবে যে একাজটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দিয়ে করাতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত সামান্য কিছু খরচের প্রয়োজন হলে সে ব্যয়বহনের জন্যে তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

১০ ছক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পাঠাবে। ছক যেন অপচয় না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিকে নির্বাচিত এলাকার সাক্ষর নমুনা অধিবাসীর আনুমানিক সংখ্যা অনুযায়ী ছকের জন্যে পরিষদকে লিখতে হবে।

১১। ছকগুলি পূরণ হয়ে গেলে পরিষদের কাছে ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী সেগুলি ফেরৎ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিষদ সকলের নিকট হতে গৃহীত ছকের ভিত্তিতে সমগ্র অবস্থার একটি পরিসংখ্যান ও বিবরণ সঙ্কলন করবেন।

১২ কাজটি এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করা বাঞ্ছনীয়।

বলা বাহুল্য পরিসংখ্যান বিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও অর্থ আমাদের না থাকায় সমীক্ষায় কিছু 'টেকনিক্যাল' ত্রুটি থাকতে পারে। সেই ত্রুটি আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের দ্বারা শোধন করব। আশা করি গ্রন্থাগার কর্মীরা এই যৌথ প্রচেষ্টায় নিজেদের অংশীদার করবেন।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

[ছকটি চূড়ান্ত নয়, কর্মীদের অভিমত অনুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষ]

ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা র প রি ষ দ

পঠনপাঠন সম্পর্কে নমুনা সমীক্ষার ছক

এলাকা…… ……[গ্রাম/ওয়ার্ড] ক্রমিক সংখ্যা…… ……নমুনা পরিবার সংখ্যা…… · ……

সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির নাম……………………………………………………

ঠিকানা……………………………………………………………………

শিক্ষার মান……………………… পেশা……………………………

বয়স (২০ বৎসরের ঊর্ধ্বে হবে)……………পুরুষ ☐ মহিলা ☐

সংশ্লিষ্ট এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

স্কুল………কলেজ………কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান………গ্রন্থাগার…………

(কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ☐ চিহ্নিত স্থানের ভিতর × চিহ্ন বসবে)

১ **আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন ?** হাঁ ☐ না ☐

১১ যদি পড়েন :

১১১ কিভাবে ? নিয়মিত ☐ মাঝে মাঝে ☐

১১২ কতখানি ? বিস্তারিত ☐ আংশিক ☐

১১৩ কোন্ ভাষায় ? বাংলা ☐ ইংরেজী ☐ হিন্দী ☐ উর্দু ☐ অন্যান্য ☐

১১৪ কোন্ বিষয়ে আগ্রহ বেশী ? প্রধান খবর ☐ খেলাধুলা ☐ সিনেমাথিয়েটার ☐ প্রবন্ধ ☐ সম্পাদকীয় ☐ চিঠিপত্র ☐ বিজ্ঞাপন ☐ অন্যান্য ☐

১২ যদি না পড়েন, তার কারণ :

১২১ সময়াভাব ☐ অর্থাভাব ☐ অনভ্যাস ☐ অন্যান্য ☐

২ **আপনি কি সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়েন ?** হাঁ ☐ না ☐

২১ যদি পড়েন :

২১১ কিভাবে ? নিয়মিত ☐ মাঝে মাঝে ☐

২১২ কতখানি ? বিস্তারিত ☐ আংশিক ☐

২১৩ কোন্ ভাষায় ? বাংলা ☐ ইংরেজী ☐ হিন্দী ☐ উর্দু ☐ অন্যান্য ☐

২১৪ কি জাতীয় ? সাপ্তাহিক ☐ পাক্ষিক ☐ মাসিক ☐
ত্রৈমাসিক ☐ অন্যান্য ☐

২১৫ কি বিষয়ের ? সাহিত্য ☐ সিনেমাথিয়েটার ☐
খেলাধুলা ☐ কারিগরি ☐ শিল্পকলা ☐
বিজ্ঞান ☐ সমাজ বিজ্ঞান ☐
ধর্মদর্শন ☐ অন্যান্য ☐

২২ যদি না পড়েন, তার কারণ ঃ

২২১ সময়াভাব ☐ অর্থাভাব ☐ অনভ্যাস ☐ অন্যান্য ☐

আপনি কি বই পড়েন ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩১ যদি পড়েন ঃ

৩১১ কোন্ ভাষায় ? বাংলা ☐ ইংরেজী ☐ হিন্দী ☐
উর্দু ☐ অন্যান্য ☐

৩১২ কোন্ সময় ? অবসর সময়ে ☐ ছুটির দিনে ☐
ট্রামে-বাসে-ট্রেনে ☐

৩১৩ কি বিষয়ের ? গল্পোপন্যাস ☐ সাধারণ সাহিত্য ☐
কবিতা ☐ ক্রীড়া ☐ কলা ☐
ধর্মদর্শন ☐ কারিগরি ☐ বিজ্ঞান ☐
ভ্রমণ ইতিহাস ☐ সমাজবিজ্ঞান ☐

৩২ যদি না পড়েন, তার কারণ ঃ

৩২১ সময়াভাব ☐ অর্থাভাব ☐ অনভ্যাস ☐ গ্রন্থাগারের অভাব ☐

আপনি কি কোনও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪১ যদি করেন

৪১১ কোথাকার গ্রন্থাগার স্থানীয় ☐ অফিসের ☐ স্কুলকলেজের ☐

৪১২ সেখানে প্রয়োজনীয় সব বই কি পান ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪১৩ কিভাবে ব্যবহার করেন ? গ্রন্থাগারে পড়েন ☐ বাড়ীতে বই আনেন ☐

৪১৪ গ্রন্থাগারের কী কী ত্রুটি দেখেন ? ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থা ☐
লোকাভাব ☐ অর্থাভাব ☐ অন্যান্য ☐

৪২ যদি না করেন, তার কারণ ঃ

৪২১ গ্রন্থাগার না থাকা ☐ দূরত্ব ☐ চাঁদার বাধা ☐ অন্যান্য ☐

৫ আপনি কি নিম্নখাতে অর্থব্যয় করেন ? হাঁ ☐ না ☐

৫১ বই কেনায় ঃ নিয়মিত ☐ অনিয়মিত ☐

৫২ পত্রিকা কেনায় নিয়মিত ☐ অনিয়মিত ☐

৫৩ সংবাদপত্র কেনায় নিয়মিত ☐ অনিয়মিত ☐

৬ অধুনা প্রকাশিত বাংলা বই সম্পর্কে আপনার অভিমত

৬১ বইয়ের সংখ্যা ঃ পর্যাপ্ত ☐ কম ☐

৬২ বইয়ের মান ঃ সন্তোষজনক ☐ অসন্তোষজনক ☐

৬৩ বইয়ের বিষয় বৈচিত্র্য ঃ পর্যাপ্ত ☐ কম ☐

৬৪ বইয়ের মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই সন্তোষজনক ☐ অসন্তোষজনক

৭ সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির অন্যান্য মতামত [যদি থাকে]

সমীক্ষা পরিচালনকারী গ্রন্থাগারের ষ্ট্যাম্প
[নাম ঠিকানা সহ]

তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীর সাক্ষর
সাক্ষাতের তারিখ.........

জরুরী বিজ্ঞা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন

আগামী ২৭শে মার্চ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা (১৯৬৬) হবার যে কথা ছিল তার নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে :—

তারিখ— ১৭ই এপ্রিল রবিবার
সময়— বৈকাল ৫টা
স্থান— স্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়ার)

মনোনয়ন পত্র, বার্ষিক কার্যবিবরণী ও সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভ্যদের নিকট ১৫ দিন পূর্বে পাঠানোর কথা। বর্তমান গোলযোগের জন্য তা যথাসময়ে পাঠানো যায়নি বলে তারিখ পরিবর্তন করতে হয়েছে। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ—১১ই এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ—১২ই এপ্রিল। প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৩ই এপ্রিল।

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব
১৯।৩।৬৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বার্ষিক ছুটির তালিকা—১৯৬৬

ইংরাজী নববর্ষ দিবস	১লা জানুয়ারী
নেতাজীর জন্মদিন	২৩শে জানুয়ারী
ইদ-উল-ফিতর	২৪শে জানুয়ারী
প্রজাতন্ত্র দিবস	২৬শে জানুয়ারী
দোলযাত্রা	৭ই মার্চ
গুড ফ্রাইডে	৮ই এপ্রিল
চৈত্র সংক্রান্তি	১৪ই এপ্রিল
বাংলা নববর্ষ দিবস	১৫ই এপ্রিল
মহরম	২রা মে
রবীন্দ্র জন্মদিবস	৯ই মে
স্বাধীনতা দিবস	১৫ই আগষ্ট
জন্মাষ্টমী	৭ই সেপ্টেম্বর
মহালয়া	১৩ই অক্টোবর
দুর্গাপূজা (ষষ্ঠী থেকে একাদশী)	১৯শে অক্টোবর
লক্ষ্মীপূজা	২৮শে অক্টোবর
কালীপূজা	১১ই নভেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস	২০শে ডিসেম্বর
খ্রীষ্ট জন্মদিবস	২৫শে ডিসেম্বর

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীপঞ্চমী ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে পড়ায় এবং গান্ধিজীর জন্মদিন ২রা অক্টোবর রবিবার হওয়ায় ঐ দুদিন এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১১ } ১৩৭২, ফাল্গুন

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ বিগত দিনের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের গ্রন্থাগারিক ॥

'তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা'—রবীন্দ্রনাথ।

সেদিন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারকর্মীদের তরফ থেকে জনৈক প্রবীণ ও খ্যাতকীর্তি গ্রন্থাগারিককে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হল। সম্প্রতিকালে কলকাতায় গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগে আয়োজিত আর কোন সভায় এত অধিক জনসমাবেশ ঘটেনি। সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিতে উঠে বহুকষ্টে উদ্গত অশ্রু দমন করে অভিভূত বৃদ্ধ গ্রন্থাগারিক আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেন যে তিনি জীবনে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনেক সম্মানই এ পর্যন্ত পেয়েছেন; কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তাঁর আপণ বৃত্তির লোকেদের—নিজের ভাইদের কাছ থেকে পাওয়া এই সম্মানকেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে বোধ হচ্ছে। তাঁর এই উক্তি যথার্থই সত্য। সারা দেশ যাঁকে বিবিধ সম্মানে সম্মানিত করেছে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় তাঁকে সম্মানদান হয়তো সমুদ্রে বারিবিন্দুর অর্ঘ্য দেওয়ার সামিল বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যিনি এই সম্মান পেলেন এবং যাঁরা এই সম্মান দিলেন তাঁদের কারো কাছেই এটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আপণ বৃত্তির লোকদের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান যেমন একজনের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে মনে হয়েছে তেমনি সেই সর্বজনবন্দিত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার বৃত্তির লোক বলে সম্মান জানিয়ে গ্রন্থাগারকর্মীরা নিজেদেরই গৌরবান্বিত করেছেন। এটি তাঁদের অন্যতম কর্তব্য বলে বৃত্তির মুখপাত্র হিসেবে গ্রন্থাগার পরিষদেরও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে।

আজ গ্রন্থাগারবৃত্তিকে স্বদেশে ও বিদেশে একটি মহান বৃত্তি বলে মনে করা হচ্ছে এবং এই বৃত্তি অনেকের নিকট আকর্ষণীয় বলেও বোধ হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর কেন, পনের বছর আগেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগারবৃত্তি এতটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। বিগত দিনের যাঁরা গ্রন্থাগারিক সুখেই হোক, দুঃখেই হোক তাঁরা তাঁদের কর্মের দিনগুলি অতিক্রম করে এসেছেন। আজ হয়তো অতীত স্মৃতির অধিকাংশই তাঁদের কাছে সুখস্মৃতি না হলেও পিছনে ফেলে আসা অতীতকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব। বর্তমানের গ্রন্থাগারিকের সামনে আজ অনেক সমস্যা। আধুনিক সমাজের পটপরিবর্তন ঘটছে দ্রুতবেগে। গ্রন্থাগারের

সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখা বর্তমানের গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। একদিকে বৃত্তিগত জটিলতা বৃদ্ধি ও অন্যদিকে খাওয়া-পরা, গৃহ, শিক্ষা, পরিবার প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তার সমস্যা তাঁদের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থাগারিকেরাও সমাজেই বাস করেন। আর এ সকল সমস্যাই সমাজ থেকে উদ্ভূত বলে সমস্যা এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই। আর আমাদের অনেক লক্ষ্যপূরণের সম্ভাবনাই বর্তমানে সুদূরপরাহত। অসংখ্য সমস্যাজর্জরিত বর্তমানের গ্রন্থাগারিকদের বৃহদংশ আজ পরাজিতের হতাশা ও আশাভঙ্গের বেদনা বহন করে চলেছেন।

অবশ্য হতাশা, বাধা-বিঘ্ন ও সাময়িক পরাজয়কে অগ্রাহ্য করে প্রাণবন্ত মানুষের দল অতীতে এগিয়ে গেছে এবং বর্তমানেও যাবে। বর্তমান যুগে যে কোন স্বাধীন দেশে ডাক্তার যন্ত্রবিদ্, আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক এবং আরো বহু বৃত্তির লোকেরই নিজেদের সমস্যা সমাধানের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বৃত্তিধারীদের সমস্যা আজ আর কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে ও আবদ্ধ নয় এবং আজ বৃত্তিধারীদের আন্তর্জাতিক সংস্থারও অভাব নেই। আজ বৃত্তির মানোন্নয়ন, বৃত্তির মর্যাদাবৃদ্ধি ও বৃত্তি স্বার্থরক্ষা তথা বৃত্তিধারীদের জীবনের মানোন্নয়ের প্রচেষ্টা প্রত্যেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থারই লক্ষ্যের মধ্যে থাকে।

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার পর আমরা স্বাধীন হয়েছি। আজ নয়া ভারতের উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। বিগত যুগ অতীত হয়ে গেলেও তার কিছু প্রত্যক্ষ ফলও আমাদের ভোগ করতে হয়। অতীতকে ভুলে গেলে চলেনা, কেননা অতীত চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। আর ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আজ যা বর্তমান, কাল তাই অতীতে পরিণত হয় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ অধিকার করে বর্তমান কালের স্থান।

মানুষ তার ভবিষ্যৎকে নিজেই গড়ে। আবার আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাই হয়তো এক পুরুষেও পূর্ণ হয়না; তাই পিতা পুত্রের মধ্য দিয়ে—প্রবীণ নবীনের মধ্যদিয়ে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চান। আর ভবিষ্যৎ আছে বলেই মানুষ আশায় বুক বাঁধে। বর্তমানে আমরা যে আশা পূরণ করতে সমর্থ হইনা তা পূরণের জন্য আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভবিষ্যতের ওপর। আশার কথা, আজ দেশে গ্রন্থাগারিকদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি যদি গুণগত না হয়ে কেবল পরিমাণগত হয় তাহলে তা গ্রন্থাগারিকদের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারবে কিনা সন্দেহের বিষয়। যে হারে গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা বাড়ছে সে তুলনায় গ্রন্থাগারবৃত্তির উন্নয়নে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়েছে কিনা এবং পূর্বের তুলনায় তাঁরা এ ব্যাপারে অধিক সংখ্যায় আগ্রহী হয়েছেন কিনা এটা লক্ষ্য করার বিষয়। তবে ভবিষ্যতের গ্রন্থাগারিক যে আরও অধিক সংখ্যায় বৃত্তিগত মেজাজের (Professional spirit) অধিকারী হবেন ও বৃত্তিগত কর্তব্য (Professional duty) সম্পাদনের উপযুক্ত হবেন এবং সে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকতর সুযোগ-সুবিধাও পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে অনাগত দিনগুলির দিকে সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা তাকিয়ে থাকব।

Editorial: Librarians of yesterday, today and tomorrow.

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভূমিকা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

স্কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি তা ঠিকমত জানতে হ'লে, স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে স্কুলের গ্রন্থাগারের কাজের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন; কেবল তাই নয় শিক্ষার জন্য পাঠ এবং সাধারণ পাঠের জন্য পাঠ এ দুটির মধ্যে তফাৎ কোথায় তাও জানা প্রয়োজন। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, স্কুলের গ্রন্থাগারের সত্যিকারের কাজ কি, এবং স্কুলের গ্রন্থাগারের স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাই দেখান।

শিক্ষার জন্যে পাঠ এবং পাঠের জন্য পাঠ এই দুই ধরনের পাঠ এক নয়। শিক্ষার জন্য পাঠ ও পাঠের জন্য পাঠকে এক করে দেখা হয় বলেই গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে ভুল করা হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া নয়। গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে যারা পড়তে চায় তাদের পাঠের সুযোগ দেওয়া। পাঠের সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া এ দুটি এক নয়, কেন তা আমি পরে বলছি।

স্কুল কলেজের এবং গ্রন্থাগারের উন্নতির ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে এ দুটিই সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু দুটির সৃষ্টির কারণ ভিন্ন, এবং স্কুল কলেজ সৃষ্টি হবার পূর্বেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'য়েছে এ কথাও সত্য। স্কুলের সৃষ্টি হ'বার পূর্বেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টির প্রধান কারণ হ'চ্ছে, সে যুগের মানুষেরা নির্ধারিত পাঠ্য অনুযায়ী পাঠ পছন্দ করতো না। তাদের ধারণা ছিল এ ধরণের পাঠের দ্বারা সত্যিকারের জ্ঞানার্জন হয় না। শিক্ষার জন্যেও পাঠের প্রয়োজন এবং জ্ঞানার্জনের জন্যেও পাঠের প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের পরিমাণ বেশী এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পাঠ হ'লো গুণাত্মক। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠে স্বাধীনতা থাকে না কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পাঠের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে। ফলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যে পাঠ, সে পাঠ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং সে পাঠের প্রয়োজনও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। শিক্ষার জন্য যে পাঠ তা সম্পূর্ণভাবে সমষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শিক্ষার জন্যে যে পড়া, তা পড়তে হয় বলে পড়া কিংবা সমাজের প্রয়োজনে পড়া। সুতরাং শিক্ষার জন্য যে পড়া তা সামাজিক পাঠ এবং ব্যক্তিগত পাঠ সম্পূর্ণভাবে অসামাজিক কারণ "La lecture est par excellence l'occupation solitaire. L'homme qui lit ne parle pas, s'isole du monde qui l'entoure, n'agit pas, se retranche de ses semblables"—অর্থাৎ পড়বার সময় সম্পূর্ণ নির্জনতার প্রয়োজন। যে পড়ে, সে কথা কয় না, পৃথিবী থেকে এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেয়—সে যখন পড়ে তখন সে সম্পূর্ণভাবে একা। তার "বাহিরের" তখন সম্পূর্ণভাবে মৃত্যু হয় তখন থাকে কেবল সে "নিজে"।

শিক্ষার সংজ্ঞা হ'চ্ছে, "The art of making available to each generation the organised knowledge of the past." এই সংজ্ঞা যদি সত্য হয় তা' হ'লে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার কোনই প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং সে শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন সম্বন্ধ থাকে না। সে শিক্ষা আমরা পাই বিগত যুগের উত্তরাধিকার সূত্রে। সেই শিক্ষার ভিত্তিতে যখন আমরা চিন্তা করতে থাকি তখন সে চিন্তা হয় "thinking something without actually thinking it through. (This) is our usual way of thinking." তা' হ'লে সে ধরনের চিন্তা আমাদের নিজস্ব চিন্তা বলে মনে হলেও আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা নয়। সে চিন্তার আমাদের Reality'র সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে থাকে না। ফলে শিক্ষাই যদি আমাদের চিন্তাধারার একমাত্র সম্বল হয় তা হ'লে সারা জীবনই আমাদের পরের ধনে পোদ্দারী করে নিজেকে প্রতারণা করতে হয়। আমাদের আগের মানুষেরা যে পৃথিবীর সৃষ্টি করে গেছে সেই পৃথিবীর মধ্যেই যদি আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকি তা হ'লে আমাদের নিজস্ব সত্বাকে পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। অর্থাৎ আমি যে "আমি" আমি যে "অন্য" নই তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। এভাবে মানব সভ্যতার অগ্রগতি হয় না। মানুষ যদি নিজের পৃথিবী সৃষ্টি করতে না পারে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নিয়েই যদি সে সন্তুষ্ট থাকে, সেই সম্পত্তির মধ্যেই মানুষ যদি তার জীবনের reality'র সমুদয় সমস্যার সমাধান পায় তাহলে মানুষেরও মৃত্যু হয়; মানুষের সমাজেরও মৃত্যু হয়। কারণ সমাজ তখন হয় অনড়, অচল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এধরণের যুগ আসে নি তা নয়। যে সব যুগকে আমরা স্বর্ণ যুগ বলে আখ্যা দি' সেই স্বর্ণ যুগই হ'লো এই ধরনের যুগ। এ যুগের মানুষ সুখী মানুষ, কিন্তু static. কারণ তাদের জীবনে সমস্যা নেই, ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন থাকে না—শক্তিক্ষয় হ'তে থাকে চরিত্রের অবনতিতে, আনন্দে, স্ফূর্তিতে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সামাজিক করে তোলা। মানুষকে সামাজিক করে তোলা মানেই ব্যক্তিকে সমষ্টির অঙ্গীভূত করা। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না কারণ সে হয় সমষ্টি। তার চিন্তাধারাও আর ব্যক্তিগত হয় না। কারণ সে সমষ্টির অংশ। সমষ্টি যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, ব্যক্তিও তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীন। চলতি প্রবাদেই আছে—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। অর্থাৎ দশজনের একজন হয়ে কাজ করলে নিজেকে প্রতারণা করার সুবিধা হয় কারণ নিজের কাজের জন্যে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

আধুনিক সমাজের লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসা। যুগ যুগ ধরে মানুষের সমাজ এই চেষ্টাই করে আসছে। কিন্তু সমাজের সে চেষ্টা সফল হয় না। যখনই মানুষের সমাজ একটা নিশ্চল অবস্থায় এসে পড়ে তখনই তার পতন আসে। কারণ তখনই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার ফলে সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মূলে থাকে কয়েকজন স্বাধীন চিন্তাশীল

ব্যক্তি—তারা নিজেকে প্রতারণা করতে শেখে নি। তারাই মানুষের সমাজে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে মানুষের সমাজকে আবার গতিশীল করে। মানুষের পৃথিবীকে নতুন রূপ দেয়।

এত কথা বলার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহ'লে কি শিক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই? শিক্ষারও প্রয়োজন আছে কিন্তু তা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, তা সমাজের প্রয়োজনে। প্রাচীন যুগে এ প্রয়োজন ছিলনা। তখন সমাজের চাহিদা ছিল সরল; ফলে মানুষের জীবনেও জটিলতা ছিলনা। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে কৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হ'তে থাকল, ফলে জনসংখ্যাও কেন্দ্রীভূত হলো। বিজ্ঞান ও Technology-র উন্নতির ফলে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। মানুষের জীবনের সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে আজ বিশেষ কোন এক ধরণের শিক্ষা না পেলে ব্যক্তির পক্ষে সমাজের অঙ্গে স্থান করে নেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি হ'য়েছিলো এখন সমাজের প্রয়োজনে মানুষ গড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সমাজের অঙ্গীভূত না হ'তে পারলে ব্যক্তিকে আর জায়গা দেওয়া সম্ভব হ'লোনা।

স্কুলের গ্রন্থাগার রাখা প্রয়োজন কিন্তু কেন? পাঠ্য অনুযায়ী পাঠ প্রস্তুত করবার জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা রয়েছেন; গৃহশিক্ষক রয়েছেন; পিতামাতা রয়েছেন এবং রয়েছে পাঠ্য পুস্তক। তাহলে গ্রন্থাগারের আবার প্রয়োজন কিসের? ছাত্রেরা যখন সমাজের প্রয়োজনে পড়ছে তখন যা তাদের শেখান হচ্ছে বিনা প্রশ্নে তারা তা শিখছে। একবারও তখন তারা প্রশ্ন করেনা দুই আর দুয়ে কেন চার হয়। "রাম বড় সুবোধ ছেলে সে যাহা পায় তাই খায়"—এ কথা যখন তাদের শেখান হয়, রাম গাঁজা গুলি চরস পর্যন্ত খায় কিনা ছাত্রেরা একবারও সে প্রশ্ন করেনা। তখন গ্রন্থাগার এ শিক্ষার মাধ্যমে কি কাজ সম্পন্ন করতে পারে? ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা স্কুলের গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয় খুব জোর শিক্ষায় সাহায্য কারী কয়েক খানি Referene book গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে। তাহলে ছাত্রেরা স্কুলের গ্রন্থাগারে কেনই বা আসবে। এবং কি বই পড়তে আসবে? তাদের এই বাড়তি পাঠের উদ্দেশ্য বা কি হ'বে। আর পড়তে শিখলেই বা ছাত্র পড়বে একথাও কিছু সত্য নয়।

স্কুলের পাঠের চরিত্র কি তা আমরা বলেছি। স্কুলের শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা থাকে; স্কুলে পড়া সমাজের একটা রীতি তাই সকলে স্কুলে যায়। এ অবস্থায় পাঠে স্বাধীনতা থাকেনা এবং ব্যক্তিগত রুচিরও কোন মূল্য থাকেনা। ফলে স্কুলের শিক্ষায় ছাত্রদের পাঠ অভ্যাসে (as a generic habit) দাঁড়ায় না স্কুলের গণ্ডি পার হলেই ছাত্ররা বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দেয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পাঠ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হয়, পাঠ যদি ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী হয়, পাঠের মধ্যে যদি কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহ'লে বইয়ের সঙ্গে যে পরিচয় হয় সে পরিচয় সহজে ভোলা যায় না; কারণ তাতে বইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হয়। সে সম্বন্ধে মানুষের "ভিতর" গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত সত্বার উপলব্ধি হয়।

শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধ এবং লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ এক নয়। শিক্ষক শিক্ষার ভার যখন নিয়েছে তখন পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিতে বাধ্য। ছাত্রও পাঠ্য পুস্তক পড়তে বাধ্য কারণ সে শিক্ষা নিতে এসেছে।

লেখক কিন্তু ইচ্ছে করলে লিখতেও পারে নাও লিখতে পারে। পাঠক তেমনি ইচ্ছে করলে পড়তে পারে নাও পড়তে পারে। সুতরাং লেখক এবং পাঠকের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তা সম্পূর্ণভাবে gratuitous. কোন পাঠ্য পুস্তকের লেখককে সত্যিকারের লেখক বলা চলেনা। লেখক বলতে একখানি বইয়ের সৃষ্টি কর্তা। সৃষ্টি তখনই সত্যিকারের সৃষ্টি হয় যখন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা থেকে আলাদা করে দেখা হয়না। একই শ্রেণীর কোন একখানি পাঠ্যপুস্তক যে কোন লোক লিখতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবেনা, বা নষ্টনীড়ের স্থান আর কোন বই অধিকার করতে পারবেনা। কিন্তু একখানি ইতিহাসের বইয়ের স্থলে অন্য এক খানি ইতিহাসের বই একই কাজ করতে পারে। সেই জন্যে সত্যিকারের সৃষ্টিকে পাঠক যখন সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে থাকে, তখন তার মন সৃষ্টির আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। বইখানিকে সৃষ্টি করতে করতে সে নিজেকেও সৃষ্টি করে। যখন সে পড়ে, বাহিরের কোন প্রভাব তার উপরে পড়েনা। তখন থাকে পাঠক "নিজে" এবং পুস্তকের অন্তর্গত পৃথিবী।

স্কুলের কাজ কি এবং পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ছাত্রদের সম্বন্ধ কি তা বলা হ'ল। এখন দেখা যাচ্ছে স্কুলের ক্ষেত্রে, অন্ততঃ শিক্ষার সঙ্গে স্কুলের গ্রন্থাগারের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। স্কুলের গ্রন্থাগারের কাজ ছাত্রদের সঙ্গে পুস্তকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়ে ছাত্রদের মধ্যে পাঠ অভ্যাসে দাঁড় করান। তা করতে গেলে স্কুলের গ্রন্থাগারে যে সকল বই থাকবে তা হবে ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী। শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী নয়। গ্রন্থাগারে এসে ছাত্রেরা যে সব বই পড়বে তার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ছাত্ররা বই বেছে নেবে। এই ভাবে ছাত্ররা আপনা থেকে বুঝতে পারবে তারা বই থেকে কি পেতে পারে, কেন তাদের বই পড়া দরকার। ক্রমশঃ বই পড়া তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্কুলের গণ্ডি পার হ'য়েও তারা বই খুঁজে বেড়াবে।

জন-সাধারণের গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ হ'চ্ছে জন-সাধারণের সাধারণ পাঠের চাহিদা যোগান। কিন্তু পাঠের ক্ষমতা জন-সাধারণ যেখান থেকে অর্জন করেছে, সেখান থেকেই পাঠ যদি অভ্যাসে না দাঁড়ায় তা হ'লে সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রে জন-সাধারণের গ্রন্থাগারের আর কোন কাজই থাকে না। জন-সাধারণের গ্রন্থাগার হয়ে দাঁড়ায় একটা Information Centre —যেটা এই গ্রন্থাগারের কার্যক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ এবং যেটা চলো বিশেষ গ্রন্থাগারের (Special libraries) কাজ।

স্কুল থেকেই ছাত্রদের জন-সাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। এখন কি জন-সাধারণের গ্রন্থাগারে স্কুলের ছাত্রদের পড়বার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার। এ কথা মনে রাখতে হবে যে দেশে শিক্ষার বিস্তার হ'চ্ছে। নিরক্ষরতা যখন কমছে তখন জন-

সাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা বাড়ান সম্ভব কিন্তু সে ভার জন-সাধারণের গ্রন্থগারের নয় সে ভার স্কুলের গ্রন্থাগারের। "My own view is that one of the functions of the public library in Africa should be to follow up mass education programmes by providing books of all types, so that what has been learnt in adult education classes is not immediately forgotten through lack of reading materials (Unesco : Development of libraries in Africa. The Ibadan Seminar)। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মন্তব্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি ঐ একই মন্তব্য স্কুলের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ যারা নতুন পড়তে শিখেছে তাদের জন্য স্কুলের গ্রন্থাগারে যথেষ্ট পরিমাণে সব রকমের বই না রাখলে তাদের পড়বার প্রেরণা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হ'বে না। কেবল তাই নয় "Education has caught on in Africa but many Africans do not realise the connection between education and what we call reading habit"—সুতরাং শিক্ষা পেলেই যে পাঠ অভ্যাসে দাঁড়াবে তা ঠিক কথা নয় এবং স্কুল থেকে পাঠ অভ্যাসে দাঁড়ায় না তার কারণ "This is because in schools and adult classes the reading habit is not sufficiently nurtured"। স্কুলের গ্রন্থাগারের এটা যে একটা প্রধান কাজ তা আমরা সবিস্তারে বলেছি।

স্কুলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা যত কথাই বলিনা কেন, এবং স্কুল ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারের যত উন্নতি করবার চেষ্টা করিনা কেন, গ্রন্থাগারকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক করে দেখলে স্কুলের ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ সত্যিকারের কি তা আমরা মোটেই বুঝতে পারব না। পাঠের অভ্যাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত একথা ভুললে গ্রন্থাগারের মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় হবে না।

যুগ যুগ ধরে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পেয়ে আসছি যদি তাকেই সম্বল করে জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ করতে প্রয়াস করি তা'হলে মানুষের জীবনে আর কোন reality থাকেনা। অথবা ব্যক্তিগত reality-কে উপলব্ধি করতে দেওয়াই গ্রন্থাগারের কাজ। সমাজ যেখানে এক ছাঁচে মানুষ গড়তে চাইছে, সমাজ যেখানে equality-র প্রচার করছে অথচ তার লক্ষ্য হ'চ্ছে sameness-এর দিকে সেখানে গ্রন্থাগারের কাজ হ'চ্ছে Counteract করা এবং পুতুল না গড়ে মানুষ গড়বার চেষ্টা করা—কিন্তু এর মূলে রয়েছে স্কুলের গ্রন্থাগার।

সুতরাং স্কুলের গ্রন্থাগারের দিকে নজর না দিয়ে, অন্ততঃ অনুন্নত দেশে, জন-সাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে তোলবার চেষ্টা করা—ঠিক গাড়ী না কিনে ঘোড়া কেনার মত। ঘোড়াকে দানা-পানি খাইয়ে যেতে হবে। তাকে গাড়ী যে কবে টানতে হ'বে তার কোন ঠিক নেই। আমাদের দেশে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে তা যে কেবল খরচ করে ঘোড়া পোষা হ'চ্ছে তা Unesco-র উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায়। Africa ও ভারত উভয় দেশই অনুন্নত দেশ। যে অর্থ জন-সাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে তোলবার জন্য খরচ করা হ'চ্ছে যদি তার একটা নগণ্য অংশ স্কুলের গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে খরচ করা হ'তো তা হ'লে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিত—এমন ধোঁয়াটে হ'তো না।

The Role of School Libraries in the Field of Public Libraries

By—Rajkumar Mukhopadhyay

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

চঞ্চলকুমার সেন

মানবজীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে করতে শিশু বালকে পরিণত হয়, বালকাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয় এবং বয়ঃসন্ধির গণ্ডী পেরিয়ে যৌবনের দিকে এগিয়ে চলে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে সাধারণতঃ ১৬ বছর পার হয়ে যায়। আমাদের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে ঐ বয়সটাই প্রাপ্ত বয়স্কের মানদণ্ড। "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ" অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সে মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ঐ সময় থেকে সে যদি পুত্রও হয় তাহোলে তার সাথে বন্ধুর মত, মিত্রের মত ব্যবহার করা উচিত।

স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষের এই দ্রুত পরিবর্তনকে স্থিতপ্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদেরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ছাত্রছাত্রীদের বয়সের এবং মনের পরিবর্তনকে মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে শিক্ষককে শিক্ষাদানে তৎপর হতে হবে। বালকত্বের গণ্ডী পেরিয়ে ছাত্র যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয় তখন তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। এমন অনেক তত্ত্ব ও তথ্য তখন সে জানতে চায় যা তার নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পর্যায়ে পড়ে না এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেও সব সময় সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় না। আর এই কারণেই শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষককে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনকে আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না। Extra-curricular activities এর ব্যবস্থাও তাই আজ বিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকেও আজ সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীলক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র তাঁর রিপোর্টে এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ :—

"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল দেখলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ পাঠস্পৃহা বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক; আর এই কাজের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন—"**The establishment of an intelligent and effective library service**".

ভারত সর কারের' ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং'-এর পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিসটিকাল ডিপার্টমেন্ট পশ্চিম বাংলার শতকরা ৬০ ভাগ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় সার্ভে করে সম্প্রতি "Educational Facilities Available in the Higher Secondary Schools in West Bengal (1963-64)" নামে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এই রিপোর্টে গ্রন্থাগারের বিষয়ে বলা হয়েছে :—

..."The library of a school may be regarded as another index of teaching facilities. Every school should possess a well-equipped library. The school library should possess several copies cf each of the book recommended by the Board of Secondary Education in addition to books of reference and other books of general interest to students. Students should be encouraged to develop the habit of general reading and every effort should be made to induce the student to use the school library properly. For all this it is unecessary to appoint a whole time and trained librarian who will be placed in charge of the library. The school library should be accomodated in a spacious room. There should be separate period for use of library by students in the school routine."

মুদলিয়র কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা দেশে একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এই সব বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ। ঐ টাকায় পর্ষৎ অনুমোদিত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স এবং অন্যান্য পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়। যেটুকু বা সম্ভব তাও হয়ত অনেক বিদ্যালয়ে সংগৃহীত হয়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এ বিষয়ে মোটেই আশাপ্রদ নয়। Educational Facilities Available in the Higher Secocdary Schools in West Bengal-এ এবিষয়ে বলা হয়েছে :—"The situation regarding library stocks is worse in rural regions particularly in remote areas. One third of boys' and girls' schools possess only half or less of texts and reference books recommended by the Board of Secondary Education..."

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির সম্পাদক শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বশেষ প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষক সমিতির সহায়তায় ২২০০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুদ্রিত প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিলেন। ২২০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৯৩টি বিদ্যালয় থেকে উত্তর এসেছে। এর থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগারের প্রতি ঔদাসিন্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অনুগ্রহ করে যে সব বিদ্যালয় প্রশ্নাবলীর উত্তর পাঠিয়েছেন তাঁদের উত্তর বিশ্লেষণ করলে জানা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই বইয়ের অভাব, বই রাখবার স্থানের অভাব ও সর্বসময়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের

অভাব। উপরিউক্ত বিবরণের সঙ্গে Educational Facilities Available in the Higher Secondary Schools in West Bengal এর গ্রন্থাগার বিষয়ক বিবরণের অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়াও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রাপ্ত উত্তর থেকে জানা যায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা লঘু সাহিত্যের প্রতি (অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী ইত্যাদি) বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট।

অনেকেই মনে করেন ছাত্রছাত্রীদের লঘু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ শিক্ষার প্রধান অন্তরায় স্বরূপ। এই ধরণের সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ অবশ্যই ক্ষতিকারক কিন্তু সাধারণ অনুরাগ মোটেই ক্ষতিকারক নয়। উপরন্তু পাঠস্পৃহা বাড়ানোর পক্ষে সহায়কও বলা যেতে পারে। ডঃ জনসন বই পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, কোন বই হাতের কাছে পেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন কিন্তু সব বিষয় মনে রাখবার চেষ্টা করতেন না। যে সব বই থেকে যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় পেতেন সেগুলোই মনে রাখবার চেষ্টা করতেন, বাকি গুলো তাড়াতাড়ি ভুলে যেতেন। নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধারণ পাঠকদেরও তিনি এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। এই উপদেশের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠাভ্যাস বাড়ানো ; আর এই পাঠাভ্যাস বাড়ানোর লঘু সাহিত্য পাঠও যথেষ্ট সহায়তা করে। স্বর্গীয় মুদলিয়র এ বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন :—

..."The guiding principles in selection should not be the teacher's own idea of what books the students must read but their natural and psychological interests. If they feel more attracted at a particular age to stories of adventure, or travels or biographies or even detection and crime, there is no justification for forcing them to read poetry or classic or belle letters..."

Educational Facilities Available in the Higher Secondary School in West Bengal-এও বলা হয়েছে :—

..."Students should be encouraged to develop the habit of general readig and every effort should be made to induce the students to use the school library properly..."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাঠাভ্যাস বাড়ানো যাবে কি ভাবে? ছাত্ররা যদি পড়বার মত অধিক সংখ্যক বই পায় তবেই ত তাদের পাঠাভ্যাস বাড়বে? গ্রন্থাগারে পড়বার জন্ত যদি তারা উপযুক্ত সময় পায় তবেইত তারা গ্রন্থাগারকে সাধ্যমত কাজে লাগাবে? পাঠকক্ষে বসে যদি তারা পড়বার সুযোগ পায় তবেই ত তারা গ্রন্থাগারের প্রতি অনুরক্ত হবে?

উপরের রিপোর্টে এবিষয়ে বলা হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ উচ্চমাধ্যমিক বিভালয়ে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স ও অন্যান্য পুস্তকের অর্দ্ধেক অথবা তারো কম আছে। পাঁচ হাজারের উপর বই আছে মাত্র আটত্রিশটি বালক বিভালয় এবং নয়টি বালিকা বিদ্যালয়ে (এর মধ্যে উনিশটি কলকাতায়)। পশ্চিম বাংলার এক পঞ্চমাংশ বিভালয়ে বইয়ের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রূপে ব্যবহার করবার জন্ত ২৫০ স্কয়ার ফুটের একটা ঘরও নেই। এছাড়াও অধিকাংশ বিভালয়ে

গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার জন্ত রুটিনে একঘণ্টা সময়ও ছাত্রদের দেওয়া হয়নি। এর পরেও আছে সর্ব সময়ের জন্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাব। ঐ রিপোর্টের মন্তব্যে বলা হয়েছে :—

"Proportions of schools where whole time librarians have been appointed are generally small (nearly one tenth) except for boys' and girls' schools in Calcutta and boys' schools in Howrah. A teacher has to book after the library in an over whelming majority of schools (65·6% for boys and 58·9% for girls) and the library is entrusted even to the care of a clerk in several other schools."

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করবার জন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং একটা বেতনক্রমও ঠিক করে দিয়েছেন। এই বেতনক্রমে বলা হয়েছে যে সব বিদ্যালয়ে দশ হাজারের উপর বই আছে সেখানে গ্রন্থাগারিক যদি গ্রাজুয়েট ও ডিপ, লিব হন তাহলে তাঁকে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। ঐ একই শিক্ষণগত যোগ্যতার অধিকারী গ্রন্থাগারিক যে সব বিদ্যালয়ে দশ হাজারের কম বই আছে সেখানে বেতন পাবেন ১৬০ থেকে ২৯৫ টাকা। যাঁরা ইন্টারমিডিয়েট পাশ এবং যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনুমোদিত সার্টিফিকেট আছে, দশ হাজারের কম পুস্তক সম্বলিত বিদ্যালয়ে তাঁরা নিযুক্ত হলে তাঁদের বেতন দেওয়া হবে ১১৫ থেকে ১৮৫ টাকা।

Educational Facilities Available in the Higher Secondary Shools in West Bengal-এ দশ হাজারের অধিক পুস্তক সম্বলিত একটিও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উল্লেখ নেই। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে অদূর ভবিষ্যতেও কোন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকই ২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেতন পাবার অধিকারী হবেন না। এই রিপোর্ট থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে কলকাতার বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং হাওড়ার বালক বিদ্যালয় ব্যতীত মাত্র শতকরা দশভাগ বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের জন্ত গ্রন্থাগারিক আছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বেতনক্রম যথেষ্ট আশাপ্রদ নয় তাহলেও সরকারের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও এত অধিক সংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব-সময়ের জন্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক যে কেন নিযুক্ত করা হচ্ছে না এটা আমরা বুঝতে পারছিনা।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। গ্রন্থাগারের জন্ত পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বছরের প্রথমে যে সেসন ফি আদায় করা হয় তা থেকে গ্রন্থাগারের জন্ত কিছু বই অনেকেই চেষ্টা করলে কিনতে পারেন। এছাড়াও বই দান করবার জন্ত যদি প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে কর্তৃপক্ষ আবেদন জানান তাহলেও কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন এবং বাৎসরিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন তাহলেও এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে।

Libraries in the Higher Secondary Schools
By—Chanchal Kumar Sen

বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী। নিত্য নতুন রঙের খেলা চলছে অহরহ, ঘটছে কত বিস্ময়কর ঘটনা। তাই আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি এর বিচিত্রতার দিকে—আকণ্ঠ পান করতে চাই এ ধরার রূপ, রস, গন্ধ। নিজের চোখে দেখতে চাই, যাচাই করতে চাই নিত্য নতুন ঘটনার ইতিহাসকে। কিন্তু দৃষ্টিহীনদের কাছে এ জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন, বহির্দৃষ্টি তাদের কাছে প্রভাহীন—তাই অন্তরদৃষ্টি দিয়েই তারা চায় অজানাকে জানতে। কিন্তু জানার যে সহজ উপায় ছাপার অক্ষর বা লেখা যা সাধারণে খুব সহজেই আয়ত্তে এনে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে—সেই লেখাও দৃষ্টিহীনদের কাছে দুর্বোধ্য। তা বলে অদৃষ্টের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত নেই আমাদের জগৎ। তাই জ্ঞানের আলোক যাদের কাছে ছিল আপাতরুদ্ধ তাদের সামনেই আজকের বিজ্ঞানী তুলে ধরেছে এক নূতন আলোর ইশারা। এই নতুন আলোর দিশারী হলেন ফরাসী দেশের লুই ব্রেইল। দৃষ্টিহীনদের মধ্যে তিনিও একজন। বাবা মা'র 'দায়'ই হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু লুই ব্রেইলের অধ্যবসায় আর সূক্ষ্ম অনুভূতিই আজ শিক্ষা জগতের এক পরম সম্পদ। ১৮৩৭ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন নিজের নামেই 'ব্রেইল পদ্ধতি"—যার সাহায্যে দৃষ্টিহীনেরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে—সাধারণ লেখা দুর্বোধ্য হলেও এই ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা সকল দৃষ্টিহীনদের কাছে হয়ে দাঁড়াল এক নতুন বর্ণমালা—যার ফলে এতদিন যারা ছিল অজ্ঞানান্ধকারে তারা পড়তে বা জানতে পারল—সাধারণ লেখার বিষয়ও। মোটা কাগজে একটা সূচাল কলমের চাপ দিয়ে মাত্র ৬টি বিন্দুর সাহায্যে খুলে গেল এক নতুন জ্ঞানের রশ্মি। সৃষ্টি হল নতুন বর্ণমালা—। 'ব্রেইল' পদ্ধতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে—দৃষ্টিহীনদের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাতে গড়ে উঠছে নানা শিক্ষায়তন। এই 'ব্রেইল' বইকে কেন্দ্র করে আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠছে 'ব্রেইল গ্রন্থাগার'ও।

কিন্তু চাহিদার তুলনায় বইয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কারণও আছে প্রচুর। সর্বসাকুল্যে একখানা মূল বইকে ব্রেইলে পরিবর্তিত করতে কম করে ৮ গুণ বেশী খরচ পড়ে। এ ছাড়াও আনুসঙ্গিক ব্যয় তো আছেই। এ ছাড়া মূল বইয়ের প্রায় ১৫ গুণ বেশী স্থান অধিকার করে রূপান্তরিত ব্রেইল বই, আর ওজনও ২০ গুণের বেশী। তাই কেবলমাত্র ভারতেই নয় সারা বিশ্বে এমন খুব অল্প লোকই আছে যারা এই অত্যধিক মূল্যে বই কিনে লেখাপড়া চালাতে সমর্থ। তাই ভারতে গড়ে যেখানে শতকরা শিক্ষিতের হার ২৭ জন, সেখানে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হাজারে একজন। এর একমাত্র কারণ—ব্রেইল বই সংগ্রহ ও আনুসঙ্গিক ব্যয়ভার বহনের অসামর্থ্য।

কিন্তু সামর্থ্য থাকলেও খুব সহজে ব্রেইল বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কারণ ভারতে মাত্র বর্তমানে দুটি স্থানেই ব্রেইল বই ছাপানোর ব্যবস্থা রয়েছে—এক দেরাদুনে আর বোম্বাইতে। যদিও ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার নরেন্দ্রপুর আর মাদ্রাজে এক একটি করে আঞ্চলিক ব্রেইল ছাপাখানা তৈরীর তোড়জোড় চলছে। ছাপানোর অসুবিধায় অধিকাংশ বইই হয় হাতে লিখে বা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ব্রিটেনের National Library for the Blind গ্রন্থাগারের ৩৫০,০০০ বইয়ের অধিকাংশই হাতে লেখা। কিন্তু বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে এদেশে অন্য দেশ থেকে বই কিনে আনাও সমস্যা হয়ে উঠেছে। আর বই কিনে আনা বা হাতে লেখা —কোন অবস্থাই বইয়ের দাম কমাতে পারেনি। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রসারের একমাত্র উপযোগী পন্থা শিক্ষায়তনে ব্রেইল গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। তাই অন্যান্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা অন্ধবালক বিদ্যায়তনে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য, প্রয়োজনীয়তাও অত্যধিক। ব্রেইল গ্রন্থাগারই হবে দৃষ্টিহীন পাঠকদের বইয়ের একমাত্র অবলম্বন। কারণ তাদের পক্ষে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের ন্যায় সহজে বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ কারণ বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের লক্ষ্য থাকবে সব রকমে পাঠকদের সাহায্য করার দিকে। প্রয়োজন হবে গ্রন্থাগার কর্মী, বই ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সহজ সমন্বয়।

বিদ্যালয়ের সবচেয়ে সহজগম্য ঘরটিকেই গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দৃষ্টিহীন ছাত্রদের পক্ষে বই লেনদেন করা কোন কষ্টের না হয়। ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষিত, সেবার মনোবৃত্তি সম্পন্ন দরদী গ্রন্থাগারিককে সদা উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে দৃষ্টিহীন পাঠকদের সাহায্যের জন্য। উপযুক্ত গ্রন্থাগার সহকারীরও থাকবে পাঠকের চাহিদা অনুসারে বই এনে দেওয়ার আন্তর-স্পৃহা, কারণ "উন্মুক্ত দ্বার জ্ঞান ভাণ্ডারের" প্রয়োজনীয়তা আর সবার কাছে যত বেশীই থাক না কেন, দৃষ্টিহীনদের কাছে তার উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে না। নিজের হাতে তাক থেকে বই আনার ক্ষমতা যাদের নেই তাদের পক্ষে 'বদ্ধ আলমারী'ই উপযুক্ত। আবার বহুল প্রচলিত Card catalogue থেকে Sheaf বা Binder catalogue অধিকতর সহায়ক হবে দৃষ্টিহীনদের পক্ষে বইয়ের 'ডাক সংখ্যা' খুঁজে নিতে। অবশ্য বর্তমানে অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক পন্থাই চালু হয়েছে গ্রন্থসূচীর পরিবর্ত হিসাবে, যেমন "টেপ রেকর্ডার", 'ডিস্ক' প্রভৃতি। সহজ ও মিশ্র পদ্ধতির বর্গীকরণ প্রণালীরই প্রয়োজন হবে ব্রেইল গ্রন্থাগারে কারণ বড় বা জটিল সংখ্যা মনে রাখার যেমন অসুবিধা তেমনি ওগুলি লিখতে গেলেও পাঠকদের বয়ে আনতে হবে ব্রেইল লেখার স্লেট, কাগজ কলম ইত্যাদি।

কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারই সব সময় প্রত্যেক পাঠককে সাহায্য করতে পারেনা তাই কয়েক স্থানে প্রয়োজন শ্রেণী গ্রন্থাগারেরও। বিশেষতঃ যেখানে বিদ্যালয় দুই বা তিন তলা সেখানে শ্রেণী গ্রন্থাগারের খুবই প্রয়োজন। শ্রেণী গ্রন্থাগারে থাকবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপযুক্ত বই, আর এর তত্ত্বাবধান করবেন শ্রেণী শিক্ষক। এর ফলে ছাত্ররা তাদের প্রয়োজনীয় বই অবসর সময়ে বা প্রয়োজন মত খুব সহজেই শ্রেণীতে বসে পড়তে পারবে। অবশ্য কেবল

বই রাখলেই চলবে না ব্রেইল গ্রন্থাগারে। এখানে মাটির তৈরী নানা প্রাণীর মূর্তি, রিলিফ ম্যাপ, বিশেষ ধরনের ভূগোলক ইত্যাদিও রাখা প্রয়োজন। দরকার মত দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্যার্থে স্লেট, কলম ইত্যাদিও যাতে গ্রন্থাগার থেকে সরবরাহ করা যায় তারও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে আদর্শ ব্রেইল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন খুবই কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্রেইল গ্রন্থাগারের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাংলাদেশে মাত্র ৫টি এই ধরণের বিদ্যালয় আছে কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। কেবলমাত্র ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুরস্থিত অন্ধবালক বিদ্যায়তনের' ব্রেইল গ্রন্থাগারই আদর্শ ব্রেইল গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হতে চলেছে—এছাড়া বেহালার 'কলিকাতা অন্ধবালক শিক্ষায়তনে'র গ্রন্থাগারও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চলেছে। এই গ্রন্থাগারগুলি অচিরেই অগণিত দৃষ্টিহীন পাঠকদের দুঃখ মোচন করবে তাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে ব্রেইল গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে দেরাদুনের 'Central Braille Library for the blind' গ্রন্থাগারটি। এ সংস্থার ইচ্ছা যে ইংরাজীতে অনূদিত সমস্ত বইয়ের ব্রেইল সংস্করণ করে ভারতের সমস্ত গ্রন্থাগারে ঐ বই দিয়ে গ্রন্থাগার গুলিকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা। এদের প্রচেষ্টা মহৎ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা কেবলমাত্র একক প্রচেষ্টায় সফল হবে কি না তা চিন্তার বিষয়। ভারত সরকার আগামী ২।৩ বছরের মধ্যেই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুরে তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। American Library Associatoin ও American Foundation for the Blind' এর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সব আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলির কাজ হবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রন্থাগার গুলিকে বই সরবরাহ করা। এর ফলে সারা ভারতে গড়ে উঠবে এক সুসংবদ্ধ ব্রেইল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিন্তু যতদিন না এ মহতী প্রচেষ্টা কার্যকরী হবে ততদিন পর্যন্ত দৃষ্টিহীন পাঠকদের বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের স্বল্প সংখ্যক বইয়ের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হবে।

ডাকযোগেও বই আনা সম্ভব হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এ ব্যাপারে অগ্রণী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ১৯০৪ সালে "Library of Congress" বিনা মাশুলে ব্রেইল বই ডাকযোগে লেন-দেনের ব্যবস্থা করেছেন। ব্রিটেনেও এই নিয়ম চালু আছে যে অন্তর্দেশীয় ডাকযোগে ব্রেইল বই পাঠাতে ৫ পাউণ্ড পর্যন্ত কোন ডাকমাশুল লাগবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ডাকযোগে কোন মাশুলই প্রযোজ্য নয়। ভারত সরকারের নিয়মানুসারে ৭ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ব্রেইল বই বিনা মাশুলে চলাচল করতে পারে।

কিন্তু উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাবে কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে বলে হয় না। কাজেই বিদ্যালয়ে অন্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ শুধু নির্দিষ্ট কোন বিদ্যায়তনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সাহায্য করবে সব রকমের দৃষ্টিহীন পাঠকদেরই। এর কার্যপরিধি হবে আরও বিস্তৃত—আরও মহৎ। বাড়িয়ে তুলবে দৃষ্টিহীনদের পাঠস্পৃহা, তাদের সমাজের কাছে 'দায়' না করে রেখে করে তুলবে 'সম্পদ'। তাই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রসঙ্গে ব্রেইল গ্রন্থাগারের অনন্য ভূমিকার কথা সবার আগেই মনে পড়ে।

দৃষ্টিশক্তি যাদের নেই তদের কাছে ব্রেইল বই এক অমূল্য সম্পদ কিন্তু যারা অর্থাভাবেও পীড়িত তাদের কাছে ব্রেইল গ্রন্থাগারের সাহায্য ছাড়া কোন ক্রমেই শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। সমাজ চেতনার মূল্যায়নে বিদ্যালয়ে ব্রেইল গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তিই নয়, যারা অর্থাভাবেও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে—দারিদ্র্যের কষাঘাতে যারা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষায় বীতস্পৃহ হতে চলেছে, তাদের মুখে হাসি ফুটাতে সেই দুরাশার মরীচিকায় মরুদ্যানের শান্তছায়ার শান্তি প্রলেপ দিতে, দৃষ্টিহীন পাঠকদের সম্মুখে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ব্রেইল গ্রন্থাগার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম সোপানেই তাই প্রয়োজন দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল গ্রন্থাগার। এ যেন কল্যাণময়ী প্রতিমূর্তির মত ডাকছে, "এসো এখানে এসো, এইখানে আলোকের জন্ম সংগীত গান হইতেছে।"

The Role of Braille Libraries in School
By—Bimal Chandra Chattopadhyay

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ মানবজীবনের আলোকবর্তিকা

মনোরঞ্জন জানা

ভূমিকা

"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে......"—এই হারিয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা মানবমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে নিত্য নূতনকে পেতে চায়। এই চাওয়া পাওয়ার আগ্রহ থেকে যে রসবোধের সঞ্চার হয় তা থেকেই সাহিত্যের আবির্ভাব। আর এর একমাত্র ধারক ও বাহক হল গ্রন্থাগার।

জাতীয় জীবনের প্রকাশ, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, শিল্পগত নৈপুণ্য, সৌন্দর্যানুভূতির দক্ষতা, অক্ষরজ্ঞান ও পাঠক্ষমতা অর্জন; স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা, নাগরিক কর্তব্যবোধের সঞ্চার, সার্থকভাবে অবসর বিনোদনের উপায়—সবই আজ আমাদের লক্ষ্য। এই বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করার দায়িত্ব আজ গ্রন্থাগারের। তাই জাতির সমৃদ্ধি, ব্যক্তির উন্নতি অর্থাৎ গোটা মানব সমাজের আত্মিক উন্নতির ঐশ্বর্য নির্ভর করছে এই গ্রন্থাগারের ওপর।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় বহু প্রাচীনকাল হতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। তার নিদর্শন স্বরূপ নালন্দা তক্ষশীলা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাজগতের আলো নানা দিকে নানা ভাবে উৎসারিত হচ্ছে—যার গতি প্রকৃতি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। নবযুগের সাধনায় এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে, জগৎকে জানতে হলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকের গ্রন্থের সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। এই প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল বিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ ঃ তরুণের জয়যাত্রা

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার হল বিংশশতাব্দীর অবদান। তরুণমতি বালক-বালিকাদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি স্ফুরণের সহায়তার জন্য পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেবল মাত্র পাঠ্যপুস্তক এই পাঠাভ্যাস সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে না। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে একটা সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল জগৎ আছে ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে জানার আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টির জন্য এবং তাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরশ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সৃষ্টি।

মানবচিত্ত বিস্তারলাভ করবে, জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাবে বিদ্যালয় গ্রন্থ হতে। বিদ্যালয়ে যে সকল সুকুমারমতি বালক-বালিকার আগমন হয় তারাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। সুতরাং তাদের সাধারণ জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করতে, গ্রন্থের ব্যবহার শিক্ষা দিতে, চিত্তে নতুনের স্বাদ আনতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীয়। মধ্যশিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫২—৫৩)

এ বলা হয়েছে "The aim of Secondary Education is to train the youth of the country to be good citizens who will be competent to play their part effectively in the social reconstruction and economic development of their country." অতএব দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তরুণমতিদের বুদ্ধিবিকাশের অনুকূল, পারিপার্শ্বিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্যকারী এবং সর্বজনীন মেধাবিকাশের চিরসুহৃৎ।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরিক রূপ

অনেক বিদ্যালয়ই এখনও পর্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠেনি। সাধারণতঃ তিন প্রকারের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়।

(ক) শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,

(খ) শ্রেণী শিক্ষক পরিচালিত নির্দিষ্ট শ্রেণী গ্রন্থাগার,

(গ) নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক পরিচালিত বিষয় গ্রন্থাগার। সুবিধা ও অসুবিধার দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় 'ক'—শ্রেণীর গ্রন্থাগারই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এ বিষয়ে আচার্য রঙ্গনাথন বলেছেন যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে একটা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গঠন করা বিধেয়।

(ক) গ্রন্থাগার গৃহ

গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনায় নির্বাচন করতে হবে সবচেয়ে বেশী আলোবাতাস যুক্ত নির্জন এমন একটি গৃহ যার মাঝখানে থাকবে একটা সুসজ্জিত পাঠকক্ষ, যেখানে অন্তত পক্ষে ৭৫ জন পাঠক-পাঠিকা একসঙ্গে বসে পাঠ করতে পারবে এবং যার চারপাশে থাকবে বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত পুস্তকাধার রাখার স্থান—যা পাঠককে বার বার পাঠে উৎসাহী করে তুলবে—কেননা আমরা জানি "Every book its reader".

গৃহের একটিমাত্র প্রবেশ পথ থাকবে—তার অনতিদূরেই থাকবে Card Catalogue Cabinet রাখার স্থান। এছাড়া গ্রন্থাগারিকের ব্যবহারিক কাজের জন্য এমন একটা স্থান নির্ণয় করতে হবে যেন একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সমস্ত কিছু নজরে রাখা যায়।

(খ) অলঙ্কার ও সাজসজ্জা

আলমারী, চেয়ার, টেবিল, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট, পত্রিকা প্রচারের আধার ইত্যাদি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সকল প্রকার আসবাবপত্রই অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সহজে ব্যবহারোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। পাঠকমনকে পাঠ্যবিষয়ের ক্লান্তি থেকে বিরত করার জন্য পাঠকে উপযুক্ত বিষয়ের সংবাদ, ছবি ইত্যাদি দিয়ে অত্যন্ত পরিমার্জিতরূপে যাতে Display করা যায় তার জন্য Display board এবং Case ইত্যাদি রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্রের বিস্তার

গ্রন্থাগার গৃহ ও তার আঙ্গিকরূপ সুন্দর ও পরিপাটি করে তোলা যেমন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তেমনি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে মানুষ করে তোলাও গ্রন্থাগারের

একমাত্র পরোক্ষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারের সকল প্রকার কর্মের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রচনা করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য মোটামুটি ৫টি—

(১) সামাজিক জীবনে দক্ষতা ও বিশ্বস্ত নাগরিক সৃষ্টি
(২) নৈতিক চরিত্র গঠন
(৩) সৌন্দর্যানুভূতির দিক ও অবসরকালের সদ্ব্যবহার
(৪) কর্মদক্ষতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিক
(৫) বৌদ্ধিক দিক

উপরিউক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্যকে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত করতে হবে

(ক) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে
(খ) পরের অভিজ্ঞতা থেকে
(গ) শেষে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করার একটা বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে।

যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এই উদ্দেশ্যগুলোকে নিজেদের জীবনপথের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেতে পারে।

সুতরাং এসকল উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে গ্রন্থাগারিককে, শিক্ষকমশায়কে, কর্তৃপক্ষকে ও অভিভাবককে।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককেই সকল ক্ষেত্রের মেরুদণ্ডরূপে কাজ করতে হয়। সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ ও অভিবাবকের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির সার্থক রূপায়ণে অগ্রসর হতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগারিককে কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে।

(ক) মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান
(খ) সুবুদ্ধিবিলাস জ্ঞানের প্রকাশ
(গ) জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি এবং শিক্ষার সঙ্গে নৈপুণ্য যুক্ত হওয়া চাই।
(ঘ) নিয়মানুবর্তিতাকে স্নেহের দ্বারা পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন
(ঙ) সরাসরি অগ্রগতির দ্বারা মনের একমুখিতা ও উন্মুক্ততার প্রকাশ
(চ) সকল প্রকার অভিজ্ঞতা, সমস্যা, তথ্য, প্রকল্প অর্থাৎ চিন্তাকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির দ্বারা সার্থক মূল্যায়ন।

॥ পুস্তক ও পত্র পত্রিকা নির্বাচন ॥

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের প্রথম ও প্রধান কাজ হল পুস্তক নির্বাচন। আপাতদৃষ্টিতে এ কাজ অত্যন্ত সহজ মনে হলেও মূলতঃ একাজ বড় কঠিন। যে সব পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের সুদৃঢ়

জ্ঞানের পরিমাপক ও পরিবর্দ্ধক এবং যা তাদের রুচির অনুকূল সেই সব পুস্তকই নির্বাচন করতে হবে। সুতরাং প্রথমতঃ প্রয়োজন কিছু মৌলিক গ্রন্থ—যেমন, বিশ্বকোষ, অভিধান, জীবনীকোষ মানচিত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য গ্রন্থাদি যেমন, ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত ও কলা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ভ্রমণ, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের—যেমন ,গল্প, উপন্যাস, রূপকথা অনুবাদ ইত্যাদি।

এছাড়া বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর অথচ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আছে এমন কয়েকটা পত্র-পত্রিকা নির্বাচন করতে হবে। তবে একটা কথা, আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি মোটেই সন্তোষজনক নয়; সরকারী অনুদান ব্যতীত এর সার্বিক উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সরকার যদি স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করেন এবং অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থগুলির যদি Library Edition প্রকাশ করেন তাহলে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ করার কাজ নিয়মিত হবে বলে আশা করা যায়।

॥ বিবিধ ॥

গ্রন্থাগারের বিচিত্র সম্ভার সম্পর্কে, গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে সকল ছাত্রছাত্রীকে অবহিত করার জন্য সভা ও আলোচনা করতে হবে।

ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে গল্পের আসর করতে হবে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"...for a young person cannot judge what is allegorical and what literal, anything that he receives into his mind at that age is likely to become indelible and unalterable ; and therefore it is most important the tales which the young first hear should be models of virtuous thoughts." তারপর তাদের সংগৃহীত মালমসলা হতে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী আত্মস্থ করার শিক্ষা দিতে হবে।

গ্রন্থাগারে সেবা, সাহচর্য ও সৌহার্দমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করাই যখন গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্য তখন তাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে কি রকম পদ্ধতি অবলম্বন করলে গ্রন্থগারের ব্যবহার সহজ ও সাবলীল হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে জ্ঞানবলে বলীয়ান হতে হবে—যে জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে দেয়, আত্মনির্ভরশীলতা উদ্দীপিত করে, জগতে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস এনে দেয়, দেশের ও দশের কল্যাণে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে এবং যা বিশুদ্ধ ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা, সুন্দরের উপাসনার দ্বারা জীবনকে মধুময় করে তোলে।

গ্রন্থাগারকে সকলের নিকট অবসর কাল সদ্ব্যবহারের নিত্যনৈমিত্তিক সঙ্গী করে তোলার জন্য সঙ্গীত শিল্প ও নাটকের চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া চিত্র-প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য Display Board-এ স্থাপন, সময়ে সময়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

পুস্তক আদান-প্রদান করা ছাড়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের আরও কয়েকটা নিভৃত চিন্তা আছে—

(১) পুস্তক মঞ্চে পুস্তক পাঠকের ব্যবহারের নিমিত্ত রাখার পূর্বের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ।
(২) একটা সুবিন্যস্ত ও সাবলীল গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন।
(৩) Reading list তৈরী করা ও পূর্বাহ্নে শিক্ষকমহাশয়কে প্রদান করা।
(৪) গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সংগতি।
(৫) শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য পৃথক ভাবে আলোচনা।
(৬) মাসিক ও বাৎসরিক সমীক্ষা প্রস্তুত ইত্যাদি।

শিক্ষকের কর্তব্য :

বিভিন্ন মানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বই, পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করা আবশ্যক।

ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের উপকরণাদি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য।

পাঠ্য বিষয়ের সম্ভাব্য সূত্র সম্বন্ধে স্বাধীন এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহদান কর্তব্য কারণ—"By education must be understood the active help given to the normal expansion of life of the young."

বিষয়বস্তুকে আয়ত্তে আনার জ্ঞানে অর্জনের জন্য ক্লাস চলা কালেই ছাত্র-ছাত্রিগণকে একক বা দলবদ্ধভাবে গ্রন্থাগারে প্রেরণ করা কর্তব্য—তবেই অনুসন্ধিৎসু মন গড়ে উঠবে, পুস্তককে ভালবাসতে শিখবে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব :

গ্রন্থাগারের আঙ্গিক পরিকল্পনা ও উপযুক্ত পুস্তক ক্রয়ের সহযোগিতার দ্বারা শিক্ষক ও বিদ্যার্থীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলে।

শান্ত ও উপযুক্ত পরিবেশই অধ্যয়নে আগ্রহ জন্মায়—তাই একটা রুচিসম্মত গৃহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য।

গ্রন্থাগারকে সক্রিয় এবং সচল রাখার জন্য চাই কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি এবং সরকারের নিকট পুস্তক ও আসবাব পত্রের জন্য অনাবর্তক অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

অভিভাবকের দায়িত্ব :

অভিভাবক চান ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে উঠুক। ছোটরা সাধারণতঃ অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই তাদের জীবনের সুষ্ঠু ও সম্যক বিকাশের জন্য সর্বসময় অবহিত থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

উপসংহার :

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করি তাহলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটা জ্ঞান গর্বিত জাতি গঠনের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে।

আজ আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠতর হবে বলে—ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য নিবিড়তর হবে বলে—এত দিন যা ছিল সুপ্ত আজ তা হৃদয় দিয়ে কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় এসেছে।

Guidelines for Secondary School Libraries. —By Manoranjan Jana

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থবিদ্যার ক্রমবিকাশ। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা; দি ওয়ার্লড প্রেস, ১৯৬৫। ২২৮ পৃঃ। মূল্য: সাত টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) ঐতিহাসিক (২) কলাকৌশল ও (৩) বর্ণনামূলক। প্রথম ভাগে বিবৃত হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও বিবর্তন, দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থাগার পরিচালনার কলাকৌশল, এবং তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের স্বরূপ।

গ্রন্থকার গ্রন্থাগার-বিদ্যায় প্রবীন এবং বহুধা অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর ব্যাপক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান তথা গ্রন্থাগার পরিচালনায় বিপুল অভিজ্ঞতা, এই দুয়ের ছাপ তাঁর লেখায় রীতিমত স্পষ্ট। এই গ্রন্থে তিনি বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যতদূর জানি, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় রচিত অন্য কোন বইতে এত তথ্য একত্রিত হয়নি। এই তথ্য-বৃদ্ধির জন্যে বইটি বৃহদাকার না হয়েও আকর-গ্রন্থের মূল্য পেয়েছে। হাতের কাছে এ বই থাকলে, গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বহু খুঁটিনাটি তথ্যের অনুসন্ধান অনায়াসে চরিতার্থ করা সম্ভব হবে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনার আধুনিক রূপ ও কলাকৌশল ইয়োরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ ও পুরিপুষ্ট হয়েছে, এবং তার প্রভাব এদেশে বিস্তৃত হয়েছে। একারণে আধুনিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই বিদেশের কথা প্রাসঙ্গিকক্রমে বিশদ হয়ে পড়ে। বর্তমান লেখকের কৃতিত্ব, তিনি বিদেশের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি দেশের কথাও অনেক বলতে পেরেছেন। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার-বিদ্যার সূচনা ও ক্রমবিকাশ তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষায় ভারতে বর্তমান পরিস্থিতি, সমস্যা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কী ও কোনপথে তা চালিত হওয়া উচিত—এসবের আলোচনা তিনি করেছেন।

গ্রন্থাগার পরিচালনার কলাকৌশল আজ এমন পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে এ সংক্রান্ত জ্ঞান একটা বৈজ্ঞানিক বিদ্যারূপে পরিণত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বাংলাভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করা কঠিন কাজ, এই কাজ করতে পারা বিপুল কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশ্বনাথবাবু গ্রন্থাগার পরিচালনায় কলাকৌশল সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে ভাবে বিবৃত করেছেন তাতে তাঁর লেখনীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। একথার যাথার্থ বিশেষ করে ধরা পড়বে বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতির ওপর লিখিত অধ্যায়গুলি পাঠ করলে।

মোটকথা, এই সুলিখিত বইখানি গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পঠন-পাঠন ও জ্ঞানানুশীলনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

পরিশেষে দু'একটি ত্রুটির কথা। লেখক 'গ্রন্থবিদ্যা' বলতে গ্রন্থাগারবিদ্যাকে বুঝেছেন।

কিন্তু 'গ্রন্থবিজ্ঞা' কথাটা আসলে Bibliography-র পরিভাষা। যেহেতু তাঁর বিষয়বস্তু লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারকে নিয়ে, তাঁর গ্রন্থের আখ্যা 'গ্রন্থাগার-বিদ্যার ক্রমবিকাশ' হওয়া উচিত।

ভারতে কি কপিরাইট গ্রন্থাগার আছে? অথচ লেখক বলেছেন বোম্বাই ও মাদ্রাজে কপিরাইট গ্রন্থাগারে বই জমা দেবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৪ সালের ভারতীয় আইনটির নাম Deposit of Books Act নয়, ওর নাম Delivery of Books (Public libraries) Act. ১৯৫৫ সালে এ আইনের কিছু সংশোধন ঘটে। সেই সংশোধনের কথা ও আইনটি সম্পর্কে আরো বিশদ বিবরণ থাকা উচিত ছিল। 'দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী' ও 'ইনসডক' (INSDOC.) এরও কোন বিবরণ নেই। ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিকথায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের বিবরণ অবশ্যই থাকা উচিত।

আশা করি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই বিষয়গুলির প্রতি নজর দেবেন।

—ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার
—Book Review

সম্পাদকের নিবেদন

এই সংখ্যায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সর্বশ্রী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার সেন, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন জানা এঁদের প্রবন্ধ গত বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে পঠিত হয়। গত 'মাঘ' সংখ্যায় সম্মেলনের রিপোর্টে সে কথা বাদ পড়ে গেছে। 'পৌষ'—সংখ্যায় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রবন্ধটির যে মর্ম প্রকাশ করা হয়েছিল তার সর্বশেষ লাইনে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গিয়েছিল—এজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোটা বাজানো যায়

শ্রীভণ্ডুলানন্দ শর্মা

আবার ভণ্ডুল! 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় এত শীঘ্রই আবার আমার আবির্ভাব হয়েছে দেখে হয়তো আপনার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই আপনারা আমার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। আপনাদের সমালোচনার কিছু অংশ আমার কানেও এসেছে। কিন্তু প্রশংসা কুড়োবে বলে ভণ্ডুল কলম ধরেনি। ভণ্ডুল ভণ্ড বা ভাঁড় নয়, ভণ্ডুল একজন গ্রন্থাগারিক মাত্র। উপদেশ বিতরণ বা রসসৃষ্টি এর কোনটাই ভণ্ডুলের উদ্দেশ্য নয়। এযুগে দু'একটি নির্বোধ ও পাগল ছাড়া 'মথিলিখিত সুসমাচারে'র প্রতি সকলেরই প্রবল বিতৃষ্ণা। আজও বিদ্যালয়ে আমাদের শিশুদের 'সদা সত্য কথা বলিবে' এই বাণী দিয়ে হয়তো বোধোদয় হয়; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই বাণীর আক্ষরিক অর্থ ও নিহিতার্থের পার্থক্য বেশ বুঝে ফেলে; বুঝে ফেলে যে ওগুলি শুধু কেতাবী বুলি—ঠিক আচরণীয় নয়। আর বাংলাদেশে রসিক বা ভাঁড়ের অভাব নেই; প্রতিযোগিতায় তাঁদের সঙ্গে এঁটে ওঠার সাধ্য ভণ্ডুলের নেই—প্রবৃত্তিও নেই। তবে এ যুগের বেশীর ভাগ বুদ্ধিমান লোকের মতই ভণ্ডুলও 'মথিলিখিত সুসমাচারে' আস্থা হারিয়েছে। তাই সব কিছুকেই বাঁকাভাবে দেখা ভণ্ডুলের অভ্যাস হয়ে গেছে।

'কি করে একটি প্রতিষ্ঠানের সহজেই বারোটা বাজানো যায়'—এ সম্পর্কে আমার সুচিন্তিত মতামত দেব বলেই আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা। আশা করি, আমার উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এ সম্পর্কে বুদ্ধিমানেরা সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। তাছাড়া তাঁরা আমার এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেও ভুলবেন না। আমার এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের আপনি যদি বারোটা বাজাতে চান তবে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে কিংবা না হয়েও —এর বিভিন্ন কমিটিতে থেকে কিংবা না থেকেও—এর সদস্য হয়ে কিংবা না হয়েও আপনি এই প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজাতে পারেন। আমার কথাটা হয়তো একটু হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে। তাহলে বিশদভাবেই বলা যাক।

আপনারা অনেকেই হয়তো কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। কেউ বা নৈবেদ্যের চূড়োর কলাটির মত অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়েও বসেছেন। ভণ্ডুল নিজেও দীর্ঘকাল ধরে এমনিভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানান্তরে বিরাজ করে অনেক প্রতিষ্ঠানেরই বারোটা বাজিয়ে এসেছেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম প্রথম অল্প কিছু লোকের চেষ্টায় গড়ে ওঠে। ভণ্ডুল ভেবে দেখেছে যে প্রতিষ্ঠানটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যারা ভূতের বেগার খাটে তাদের অধিকাংশই হয় নির্বোধ নয় পাগল। কারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গিয়ে শুধু শুধু পরিশ্রম করে তাদের আয়ুক্ষয় করতে হয় মাত্র—এদের বেশীর ভাগই এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। কিন্তু ভণ্ডুলের পরামর্শ মতো আপনি যদি কোন সাজানো গোছানো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে বসতে পারেন, তাহলে আপনাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। শুধু যদি আপনি 'দাদা' হবার আর্টটি ভালো করে রপ্ত করে

নিতে পারেন, তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি, অনুগত 'ছোট ভাই'-এর কখনোই অভাব হবে না। একথা সকলেই স্বীকার করবেন প্রতিষ্ঠান গড়ে তার কর্তাব্যক্তি হওয়া লাভজনক মোটেই নয়। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালাভ সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্যও বটে; কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হওয়া মোটেই কষ্টকর নয়—আর তার কর্তাব্যক্তি হওয়া বিশেষ লাভজনকও বটে। প্রশ্ন হতে পারে আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের শুধু শুধু বারোটা বাজাতে যাবেন কেন? কিন্তু প্রয়োজন বলেই তা করতে হবে। কথায় আছে, 'শতমারীং ভবেৎ বৈদ্য'—ডাক্তারীতে পশার জমাতে হলে যেমন আপনার কর্তব্য হবে অন্ততঃপক্ষে কিছু রোগী মারা (চিকিৎসাবৃত্তির লোকেরা ক্ষমা করবেন, ভণ্ডুলের জীবন যখন তাঁদেরই হাতে); তেমনি নেতা হতে গেলেও 'মান, লজ্জা, ভয়—এ তিন থাকতে নয়'—বিবেকের দংশন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কিছু প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজানো আপনার অবশ্যকর্তব্য হবে; পরে আপনি একজন নামী লোক হয়ে পড়লে আপনার জীবনীতে লেখা হবে—ইনি অমুক সালে অমুক অমুক প্রতিষ্ঠানের ইত্যাদি ইত্যাদি ছিলেন। (আপনি সে সব প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজিয়েছিলেন কিনা তার অবশ্য উল্লেখ থাকবে না)।

একবার যদি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে বসতে পারেন তবে আপনার প্রথম কর্তব্যই হবে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে যে সব সুযোগ-সুবিধা আপনার পাবার কথা তা আদায় করা; এমন কি কর্মকর্তা হিসেবে যদি কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সম্ভাবনা থাকে তার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করা; কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে আপনার কিছু দেবার যেন বাধ্যবাধকতা না থাকে; এমন কি আপনার সময়ও। যে কাজে আপনার কোন ব্যক্তিগত লাভ হবে না তার জন্য আপনার সময় এবং উত্তম নষ্ট করা বৃথা। তা সে সপ্তাহে কয়েক-ঘণ্টা মাত্র সময়ই হোক না কেন! আপনার মনে হতে পারে, যদি কেউ এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে তাহলে কি জবাব দেবেন? সেজন্য ভাববেন না; একবার একথা কেউ বলুক না, আপনিও তেড়ে জবাব দেবেন,—'আমি কি মাইনে পাই, না একাজ করে আমার কোন লাভ হচ্ছে? বরং আমি যদি এ সময়ে অন্য কোন কাজ করি তাহালে আর্থিক দিক দিয়ে আমার কত লাভ হত। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হয়ে সপ্তাহে কেন মাসে, ছমাসে কিংবা বছরেও যদি একেবারে এতটুকুও সময় তার জন্য আপনাকে ব্যয় না করতে হয় তবে বুঝব আপনি বাহাদুর, এমন কি আপনি ভণ্ডুলেরও গুরুদেব।

প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হওয়া ছাড়াও আপনি এর বিভিন্ন কমিটির সদস্যপদ অথবা সভাপতি বা সচিবের পদ অলঙ্কৃত করে থাকতে পারেন; আপনার যোগ্যতা আছে কিনা বা আপনার সময় হবে কিনা তার জন্য মোটেই চিন্তিত হবেন না। যত বেশী কমিটিতে আপনার নাম থাকে তত বেশী ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়ে আপনার নাম প্রচারের সুবিধে হবে। তবে ভণ্ডুলের একটা উপদেশ সর্বদা মনে রাখবেন মিটিং-এ কখনো ভুলেও মুখ খুলবেন না; বিজ্ঞের মত চুপচাপ বসে থাকবেন, তাতে ধরা পড়বার ভয় থাকে না। আপনি মুখ খুললেই আপনার পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া শত্রুও সৃষ্টি হতেও পারে। বোবার শত্রু নেই, সেকথা স্মরণ রাখবেন।

কি করে মিটিং-এর এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে ভণ্ডুল কয়েকটি পন্থা বার করেছে। আপনাদের অবগতির জন্য তা দেওয়া হল :—

১। মিটিং ডাকলে যদি সম্ভব হয় একেবারেই মিটিং-এ না যাওয়া ; যাঁরা কমিটিতে থাকেন অথচ মিটিং-এ যাবার একেবারেই প্রয়োজন বোধ করেন না ভণ্ডুল তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন।

২। যদি একান্তই মিটিং-এ যেতে বাধ্য হন তবে যথাসম্ভব দেরী করে যাবেন। মিটিং-এর সভাপতি হয়তো আপনার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাববেন—'হি ইজ টু আর্লি ফর দি নেক্স্ট মিটিং'—কিন্তু আপনি সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে অম্লানবদনে বসে পড়বেন। পাশের ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন আলাপ আলোচনা জুড়ে দিতে পারেন। কেউ লক্ষ্য করবে না। লক্ষ্য করলেও ভাববে মিটিং-এ এতক্ষণ কি হচ্ছিল আপনি হয়তো সেটাই জানতে চাচ্ছেন।

৩। মিটিং-এ ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েও জরুরী কাজ আছে বলে কেটে পড়তে পারেন। অথবা সভাপতির অনুমতি নিয়েই দুচারবার সভার বাইরে কাটিয়ে আসতে পারেন। যদি সময়টা ভালভাবে কাটাতে চান তবে আর একজন সঙ্গীকেও অনুরূপভাবে বাইরে আসতে বলুন। এটা সম্ভব না হলে একেবারে পেছনের আসনে বসে পাশের ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিম্নস্বরে আলাপ করে এই সময়ের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

এ ব্যাপারে একেবারে চরম পন্থা হচ্ছে সভাপতিকে কিছুই না বলে সকলের অলক্ষ্যে একসময়ে কেটে পড়া—হয়তো কেউই আপনাকে লক্ষ্য করবে না।

বিশ্বাস করুন, এসবই ভণ্ডুলের পরীক্ষিত সত্য ঘটনা, এর এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। আপনি বলতে পারেন প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে থেকে এসব করার অর্থ কি—তার চেয়ে না থাকলেই হয়। কিন্তু কি করা যাবে বলুন ভণ্ডুলের চেলাদের কাছে মিটিং-এর বিষয়বস্তু 'বোরিং' লাগে, অথচ তাঁদের এসব প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে না থাকলেও নয়। তবে প্রতিষ্ঠানের যাঁরা কর্মকর্তা হন না—বা কমিটিতেও থাকতে চান না, এমন কি যাঁরা প্রতিষ্ঠানের সদস্যও হন না তাঁরাও কি প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজাচ্ছেন না ?

ধরুন কর্মকর্তা হতে গেলেই কিছু না কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। সে দায়িত্ব নিতে যারা অস্বীকার করেন তাঁরা কি প্রতিষ্ঠানের বারোটা বাজাচ্ছেন না? একজন না একজন কাউকে তো কর্মকর্তা হতেই হবে—তখন ভণ্ডুলের মত লোকেরাই কর্মকর্তা হয়ে বসে ; আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তবে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে সমালোচনা করা সহজ। সুতরাং কেউ যদি আপনাকে দায়িত্ব নিতে বলে তাতে রাজী না হয়ে সমালোচকের ভূমিকাই নেবেন। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে কোন কোন বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ; সেই কমিটিতে যদি কেউ থাকতে রাজী না হন তবে প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে কি করে? সুতরাং না থেকেও আপনি বারোটা বাজাচ্ছেন। আর কমিটিতে থেকে কি উপায়ে বারোটা বাজানো যায় তাতো বিশদরূপেই বলা হয়েছে। তেমনি প্রতিষ্ঠানের সদস্য

হয়ে যদি আপনি প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করেন তবে যেমন এর বারোটা বাজাতে পারেন প্রতিষ্ঠানের সদস্য না হয়েও পারেন। আপনার অর্থ ও সহযোগিতা না পেলে প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই চলতে পারেনা। আপনারা একযোগে যদি সকলেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য না হন তবে দুদিনেই এর বারোটা বাজবে। আর যদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে ভণ্ডুলবাবুর চেলা হন তাহলেও সহজেই এর বারোটা বাজাতে পারবেন।

অবশেষে ভণ্ডুলের চেলাদের আরও কিছু অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

মিটিং-এ যাঁরা খুব বড় বড় কথা বলেন কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে সব ভুলে যান তাঁদের ওপর ভণ্ডুলের অগাধ শ্রদ্ধা। তারপর শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন যখন আসবে এবং হিসেব নিকেশ হবে তখন যথারীতি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বন্ধুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে ভুলবেন না। একান্তই যদি দোষ দেবার মত কাউকে না পান তাহলে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীর ঘাড়ে এই দোষ চাপিয়ে দেবেন কারণ এরা সহসা প্রতিবাদ করতে সাহসী হবেন না।

সহযোগিতার কথা সর্বদাই মুখে বলবেন কিন্তু কেউ সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলে তাঁর সঙ্গে যেন অসহযোগ করতে ভুলবেন না। অন্ততঃ ভণ্ডুল কখনো কাউকে তার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলে না। কি জানি কখন হয়তো ভণ্ডুলের চেয়েও ধুরন্ধর কোন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে এবং ভণ্ডুলকে গদিচ্যুত করবে।

যদি কেউ কখনো প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেন তবে সব সময়েই একটি জবাব দেবেন—"আমার সময় নেই"—এর চেয়েও গুরুতর কাজে আপনি জড়িত সেকথা বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে সেই সাহায্য প্রার্থনা যদি আপনার নিম্নপদস্থ কারো কাছ থেকে আসে তাহলে তো কথাই নেই।

যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করতে চায় তবে তাকে অবিলম্বে নিরস্ত করবেন; নাহলে আপনার বাজার খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কথায় কথায় পদত্যাগ করার হুমকী দেবেন অথবা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেবার কথা বলবেন—দেখবেন নিঃসন্দেহে আপনার দাম বেড়ে গেছে।

মুস্কিল হয়েছে এই যে ভণ্ডুলের এই সব যুগান্তকারী চিন্তার ফসল বহন করে নিয়ে যে সব প্রবন্ধ সম্পাদকের দপ্তরে যাচ্ছে সম্পাদক তার অধিকাংশই ছাপতে রাজী হচ্ছেন না। দ্বারহট্টের সম্মেলনের তীব্র সমালোচনাপূর্ণ ভণ্ডুলের সারগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধটি তিনি ছাপেননি দেখা গেল; এমন কি প্রাপ্তি-স্বীকার পর্যন্ত করেননি। সম্পাদকের বোধ হয় ধারণা দ্বারহট্টের সম্মেলন খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে! সম্পাদকের মতে আমার লেখার মত কতকগুলি রাবিস ছেপে পত্রিকার স্পেস নষ্ট করা নাকি ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কি অবিচার বলুন তো? এই গণতান্ত্রিক দেশে ভণ্ডুল কি তার বক্তব্য বলবারও সুযোগ পাবে না? একমাত্র সম্পাদকের 'ঢাউস' সম্পাদকীয় ছাড়া কি আর কোন লেখাই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সহজে ছাড়পত্র পাবে না?

এখন একমাত্র আপনারাই ভরসা। আপনারা সবাই দাবী তুলুন, ভণ্ডুলের লেখা ছাপতে হবে নতুবা স্বৈরাচারী সম্পাদকের গদি ছাড়তে হবে। আগামী সংখ্যার জন্য ভণ্ডুলের প্রবন্ধ "কি করে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটিকে ডকে তোলা যায়" এই সম্পাদক যে ছাপবেন সে ভরসা আমার নেই। আপনারা এক কাজ করুন, আগামীবারে ভোট দিয়ে ভণ্ডুলকেই সম্পাদক করে দিন। ভণ্ডুল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কখনো কারো লেখাই সে আটকাবে না।

আপাততঃ নাছোড়বান্দা সম্পাদককে দেখাতে হয়েছে যে Brooklyn-এর কোন এক বিদ্বৎ সমিতির মুখপত্রে সম্প্রতি ঠিক এই ধরণেরই একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে (বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এবার আর চুরিবিদ্যা নয়)।

The sure way to kill an organisation. —By Bhandulananda Sharma

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শ্রেণীতে (মে—আগষ্ট) ভর্তি হইবার আবেদন পত্র ২৬শে মার্চ, ১৯৬৬ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। আবেদন পত্র (মূল্য ০.২৫ পঃ) ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ কার্যালয়, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে বিকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পঃ ৭টি ডাক টিকিট সহ স্বঠিকানা লেখা খাম পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যাইবে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন।

সম্পাদক

পরিষদ কথা

বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বারহাট্টা, হুগলী—১৯৬৬

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি/দর্শকবৃন্দের তালিকা

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। অজয়কুমার রায় ৫/১-এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা ৩২। অজিতকুমার মিত্র—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ৩২। অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়—বহরমপুর গার্লস কলেজ, মুর্শিদাবাদ। অনিলকুমার দত্ত জেলা গ্রন্থাগার, চুচুড়া, হুগলী। অনিলকুমার দেয়াসী—আমতা পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া। অনিলকুমার হালদার—গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী। অনিলচন্দ্র চক্রবর্তী—১০এ কানাই ধর লেন, কলিকাতা ১২। অমিতাভ বসু—৪এল খেলাৎবাবু লেন, কলিকাতা ২। অমিয়ভূষণ রায়—পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১। অমূল্যচরণ ভাণ্ডারী—ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পাঠাগার, হাওড়া। অরুণকুমার ঘোষ—১৯ দক্ষিণপল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। অরুণা চক্রবর্তী—ইস্ট স্টেশন রোড, আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। অশোককুমার চক্রবর্তী—এম, এ, এম, সি—স্টাফ ক্লাব লাইব্রেরী, দুর্গাপুর। অশ্বিনীকুমার বেরা—বান্ধব পাঠাগার, সারাঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার; হুগলী। আরতি বিশ্বাস—৪৯৪ দমদম পার্ক, কলিকাতা ২৮। আশীষকুসুম ঘোষ—১০২ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেনিউ, কলিকাতা ৩। কণকবরণ চট্টোপাধ্যায়—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা কমলাকান্ত কুমার শেওড়াফুলি, হুগলী। কমল গুহ—১৮-এ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা২৬। করুণাময় চট্টোপাধ্যায়—কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন কাটোয়া বর্ধমান। কল্যাণী বসু—আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯ কালিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সুহৃদ সংঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর, হুগলী। কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার, কলিকাতা ১৪। কুশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার. হুগলী কে, সি, দত্ত—সাহিত্য আকাদমী, গ্রন্থপঞ্জী বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার. কলিকাতা। কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী। কৃষ্ণা দত্ত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৩২। ক্ষিতিশচন্দ্র প্রামাণিক—১৮ দুর্গাপুর লেন, কলিকাতা ২৭। গীতা ভট্টাচার্য—সরকারী শিল্প ও বানিজ্য সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১৩। গীতা ভটাচার্য (হাজরা)—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ শৈলেন্দ্র বসু রোড, শালিখা, হাওড়া। গুরুশরণ দাশগুপ্ত—৬২ ফিডার রোড, কলিকাতা ৫৬ গোপালচন্দ্র পাল—বালসী ধ্রুব সংহতি, বাঁকুড়া। গোপাল নারায়ণ চৌধুরী—ভদ্রকালী জয়গঙ্গা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, হুগলী। গোবিন্দচন্দ্র দেবনাথ—গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রাঃ গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা। গোবিন্দলাল মল্লিক কানাই স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা ৬। গোবিন্দলাল রায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ২৭। গোলোকেন্দু ঘোষ—সাহিত্য সংসদ, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রোড কলিকাতা ৯। চঞ্চল কুমার সেন—৩৩বি, কালিঘাট রোড, কলিকাতা ২৫। চিত্তরঞ্জন দাস—বিবেক ভারতী পাঠভবন, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ২৪ পরগণা। চিত্তরঞ্জন দাস—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা ৪৩। ছবি চক্রবর্তী—রসিকগঞ্জ রবীন্দ্র পাঠাগার, মেদিনীপুর। জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়—১৯, দক্ষিণপল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। জগমোহন মুখোপাধ্যায়—আমেরিকান লাইব্রেরী, ইউ. এস. আই. এস কলিকাতা। জলি গুপ্ত—৩/২৯, বিবেকনগর, কলিকাতা ৩২। জহরমোহন দাশগুপ্ত—৬ উমেশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ৫৬। জহরলাল বসু—মাজু পাবলিক লাইব্রেরী, মাজু, হাওড়া। জিতেন সাহা—ঈশ্বরচন্দ্র পাঠভবন, ডে ষ্টুডেন্টস হোম কলিকাতা ৯। জ্যোতির্ময় বসাক—১০ নীলকান্ত চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, তুষারকান্তি সান্যাল—১৪।ডি।১বি দমদম রোড, কলিকাতা ৩০। দাশরথি ভট্টাচার্য—আশুতোষ স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, হুগলী। দিলীপকুমার চক্রবর্তী—সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর। দিলীপকুমার বসু—১।২এ ষ্টেশন রোড, কলিকাতা ১৯। দিলীপকুমার ভট্টাচার্য—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা। দিলীপকুমার ভট্টাচার্য ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা। দিনেশচন্দ্র সরকার—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা। দীপকচন্দ্র দত্ত—আমতা পীতাম্বর হাই স্কুল, আমতা, হাওড়া। দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, কলিকাতা। দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী—অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৪। দেবনারায়ণ দত্ত—বেলমুড়ি নেতাজী তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, বেলমুড়ি, হুগলী। ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিশ্বভারতী পোঃ শান্তিনিকেতন বীরভূম। নচিকেতা মুখোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ২৭। নন্দিতা দে—কলিকাতা। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী, হুগলী। নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী—বি ৫৪।ই মোতিবাগ (সাউথ), নিউ দিল্লী। নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী—৭ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিঃ ১২। নিতাইচাঁদ ঘোষ—১৫ বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। নিমাইচাঁদ ঘোষ—১৫ বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলকাতা। নির্মল কুমার মান্না—কল্যাণব্রত সঙ্ঘ গ্রন্থাগার, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর পাঠাগার, পোঃ ও গ্রাম পুলসিটা মেদিনীপুর। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—৩০/১, ঘোলা রোড, কলিঃ ৫৬। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—বাদল সাধারণ গ্রন্থাগার, বালী; হাওড়া। নিশীথকুমার দে—হেমেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী। নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়—৪০২ কালীঘাট রোড, কলিঃ ২৬। পান্নালাল দাস—মনীন্দ্র পাঠাগার সঙ্ঘ, কাষ্ঠনালী ঈশ্বরদহ:, জলপাই, মেদিনীপুর। পার্বতী মাইতি—রসিকগঞ্জ রবীন্দ্র পাঠাগার, মেদিনীপুর। পি, সুব্রাহ্মনিয়াম—১৮৩৬ ভোতার লেন, কলিঃ ২৯। পূর্ণেন্দু প্রামাণিক—মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, কলিঃ ২৩। প্রণবানন্দ জানা—পরিসংখ্যান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিঃ ১৯। প্রতিমা সেনগুপ্ত—১৮।৩ ফার্ণ রোড, কলিঃ ১৯। প্রমীলচন্দ্র বসু—সুরধাম, মধ্যমগ্রাম, ২৪পরগণা। প্রাণগোবিন্দ দত্ত—৩৭২।৫-এ রসারোড সাউথ, কলিঃ ৩৩। পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—গড়ভবানীপুর রামপ্রসন্ন বিদ্যা-নিকেতন প্রাক্তন ছাত্র সমিতি ও সাধারণ (পল্লী) পাঠাগার, পোঃ চিত্রসেনপুর হাওড়া। ফণিভূষণ রায়—১৪-এ, মহারাজ নন্দকুমার রোড, কলিঃ ২৯। বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১১ই

মনোহর পুকুর রোড, কলি ২৬। বলাইচন্দ্র শীল—গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা। বাণী বসু—৩এ, ফরডাইস লেন কলিঃ ১৪। বালানন্দ পাণ্ডে—২৬ শঙ্করীতলা ষ্ট্রীট কলিঃ। বাসুদেব সাহা—১২.সি, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিঃ ৪। বিনয়কৃষ্ণ মাইতি—গড়বালিয়া, রাখালচন্দ্র মান্না, ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া। বিজয় চক্রবর্তী—সুহৃদসঙ্ঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর, হুগলী। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতাঃ ১২। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়—৮ অনন্তরাম মুখার্জী লেন, হাওড়া। বিভাবসু ঘোষ—উমেশপুর, আগরপাড়া ২৪ পরগণা। বিভূপ্রসাদ বসু—রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির গ্রন্থাগার, সরিষা ২৪ পরগণা। বিমলকুমার মাইতি—সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গ্রন্থাগার, নরেন্দ্রপুর, ২৪পরগণা। বিমলনারায়ণ সুর—৭৫ বকুলবাগান রোড, কলিঃ ২৫। বিশ্বপদ জানা—চৈতন্যপুর, শহীদ পাঠাগার, মেদিনীপুর। বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য—হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগার, হাওড়া। বিশ্বনাথ সিংহ—খলিসানি পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—রিজিওন্যাল কাউন্সিল অব চারটার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা ১৬। বীরেন্দ্রনাথ দাস—৪।১বি, রাধাপ্রসাদ লেন, কলিঃ ৯। বেচারাম ঘোষ—রামপাড়া মোক্ষদাময়ী পাঠাগার পোঃ দক্ষিণ ডিহি, হুগলী। বৈদ্যনাথ মাইতি—সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া। ভবরঞ্জন দাস চাকলাদার—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিঃ ৩। ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আশুতোষ স্মৃতিমন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা। ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—২৬ শাখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৪। ভানুপ্রকাশ সিংহরায়—বিবেকানন্দ পাঠাগার, খারহাট্টা, হুগলী। ভারতী গুহ মজুমদার—রাণী বিড়লা কলেজ, কলিকাতা। ভূপতিরঞ্জন বিশ্বাস—৮৭ ফিডার রোড, কলিঃ ৫৬। ভোলনাথ কর—মহানাদ সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। ভোলানাথ দেবনাথ—মনোহরপুর। সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। ভোলানাথ পাল—মগরা সাধারণ পাঠাগার, পোঃ মগরা, হুগলী। মদন আঢ্য—পুরশুরা কিশোর গ্রন্থাগার, হুগলী। মদনগেপোল ঘোষ—ধ্রুব সংহতি, বালসী, বাঁকুড়া। মদনগোপাল ঘোষ—সাহাপুর লাইব্রেরী, কলিঃ ৩৮। মণিমোহন প্রামাণিক—শ্রীরামপুর বঙ্কিম স্মৃতি পাঠাগার গ্রাঃ ও পোঃ আকড়ি, শ্রীরামপুর, হুগলী। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ—উত্তরবাহিনী লাইব্রেরী, শিয়াখোলা, হুগলী। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ—২২৭ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিঃ ১৯। মনোজকুমার ঘোষ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী। মনোজ রায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিঃ ৩২। মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়—২৯।৮সি চেতলা সেণ্ট্রাল রোড কলিঃ ২৭ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ৩২। মনোরঞ্জন জানা—গড়বালিয়া রাখালচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন, হাওড়া। মহাদেব দাস—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী। মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২। মঞ্জু গুহঠাকুরতা—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ২৭। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কলিঃ ৩২। মাধব দাস—যতীনদাস সেবাসমিতি, গ্রাঃ দেবীতলা পোঃ ইছাপুর, ২৪ পরগণা। মানস মাইতি—মণীন্দ্র পাঠাগার সঙ্ঘ কাঠনালী ঈশ্বরদহ, জলপাই, মেদিনীপুর। মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়—দক্ষপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, হাওড়া। মৃনালকান্তি কুমার—শেওড়াফুলী, হুগলী। মোহিনী মোহন

দাস ঠাকুর—জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, বর্দ্ধমান। রণজিৎকুমার পাল—রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, ৮২ ডঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিঃ ১৪। রবীন চক্রবর্তী—মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। রমলা মজুমদার—বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, কলিকাতা। রমাপ্রসাদ সেন—আই।৪ যাদবতীন পল্লী, কলি ৪৭। রাধাবিনোদ সুরাল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১২। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর। রাসবিহারী মিত্র—চানক পাঠাগার, তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪পরগণা। রেখা চট্টোপাধ্যায়—নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, কলিকাতা। ললিত মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলন, উত্তরপাড়া, হুগলী। শচীনন্দন দে—তিলক সাধারণ পাঠাগার, ভাণ্ডার হাট, হুগলী। শচীন্দ্র ঘোষাল—অকালপৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার, পোঃ অকালপৌষ, বর্দ্ধমান। শম্ভুচরণ পাল—৩৭৪, জি, টি, রোড, হাওড়া ৬। শান্তিপদ ভট্টাচার্য—২ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিঃ ৯। শান্তিময় মিত্র—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি; ২৭। শিবব্রত ঘোষ; ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা শিবশঙ্কর মিত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিঃ ১২। শিবাণী ঘোষ—৩নং নফর কুণ্ডু রোড কলিঃ ২৬। শিবেন্দু মান্না—গড়বালিয়া, হাওড়া। শুবনারায়ণ সিংহ—হিন্দী হাই স্কুল লাইব্রেরী, কলিঃ ১৬। শেখ আবদুল মহিত—বালক সঙ্ঘ পাঠাগার, পোঃ পাঁচলা, ধুনবী, হাওড়া। শেখ মোহম্মদ ইসলাম—বালকসঙ্ঘ পাঠাগার পাঁচলা, পোঃ ধুনবী হাওড়া। শোভা ঘোষ—৫৫।১০এফ পদ্মপুকুর রোড, কলিঃ। শোভা চক্রবর্তী—চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার, মেদিনীপুর। শ্বেতবাহন রায়—বনপাশ প্রগতি পাঠাগার, বর্দ্ধমান। ষষ্ঠীচন্দ্র সাধুখাঁ—ভাঙ্গর পাবলিক লাইব্রেরী, ২৪ পরগণা। সত্যরঞ্জন আচার্য—হাইড রোড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতাঃ ৪৩। সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় —কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, হুগলী। সিদ্ধেশ্বর পাল—প্যারীমোহন স্মৃতি পাঠাগার, ফিডার রোড, কলিঃ ৫৬। সুকুমার ভট্টাচার্য—মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। সুচিত্রা ঘোষ—১।বি, রাজা লেন, কলিঃ ৯। সুচিত্রা ঘোষ—২।ডি, কেদার বসু লেন, কলিঃ ২৫। সুধাময় ভট্টাচার্য—সুহৃদসংঘ লাইব্রেরী, চন্দননগর, হুগলী। সুধাংশু শেখর দে—জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগার, হাওড়া। সুখেন্দু চক্রবর্তী—যতীনদাস সেবা সমিতি, মাঝেরপাড়া, ইছাপুর। সুনীলকান্তি কুমার—শেওড়াফুলি, হুগলী। সুনীলকুমার রায়—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলি ৫০। সুনীলভূষণ গুহ —৮২ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা ৩৭। সুধীর ঘোষ—১৫।বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিঃ ৩। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২। সুশান্ত মুখোপাধ্যায়—রালগাছা, সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। স্নেহময় নন্দী—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি ২৭। স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ—বান্ধব পাঠাগার, সারাজাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা। হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমিরকোলা প্যারীমোহন গ্রামাঞ্চলিক পাঠাগার, পোঃ রূপসা, বর্দ্ধমান। হরিগোপাল রায়—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির, পেঁড়ো, হাওড়া। হরেন দেবনাথ—সাহাপুর লাইব্রেরী, কলিঃ ৩৮। হাজারীলাল মণ্ডল—রাহাহাটী গ্রামীসঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী, ২৪পরগণা। [illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়—সারদাপল্লী বিবেকানন্দ পাঠাগার, ২৪ পরগণা।

Association Notes.

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি :

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২।

২। প্রকাশের সময়ের ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—১০০।১ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা—৪

৪। প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—১০০।১ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা—৪

৫। সম্পাদকের নাম—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—৩০।১ ঘোলা রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬

৬। স্বত্বাধিকারী—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য।

তারিখ—
২৮শে ফেব্রুয়ারী,
১৯৬৬

স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক